পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

সমকালীন বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্তের নাটকের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য

সামসুন নাহার
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

সমকালীন বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্তের নাটকের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য

সামসুন নাহার
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩ আষাঢ় ১৪২০

২৭ জুন ২০১৩

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সামসুন নাহার কর্তৃকপিইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত 'সমকালীন বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্তের নাটকের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ইতঃপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(আহমদ কবির)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাককথন

এ-অভিসন্দর্ভটির জন্যে সবার আগে যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা – আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ কবির। সরকারি চাকুরে হবার কারণে আমার কাজের ধীরগতি তাঁর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে শেষ পর্যন্ত গন্তব্যসীমায় পৌঁছুতে পারলো। কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড.বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রতি। তাঁর প্রস্তাব, প্রেরণা ও উৎসাহে আমি উৎপল দত্তের নাটক বিষয়ে গবেষণায় সম্মতহই। গবেষণাকর্মে রত হয়ে আমি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞবোধ করেছি এ-আবিষ্কার করে – উৎপলের সমাজ ও শিল্পদর্শন আমার নিজস্ব সমাজ-শিল্প চৈতন্যের সাথে বিস্ময়কর রকমে একীভূত – উৎপলের শতাধিক নাটক পাঠে আমি এক নিমেষও ক্লান্তিবোধ করিনি তাই।শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছিঅধ্যাপক সানজিদা খাতুন,অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপকরফিকউল্লাহ্ খান-এবং প্রয়াত অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ,অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস-এর প্রতি;৮০-৯০-এর উত্তাল স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে আমার ছেঁড়াখোঁড়া ছাত্রজীবন যাদের মননশীল সান্নিধ্যেপ্রতিকূল সময়েরঅনেক নিরর্থকতার মাঝে অর্থ আর তাৎপর্য খুঁজে পেতে সহায়ক হয়েছিলো।

কলকাতার টালিগঞ্জে নিজ বাসভবন 'কল্লোল'-এ উৎপল-জীবনসঙ্গী শোভা সেন আমাকে কয়েকদিন সময় দিয়েছেন; উৎপল সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন;উৎপলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ব্যবহার করতে দিয়েছেন; উৎপলের সংগৃহীতদুর্লভ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার ফটোকপি করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।গবেষণাকর্মের বাইরে ও-কদিনের স্মৃতি আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিভাণ্ডারে বিশেষ মূল্যের সঞ্চয় হয়ে থাকলো।

আমার বন্ধু-শুভার্থী এবং এককালেরসহযোদ্ধাদের তালিকা বেশ দীর্ঘ; গবেষণা-কর্মে অনেক শুভার্থী-স্বজন-সহযোদ্ধা আমাকে সহযোগিতা, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন- তাঁদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। বই-পুস্তক,পত্র-পত্রিকা ও তথ্য দিয়ে অনেকেই আমাকে সহযোগিতা করেছেন;এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নামোল্লেখ করতে হয় চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সতীর্থ-বন্ধু অরূপ বড়ুয়ার। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজনড. সাইফুল ইসলাম,মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড.সাইফুদ্দিন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক,বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব প্রিয়বন্ধু জুনায়েদ হালিম, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপসচিব (জনসংযোগ) সুহৃদ শামসুল আরেফিন ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক স্নেহভাজনড. হোসনে আরা জলিএবং বাংলা বিভাগের শিক্ষক, আমার স্নেহভাজনমাহবুব মাসুম(আমার কাজে যাঁরসহযোগিতা কৃতজ্ঞতায় তুচ্ছ করতে চাই না) – ওঁদের নিরন্তর তাগিদ এবং আরও অনেকের মমতাবন্ধন এ-কাজের প্রাণময় প্রেরণা।গবেষণাকর্মটি দ্রুত সমাপ্ত করার জন্যে আমার প্রাক্তন ও বর্তমান সহকর্মীবৃন্দ তাগিদ ও উৎসাহ দিয়েছেন প্রতিনিয়ত; তাঁদের প্রতিও আমারঅশেষ কৃতজ্ঞতা। গবেষণা-কর্মের শুরু থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি আমি। এ-সব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা, কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

সরকারি চাকুরিসূত্রে দীর্ঘসময় ঢাকার বাইরে থাকায় অনেক শুভজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ঢাকায় পদায়ন পেয়ে ফিরে এসে কাউকে কাউকে পুনরায় ফিরে পেয়েছি। এক যুগাধিক সময় পেরিয়ে তেমনি ফিরে পাওয়া একজন,ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে আমার সতীর্থ, একই রাজনৈতিক সংগঠনের সহযাত্রী, জ.বি. বাংলা বিভাগের শিক্ষক –গুণবান তারুণ্য তৈরির কারিগর, দ্রোহী মানুষঅনুজপ্রতিমড. সেলিম মোজাহার –ওর অফুরান উৎসাহএ-রচনাটির প্রাণবীজ। কেবল কৃতজ্ঞতা ওর প্রাপ্য নয়।

ছুটিবিহীন এ-গবেষণাকাজে কর্মক্ষেত্র-পরিবার-পাঠএ-তিনের সমন্বয় করতে হয়েছেআমাকে; রীতিমতো হিমশিম মেনে। আমরা দু'জনেই একই বি.সি.এস (শিক্ষা) ক্যাডারের (একই ব্যাচের) কর্মকর্তা; দু'জনেরই দাপ্তরিক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমার জীবনসঙ্গী শাফীউল মুজনবীন পরিবারের অনেকদায়িত্ব নিজে বহন করে আমাকে গবেষণার ফুরসত তৈরি করেদিয়েছেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়নেরসুবাদে গবেষণার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনার সুযোগ মিলেছে আমার।আমার সন্তানদ্বয়, স্মিতা মহানন্দাও মুনাসিব মনন মায়ের কর্মব্যস্ততার কারণেপ্রত্যাশিত সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত হয়েছে।নিশ্চয়ই একদিন ওরা আমাকে ক্ষমা করবে – ওদের সে পরিণত 'বুঝ'-এর জন্যে আমার অপেক্ষা। আমার অনুজ শাহীন,সাইফুন,সাহানা, শিখা ও অনুজপ্রতিম খান মাহবুব এবং ড.সৈয়দ শামসুদ্দোহা – যাদের নিরন্তর উৎসাহও তাগিদ আমাকে এ-কাজে ধৈর্য আর সাহস যুগিয়েছে। স্বনামধন্য সাংবাদিক সুপ্রিয় শাহানা শিউলী এবং তার পুত্র প্রাচ্য প্রিয়দীপ – আমার এ-কাজে তাদেরও ছিলো ঘনিষ্ঠ শুশ্রূষা, প্রীতিভরে স্মরণ করি তা।

সাম্যবাদে বিশ্বাসী, বীর মুক্তিযোদ্ধা পিতা আমিন উল্লাহ, যাঁর নিয়তসংগ্রাম ছিলো সাম্যবিনাশী শক্তির বিরুদ্ধে। বারডেম হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের শেষ লড়াইযখন চলছে, তাঁর জ্যেষ্ঠ-কন্যা উৎপল দত্তের মতো বিপ্লবী, মার্কসিস্ট নাট্যকারকে নিয়ে গবেষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে দেখে উদ্দীপ্ত দুচোখে আলোর ঝিলিক; সে-আলোক রেখাই আমার বাকি জীবনের পথ চলার প্রেরণা। সবশেষে স্মরণ করি মা সেলিনা আমিনকে : 'আমাকে তুমি জন্ম দিয়েই অশেষ করেছো ঋণী'।

সামসুন নাহার
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) একটি উজ্জ্বল, ব্যতিক্রমী, বিশিষ্ট নাম। চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত যদিও; তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ, উর্বরতম ভূমি নাটক, মঞ্চনাটক। আধুনিক বাংলা নাটকের বিষয় ও রূপরীতিতে উৎপলের রয়েছে স্বতন্ত্র যোজনা। কৈশোরে নাট্যাভিনয়ে যুক্ত হয়ে, বাকি জীবন নাট্যাভিনয়, নাট্য-পরিচালনা এবং নাট্য-রচনায় নিবিষ্ট তপস্বীর মগ্নতা ছিল তাঁর। লিখেছেন শতাধিক নাটক। এ-গুলোর ভেতর পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক যেমন আছে, তেমনি আছে যাত্রাপালা, পথনাটক, একাঙ্ক নাটক; আছে বাংলা-ভাষায় বিদেশি নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর। যে-ধরনের, যে-প্রকরণের নাটকই হোক, তাঁর নাটকের মর্মবস্তু ছিলো সামাজিকভাবে বঞ্চিত, বিড়ম্বিত, শোষিত, নির্যাতিত গণমানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই-সংগ্রাম। সমকালের 'মৃদু প্রগতির ফিসুফিস' ধরনের নাটক তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। নাটকে তিনি চাইলেন, সমাজ- বিপ্লবের কর্কশ রণ-হুঙ্কার। বিশ্বাস করতেন, বিশ্বের সকল বিপ্লবী তাঁর নিকটাত্মীয়। বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যে-ধারা, তা অবিচ্ছিন্ন, একাত্ম। এ-অবিচ্ছিন্ন বিপ্লবী চেতনাধারাকে গণমানসে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর নাট্যকর্মে। তিন বিশ্বাস করেন, বাংলায় রাজনৈতিক নাটকের ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের; কিন্তু তা বিপ্লবী থিয়েটারের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। অর্ধশতাব্দীব্যাপী নাট্যচর্চায় উৎপল দত্ত তাই অভিনিবিষ্ট ছিলেন বাংলা নাটককে বিপ্লবী থিয়েটারের অভিযাত্রায় বেগবান রাখার অঙ্গীকারে। তবে, বিশুদ্ধ নাট্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে দর্শককে আনন্দ দেয়া এবং নাট্য-বিষয়কে শিল্পশুদ্ধ রূপ দানের সতর্ক প্রচেষ্টাও তাঁর ভেতরে ছিল গভীর কর্তব্যবোধের মূল্য নিয়েই।

মানুষে মানুষে ব্যবধান ও বৈষম্যের কার্যকারণ অনুসন্ধান উৎপল দত্তের রাজনৈতিক চেতনা ও ইতিহাস জ্ঞানকে সুগভীর ও সুতীক্ষ করেছে। উৎপল দত্ত ছিলেন নিরন্তর পাঠক; বিপুল-বিচিত্র ছিল তাঁর পঠন-পাঠন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনাগুলোর সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটেছিল। শেকস্পিয়ার, ব্রেখ্ট, ওডেট্স, গোর্কি ও শ-এর মতো কিংবদন্তি নাট্যকারগণের রচনায় তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সমাজ ও শিল্পচেতনা খুঁজে পান এবং তাঁদের রচনা দেশ ও কালের চেতনায় সমন্বিত করে রূপান্তরিত করেন। বলাবাহুল্য, উৎপল দত্তের নাটক সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার প্রসূন। সমাজতান্ত্রিক জীবনবীক্ষা তাঁর রাজনৈতিক চেতনার বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক। অতীত ও সমকালের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির গতি-প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি; তেমনি বাংলা নাটকের গতি-প্রকৃতিরও তিনি একজন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক। আর তাই, ধ্রুপদী নাটকের রূপরীতির সঙ্গে বাংলার হাজার বছরের লোকায়ত নাট্যপ্রকরণকে মেলাতে পেরেছেন তিনি ঐতিহ্যের প্রতি সুবিনীত শ্রদ্ধা ও নব-ঐতিহ্য নির্মাণের জাগর প্রাণনায়।

সমাজকে উৎপল যুদ্ধক্ষেত্র বিবেচনা করেছেন এবং মেনেছেন, সে-যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ের সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার নাটক। বিশ্বাস করতেন গণনাটকে, গণমানুষের নাটকে। ধ্রুপদী নায়কচেতনাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে, সাধারণের ভেতর অন্বেষণ করেছেন অসাধারণ হয়ে ওঠার শক্তি ও সম্ভাবনা। সমাজসত্তার দ্বান্দ্বিক বিবর্তন-বিকাশ ছিল তাঁর দার্শনিক প্রতীতি। তাই, ভাঙন ও সৃষ্টির যুগপৎ যাত্রায় সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁর নাট্যমন, নাট্যদর্শন। নাটক সুখদায়ক বিনোদন নয়; নাটক দায়, বিশেষ কর্তব্যবোধের চেতনাপ্রসূত দায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উপনিবেশ-উত্তর, আধুনিক বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উৎপল দত্তের নাট্যকর্ম স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। 'সমকালীন বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্তের নাটকের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা আমাদের তাই আগ্রহী করেছে। বর্তমান গবেষণা কর্মটি সে বিশেষ, সচেতন আগ্রহের পরিণত ফল। আলোচনার সুবিধার্থে এবং তাঁর নাট্যকর্মের আনুপূর্বিক রূপপরিচিতি পেতে আমরা বর্তমান অভিসন্দর্ভকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় : উৎপল দত্তের কাল ও বাংলা নাটক। এ-অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে লিখেছি বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত। বাংলা নাটক চল্লিশের দশকে এসে যে-গণমুখী চরিত্র অর্জন করেছে, সে-ধারার সার্থক উত্তরাধিকার উৎপল দত্ত। এ-অধ্যায়ে তাই, উৎপলের পূর্ব ও সমসাময়িক নাট্যকারদের নাট্যকৃতির সাথে তুলনামূলক আলোচনায় উৎপল দত্তের স্বাতন্ত্র্যসীমা নির্দেশ ও চিহ্নায়নের চেষ্টা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উৎপল দত্তের জীবন ও নাট্যচর্চা। এ-অধ্যায়ে উৎপল দত্তের নাট্যচর্চা-কেন্দ্রিক বর্ণাঢ্য কর্মময়তা আলোচিত হয়েছে। সংযুক্ত হয়েছে তাঁর জন্ম, শৈশব-কৈশোর, বিদ্যায়তনিক জীবন, পাঠ-পাঠাভ্যাস, ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রান্ত। সব মিলিয়ে উৎপলের শতভাগ নাট্যব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত এ-অধ্যায়ের উন্মোচন।

তৃতীয় অধ্যায় : পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। উৎপল দত্ত রচিত শতাধিক নাটকের ভেতর পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক ৩১টি। ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনী তুলে এনে সমকালের বাস্তবতায় ঐ-বিদ্রোহের প্রেরণাদায়ী প্রাণরস সঞ্চারের চেষ্টা তাঁর নাটকের বিশিষ্টতা। ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, ত্রিশের বিপ্লবী জাগরণ, পারি কমিউন, অক্টোবর বিপ্লব ছাড়াও পৃথিবীব্যাপী স্বপ্নবান গণমানুষের সংগ্রামী জাগরণ তাঁর মৌলিক, পূর্ণাঙ্গ নাটকসমূহের বিষয়ভাবনাকে কেন্দ্রিভূত করেছে। এ-অধ্যায়ে আলোচিত নাটকসমূহেই মূলত নাট্যকার উৎপলের পূর্ণায়ত প্রকাশ।

চতুর্থ অধ্যায় : যাত্রপালা-পথনাটক-একাঙ্কনাটক-রূপান্তরিত নাটক। এ-অধ্যায়ে উল্লিখিত চার ধরনের নাটক আলোচিত হয়েছে। উৎপল রচিত যাত্রাপালার সংখ্যা ২১টি। ইউরোপীয় নাট্য-আঙ্গিকেরসাথে উৎপল বাংলা লোকনাট্যের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন এবং তা করেছেনও সাফল্যের সাথে। যাত্রাপালাসমূহের বিষয় নির্বাচনেও উৎপল ইতিহাসানুরক্ত। ইতিহাসের অস্থিতে সমকালের মজ্জা সংস্থাপন উৎপলের সহজাত সংরাগ। নাট্যকার পানুপালকে বাংলা পথনাটকের পথিকৃৎ মেনেছেন উৎপল নিজেই। তবু অনেক নাট্যবেত্তাই মনে করেন, উৎপলই বাংলা পথনাটকের প্রথম জাগরকর্মী। ২৫টি পথনাটক রচনা করেন উৎপল। নিজেকে 'এজিটেটর,প্রপাগাণ্ডিস্ট' হিসেবে পরিচয় দিতে আগ্রহবোধ করতেন। একাঙ্ক নাটকও উৎপলের নাট্য-সাফল্যের আরেক প্রান্ত। সর্বমোট ২৩টি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন তিনি। তবে, একাঙ্ক নাটকসমূহের বেশিরভাগই ছিলো অ-মঞ্চায়িত, অপ্রকাশিত। শেকস্পিয়ার, ব্রেখ্ট, ভোল্ফ, ওডেট্স, বার্নাড শ-সহ বিশ্বখ্যাত নাট্যকারগণের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাটক উৎপল দত্ত অনুবাদ কিংবা রূপান্তর করেছেন। বর্তমান অধ্যায়ে তারও একটি সংক্ষিপ্ত, পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : আঙ্গিক ও শিল্পরীতি। নাটকের বিষয়ানুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণ-প্রচেষ্টা উৎপলের নাট্যদর্শনের প্রধানতম অন্বিষ্ট যদিও, তাঁর মার্কসবাদী শিল্পবিশ্বাসই মূলত এ-বিষয়ের বিশেষ নিয়ন্ত্রক। উৎপল দত্ত নিজেই নাটক লিখেছেন, পরিচালনা করেছেন, অভিনয় করেছেন এবং সংগীত, মঞ্চ, আলোক, পোশাকসহ প্রযোজনা-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেছেন সমান নিবিষ্টতায়। বিশ শতকের মধ্যকাল থেকে পাশ্চাত্য নাট্যভাবনায় 'পরিচালকের থিয়েটার' বলে যে-বিশিষ্ট প্রত্যয়ের উদ্ভব, তা, কার্যকর অর্থে বাংলা নাটকে উৎপলই লালন করার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণিত ছিলেন। নাটক যৌথ তথা সমন্বিত শিল্পমাধ্যম – এবং উৎপলও যেহেতু কেবল পাণ্ডুলিপি রচয়িতা ছিলেন না, তাই তাঁর নাটকের আঙ্গিক-ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে একজন নাট্যসমন্বয়কের পূর্ণায়ত অভিজ্ঞতা।

অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ ও শেষ অধ্যায় : উপসংহার। এ-অধ্যায়ে সামগ্রিক আলোচনাসূত্রে প্রাপ্ত নাট্যকার উৎপল দত্তের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞাপক সূচকসমূহের সমন্বয়-সার তৈরি করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র :পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ১
উৎপল দত্তের কাল ও বাংলা নাটক

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৪
উৎপল দত্তের জীবন ও তাঁর নাট্যচর্চা

তৃতীয় অধ্যায় ৯০
পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক

চতুর্থ অধ্যায় ১৭৯
যাত্রাপালা-পথনাটক-একাঙ্ক নাটক-রূপান্তরিত নাটক

পঞ্চম অধ্যায় ২৪২
আঙ্গিক ও শিল্পরূপ

ষষ্ঠ অধ্যায় ২৬৭
উপসংহার

পরিশিষ্ট ২৭৯

গ্রন্থপঞ্জী ২৮১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
উৎপল দত্তের কাল ও বাংলা নাটক

বিংশ শতাব্দীর কল্লোলিত তিরিশের দশকে উৎপল দত্তের (১৯২৯–১৯৯৩) জন্ম। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজ-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে উত্তাল চল্লিশে শৈশব-কৈশোর, স্পন্দিত পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যৌবন, আলোক-উন্মুখ সত্তর-আশির দশকে প্রৌঢ় আর আলোড়িত নব্বইয়ে তাঁর মহাপ্রয়াণ। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্ত একটি ব্যতিক্রমী, উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নাম। অর্ধশতাব্দীব্যাপী নাট্যচর্চায় তাঁর অভিনিবেশ ছিল রেভ্যুলিউশনারি (বিপ্লবী) থিয়েটার অভিযাত্রায়। নাট্যজীবনের শুরু থেকেই উৎপল দত্ত শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে নাট্যসাধনার কেন্দ্রিভূত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বঞ্চিত গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের অগ্রপথিকেরা তাঁর নাটকের বিষয়-চরিত্র। কেবল নাট্যবিষয় নয়, নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁর নাটকসমূহ বাংলা নাট্যভুবনে নবমাত্রা সংযোজন করেছে। 'নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা'[১]– এই নাট্যবিশ্বাস উৎপলকে নির্দেশনা দিয়েছিল গণনাট্যের কেন্দ্রভূমিতে গিয়ে দাঁড়াবার। মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত, আর তাই হাজার বছরের ঐতিহ্যলালিত বাংলা নাটককে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিচেতনার নিরিখে 'বিপ্লবী' থিয়েটার চর্চার ধারাস্রোতে মিলিয়ে নেবার চেষ্টায় ব্রতী হন। অবশ্য স্বীকারের দায় রয়েছে যে, বাংলানাটকে এই সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার, অনুপ্রেরণার মর্মবীজ অঙ্কুরিত হয়ে গিয়েছিল বিশ শতকের প্রথমার্দ্ধেই; যা চল্লিশের দশকে এক বিশেষ মাত্রা পায়। বাংলানাটকের সেই গণজীবনমূল সংলগ্নতার ধারাটিকেই ষাটের দশকে নতুন বহমানতা দিয়ে আরো বেগবান করে তোলেন উৎপল দত্ত। কেবল নাট্যবিষয় নয়; নাট্যলক্ষ্য, নাট্যনির্মাণ, নাট্যপ্রয়োগ, নাট্যরূপ সবদিক থেকেই উৎপল দত্ত এক নবযুগের স্রষ্টা। তাঁর কালে তিনিই একক ও প্রাতিস্বিক।

বর্তমান অধ্যায়ের বিষয়ভাবনা উৎপল দত্তের কাল ও বাংলা নাটক। নাট্যকার ও পরিচালকের যৌথযোজনায় নাটকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি আস্ত সমাজের চিন্তা, ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ প্রকাশ পায় বলে উৎপল দত্ত মনে করতেন। শিল্পে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সমাজে, রাজনীতিতে নতুন চিন্তা-চেতনা, নতুন আবিষ্কার, মত-মতাদর্শের গ্রহণে-বর্জনে উত্তাল ছিল উৎপলের সমকালীন পৃথিবী। সঙ্গত কারণে, ভারত উপমসহাদেশও তখন নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি স্থিতাবস্থার দিকে এগুচ্ছিল। আমরা জানি যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় দশক পেরিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে এসে বাংলা-নাট্যচর্চা একটি গণমুখী চরিত্র অর্জন করে। চল্লিশ-পঞ্চাশের সমাজমূল থেকে ওঠে আসা স্বতঃস্ফূর্ত গণমুখিতার সঙ্গে যুক্ত হয় উৎপলের মৌলিক তত্ত্ব-সংস্কৃত মার্কসীয় ধারা। রাজনৈতিক নাট্যকার উৎপল দত্ত বাংলা নাটকে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছেন নাটকের শিল্পগুণ অক্ষুণ্ন রেখে। তিনি মনে করতেন, বিষয়ের গুরুত্ব মেনে নিয়েও প্রথমত নাটক একটি শিল্প এবং শিল্পের প্রাথমিক আবেদন রসগ্রাহীদের রসনাবৃত্তির ভেতর। এখানেই নিহিত সমকালীন বাংলা নাট্যধারায় উৎপলের স্বাতন্ত্র্য।

নাটক শিল্পের এক বিশিষ্ট রূপ(genre)। মানুষ ও তার জীবনাচরণের (action) ভেতরেই রয়েছে নাট্যোপকরণ। জীবনের গতিশীল ক্রিয়া(action)নিয়েই নাট্যের রূপনির্মিতি। তাই দেখা যায়, সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ যে-কটি শিল্পসূত্র সৃষ্টি ও আবিষ্কার করেছে নাট্যকলা তার অন্যতম শুধু নয় অগ্রগণ্য। বাংলা সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নাট্যচর্চা পরিদৃষ্ট হয়েছে মধ্যযুগে এমনকি প্রাচীন যুগেও। মানুষ ও তার জীবনাচার, জীবনাচরণের সাথে যেহেতু নাটক সম্পর্কিত তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাটকের বিষয়-প্রকরণে আবর্তিত হয়েছে সে-সময়ের মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোতে। পুরাণ, রূপকথা, দেবনির্ভরতা, লোকবিশ্বাস, লোকাচার, আঞ্চলিক ঐতিহ্য-সমন্বিত লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেছিল সেকালের নাটক ও নাট্যসাহিত্য।

বাংলাসাহিত্যে আধুনিক যুগ শুরু হবার আগেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ইংরেজদের আগমন ঘটেছে বাংলায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাটক থাকলেও আধুনিক নাটকের সঙ্গে সে-সময়ের নাটকের বিষয় ও শৈলীর দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল প্রধানত দেবতানির্ভর, গোষ্ঠী চেতনাসমৃদ্ধ, গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আধুনিক সাহিত্যে দেবতার জায়গা দখল করে নিয়েছে মানুষ, গোষ্ঠী চেতনার বদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য;ধর্মীয় আবহ নয়, ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, টানাপোড়েন, সংগ্রামশীলতা, বাঁচার লড়াই আধুনিক নাটকের বৈশিষ্ট্যবাহক।

বাঙালির লালিত নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যেই বেঁচে ছিল হাজার বছরের বাংলা নাটক। সংস্কৃত নাট্যরীতি, বাংলার স্থানীয় নাট্যকলা এবং উপনিবেশ প্রভাবিত নাট্যরীতি – এই তিনটি স্বতন্ত্র ধারার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠেছে বাংলা নাটকের বিশিষ্ট রূপ-কাঠামো। আধুনিক বাংলানাটক ও নাট্যশালার বর্তমান যে অবয়ব শতবর্ষ আগে তা এমন ছিল না। ওল্ড প্লেণ্টহাউজ নামক থিয়েটারের মাধ্যমে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়েছে আঠার শতকের ষাটের দশকে কলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজদের বিনোদনের জন্য। ১৭৮০ সালের দিকে কলকাতায় আরেকটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। শতাব্দীর উপান্তে (১৭৯৫) লেবেদেফ-এর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় বেঙ্গলী থিয়েটার। উনিশ শতকের ষাটের দশক নাগাদ বেশকিছু প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছে–যাতে বিশেষ অবদান রেখেছেন কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তির্বগ; এঁদের উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যেই স্থাপিত হয়েছে ঐ-সময়ের নাট্যশালা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার এবং ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল থিয়েটার। স্টার থিয়েটার (১৮৮৭) এবং মিনার্ভা থিয়েটার(১৮৯৩)-এর প্রতিষ্ঠা তৎকালীন নাট্যশালার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উনিশ শতকের শেষার্ধের মধ্যে আরও কিছু থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে গ্রুপ থিয়েটারের ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করে।

১৮৭৬ সালে জারি হওয়া 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়–বাংলা নাট্যান্দোলনে যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে। ইংরেজদের জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিত্র(১৮৩০-১৮৭৩)-এর *নীলদর্পণ* (১৮৬০) নাটক বিশেষ তাৎপর্যবাহী। উপেন্দ্রনাথ দাস(১২৫৫-১৩০২)-এর *শরৎ-সরোজিনী* (১৮৭৪) ও *সুরেন্দ্র বিনোদিনী*(১৮৭৫) নাটক দুটিও একই ধারার উজ্জ্বল সংযোজন। এ

দুটি নাটকে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে আরও জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। নাটকগুলোতে ব্রিটিশদের অত্যাচার-নির্যাতনের দৃশ্য দেখানো হলেও ব্রিটিশ শাসকরা অভিযোগ তোলেন অশ্লীলতার। এ জন্যে নাট্যকার উপেন্দ্রনাথকে কারাবরণ করতে হয়েছে। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লেখা এ-ধরনের নাটক প্রদর্শন সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই তারা নাটক বন্ধ করার নানারকম পাঁয়তারা খুঁজতে থাকে। নানা অভিযোগে নাট্যকারসহ অন্যদের জেল জরিমানা করেও ক্ষান্ত হতে পারছিল না; তারা আরও জোরালো পদক্ষেপের অপেক্ষা করছিল। সুযোগও এসে *গেলগজানন্দ ও যুবরাজ* প্রহসন মঞ্চস্থ করার সুবাদে। এই সময়ে পুলিশ-বিষয়ক ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন *দি পুলিশ অফ পিগ এ্যান্ড শিপ*-এর প্রদর্শন চলছিল। এ ছাড়াও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে এই সময়ে নাটক রচনা ও প্রদর্শন চলছিল-যা বরদাস্ত করা ব্রিটিশদের শ্লাঘায় লাগছিল । ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নাট্যকার বা অন্যদের জেল-জরিমানা না করে চিরতরে এই ধরনের নাটকের প্রদর্শন বন্ধ করতে ১৮৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা নাটকে অশ্লীলতার অজুহাতে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করে।

উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত শহুরে নাট্যচর্চায় শেকস্‌পিয়ার ও ইউরোপীয় নাটকের প্রভাব লক্ষ করা যায়; এর কোনো বিকল্পও তখনকার নাট্যকর্মীদের সামনে ছিল না। এই শতকের প্রথমার্ধে কিছু প্রহসন ধরনের রচনার দেখা মিললেও মৌলিক নাটক রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায় দ্বিতীয়ার্ধে – তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ(১৮১৭-১৮৮৪), রামনারায়ণ তর্করত্ন(১৮২২-১৮৮৬), কালীপ্রসন্ন সিংহ(১৮৪০-১৮৭০) প্রমুখ নাট্যকারের নাট্যরচনার মাধ্যমে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪–১৮৭১) পূর্ব পর্যন্ত সার্থক বাংলা মৌলিক নাটকের দেখা মেলেনি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫৮ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের সংস্কৃত নাটক *রত্নাবলী* ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় *রত্নাবলী* নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে বাংলা নাটকের দীনতা দেখে মাইকেল মধুসূদন খুবই ব্যথিত ও বিরক্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই একটি ভাল নাটক লেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি লিখেন *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯)নাটক। বেলগাছিয়া নাট্যশালা ঐ-বছরই এ-নাটক মঞ্চস্থ করে। *শর্মিষ্ঠা*'র পর মাইকেল মধুসূদন দত্ত*পদ্মাবতী* (১৮৬০), *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১), *মায়াকানন* (১৮৭৪) ইত্যাদি নাটক রচনা করেন। *কৃষ্ণকুমারী* বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি এবং সার্থক ঐতিহাসিক নাটক। বাংলা নাটকে প্রহসন একটি বিশিষ্ট ধারা; এই বিশিষ্ট ধারার জনকও মাইকেল মধুসূদন দত্তই। তাঁর অসাধারণ দুটি প্রহসন হচ্ছে–*একেই কি বলে সভ্যতা* এবং *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িক আর এক অসীম সাহসী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র; গণমানুষের গণসংগ্রাম তাঁর নাটকেই প্রথম ওঠে আসে। বাংলার কৃষকদের নীলচাষের বিরুদ্ধে যে-মনোভাব – প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ তারই ইতিবৃত্ত *নীলদর্পণ*। এই নাটক তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক অবদান রেখেছে, বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিকশিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। *নীলদর্পণ* ছাড়াও দীনবন্ধু মিত্র *নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, লীলাবতী, জামাইবারিক* ও *কমলে কামিনী* ইত্যাদি নাটক ও প্রহসন রচনা করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররা হলেন মনোমোহন বসু(১৮৩১–১৯১২), মীর মশাররফ হোসেন(১৮৪৭–১৯১২) প্রমুখ।

উনিশ শতকের শেষাংশ ও বিশ শতকের প্রথমদিকে– জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫),অমৃতলাল বসু(১৮৫২-১৯২৯), উপেন্দ্রনাথ দাস,ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯২৭) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৫-১৯১৩) প্রমুখ নাট্যকারদের নাট্যপ্রয়াসে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে এ-সময়ের বাংলা নাটক। এই সময়ের নাট্যকারবৃন্দ বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরণেসচেষ্ট ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ(১৮৪৪–১৯১২),শিশিরকুমার ভাদুড়ি(১৮৮৯–১৯৫৯) প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব থিয়েটারকে বাবুশ্রেণীর হাত থেকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ব্যতিক্রম। *বাল্মীকিপ্রতিভা* (১৮৮১) দিয়ে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাট্য জীবনের যাত্রা শুরু –তিনি (নাটক, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য, প্রহসন ইত্যাদি) সব মিলিয়ে প্রায় অর্ধশত নাটক লিখেছেন। রবীন্দ্র নাটক মানবিকতা-প্রধান। মানবিকতার পীড়ন তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাই তাঁর নাটকে তিনি মানুষকে উদার অবস্থায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সময়ে ইউরোপে রূপক নাটক লেখা হতো। তিনি সেগুলো দেখেছেন। তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। *মুক্তধারা, অচলায়তন, রক্তকরবী*তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা তথা সংলাপ অসাধারণ ও অতুলনীয়।

বিংশ শতাব্দীর মানুষের বড় অর্জন প্রযুক্তি তথা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার । ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও হ্যাক্সলির জীববিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কার ইতোমধ্যে মানুষের প্রথাগত বিশ্বাস ও সংস্কারকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। আধুনিক মানুষের বড় বৈশিষ্ট্য যুক্তিবাদিতা। মানুষের প্রথাগত ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, পুরানো বিশ্বাসের জায়গা দখল করেছে যুক্তি ও বিজ্ঞান মনস্কতা। একালের মানুষ সব কিছুই গ্রহণ করতে চেয়েছে বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে; প্রশ্ন করে যাচাই করার মধ্য দিয়ে। বিবর্তনবাদ, বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক আবিস্কার সব কিছুর মধ্যে সমাজ বিকাশের বৈপ্লবিক ধারণা মানুষের চেতনার জগতকে আন্দোলিত করে। কার্ল মার্কস্-এর শ্রেণিহীন শোষণহীন সমাজের ধারণা মানব সমাজে এক বৈপ্লবিক মতবাদের ধারণা। মার্কস এবং এঙ্গেলস্ মনে করেন পৃথিবীর ইতিহাস হল শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়েই নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে। আর নতুন সমাজ ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক শ্রেণি। মার্কস-এঙ্গেলস দাস বিদ্রোহ, সামন্ত বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিকদের দাবি আদায়ের লড়াই সকল বিদ্রোহকে বিবেচনা করেছেন শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে; তাঁদের মতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনো কিছুই নিরপেক্ষ নয়, হতে পারে না; হয় তা শোষকের পক্ষে, নয় তা শোষিতের পক্ষে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনো না কোনো শ্রেণিই নিয়ন্ত্রণ করে ঐ ব্যবস্থাকে। উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ যার হাতে সমাজের কর্তৃত্বও থাকে তার হাতে। মানুষের ইতিহাস সম্পর্কিত উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে। তাই মার্কস-এঙ্গেলস উৎপাদন ব্যবস্থায় বুর্জোয়া বা ধনিক শ্রেণির মালিকানার অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন। উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পদের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের প্রথম ধাপ; এটা সম্ভব শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লব সংঘটিত করে। সমাজতন্ত্রের পরের ধাপ সাম্যবাদ। কার্ল মার্কস্ বলেছেন :

> বিপ্লবে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিকাশ ঘটে। শ্রমিক কৃষককে পুঁজিপতিরা করে রাখে ব্যক্তিত্বহীন গোষ্ঠীবদ্ধ উৎপাদনী যন্ত্রমাত্র। তারা আধখানা হয়ে আছে। বিপ্লব তাকে এই পরিচয়হীনতা থেকে মুক্তি দেয়।...সমাজবিবর্তনের নিয়মগুলি একবার সম্যক বুঝতে পারলেই মানুষ আর সেনিয়মের অন্ধ বলি হতে রাজি হবে না, সে লড়াই করবে।[২]

মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদের ধারণার পূর্বেও রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে – তবে তা হয়েছে এক শাসকের পরিবর্তে আরেক শাসকের ক্ষমতা দখল। অর্থাৎ ক্ষমতার হাত বদল। ঐ শাসক-শোষকরা রাষ্ট্রযন্ত্র তথা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখেই শাসন ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছেন। মার্কস্-এঙ্গেলস্ এই প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পুর্ণ ভেঙে ফেলে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে নতুন সমাজ ব্যবস্থার কথা বললেন – যে-ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করবার জন্য আছে সারা বিশ্ব– এই দৃঢ় প্রত্যয় এবং বিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবী শক্তি হিসেবে নিজেদের আস্থা ও সাহস সবসময় প্রজ্জ্বলিত রাখার ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেছেন।

ব্যাপক জনতা বা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ তথা শ্রমিক শ্রেণির নিকট সমাজের পরিবর্তনের এবং সমাজবিজ্ঞানের চেতনা পৌঁছানোর সব থেকে বড় মাধ্যম হল রাজনৈতিক নাটক। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজের পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি বুঝতে হলে সমাজ বিকাশের স্তরগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। সমাজবিজ্ঞানের চেতনা ছাড়া মানুষের ইতিহাস,সমাজবিকাশের স্তর ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানা যায় না। মার্কস এঙ্গেলস তাই সমাজ পরিবর্তনের চেতনার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের চেতনার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। রাজনৈতিক নাটকে শ্রমিক শ্রেণি,তথা সাধারণ মানুষের কাছে সমাজ বিকাশের স্তর,ধারণা তথা সমাজবিজ্ঞানের চেতনা পৌঁছানোর প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

মার্কস্-এঙ্গেলস-এর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারণা চিন্তাশীল সৃষ্টিশীল মানুষের চেতনার জগতে নাড়া দিয়ে আসছিল উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লব সংঘটিত হওয়া এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিশ্ব ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। এর প্রভাব সাহিত্য-সংস্কৃতি নাটকে পড়াই স্বাভাবিক। বিশ শতকের এইসব ঘটনাপ্রবাহই রাজনৈতিক নাটকের জন্ম অনিবার্য করে তোলে। রাজনৈতিক নাটক নিপীড়িত মানুষের পাশে, শ্রমিক শ্রেণির পাশে দাঁড়িয়েছে। এই নাট্য-সৃজন মঞ্চায়ন,অভিনয় সবকিছুতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাজুয্য লক্ষ করা যায়।

রাজনৈতিক তথা মার্কস্বাদী থিয়েটার নির্মাণে জার্মানিতে এরভিন পিসকাটর এবং বের্টল্ট ব্রেখট অনন্য অবদান রাখলেও তাঁরা জার্মানে ফ্যাসিস্টদের জন্য টিকতে না পেরে বাধ্য হয়েছেন দেশ ছাড়তে। যুদ্ধশেষে অবশ্য ফিরে এসেছেন নিজ বাসভূমে। ব্রেখ্ট-এর এপিক থিয়েটার বিশ্বব্যাপী নাট্যজগতে সাড়া জাগিয়েছে। পিসকাটর, ব্রেখট, ফ্রিডরিশ ভোলফ্ প্রমুখ নাট্যকারদের নাট্যপ্রয়াসে যে-রাজনৈতিক থিয়েটারের জন্ম হয় তা গোটা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বব্যাপী নাট্যকাররা রাজনৈতিক নাটক নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের মতে এ-বিশ্বে থেমে থাকা বলে কিছু নেই,সবই নিয়ত পরিবর্তনশীল। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে আস্থাবান ব্রেখট বিশ্বাস করতেন সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল, মানুষের চিন্তা-চেতনাও পরিবর্তনশীল। দর্শককে এই পরিবর্তনের ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে নাটকের মাধ্যমে। নাটকে এমন বিষয় হাজির করতে হবে যাতে দর্শকরা চলমান সমাজের পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়। থিয়েটারকে ব্রেখট সমাজ পরিবর্তনের যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বুর্জোয়া নাটকে যেখানে খণ্ডিত জীবনের ছবি, ব্যক্তি মানুষকে দেখা হয় বিচ্ছিন্নভাবে; ব্রেখ্ট-এর থিয়েটার সেখানে অখণ্ড জীবন,পূর্ণ মানুষের ছবি উপস্থাপন করে– মানুষের ভালো-মন্দ, ক্ষুদ্রতা, নীচতা মহত্ব সব মিলিয়ে শ্রেণিচরিত্রসহ আস্ত মানুষকে হাজির করে। সমাজের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ব্রেখট তাঁর নাটকে দর্শক এবং দর্শকের তৃপ্তির দিকেও খেয়াল রেখেছেন ষোল আনা।

নাটকের আলোচনায়অনিবার্যভাবেই এ্যারিস্টটল এসেযায়। সমালোচকেরা ব্রেখটকে সচেতনভাবে অ-এ্যারিস্টটলীয় হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এর নায়কের যে শৌর্য, বীর্য, উচ্চ আদর্শ, সর্ব গুণে গুণান্বিত মহত্বের কথা বলেছেন– ব্রেখ্ট এসবের বিরোধী। সর্বাঙ্গসুন্দর কোনো মানুষের চিন্তায় মার্কসিস্ট নাট্যকার ব্রেখ্ট-এর আস্থা নেই। মার্কসবাদ কোনো চিরন্তনতায় বিশ্বাস করে না,সব কিছুই নিরন্তর পরিবর্তনশীল, আপেক্ষিক। তাই মার্কসবাদের বিচারে অনড় আদর্শ বলে কিছু নেই। ব্রেখ্ট-এর কাছে সব মানুষের মধ্যেই ভালো-মন্দ দুই দিকই আছে, সম্পূর্ণ ভালো বা সম্পূর্ণ খারাপ মানুষের অস্তিত্ব তাঁর কাছে নেই। দ্বান্দ্বিকতায় বিশ্বাস করেন বলে তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো ভালো-মন্দ নিয়ে বৈপরীত্যসহই নাটকে উপস্থিত হয়েছে।

যুগ,সমাজ, শ্রেণি,সংস্কৃতি সবকিছুই নাটকের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।তাই মার্কর্সবাদ বলে,

> যে-কোন যুগে উৎপাদনী-শক্তিগুলির ভিত্তিতে উৎপাদনী-সম্পর্কগুলি গড়ে ওঠে। গোড়ায় এই সম্পর্কগুলি–প্রভু-ক্রীতদাস, জমিদার-ভূমিদাস,বুর্জোয়া-শ্রমিক–আবির্ভূত হয় উৎপাদনী-শক্তিকে আরো এগিয়ে দিতে,সমাজ তথা ইতিহাসকে আরো এগিয়ে দিতে। কিন্তু কালক্রমে এই শ্রেণিবিন্যাসই হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদন তথা সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা-স্বরূপ। তখন উৎপাদনী-শক্তি ও উৎপাদনী-সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ ঘটে এবং অবশেষে নূতন শ্রেণীবিন্যাস ঘটে। ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে উৎপাদনী-শক্তি ও উৎপাদনী-সম্পর্কের যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া,তারই প্রতিফলন হয় সেই যুগের সব সাহিত্যে,বিজ্ঞানে,আইনে,দর্শনে,ধর্মে, লোকাচারে,রাষ্ট্রে,রাজনীতিতে।[৩]

সাহিত্য তথা নাটকের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে যায় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি।ভারতে উনিশ শতকের শেষার্ধে– ১৮৮৫ সালে, কংগ্রেসের জন্মের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। মুসলিম লীগের জন্ম ১৯০৬ সালে,বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ সালে এবং বঙ্গভঙ্গ রদও হয় ১৯১১সালে এ-সব ঘটনার ধারাবাহিকতায় বিশ শতকের গোড়াতেই জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতে থাকে। অন্যদিকে বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে সশস্ত্র ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রস্তুতিও চলতে থাকে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি প্রথম দিকে ছিল মন্থর । দেশের যুবসমাজ এ-রকম মন্থরতা বা নিষ্ক্রিয়তা মেনে নিতে পারেনি। গান্ধীর নেতৃত্বে যে-জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলছিল ঐ আন্দোলন দেশের তরুণ সমাজের তারুণ্যকে ধারণ করতে পারেনি। তরুণরা আরো অগ্রসর ও জোরালো আন্দোলন চাইছিল; গান্ধী যে-ধরনের আন্দোলন করছিলেন ঐ-রকম আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়ন করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে বলে তরুণদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছিল না এবং এতে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণও তাঁরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষা-অনুযায়ী দেখতে পায়নি। তাই দেশের তরুণ সমাজ সশস্ত্র ও বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ঐ আন্দোলনে অংশ নিতে আগ্রহ বোধ করে। তাঁরা বৃটিশ শক্তিকে ভারতের মাটি থেকে চিরদিনের মত বিদায় দিতে,পরাধীনতার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে সর্বোপরি শোষণ,নিপীড়নমুক্ত সমাজ বির্নিমাণে কোনো অহিংস আন্দোলনে আস্থাশীল হতে না পেরে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র সংগ্রামে। এ-কারণে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র তথা বিপ্লবী আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারত উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় দশকের মধ্যে জন্ম হয়েছে নানা সংগঠনের, ঘটেছে নানা ঘটনা– যার সাক্ষ্য বহন করে যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি, মানিকতলার বোমা ষড়যন্ত্র, অরবিন্দ, বারীণ ঘোষ, যতীন মুখোপাধ্যায়ের আত্মত্যাগ, রাইটার্সের অলিন্দ যুদ্ধ কিংবা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ইত্যাদি। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ রাজশক্তি রাউলাট এ্যাক্ট পাশ করে। বিনা বিচারে আটক, অমানুষিক নির্যাতন, সভা-সমাবেশ বন্ধ, গুলি করে হত্যা ইত্যাদি এই এ্যাক্টের মাধ্যমে বৈধ করে নেয় ইংরেজ শাসক। ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়; তবে আরও কয়েক বছর সময় লেগেছে পার্টি সংগঠিত হতে। এই সময়ে সাম্যবাদী ভাবনার দু'টি পত্রিকা গণবাণী ও লাঙ্গল প্রকাশিত হয়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছে ১৯২৯ সালে। কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে। সারা বিশ্বব্যাপী যেমন একদিকে ফ্যাসিস্ট শক্তির অভ্যুত্থান হয়েছে, বেড়েছে অর্থনৈতিক মন্দা, হতাশা, নৈঃসঙ্গ্য, অচরিতার্থতা তেমনি অন্যদিকে এসবের ভেতর থেকে গণতন্ত্রকামী মানুষ এর থেকে উত্তরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে– তাদের মধ্যে মৈত্রীচেতনা, সাম্যবাদী ভাবনা দৃঢ়তর হয়েছে। ভারতের সমাজ বিকাশের ইতিহাসে সাময়িকপত্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কল্লোল, কালিকলম, শিখা ইত্যাদি পত্রিকাগুলোকে কেন্দ্র করে এক একটি সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠেছে যা ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি অঙ্গনকে আন্দোলিত করেছে এবং সুদূর প্রসারী প্রভাবও বিস্তার করেছে।

ভারতসহ সারা পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন যখন তুঙ্গে তখন ১৯৩৩ সালের জুন মাসে প্যারিসে গঠিত হয় এন্টিফ্যাসিস্ট ওয়ার্কার্স কংগ্রেস। এর নেতৃত্ব দিয়েছেন সোস্যাল ডেমোক্রেট, কমিউনিস্ট ও ইউরোপের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। এই প্রয়াসের অংশ হিসেবে ১৯৩৪-এ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এন্ড ওয়্যার গঠিত হয়েছে। পৃথিবীর এমনই দুঃসময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রগতিশীল মানুষের মানবতাবাদী যুথবদ্ধ প্রয়াসের অংশ হিসেবে ১৯৩৬ সালে ভারতে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন বা ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ। একই বছরে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লীগ

এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এন্ড ওয়্যার-এর ভারতীয় কমিটি গঠিত হয় ১৯৩৭ সালে– যার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রগতিশীল, সৃষ্টিশীল মানবপ্রেমিক মানুষের নানা উদ্যোগ আয়োজন কোন কিছুই ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধকে রুখতে পারেনি। ১৯৩৯সাল থেকে যথারীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, এই বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তি জড়িয়ে পড়ে।

> ফ্যাসিজমের অমানবিক রূপ সাধারণ মানুষের অদেখা ও অজানা। তবুও সুদূরের যুদ্ধ এগিয়ে এসে গ্রাস করল তাঁর দিন-রাত্রি। তাঁর নিষ্প্রদীপ বিনিদ্র রাত সাইরেনের তীব্র আর্তনাদে খানখান হয়ে যায়। অসহায় চোখ মেলে সে দেখে বিদেশী সৈন্যের দাপাদাপি আর রাজপথে ক্ষুধিত কংকালের মিছিল। রুদ্ধ দুয়ারের ওপার থেকে শোনা যায় ক্ষুধাতুর শিশুর কান্না। যুদ্ধ হানা দিয়েছে আকাল আর মারী মড়কের চেহারা নিয়ে।[৪]

গণতন্ত্র যেখানে বিনষ্টির শিকার, সেখানে শিল্প সাহিত্যও বিনষ্টির কবলে পড়াই স্বাভাবিক। পরাধীন ভারতবাসীর জীবনে যুদ্ধ এসেছে মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে। যুদ্ধের অনিবার্য ফসল হতাশা বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা, স্বপভঙ্গ। ফ্যাসিস্ট ব্রিটিশ ও তাদের এদেশীয় দালাল মুনাফাখোরদের দৌরাত্ম্যে বাংলায় নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। আর তার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা ও ঝড়। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে ইংরেজ ও দেশীয় লুটেরা, মুনাফাবাজদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ উভয়ের মাঝে পড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে মানুষের জীবন। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে, আর কোটি মানুষের জীবনে গভীর ছায়াপাত রেখে যায় এ-দুর্ভিক্ষ। এভাবে ভারতবাসী তাদের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এ-দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল, যে কোন মূল্যে এদেশ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়ন। তাই ফ্যাসিস্ট-জার্মানির চেয়ে তাদের কাছে বড় বিষয় ছিল ফ্যাসিস্ট ইংরেজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তের প্রগতিশীল মানুষের সাথে ভারতের জনগণের ভাবনার ঐক্য থাকলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল মানুষের বেদনা আর ভারতীয়দের বেদনা এক নয়। কারণ, যে ইংরেজ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সেই ইংরেজই ভারতে পৌনে দু'শ বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়নের স্টিমরোলার। একদিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এই দুই বিষয় নিয়ে ছিল অন্তহীন বিতর্ক:

> ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে, আন্তর্জাতিকতাবোধ ও জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব কমিউনিস্ট ও অন্যদের মধ্যে সৃষ্টি করলো এক দুস্তর ব্যবধান। আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কমিউনিস্টদের দৃষ্টিতে মূল শত্রু ফ্যাসিজম। এবং যুদ্ধে ফ্যাসিজমের জয় ও লালফৌজের পরাজয়ের অর্থ মানব সভ্যতার বিনাশ ও সমাজ বিকাশের ধারায় ছেদ। অপরদিকে জলন্ত বাস্তব হল – দেশের মাটিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন অস্তিত্ব। স্বদেশ ও বিশ্বকে মেলাতে গিয়ে এক সংকটের আবর্তে গিয়ে পড়ে ভারতের কমিউনিস্টরা ।[৫]

এই সময়ে (১৯৪০সালে) মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব পেশ করে।Youth Cultural Institute (YCI) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০ সালে। এরই মাঝে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আগস্ট আন্দোলন। আগস্ট আন্দোলনের তীব্রতা গোটা দেশকে আন্দোলিত করলেও নজিরবিহীন নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে এ আন্দোলন দমন করেছে ব্রিটিশ

শাসকরা। প্রগতিশীল লেখক শিল্পী–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনী রায়, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ ১৯৪২ সালে গঠন করেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক বা শিল্পী সংঘ।

অস্থির সমাজ, বিরুদ্ধ সময়ে দাঁড়িয়েও সৃষ্টিশীল মানুষ উপহার দিয়েছে অসাধারণ সব সৃষ্টি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদাহরণ, সমাজে চলমান বৈষম্য; এই বৈষম্য-বিলোপে মার্কসবাদে বিশ্বাস, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধে অনাস্থা, মানব মনের কামনা-বাসনা এবং জটিল জিজ্ঞাসা কল্লোল যুগের সাহিত্যকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। কিন্তু বাংলা নাটক তিরিশের দশকের প্রথাবিরোধী দ্রোহী কবিতা ও কথা সাহিত্যের মত আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শিশির ভাদুড়ী, ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যকারদের নিরন্তর প্রয়াসে বাংলা নাটক অনেকদূর অগ্রসর হলেও গণজীবনমূলসংলগ্ন হতে পারেনি। বিশ শতকের প্রথম তিন চার দশক আধুনিক বাংলা নাটকের প্রস্তুতি পর্ব। নাটকের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত সময়, সমাজ, সর্বোপরি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি । বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা নাটকের পালাবদলের পালায়(গণনাট্য সংঘ-এর *নবান্ন* প্রযোজনার পূর্ব পর্যন্ত) যে-ক'জন নাট্যকারের আগমন বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়(১৮৭৫-১৯৩৪), নিশিকান্ত বসু রায়(১৮৮৪–১৯২৯),শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত(১৮৯২–১৯৬১), মন্মথ রায়(১৮৯৯–১৯৮৮),(বনফুল)বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯–১৯৭৯), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী(১২৯৫–১৩৪৯ব.), জলধর চট্টোপাধ্যায়(১২৯৭–১৩৭১ব.),বিধায়ক ভট্টাচার্য(১৯০৭–১৯৮৬), মনোজ বসু(১৯০১–১৯৮৭), প্রমথনাথ বিশী(১৯০১–১৯৮৫)এবং মহেন্দ্র গুপ্ত(১৯১০–১৯৮৪) প্রমুখ।

গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আন্দোলন-সংগ্রামকে জনতার সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যের মধ্য দিয়েই Indian People's Theatre Associotion (IPTA)বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর জন্ম। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ভারতের সংস্কৃতিজগতে বিশেষত গণমুখীধারার শিল্প সংস্কৃতি চর্চার এক মাইলফলক। প্রথমে প্রগতি লেখক সংঘ পরে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের হাত ধরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে ১৯৪৩ সালের মে মাসে Indian People's Theatre Associotion(IPTA) বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ জন্ম লাভ করে।

মন্বন্তর এবং বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বাংলার সমাজ এবং রাষ্ট্র যখন গভীরভাবে আন্দোলিত বাংলা নাটক এবং নাট্যশালায় তখনও সেই পুরনো চর্বিতচর্বণ; বিশ্বের উত্তাল পরিস্থিতি,ভারতের অবস্থা তৎকালীন নাটকে প্রতিফলিত হয়নি–

> কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালা তখনো দীপাবলী তেজে জাজ্বল্যমান এবং সমাজ-জীবনের এই বিপর্যয় থেকে উটপাখির মতো মুখ লুকিয়ে সেই গতানুগতিক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং সামাজিক (উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ-জীবনের রঙীন ছবি) নাটক অভিনয় করে চলেছে। বাংলা নাটক তখনো আবেগ সর্বস্ব জাতীয়তাবাদ (মেবার পতন, গৈরিক পতাকা) বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা(বিরাজ বৌ, বাংলার মেয়ে) কিংবা দৈবলীলার ভক্তিভাষ্য (কর্ণার্জুন, সীতা,

নরনারায়ণ) নিয়েই মশগুল ছিল। গলিত নীতি, ধর্ম ও দেশাভিমানের তরল আবেগসর্বস্বতার সীমাবদ্ধ গণ্ডীতেই বাংলা নাটকের চর্বিতচর্বন চলছিল ।[৬]

ভারতের রাজনীতি এবং সংস্কৃতির এক ক্রান্তিলগ্নে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্ম। 'গতানুগতিক পেশাদারি মঞ্চের আওতার মধ্য থেকেই তার সংস্কারের প্রচেষ্টায় এদেশে গণনাট্যের উদ্ভব নয়, তার উদ্ভব হয়েছে সমাজমানসের এক রাজনৈতিক,ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণে।'[৭] তৎকালীন থিয়েটার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি বলেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এগিয়ে এসে সে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। গণমানুষের স্বপ্ন আর সংগ্রামকে ধারণ করে গণনাট্য সংঘের পথ চলা শুরু। IPTA কেবল একটি গোষ্ঠী ছিল না এটি ছিল একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বিভিন্ন গণআন্দোলন এবং শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য সংগ্রামী শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই তথা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে এর ভূমিকা জোরালো হলেও সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এই সংগঠন ব্যাপ্তি লাভ করে। জীবনের মৌল সমস্যা–ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতার বিষয়ে ভারতের নবীন সাহিত্য যেন আলোকপাত করে তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ভারতীয় গণনাট্যসংঘের প্রথম প্রকাশিত ইশতেহারে।

আলোচনার সুবিধার্থে IPTAবা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করা যেতে পারে:
ক. গণনাট্যের নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয় জীবনের বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে। খ.সমস্যা উত্তরণের পথ নির্দেশনা থাকে এতে। গ.প্রথাগত নাটকের নায়কের মহিমার পরিবর্তে গোষ্ঠীর মহিমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়; ব্যক্তি এখানে শ্রেণি প্রতিনিধি। ঘ.সাধারণ দর্শক– বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক মেহনতী মানুষের মনোরঞ্জন ও তাদের চেতনার জাগরণ ঘটে এই নাটকে। ঙ.গণসঙ্গীত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ যে-আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়ে নাট্য প্রযোজনা করতে শুরু করল তা হল– ব্যাপক জনতার মাঝে নাটক পৌঁছে দেয়া। সঙ্গতকারণেই নাটকের বিষয়বস্তু পাল্টে গেল; এক কথায় সবই পাল্টে গেল। গণনাট্য আন্দোলন যেহেতু একটি বিশেষভাবাদর্শে বিশ্বাসী তাই একদিকে এর চিন্তায় নুতনত্ব অন্যদিকে সাংগঠনিক দায়-দায়িত্বও ভিন্নতর ছিল। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা এল, বিশেষত কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী;ব্যক্তির পরিবর্তে এলো সমষ্টি, যুক্তিবাদিতা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আস্থা, বস্তুতান্ত্রিক জীবন-ভাবনা, শোষক ও শোষিতের শ্রেণিনির্দেশ, একক নায়কের পরিবর্তে সমষ্টিকে বিশেষত শোষিত শ্রেণিকেই নায়ক করা– এসব কিছুই গণনাট্যের নাটকে গ্রহণ করা হল। গণনাট্যের নাটকে স্বভাবতই সমসাময়িক সমাজ ও মানুষ বিশেষত শোষিত জনগণের পক্ষে কথা বললো। নাটকের বিষয় চরিত্র বদলের পাশাপাশি আঙ্গিকও বদলে গেল–মঞ্চব্যবস্থা, আলো, সাজ, রূপসজ্জা, অভিনয়–সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হল। মঞ্চব্যবস্থা হল সরল, দলগত অভিনয়কে প্রাধান্য দেয়া হল, বিষয় ও আঙ্গিকের মধ্যে সাযুজ্য এল। ব্যক্তি মালিকানাধীন থিয়েটারের পরিবর্তে একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে নাট্যপ্রযোজনা হতে

থাকল। গতানুগতিক থিয়েটার নয়, একটি বিশেষ লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে তৎকালীন প্রথাগত থিয়েটারের বিপরীতে গণনাট্য আন্দোলন কাজ করতেশুরু করল।

ব্যাপক জনগোষ্ঠী বিশেষত শ্রমিকশ্রেণিকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে রাজনীতিকে প্রসারিত করতে হবে নীচের মহলে;তাই উৎপল দত্ত মনে করেন–

> মার্কসবাদী নাট্যকর্মীর কাছে ধ্রুপদী নাটক প্রধানত আঙ্গিক শিক্ষার ক্ষেত্র। রাজনৈতিক নাট্যকর্মীর কাছে বুদ্ধিজীবীর পিঠ চাপড়ানি পরিত্যজ্য, সমালোচকের ভ্রূকুটি উপেক্ষণীয়। সে ব্রেখটের কাছেও শিখবে, শেকসপিয়ারের কাছেও, গিরিশের কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য তো একটাই– রাজনীতি প্রসারিত করা নীচের মহলে।[৮]

রাজনৈতিক নাটকের প্রধান কাজ শোষিত জনগোষ্ঠী বিশেষত শ্রমিকশ্রেণির কাছে রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো।
রাজনৈতিক নাটকের যাত্রা শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে, চীনে তিরিশের দশকে পিপলস থিয়েটারের মাধ্যমে; ভারতে চল্লিশের দশকে গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে। গণচেতনাশ্রয়ী নাট্যকার রমারলাঁ-এর পিপলস্ থিয়েটার গ্রন্থের ব্যতিক্রম ও বিপ্লবাত্মক বক্তব্যের জন্য ইউরোপে হৈ চৈ পড়ে যায়। চীনের পিপলস থিয়েটার, সোভিয়েত থিয়েটার ও রমারলাঁর পিপলস্ থিয়েটার ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে প্রভাবিত করেছে। নরওয়েজিয়ান নাট্যকার ইবসেন, রুশ নাট্যকার গোর্কি পৃথিবীর নাট্যগজতে ঝড় তুলেছেন তাঁদের নাটকের জন্য। এঁদের নাটক ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়; আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জনপ্রিয়ও হয়।

গণনাট্যসংঘের নাট্যপ্রয়াসের ফলশ্রুতিতে চল্লিশের দশকে বাংলা নাটকে গণমানবকেন্দ্রিক নতুন নাট্যধারার সূচনা হয়। গণনাট্য সংঘের প্রথম নাট্যপ্রয়াস বিজন ভট্টাচার্য(১৯১৫–১৯৭৮)-এর *আগুন* (অভাবী অনাহারগ্রস্ত মানুষের অভাব, স্বভাব,হাহাকার –এই নাটকের বিষয়) এবং সংগে বিনয় ঘোষ(১৯১৭–১৯৮০)-এর*ল্যাবরেটরী* (বৈজ্ঞানিকও মানুষ; দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দুঃসময়ে বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীর দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে পারেন না, তাঁকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়–এই বাস্তবতাই *ল্যাবরেটরী*র বিষয়)। নাটক দু'টি মঞ্চস্থ হয়েছে ১৯৪৩ সালের মে মাসের নাট্য ভারতীতে। ১৯৪৪ সালে অভিনীত হয় গ্রামীণ মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামি কুসংস্কার ও তা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টাকে উপজীব্য করে নির্মিত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের *হোমিওপ্যাথী* এবং বুভুক্ষু মানুষের গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা, অভিযোজনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়া এবং অন্তিমে আশাবাদ নিয়ে নির্মিত বিজন ভট্টাচার্যের *জবানবন্দি*। গণনাট্যধারার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা বিজন ভট্টাচার্যের*নবান্ন* (প্রযোজনা ১৯৪৪)। *নবান্ন* নাটকে সমকালীন জীবনের চিত্র এবং মানুষের জীবন-সংগ্রাম এমনভাবে রূপায়িত হয়েছে যে, তা তার কালকে ছাড়িয়ে ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে।

দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম ও ত্যাগের ফলশ্রুতিতে অবশেষে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়– প্যাটেল, মাউন্ট ব্যাটেন, নেহেরু এবং গান্ধীর আপসরফায়। তার আগেই ঘটে যায় ইতিহাসের ভয়াবহতম দুর্ঘটনা – ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা। সেদিনের সেই ত্যাগী মানুষরা কোথায় যেন হারিয়ে গেল; স্বাধীনতার ফসল তারা ঘরে তুলতে পারল না। ভারতের মানুষ যে-স্বপ্ন নিয়ে মুক্ত-স্বাধীন মাতৃভূমির জন্য জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছে, আত্মাহুতি দিয়েছে, সে-রকম মাতৃভূমি সুদূরই থেকে গেল তাদের কাছে; শুধু গুটিকয় সুবিধাবাদী, আপোষকামী এর সুফল ভোগ করল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্বপ্নভঙ্গ হল মানুষের । শোষণের রূপ থেকে গেল আগের মতই, শুধু শোষক পাল্টে গেল। মুনাফাখোর, কালোবাজারি, সাদা চামড়ার পরিবর্তে কালো চামড়া, বিদেশির পরিবর্তে স্বদেশি! এইরকম আজাদি কাম্য ছিল না ভারতবাসীর।

এর মধ্যে ঘটে যায় আরেক ঐতিহাসিক ঘটনা– ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যায় ভারতবর্ষ – পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটো আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দেশবিভাগের ফলে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সুদূরপ্রসারী প্রভাব গিয়ে পড়ে ভারত-পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেই। উদ্বাস্তু-সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। এপার থেকে ওপারে কিংবা ওপার থেকে এপারে এত দিনের চেনা-জানা সবকিছু ছেড়ে আসার বেদনা নস্টালজিক অনুভূতিতে আক্রান্ত করেছে উন্মূলিত মানুষকে। স্বপ্নভঙ্গ, হতাশা, অচরিতার্থতা, বিফলতা, অপ্রাপ্তি, ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়াতে হয়েছে ভারত-পাকিস্তান দু'রাষ্ট্রের মানুষকেই।

নবগঠিত দু'রাষ্ট্রের যাত্রারম্ভ হতে না হতে শুরু হয়ে যায় নিপীড়ন। ভারতে ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় । পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে পাকিস্তানি শাসকচক্র ১৯৪৮ সাল থেকেই। কিন্তু ১৯৫২ সালে তীব্র গণআন্দোলনের মাধ্যমে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না-জানা বীর বাঙালি তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে প্রাণের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করে। ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই বাঙালির স্বাধিকার চেতনা বিকশিত হতে থাকে।

নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজে দর্শকের চিন্তা-চেতনাও পরিবর্তনশীল। নাটকের মাধ্যমে দর্শককে এই পরিবর্তনের ধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে দর্শক মানসের দিক খেয়াল রেখে নাটক রচনা ও প্রযোজনা করতে হবে। কারণ :

> দর্শকমানসের ওপর ঐতিহ্যের প্রভাব থাকে,প্রভাব থাকে পুরাণের, ধর্মের, কথকতার, জমিব্যবস্থার, জমিদারের, মধ্যস্বত্বভোগীদের , প্রকৃতির, নদীপ্রান্তরের, প্রতিবেশীর, রাষ্ট্রের, খাজনার, অত্যাচারের।[০৯]

গণমানুষের নাট্যকার উৎপল দত্ত গণনাট্যসংঘের হাত ধরেই বাংলা নাট্যজগতে পদার্পণ করেন ও ব্যাপক জনতার কাছাকাছি আসেন। যদিও গণনাট্য সংঘে উৎপলের সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা ছিল বছরখানেকের কিন্তু চেতনার সম্পৃক্ততা ছিল আমৃত্যু। কাকদ্বীপে নারীহত্যা, নয়ানপুরের মাটি লাল, ডিব্রুগড়ে গণনাট্যের অনুষ্ঠানে গুলিবর্ষণ, ময়দানে-হাজরা পার্কে জনসমাবেশে বেপরোয়া গুলিচালনা, বউবাজারে নারী-মিছিলের উপর গুলি– সমকালীন এহেন পরিস্থিতিতে লিটল

থিয়েটার যেমন মৌন থাকতে পারে না, তেমনি উৎপলও নীরব থাকতে পারেন নি। এ-সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে উৎপলের উপলব্ধি – 'কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে কোনও সংস্কৃতিই টেকে না।'[১০]

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মানুষের স্বপ্নভঙ্গ, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি,উৎপলের তাত্ত্বিক পড়াশোনা, গণনাট্য সংঘে যোগদান বিশেষ তাৎপর্যবহ। গণনাট্য সংঘের মাধ্যমেই হাটে-মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে কাজ করে বৃহত্তর জনতার কাছাকাছি আসেন তিনি। গণনাট্য সংঘে যোগ দেবার আগে নিজের দল,দ্য অ্যামেচার শেকসপিয়ারিয়ান্স, লিটল থিয়েটার গ্রুপ(এলটিজি)এবং ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানিতে জেফ্রি কেন্ডালের সঙ্গে কাজ করে থিয়েটারের কঠোর বাস্তব সত্যের মুখোমুখী হয়ে অভিনয়,নাটক পরিচালনা ও নাট্যসংগঠন চালাবার পেশাদারি দক্ষতা অর্জন করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত উৎপল দত্ত গণমানুষের নৈকট্যে আসেননি কিংবা রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কে তেমন করে ভাবেননি এমনকি বাংলা নাটকও করেননি। উৎপল দত্তের গণমানুষের কাছাকাছি আসার সূচনা তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েই উৎপল দত্ত বাংলা নাটকের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বাংলানাটকে অভিনয় ও পরিচালনা করেন। গণনাট্য সংঘের আলোকিত জাগরণে মেতে ওঠে, জনতার মুখরিত সখ্যে অবগাহন করে উৎপল উপলব্ধি করেন সাধারণ মানুষ তথা বৃহত্তম দর্শকদের জন্য,তাঁদের ভাষায় (বাংলায়) নাটক করতে হবে–

> নাটক হবে বাংলায়, নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা – সর্বস্তরের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।[১১]

এরপর থেকে গণমানুষকেই উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের উপজীব্য করলেন, বললেন সংগ্রামের কথা। নাটক পরিচালনা তথা নির্দেশনা ও নাট্য রচনায় উৎপল দত্ত সংগ্রামশীল মানুষের সংগ্রামের কথকতার একটি নতুন ধারার সূচনা করেন – সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং বেগবান করেন।

বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন* প্রযোজনার মধ্য দিয়ে গণমানবকেন্দ্রিক রাজনৈতিক নাটকের যে ধারা তৈরি হয়েছে উৎপল দত্ত মার্কসবাদী আইডিয়া যুক্ত করে সেই ধারাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেন। ১৯৪৪-৪৫ সাল থেকে ১৯৫৮-৫৯ সাল, *নবান্ন*থেকে *অঙ্গার*, নাট্যকার উৎপল দত্তের হয়ে ওঠা বা প্রস্তুতির কাল। নাট্যকার উৎপল দত্তের প্রস্তুতি-লগ্নের বা হয়ে ওঠার কালপর্বে বাংলা নাট্যশালায় প্রযোজিত/প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোকে একটি সারণিতে লিপিবদ্ধ করা যায়:

নাটক	নাট্যকার	প্রযোজনা/প্রকাশনা কাল
নবান্ন	বিজন ভট্টাচার্য	১৯৪৪
নূতন প্রভাত	মনোজ বসু	১৯৪৪
দশভাণ	বনফুল	১৯৪৪
রাষ্ট্রবিপ্লব	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৯৪৪
কঞ্চি	বনফুল	১৯৪৫
মঞ্চে ও নেপথ্যে	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৯৪৫

অন্তরাল	দিগিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৫
রাজকন্যার ঝাঁপি	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	১৯৪৬
পলাশীর পরে	অজয় দাশগুপ্ত	১৯৪৬
তরঙ্গ	দিগিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৬
সিংহাসন	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৯৪৬
টিপু সুলতান	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৯৪৬
নন্দিনী	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৯৪৬
মল্লিকা	প্রবোধকুমার সান্যাল	১৯৪৬
মাতৃপূজা	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	১৯৪৬
অবরোধ	বিজন ভট্টাচার্য	১৯৪৭
জীয়ন কন্যা	বিজন ভট্টাচার্য	১৯৪৭
রায়গড়	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৯৪৭
বাস্তুভিটা	দিগিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৭
দুঃখীর ইমান	তুলসী লাহিড়ী	১৯৪৭
পথিক	তুলসী লাহিড়ী	১৯৪৭
হায়দার আলী	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৯৪৮
তাই তো	বিধায়ক ভট্টাচার্য	১৯৪৮
বাংলার প্রতাপ	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৯৪৮
থামাও রক্তপাত	জলধর চট্টোপাধ্যায়	১৯৪৮
যুগে যুগে	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৮
কালীয় দমন	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	১৯৪৮
মোকাবিলা	দিগিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৯
এই স্বাধীনতা	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৯
পরিচয়	জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৯৪৯
সংকেত	সলিল চৌধুরী	১৯৪৯
জনান্তিক	সলিল চৌধুরী	১৯৪৯
দখল	পানু পাল	১৯৪৯
দিনান্তের আগুন	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	১৯৫০
ছেঁড়াতার	তুলসী লাহিড়ী	১৯৫০
ভাঙাবন্দর	পানু পাল	১৯৫০
ঢেউ	বীরু মুখোপাধ্যায়	১৯৫০
জ্বালা	ঋত্বিক ঘটক	১৯৫০
কৃষাণ	মন্মথ রায়	১৯৫০
কলঙ্ক	বিজন ভট্টাচার্য	১৯৫১
তুষার কণা	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৯৫১

দলিল	ঋত্বিক ঘটক	১৯৫১
নতুন ইহুদী	সলিল সেন	১৯৫১
দর্পণ	সলিল সেন	১৯৫১
বিভাব	শম্ভু মিত্র	১৯৫১
নাটক নয়	বীরু মুখোপাধ্যায়	১৯৫১
জনক	গোবিন্দ চক্রবর্তী	১৯৫১
মরাচাঁদ	বিজন ভট্টাচার্য	১৯৫২
তখ্‌ত-এ-তাউস	অজয় দাশগুপ্ত	১৯৫২
মশাল	দিগিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫২
হরিশচন্দ্র	জলধর চট্টোপাধ্যায়	১৯৫২
সাঁকো	ঋত্বিক ঘটক	১৯৫২
কেরানীর জীবন	ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫২
আবাদ	গোবিন্দ চক্রবর্তী	১৯৫২
কা তব কান্তা	বিধায়ক ভট্টাচার্য	১৯৫৩
বাংলার মাটি	তুলসী লাহিড়ী	১৯৫৩
জীবনটাই নাটক	মন্মথ রায়	১৯৫৩
সাওতাল বিদ্রোহ	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৩
লাল পাঞ্জা	ব্রজেন দে	১৯৫৩
দাসীপুত্র	ব্রজেন দে	১৯৫৩
অন্তরীণ	জোছন দস্তিদার	১৯৫৩
চার্জশীট	উমানাথ ভট্টাচার্য	১৯৫৩
শহরতলী	প্রতাপচন্দ্র	১৯৫৪
মাটির ঘর	বিধায়ক ভট্টাচার্য	১৯৫৪
পিতাপুত্র	বিধায়ক ভট্টাচার্য	১৯৫৪
পূর্বরাগের ইতিহাস	বদ্রীনাথ দাস	১৯৫৪
রাহুমুক্ত(যাত্রা)	বীরু মুখোপাধ্যায়	১৯৫৪
বিশে জুন	বীরু মুখোপাধ্যায়	১৯৫৪
গাঁয়ের মেয়ে	ব্রজেন দে	১৯৫৪
প্রতিশোধ	ব্রজেন দে	১৯৫৪
শকুন্তলা রায়	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫৪
ধর্মদ্রোহী	জলধর চট্টোপাধ্যায়	১৯৫৫
হরিপদ মাস্টার	সুনীল দত্ত	১৯৫৫
সংঘাত	পার্থপ্রতিম চৌধুরী	১৯৫৫
হরিপদ মাস্টার	সুনীল দত্ত	১৯৫৫
এরাও মানুষ	সন্তোষ সেনগুপ্ত	১৯৫৫

অংশীদার	গঙ্গাপদ বসু	১৯৫৫
নাট্যকার	তুলসী লাহিড়ী	১৯৫৬
চৌর্যানন্দ	তুলসী লাহিড়ী	১৯৫৬
শেষ লগ্ন	মনোজ বসু	১৯৫৬
বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং	মনোজ বসু	১৯৫৬
নির্বোধ	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫৬
প্রত্যাবর্তন	প্রশান্ত চৌধুরী	১৯৫৬
রাখী	ফুলরানী গুহঠাকুরতা	১৯৫৬
চতুরালি	অন্নদাশঙ্কর রায়	১৯৫৬
শুধু ছায়া	পরেশ ধর	১৯৫৭
ক্ষুধা	বিধায়ক ভট্টাচার্য	১৯৫৭
বন্দনার বিয়ে	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৯৫৭
নায়ক	তুলসী লাহিড়ী	১৯৫৭
সবার উপরে মানুষ	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৯৫৭
মৌচোর	সলিল সেন	১৯৫৭
সংক্রান্তি	বীরু মুখোপাধ্যায়	১৯৫৭
ধৃতরাষ্ট্র	ধনঞ্জয় বৈরাগী	১৯৫৭
দুই মহল	জোছন দস্তিদার	১৯৫৭
রেবার জন্মতিথি	রেণুকারানী ঘোষ	১৯৫৭
লেবার অফিসার	বীরু মুখোপাধ্যায়	১৯৫৭
সন্ন্যাসী	সলিল সেন	১৯৫৮
ঘূর্ণী	উমানাথ ভট্টাচার্য	১৯৫৮
নচিকেতা	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫৮
থানা থেকে আসছি	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫৮
অপরাজিত	রমেন লাহিড়ী	১৯৫৮
মহাকাব্য	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	১৯৫৮
রূপোলী চাঁদ	ধনঞ্জয় বৈরাগী	১৯৫৮
সরস নাটক	প্রতাপচন্দ্র	১৯৫৮
সাহিত্যিক	বীরু মুখোপাধ্যায়	১৯৫৮
সম্রাট	বীরু মুখোপাধ্যায়	১৯৫৮
গোত্রান্তর	বিজন ভট্টাচার্য	১৯৫৯
লক্ষীপ্রিয়ার সংসার	তুলসী লাহিড়ী	১৯৫৯
দিশারী	সলিল সেন	১৯৫৯
চোর	ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৯
আকাশবিহঙ্গী	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫৯

এক মুঠো আকাশ	ধনঞ্জয় বৈরাগী	১৯৫৯
এক পেয়ালা কফি	ধনঞ্জয় বৈরাগী	১৯৫৯
রজনীগন্ধা	ধনঞ্জয় বৈরাগী	১৯৫৯
মৃত্যুর চোখে জল	মনোজ মিত্র	১৯৫৯
বারোঘন্টা	কিরণ মৈত্র	১৯৫৯
নাটক নয়	কিরণ মৈত্র	১৯৫৯
সকাল-সন্ধ্যার নাটক	সোমেনচন্দ্র নন্দী	১৯৫৯
বহ্নিপতঙ্গ	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৯
ভারতসম্রাট	নন্দগোপাল চৌধুরী	১৯৫৯
অপরাধী	নন্দগোপাল চৌধুরী	১৯৫৯
ছায়ানট	উৎপল দত্ত	১৯৫৮
অঙ্গার	উৎপল দত্ত	১৯৫৯

উপর্যুক্ত কাল-পরিসরের নাট্য রচনা ও প্রযোজনা দেখে গণনাট্যের সংস্পর্শে আমূল বদলে যাওয়া উৎপল দত্ত তৃপ্ত হতে পারেননি। যাঁকে হাতছানি দেয় টালমাটাল বিপ্লবের কর্কশ হুঙ্কার-সমৃদ্ধ নাটক; সঙ্গত কারণেই মৃদু প্রগতির ফিসফিস করা নাটক তাঁকে তুষ্ট করতে পারেনি; তাই তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষার মতো বিপ্লব-বিদ্রোহের নাটক না পেয়ে বাধ্য হয়েই নাটক লিখতে শুরু করেছেন এবং ক্রমে ক্রমে হয়েওঠেছেন বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের অন্যতম। শতাধিক নাটক লিখেছেন উৎপল দত্ত – পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক, যাত্রাপালা, পথনাটক, একাঙ্ক ও রূপান্তর নাটক এবং পরিচালনা করেছেন নিজের লেখা নাটকসহ শেকসপিয়ার, গোর্কী,ওডেটস্, মাইকেল মধুসূদন, গিরীশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক। যে-নাটকই হোক না কেন তাঁর নাট্যরচনার মৌল বিষয় হল সংগ্রামশীল মানুষের সংগ্রামের ইতিকথা। এ-ক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদী ও বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তাঁর চেতনাকে আরও স্বচ্ছ ও প্রত্যয়-দৃঢ় করেছে। উৎপলের কাছে নাটক অবসর যাপন বা শখের বিষয় নয়–শৃঙ্খলা ও কমিটমেন্টের বিষয়। তাই নাটক রচনা, পরিচালনা, প্রযোজনার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। উৎপল মনে করতেন, 'যে-নাটকের রাজনীতি ভুল তার সবই ভুল।'[১২]

নবান্ন থেকে *অঙ্গার*পর্যন্ত নাট্যকার উৎপল দত্তের হয়ে ওঠার কালপর্বে প্রযোজিত বা প্রকাশিত বাংলা নাটকের উপর্যুক্ত তালিকায় শীর্ষস্থানীয় নাট্যকারদের মধ্য থেকে কয়েকজন নাট্যকার সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে – যা থেকে উৎপলের কালের নাটকের একটা চিত্র এবং উৎপল দত্তের স্বাতন্ত্র্য সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

চল্লিশের দশকে বাংলা নাটক মৃত্তিকা সংলগ্ন ও গণমানুষের নাটক হয়ে ওঠেছে যে নাট্যকারদের নাট্যপ্রয়াসে, বিজন ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরপ্রগতিশীল চিন্তাচেতনা এবং অগ্রসরমানতা বাংলানাটকে ভিন্নমাত্রা

যোগ করেছে। গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্য গণমানুষকে নিয়ে নাটক লিখে বাংলানাটকে একটি নতুন ধারা তৈরি করেন। দীনবন্ধু মিত্রের*নীলদর্পণ*-এর পর *নবান্ন*-তে দেখা গেল অতি সাধারণ মানুষকে নাটকের নায়ক হিসেবে - তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, সাধু চরণের মত মানুষ; এমনকি তাদের চেয়েও ভুখানাঙ্গা দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত মানুষের মিছিল দেখা গেল। এই প্রথম মন্বন্তরে নিঃস্ব-রিক্ত, অন্নহীন-বস্ত্রহীন, কংকালসার মানুষদের 'ভাতের ফ্যানে'র জন্য দুয়ারে দুয়ারে লঙ্গরখানায় অন্নভিক্ষা, ফ্যানভিক্ষার জন্য শীর্ণ হাত পেতে আর্তনাদ করতে দেখা গেল বাংলা নাটকের মঞ্চে।*নবান্ন* নাটকে মন্বন্তরে অভাবের তাড়নায় প্রধান সমাদ্দার ও তাঁর পরিবারের লোকজন শেষ সম্বল বিক্রি করে যখন শেষ রক্ষা হয় না তখন ভাগ্যান্বেষণে শহরে আসে। শহরেও একই অবস্থা। কালোবাজারি ব্যবসায়ীরা চাল মজুদ করে রেখেছে। কোথাও অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, সর্বত্র নিরন্ন মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ – এক লঙ্গরখানা থেকে আরেক লঙ্গরখানায় একটুখানি খাবারের আশায় মানুষ ছুটছে। কিন্তু কোথাও খাবার না পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে দলে দলে মানুষ মরছে। মানুষ ও কুকুর কাড়াকাড়ি করছে ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে। এইভাবে মন্বন্তরে ধুঁকে ধুঁকে অনেক প্রিয়জনকে হারিয়ে আবার তারা ফিরে যায় গ্রামে। আবার আসে নবান্ন উৎসব। চারটি অংক ও ১৫ টি দৃশ্যে গ্রাম-শহর উভয় পটভূমিতে বিন্যস্ত হয়েছে *নবান্ন*। একক কোনো নায়ক নয়, সমগ্র জনতাই নায়ক। প্রতিটি চরিত্রই স্বমহিমায় উজ্জ্বল। *নবান্ন*-র পর বিজন ভট্টাচার্য *কলংক, মরাচাঁদ, অবরোধ, জীয়নকন্যা, গোত্রান্তর*সহ বেশকিছু নাটক রচনা করেন। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতাল-জীবনের আনন্দ-বেদনার ইতিবৃত্ত*কলংক। মরাচাঁদ*চব্বিশ পরগণার এক অন্ধ গায়কের জীবন কথা। *অবরোধ*-এর পটভূমি শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্ব। *জীয়নকন্যা-য়* মানুষের মধ্যে ঐক্যের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। *গোত্রান্তর* নাটকের বিষয় পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষের বিড়ম্বিত জীবন।

গণনাট্যের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকে যে-প্রগতিশীল ধারার সূত্রপাত হয়েছে ; সেই ধারার পথিকৃতদের একজন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮-১৯৯০)। দিগিন জীবনের বহমানতায় বিশ্বাস করেন। জীবনে দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, হতাশা আছে, না পাওয়ার বেদনা আছে তবুও জীবন এগিয়ে চলেছে, থেমে নেই। আগামী দিনের বাসযোগ্য সোনালি সুন্দর দিনের জন্যে মানুষ দুঃখকে জয় করে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে বলে দিগিন বন্দোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন। মানুষে মানুষে বৈষম্যের একদিন অবসান হবে বলেও তিনি আশাবাদ পোষণ করেন। তাঁর প্রথম নাটক*অন্তরাল*প্রথম অভিনীত হয় ১৯৪৪ সালে। *তরঙ্গ*নাটকে তরঙ্গায়িত হয়েছে কৃষকের জীবন সংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ।*বাস্তুভিটা*নাটকের বিষয় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু জীবন। *মোকাবিলা*-এর পটভূমি স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অসন্তোষ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত মানবতার হাহাকার*মশাল*-এর বিষয়বস্তু।

তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯)-এর প্রথম প্রয়াস*মায়ের দাবী*। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক ধর্মদাসের সততার ইতিবৃত্ত *দুঃখীর ঈমান*। শ্রমিক মজদুরদের অভাব,দারিদ্র্য আর সেই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই *পথিক*-এর পটভূমি । হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব – মুসলমানদের হিন্দু বিদ্বেষ, হিন্দুদের মুসলিম-বিদ্বেষ, সংস্কৃতির সংকট উন্মোচিত হয়েছে *বাংলার মাটি*নাটকে। *লক্ষী প্রিয়ার সংসার*নাটকের উপজীব্য স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের অর্থনৈতিক চাপ, জীবন সংগ্রামের রূঢ় বাস্তবতা, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রাত্যহিক

সংকট ও ক্ষয়। তুলসী লাহিড়ীর অত্যন্ত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নাটক*ছেঁড়াতার*এর পটভূমিও মন্বন্তর। অতি মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্য রহিমুদ্দির স্কুল জীবনেই পড়াশুনার ইতি টেনে দেয়; যদিও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল। মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত কৃষক রহিমুদ্দি নিরুপায় হয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ফুলজানকে তালাক দেয় – হাকিমুদ্দির লঙ্গরখানা থেকে দু'মুঠো খাবার পাবার আশায়। সহজ সরল কৃষক রহিমুদ্দি ফুলজানকে তালাক দিয়ে ছেলে বসিরকে নিয়ে বাল্য সহপাঠী বন্ধু কৃষিবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টরের কাছে শহরে চলে যায়। মন্বন্তর শেষে ফিরে আসে গ্রামে। ফিরিয়ে নিতে চায় ফুলজানকে। কিন্তু তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় বিধিবিধান। একদিকে সন্তান মৃত্যুশয্যায় অন্যদিকে ফুলজানকে ফিরিয়ে নেয়ার পথে ধর্মীয় বিধিনিষেধে ক্ষতবিক্ষত রহিমুদ্দি সহসা দিলরুবায় সুর চড়াতে গেলে তারগুলো ছিঁড়ে যায় – রহিমুদ্দি আত্মহত্যা করে। একদিকে ব্যক্তি মানুষের সংগ্রামশীলতা, অন্যদিকে অতি সাধারণ কৃষকদের যূথবদ্ধ প্রয়াস *ছেঁড়াতার*কে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। এ নাটকে হিন্দু-মুসলমানের যুগল সংগ্রামী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বাংলা নাটকের শক্তিমান নাট্যকারদের একজন সলিল সেন (১৯২৪-)। তাঁর প্রথম নাটক*নতুন ইহুদী*'রঘটনাউদ্বাস্তু এক দরিদ্র শিক্ষক পরিবারকে অবলম্বন করে আবর্তিত। সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহের ব্যতিক্রমী কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তাঁর *মৌচোর* নাটক।

ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬)-এর *দলিল*নাটকের পটভূমি পূর্ববঙ্গের গৃহহীন মানুষের জীবন সংগ্রাম। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের আশ্রয়হীন উদ্বাস্তু মানুষ নদীর স্রোতের মত পশ্চিমবঙ্গে আসে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেই দুঃসহ পরিস্থিতিই এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে। *দলিল*নাটকে দলিল করে রাখা হয়েছে ১৯৪৮ সালে বাস্তুহারাদের আশ্রয়ের দাবিতে অনুষ্ঠিত নারী-মৌনমিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত লতিকা,অমিয়া, প্রতিভাদের আত্মদান।

বনফুলের শ্রীমধুসূদন,বিদ্যাসাগর;বিধায়ক ভট্টাচার্যের *মেঘমুক্তি,মাটির ঘর*;মন্মথ রায়ের *চাঁদ সদাগর, কারাগার* শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের*গৈরিক পতাকা,কালের দাবি,সিরাজউদ্দৌলা,মাটির মায়া,কামাল আতাতুর্ক* ইত্যাদি জনপ্রিয় নাটকসমূহ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বে রচিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। এই কাল পরিসরের নাটকের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক *সিরাজউদ্দৌলা* এবং মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক *কারগার* বিষেশভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের পূর্বে তাঁদের নাটকসমূহ মঞ্চস্থ হলেও এ পর্বেও তাঁদের বেশকিছু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত(১৯১১-১৯৬৪)-এর *রাজকন্যার ঝাঁপি* নাটকে দুঃখ দুর্দশা,অভাব দারিদ্র্য মিশ্রিত জীবন আর বিপরীত মেরুতে রাজকন্যার জীবন–রূপকথার পরিবেশ আর বাস্তব জীবনের পরিবেশ রাজকন্যার ঝাঁপিতে পূর্ণ। *দিনান্তের আগুন*-এর পটভূমি দেশবিভাগ এবং এর ফলে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের বিপর্যয় ও পরিবর্তন।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়(১৯২১-১৯৮৪) পাশ্চাত্য নাটকের ভাব অবলম্বন করে নাটক রচনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়তাঁর নাটককে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের*শকুন্তলা রায়*-ইবসেন-এর*হেডা গ্যাবলার*, *নির্বোধ*দস্তয়ভস্কির-*ইডিয়ট*অবলম্বনে রচিত। মালয়ের মুক্তিসংগ্রামের উপর ভিত্তি করে তিনি রচনা করেন *মালয় মায়ের ডাক*; এটি লেসলে রিচার্ডসনের *ফর আওর মাদার মালয়া*অবলম্বনে রচিত।*থানা থেকে আসছি* অজিত গঙ্গোপাধ্যায়-এর অতি জনপ্রিয় নাটক; এই নাটকটি জেবি প্রিস্টলির *এ্যান ইন্সপেক্টর কলস্*অনুসরণে রচিত। *আকাশবিহঙ্গী*নাটকটি চেখভ-এর *সিগাল* নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচনা করেছেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগী(১৯২৭-১৯৮৮)মূলত একজন রোম্যান্টিক নাট্যকার। মধ্যবিত্ত জীবনের নানাদিক তাঁর নাটকে বিশেষভাবে উপস্থাপিত। তাঁর প্রথম নাটক*ধৃতরাষ্ট্র*-এর পটভূমি ধীরাজ ঘোষ নামক ব্যবসায়ীর পারিবারিক জীবন।*রূপোলী চাঁদ*মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনকেন্দ্রিক নাটক। *এক মুঠো আকাশ*-এর পটভূমিও মধ্যবিত্ত জীবনেরই। দুটো নাটকেই মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সংকট উন্মোচিত হয়েছে। একজন চিত্রপরিচালককে হত্যা এবং হত্যাকারী সনাক্ত *এক পেয়ালা কফি* নাটকের পটভূমি। *রজনীগন্ধা* নাটকের পটভূমি –রজনীগন্ধা ফুলের মতোই অকালে ঝরে পড়া এক ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী আশার জীবনের করুণ পরিণতি।

গণনাট্য সংঘের কর্মী বীরু মুখোপাধ্যায়(১৯২৬-১৯৮৯) বেশকিছু নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকে সমসাময়িক সমাজের চিত্র ও মননশীলতার পরিচয় বিদ্যমান। *সংক্রান্তি* বীরু মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত নাটক– পঁচিশ বৎসরব্যাপী ঘটনাকালে এর পটভূমি বিস্তৃত। তিনটি যুগের সমাজের অবস্থা এ নাটকে খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। এক বঞ্চিত সাহিত্যিকের জীবন-বেদনা *সাহিত্যিক* নাটকের পটভূমি।

কিরণ মৈত্র(১৯২৪-১৯৯১)-এর নাটকে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন, অস্বচ্ছলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরে তাঁর*বারো ঘন্টা* ও *চোরাবালি*নাটকের কাহিনী গড়ে ওঠেছে। মধ্যবিত্তের নিরন্তর কঠিন জীবন সংগ্রাম,জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা,সংকট তাঁর নাটকের উপজীব্য।
পরেশ ধর(১৯১৮-১৯৮০)–এর *শুধু ছায়া* নাটকে আঙ্গিকের অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। এই নাটকে সমাজ জীবনের সমস্যাই অঙ্কিত হয়েছে।
জোছন দস্তিদার(১৯৩৩-১৯৯৮)-এর *দুই মহল* নাটকে সমাজের দুই মহল, উঁচু মহল-নিচু মহল; বাইরের মহল– ভিতরের মহলের চিত্র ফুটে ওঠেছে।
রমেন লাহিড়ী(১৯২৭-)-এর *অপরাজিত* নাটকের বিষয় মধ্যবিত্ত জীবনের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না।

উপর্যুক্ত নাট্যকারদের নাট্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ-সময়ের নাট্যকাররা বিশ শতকের চল্লিশের দশকের পূর্ববর্তী কালের নাট্যকারদের চেয়ে প্রগতিশীল, গণজীবনমূলসংলগ্ন। কিন্তু মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতার নিরিখে কার্যকারণসূত্রে নাটকের বিষয় তাঁরা উপস্থাপন করেননি কিংবা তুলে ধরেননি শ্রেণিদ্বন্দ্ব। এ-সময়ের নাটকে

গণমানুষ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তুসমস্যা, সামাজিক-পারিবারিক সমস্যা, মানুষের জীবনের নানামাত্রিক সংকট, সমস্যা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। এই মন্বন্তর, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যার মূলে যাওয়ার চেষ্টা কিংবা মানুষে মানুষে বিপুল বৈষম্যের কার্যকারণ সন্ধান; মন্বন্তর বা দাঙ্গার উৎসমুখ খোঁজার প্রয়াস তাঁদের নাটকে পাওয়া যায় না। কারা এর জন্য দায়ী, কিভাবে এদের মোকবিলা করা হবে– এর কোন স্বচ্ছ ছবি নেই তাঁদের নাটকে। তবে সমাজদ্বন্দ্ব, সমকালীন জীবনের নানাবিধ সমস্যা, জীবনের নানামাত্রিক জটিলতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা খণ্ডিতভাবে হলেও এসেছে তাঁদের নাটকে। সমাজের বিশ্লেষণও করেছেন নাট্যকাররা কেউ কেউ তবে এ-অবস্থা থেকে উত্তরণের সঠিক নিশানা তাঁদের নাটকে অনুপস্থিত। শ্রেণিসংগ্রামের বিশ্লেষণও করেননি তাঁরা। এ-কারণেই এসব নাট্যকারদের নাটকে রাজনীতি এলেও, সংকট বা দ্বন্দ্ব থাকলেও এই দ্বন্দ্বের মূল উৎস কোথায়–দর্শক নাটক দেখে কী সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, কীভাবে এই সংকট মোকাবিলা করা যায় তার কোন পথ বা দিকনির্দেশনা এসব নাটক থেকে পাওয়া যায় না। সার্বিকভাবে এসময়ের নাটকের যে-চিত্রপাওয়া যায় তা হল:

> গণনাট্য খুব গুরুত্বের সাথেই জনগণকে বোঝাচ্ছিল প্রচলিত সমাজ কেন ক্ষতিকর, কেন তার বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার। কিন্তু শোষণ ব্যবস্থার সামগ্রিক চেহারাটা সব নাটকে ঠিকভাবে আসছিল না। বেশির ভাগ নাটকেই শোষণের বাইরের রূপটা দেখা যাচ্ছিলো বটে, তার ভেতরের দ্বান্দ্বিক রূপটা ধরা পড়ছিল না।[১৩]

বিজন ভট্টাচার্যের*নবান্ন*, *কলঙ্ক*, *মরাচাঁদ*, *জীয়নকন্যা*, *গোত্রান্তর;*দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের*অন্তরাল*, *তরঙ্গ*, *বাস্তুভিটা*, *মোকাবিলা*, *মশাল*, তুলসী লাহিড়ীর *দুঃখীর ঈমান*,*পথিক*,*ছেঁড়াতার*,*বাংলার মাটি*,*লক্ষীপ্রিয়ার সংসার*; সলিল সেন-এর *নতুন ইহুদী*,*দর্পণ*,*মৌচোর*, *দিশারী*; ঋত্বিক ঘটক-এর *জ্বালা*, *দলিল* এবং অন্যান্য নাট্যকারের নাটকে মানুষের জীবনের নানা সংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর ইত্যাদি এসেছে। কিন্তু বিপ্লব,বিদ্রোহ বা গণ-আন্দেলনের চিত্র, বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু-সম্বলিত নাটক তাঁদের নাট্যরচনায় সেভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। *নবান্ন* নাটকের পরিসমাপ্তিতে ধ্বনিত হয় প্রতিরোধের কথা–

> এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ![১৪]

ছেঁড়াতার নাটকেও কৃষকদের যূথবদ্ধ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। জোতদারের আসল রূপ উন্মোচিত হয়ে যায় কৃষক গোবিন্দের সংলাপে –

> শও শও কায়দা আছে। টাকার কায়দা, হাকিম ত্যালেয়া দ্যাওয়ানী হবার কায়দা,উপকারের নাম করি মানুষের জান মারার কায়দা, হিসাব দ্যাখেয়া চুরি করার কায়দা, তসবী ঘুরায়া সরল মানুষ ঠকাবার কায়দা।[১৫]

মোকাবিলা-নাটকে সামাজিক অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার ইঙ্গিত দিয়েছেন –রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সাধারণ মানুষকে সংগ্রাম করে যেতে হবে। সলিল সেনের *নতুন ইহুদী*

নাটকেও মোহনকে এই মর্মে দীক্ষিত করা হয়– 'সমস্ত রোগপীড়িত মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে শপথ নিয়ে স্বার্থলোভী, অর্থলোলুপ যারা সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাদের শাস্তির বন্দোবস্ত করতে হবে, হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার খতম করতে হবে এবং ভাগ্যের গোলামীও বরদাস্ত না করার অঙ্গীকার করতে হবে।'উদ্বাস্তু সমস্যার ওপর ভিত্তি করে লেখা ঋত্বিক ঘটক-এর *দলিল*নাটকেও উচ্চারিত হয়েছে প্রতিরোধের কথা–পথে পথে প্রতিরোধ,এই বাংলা ওই বাংলার বিদ্রোহ, প্রতিরোধ পরস্পরের সঙ্গে মিলতে চেয়েছে।

গণনাট্য সংঘ বাংলা নাটকে একটি বিশেষ ধারা তৈরি করলেও চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় এই নাটকগুলোতে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ, যূথবদ্ধ প্রয়াসের কথা থাকলেও রাজনীতি,গণ-আন্দোলন, বিপ্লব, বিদ্রোহ বা বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু সেভাবে স্থান পায়নি, যে টালমাটাল বিপ্লবের কর্কশ হুঙ্কার-সমৃদ্ধ নাটক উৎপল দেখতে চেয়েছিলেন। এই অভাববোধ, এই আকুলতা, এই শূন্যতা উৎপল দত্তকে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু সম্বলিত রাজনৈতিক নাটক নির্মাণে উন্মুখ করে তোলে। ব্যাপক গভীর অধ্যয়ন, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল-কলেজ থেকে নাট্যচর্চা,জেফ্রি কেন্ডালের প্রায়োগিক ও মার্কসবাদের তাত্ত্বিক শিক্ষা, গণনাট্যের আদর্শিক দীক্ষায় দীক্ষিত উৎপল দত্ত এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আরও প্রাগ্রসর চিন্তা করেছেন; গতানুগতিকতা নয়– ভিন্নতর ভাবনা তাঁকে তাড়িত করেছে। উৎপল দত্ত মনে করেন, মানুষের জীবন,সমাজ কোনো কিছুই রাজনীতি বিচ্ছিন্ন নয়–কিন্তু শাসকশ্রেণী কৌশলে জনগণকে রাজনীতি থেকে সুদূরে রেখেছে, যাতে রাজনীতিবিদদের কৌশল জনগণ ধরতে না পারে; সেজন্যেই তিনি বলেছেন:

> রাজনীতি হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে কাছের জিনিস। শুধু শাসকশ্রেণি চায় রাজনীতি থেকে জনগণ দূরে থাকুক। সব রাজনৈতিক শলাপরামর্শ ও সিদ্ধান্ত হোক গোপনে। আমাদের নাট্য-আন্দোলনে শাসকশ্রেণির এই চিন্তাধারা খানিক ছায়াপাত করেছে।[১৬]

উৎপলের বিশ্বাস এবং প্রয়াস ছিল– জনতার কাছে রাজনীতি পৌঁছে দিতে হবে, বিপ্লবের চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে মানুষের মধ্যে; সেজন্য প্রয়োজন বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু। ব্রেখট্-এর মতো উৎপলও বিশ্বাস করেন মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতা ছাড়া এ যুগের কোনো থিয়েটারই জনগণের থিয়েটার হতে পারে না। তাই উৎপল দত্ত মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতা-সমৃদ্ধ থিয়েটার নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সবকিছুকে শ্রেণিচেতনার নিরিখে যাচাই করে নাটকে নিয়ে এসেছেন। মানুষের বিপন্নতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যেতাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল, কোথায় মানুষ প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে-প্রভুদের চাপিয়ে দেয়া মেনে নেয়নি, কোথায় মানুষ মাথা উঁচু করে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই,বাঁচার লড়াই করছে; সে লড়াই ব্যর্থ বা সফল যাই হোক। উৎপল দত্ত মনে করেন :

> সত্য সবসময়ে শ্রেণিসত্য– ক্লাশ ট্রুথ। হয় আপনি এ শ্রেণির সত্য বলবেন , না হয় ও শ্রেণির। হয় আমরা কৃষকের পক্ষে কথা কইবো, নইলে জোতদারের। হয় শ্রমিকের সত্য উচ্চারণ করবো,নইলে মালিকের। মাঝামাঝির দালালি তো সত্যের ক্ষেত্রে খাটে না। রাজনৈতিক নাটকের অবলম্বনই শ্রেণিসত্য।[১৭]

তাই উৎপলের নাটকে দর্শক মাঝামাঝির দালালি দেখতে পায় না। নাট্যজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উৎপল দত্ত সাধারণ মানুষ তথা শ্রমিক-কৃষকের পক্ষেই থেকেছেন। ১৯৫৮-তে *ছায়ানট*-এ হাতেখড়ি হয়ে ১৯৫৯ সালে কয়লা খনি শ্রমিকদের নিয়ে *অঙ্গার* নাটক লিখে আকাশছোঁয়া সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন, এরপর কেবলই এগিয়ে চলা– তবে চলার পথটা মসৃণ ছিল না; নিরন্তর মুখোমুখী হতে হয়েছে নানা বাধা-বিপত্তি; বৈরী পরিবেশের। কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতাই উৎপলের অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারেনি। অসীম সাহসী মানুষ, নাট্যযোদ্ধা উৎপল দত্ত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসে স্থিত থেকে লিখে গেছেন ও পরিচালনা করেছেন শতাধিক নাটক।*ছায়ানট*-এ হাতেখড়ির পর প্রথম অলোড়িত, জনপ্রিয় মঞ্চসফল নাটক *অঙ্গার*-এ উৎপল দেখিয়েছেন শ্রেণিচরিত্রসহ শ্রমিকশ্রেণি-মালিকশ্রেণিকে। *অঙ্গার*-এ নিষ্পেষিত কয়লা খনির শ্রমিক জীবনের পর ষাটের দশকে উৎপল দত্ত তিরিশের দশকের বাংলার বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করে রচনা ও প্রযোজনা করেন *ফেরারী ফৌজ*। ভারতের নৌবিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত উৎপলের *কল্লোল* কল্লোলিত করেছিল ষাটের দশকের বাংলা নাট্যাঙ্গনকে। উৎপল দত্ত প্রেসিডেন্সি জেলে রচনা ও পরিচালনা করেন *কঙ্গোর কারাগারে*, দেশকালের সীমানা পেরিয়ে ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন তুলে ধরেন *অজেয় ভিয়েতনাম* নাটকে, ইন্দোনেশিয়ার টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে রচনা ও প্রযোজনা করেন *রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া*, কিউবার পরিস্থিতি নিয়ে *ক্রুশবিদ্ধ কুবা*, লেনিনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে *লেনিনের ডাক*। আমেরিকার বর্ণবৈষম্য তথা সাদা মানুষ কর্তৃক কালো মানুষদের নিগ্রহের আলেখ্য *মানুষের অধিকারে* নাটক। ষাটের দশকের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের (তিরিশের দশকের) আত্মত্যাগ নিয়ে *রাইফেল*, মালিক-শ্রমিক সংঘাত নিয়ে *শোন রে মালিক*, ব্রিটিশ ফ্যাসিস্টদের নির্মম শোষণ,অত্যাচার আর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে রচিত *জালিয়ানওয়ালাবাগ* পালা নিয়ে উৎপল দত্ত ব্যাপক জনতার কাছাকাছি পৌঁছার লক্ষ্যে হাটে-মাঠে-ঘাটে গ্রাম বাংলায় ছুটে বেড়িয়েছেন। পথনাটক করেছেন *স্পেশাল ট্রেন*, *গেরিলা*, *সমাজতান্ত্রিক চাল*, *জনতার কল্লোল*, *দিনবদলের পালা*, *ময়না তদন্ত*; শেকস্পিয়ারের জন্মের চারশত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শেকস্পিয়ারের *জুলিয়াস সিজার* (আধুনিক পোশাকে), *রোমিও জুলিয়েট*, *ওথেলো(ইংরেজি)*, *চৈতালী রাতের স্বপ্ন(অ্যা মিডসামার নাইটস ড্রিম)* মঞ্চস্থ করেছেন। এ-ছাড়া আন্তন চেখভ-এর *দ্য বেট(বাজি)*, অদ্বৈতমল্ল বর্মণের উপন্যাস *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর নাট্যরূপ, জর্জ বার্নার্ড শ-এর *মিসেস ওয়ারেনস্ প্রোফেশন*-এর অনুবাদ *মধুচক্র*, ফ্রিডরিশ ভোলফ-এর *প্রফেসর মামলক*, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত রোমাঁ রোলাঁ-এর *১৪ জুলাই* আরউইন শ-এর *বেরি দ্য ডেড* অবলম্বনে *মৃত্যুর অতীত*, বের্টোল্ট ব্রেখট-এর (*ডী মাসনামে) সমাধান,(ডী টাগে ডের ডর কম্যুনে*-এর রূপান্তর) *নয়াজামানা* এবং বরিসভিয়াঁর নাটক *ল্যগুতে দে জেনেরোঁ* ও বের্টোল্ট ব্রেখট-এর *শোয়েইক ইম্ জুভাইটেন ভেল্টক্রীগ* অবলম্বনে *যুদ্ধং দেহি* ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

ঠিক এ-সময়ে কলকাতার প্রসেনিয়াম থিয়েটারে প্রদর্শিত হচ্ছিলো বিজন ভট্টাচার্যের *ছায়াপথ*, *জতুগৃহ*, *দেবীগর্জন*, *সাগ্নিক*, *গর্ভবতী জননী*; দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *জীবনস্রোত*; সলিল সেনের *ডাউন ট্রেন*; ধনঞ্জয় বৈরাগীর *আর হবে না দেরী*, *পুড়েও যা পুড়ে না*, তুলসী লাহিড়ীর *ভিত্তি*, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়-এর *নবদুর্বাদল শ্যাম*, *সেতুবন্ধন*, উমানাথ ভট্টাচার্য-এর *ছোটলোক*, পরেশ ধর-এর *ডানা ভাঙা পাখি* বীরু মুখোপাধ্যায়-এর *চারপ্রহর*, *চারণ কবি মুকুন্দ দাস*; বাদল সরকার-এর *এবং ইন্দ্রজিত*, *বাকি ইতিহাস*, *পাগলা ঘোড়া*, *বল্লভপুরের*

রূপকথা, শেষ নেই; মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের *মৃত্যুসংবাদ, নীল রঙের ঘোড়া, চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড, দ্বীপের রাজা, বাঘবন্দি, নিষাদ*, মনোজ মিত্র-এর *নীলকণ্ঠের বিষ,অবসন্ন প্রজাপতি* রতন কুমার ঘোষ-এর *অমৃতস্য পুত্র*, বিধায়ক ভট্টাচার্যের *অতএব*, শম্ভুমিত্র-এর *ঘূর্ণি*, পার্থপ্রতীম চৌধুরী-এর *শব্দরূপ ধাতুরূপ, ফিংগার প্রিন্ট* সুনীল চক্রবর্তীর *টাকার রঙ কালো*, কিরণ মৈত্র-এর *হাসি*, অনিল দে-এর *কম্পন*, মধু গুপ্ত-এর *কবর থেকে বলছি*, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *বাজী*, চানক্য সেন-এর *তারারা শোনে না*, সুনীলদত্ত-এর *বর্ণ পরিচয়, খরনদীর স্রোতে, দোলা;* সোমেননন্দী-এর *সমান্তরাল, ছারপোকা, সকাল সন্ধ্যার নাটক*; রমেন লাহিড়ী-এর *পরোয়ানা, পান্থশালা, ঢেউ, বেনজু, এলেম নতুন দেশে*; শৈলেশ গুহ নিয়োগী-এর *ক্যাম্পথ্রি, ডাইভোর্স, পাহাড়ী ফুল, সেমসাইড, ক্লান্ত রূপকার*; জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *গেটম্যান, বায়েন, মুছেও যা মুছে না* ইত্যাদি নাটক।

ষাটের দশকের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররা হলেন: বিজন ভট্টাচার্য, সলিল সেন, ধনঞ্জয় বৈরাগী, পরেশ ধর,বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, রতন কুমার ঘোষ, সুনীল দত্ত, সোমেননন্দী, রমেণ লাহিড়ী, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিজন ভট্টাচার্যের সব নাটকই মৃত্তিকার কাছাকাছি গণমানুষের নাটক। ষাটের দশকে তিনি লিখেছেন– *দেবীগর্জন*। এই নাটকের বিষয়– পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম এলাকার আদিবাসী দরিদ্র সাঁওতাল চাষীদের জীবন-সংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। অতি দরিদ্র মানুষেরা প্রভঞ্জনের মতো শোষক কর্তৃক শোষিত হতে হতে বাধ্য হয়ে এক সময় ঘুরে দাঁড়ায়। এ নাটকেও সঞ্চারিয়া আর মংলার নেতৃত্বে এরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। *কৃষ্ণপক্ষ* নাটকে উন্মোচিত হয়েছে ধর্মব্যবসায়ীর ভণ্ডামি।*সাগ্নিক* একাঙ্ক-এর পটভূমি– বাস্তুহারা মানুষদের অসহায়ত্ব। *গর্ভবতী জননীর* উপজীব্য বেদে সম্প্রদায়ের জীবন-সংগ্রাম।

একদিকে স্টেশন মাস্টারের সততা, কর্তব্যবোধ অন্যদিকে নিদারুণ অভাব, আর্থিক প্রয়োজন – এ দুয়ের টানা পোড়েনে ক্ষতবিক্ষত সত্যভূষণ এতদিনের লালিত আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ২০ হাজার টাকা আত্মসাতের লোভ সামলাতে না পেরে নিজের অজান্তে নিজেরই আত্মজকে হত্যা করে। এই করুণ কাহিনী নিয়েই সলিল সেনের *ডাউন ট্রেন।*ধনঞ্জয় বৈরাগীর *আর হবে না দেরী* নাটকে নতুন সূর্যোদয়ের নবপ্রভাতের আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এক পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নেয়া হতদরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের ভাগ্যের চাকা একদিন ঘুরবে; বিপ্লব-বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় দূর হয়ে যাবে তাদের জীবনের যত আঁধার – এই নাটকে তাই প্রতীকায়িত হয়েছে।

সমাজের নিম্নবিত্ত,মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত এই ত্রি-বিত্তের মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং শ্রেণিবদলের চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের জীবনে যে অচরিতার্থতা নেমে আসে তারই নিপুণ চিত্র পরেশ ধরেরডা*না ভাঙা পাখি।*

বাদল সরকারষাটের দশকে রচনা করেন*বাকি ইতিহাস, বল্লভপুরের রূপকথা, শেষ নেই, এবং ইন্দ্রজিৎ* ইত্যাদি নাটক। *এবং ইন্দ্রজিৎ* এ্যাবসার্ড-প্রকরণের নাটক। *এবং ইন্দ্রজিৎ* নাটকের পাঁচটি চরিত্র–অমল, বিমল, কমল,

মানসী এবং ইন্দ্রজিৎ। এদের জীবনের কোনো মানে নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই ,এদের যাত্রাও তাই নিরুদ্দিষ্ট তবু ওরা চলছে; তাই ইন্দ্রজিৎ বলছে :

> এই যে চলছে– তার কোনো মানে নেই। একটা বিরাট চাকা কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে। আর আমরা তার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ঘুরছি আর ঘুরছি।[১৮]

এ নাটকে জীবনের শূন্যতার কথা ঘুরেফিরে বারবার এসেছে :

> এক–দুই–তিন–চার–তিন–দুই–এক।এ এক অঙ্ক। আবর্তনের অঙ্ক। পুরো অঙ্কটার উত্তর শূন্য। তাই পুরো অঙ্কটা কেউ নেয় না। কেটে ছোট করে নেয়। উত্তর হয়–জীবন। এক এক জনের এক এক রকম জীবন।[১৯]

নাটকের শেষেও একইরকম। এরা জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না,তবে এরা কি নিয়ে থাকবে ইন্দ্রজিতের এই প্রশ্নের উত্তরে চরিত্রের সংলাপে নাট্যকার জানায়:

> পথ। আমাদের শুধু পথ আছে। আমরা হাঁটবো। আমার লেখবার কিছু নেই,তবু লিখবো। তোমার বলবার কিছু নেই,তবু বলবে। মানসীর বাঁচবার কিছু নেই,তবু বাঁচবে। আমাদের পথ আছে,আমরা হাঁটবো।[২০]

মনোজ মিত্রের *নীলকণ্ঠের বিষ* নাটকে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার পাদরি লংম্যান কুষ্ঠরোগীদের সেবা করে তাদের সকল বিষ নিজ কণ্ঠে ধারণ করে যেন নীলকণ্ঠ হয়েছেন কিন্তু একসময় নিজে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে নীরবে নিভৃতে চলে গেছেন। *অবসন্ন প্রজাপতি* – মনোজ মিত্রের সার্থক কমেডি।অজিত কুমার ঘোষ মনোজ মিত্রের*অমৃতস্য পুত্র*নাটক সম্পর্কে বলেছেন :

> যুগ-যুগ ব্যাপী মানুষের অমৃতলাভের সেই সাধনা, সেই সংগ্রাম – এক প্রবহমাণ ইতিহাস। এই নাটকে সেই অমৃতের পথেই যাত্রা।[২১]

সুনীল দত্তের *বর্ণ পরিচয়*নাটকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। *খরনদীর স্রোতে* নাটকের বিষয় – নদীর মতো মানুষের জীবনেও স্রোত আসে সে স্রোতে আছড়ে পড়ে পুরনো অনেক রীতিনীতি ।

সোমেন নন্দীর সমান্তরালনাটকে দেখা যায়; শুক্লা পঙ্কিল সমাজের প্রতিনিধি, আর বিনায়ক ভদ্র সমাজের। পঙ্কিল-ভদ্র উভয়েই সমান্তরাল পথে চলেছে। *ছারপোকা*নাটক পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে তরুণ অলকের কল্পনা, ভাব, স্বপ্ন ভেঙ্গে ক্রমে চক্রবদ্ধ হয়ে চাকার তালে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ বিপথগামী হয়ে ওঠার গল্প।

রমেন লাহিড়ীর *পরোয়ানা* সামাজিক সমস্যাভিত্তিক নাটক। সংসারের অভাব মেটাতে গিয়ে আদর্শবাদী পিতার সন্তান যে-পঙ্কিল আবর্তে পা বাড়ায় –তাই এই নাটকের বিষয়। *পান্থশালা* – নাম-পরিচয় বিভ্রাটে কি ধরনের

ভ্রান্তি ও কৌতুক রসের জন্ম দেয় তাই নিয়েই*পান্থশালা*। এটি একটি মজাদার ও উপভোগ্য কমেডি। *ঢেউ* আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পটভূমিতে রচিত কথোপকথনমূলক নাটক। *বেনজু* যুদ্ধবিরোধী নাটক। *এলেম নতুন দেশেজে* বি প্রিস্টলির 'দে কেম টু এ সিটি' অবলম্বনে রচিত।

শৈলেশ গুহনিয়োগী (১৯৩১-)-এর*ক্যাম্পথ্রি*,আধুনিক কলকারখানা তথা শিল্পজীবনের সমস্যাকেন্দ্রিক নাটক। *ডাইভোর্স* হিন্দু সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ আইন প্রবর্তনের পর এর প্রয়োগকেন্দ্রিক হাস্যরসাত্মক প্রহসন। *পাহাড়ী ফুল* এক সদ্য যক্ষ্মামুক্ত তরুণের সঙ্গে এক পাহাড়ি মেয়ের প্রণয়। *ক্লান্ত রূপকার*রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের জীবন-সংগ্রাম আনন্দ-বেদনার ইতিবৃত্ত।
জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৮-)-এর *গেটম্যান* নাটকের বিষয় গেটম্যান-এর মতো অতি সাধারণ একজনমানুষের কর্তব্যনিষ্ঠা। *বায়েন* গ্রাম্য ঢোল-বাদকের তথা বায়েন-এর জীবনের দারিদ্র্য, অনাদর উপেক্ষা; *মুছেও যা মুছেনা*– দেশবিভাগের ফলে মানুষের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের চিত্র।

ষাটের দশকের উপর্যুক্ত নাট্যকারদের নাট্যপ্রয়াসের ফলে নাটকের বিষয়-প্রকরণ ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। বহুমাত্রিক বিষয় এসেছে নাটকে; নাটকের ক্ষেত্র আগের চেয়ে আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নাট্যকাররা কেউ কেউ। তবে, চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের প্রবণতা থেকে সরে আসেননি। বিশ্বব্যাপী নানা ঘটনাপ্রবাহে মানুষের জীবন ক্রমশ জটিল হয়েছে। ভারতসহ বিশ্বব্যাপী রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা সব মিলিয়ে এই দশক ছিল খুবই আলোড়িত দশক।

উৎপল দত্ত সত্তরের দশকে নেতাজী সুভাষ বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের দুঃসাহসিক এক অধ্যায় নিয়ে *দিল্লী চলো*, নীল বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে *নীলরক্ত*, শেকস্‌পিয়ারের *রোমিও জুলিয়েট* অবলম্বনে *ভুলি নাই প্রিয়া*, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানসাধক কল্‌হনের বিজ্ঞানচর্চা আর সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল নিয়ে *সমুদ্রশাসন* পালা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচনা ও প্রযোজনা করেন এবং *জয়বাংলা* পালা। ইয়ং বেঙ্গল-এর প্রতিনিধি ডিরোজিও'র দ্রোহ নিয়ে রচনা করেন*ঝড় পালা*, মাও সে তুঙ-এর সংগ্রামমুখর দিনের চিত্র নিয়ে*মাও ৎসে তুঙ*, আফগানিস্তানের টালমাটাল পরিস্থিতি নিয়ে *সীমান্ত*, ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ নিয়ে*সন্ন্যাসীর তরবারী*পালাইত্যাদি। পারি কমিউন-এর উপর ভিত্তি করে বিশ্বের প্রথম বামপন্থী সরকারের জয়-পরাজয়ের ইতিবৃত্ত নিয়ে *মুক্তিদীক্ষা* এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বিহারের বীর কুঁয়র সিং-এর লড়াই নিয়ে *কুঠার* পালা রচনা করেন তিনি।

এ-ছাড়াওএ-দশকে*সমুদ্র শাসন* পালার মঞ্চভাষ্য নির্মাণ করেন *সূর্যশিকার* নামে। শতবর্ষের বাংলা নাটক ও নাট্যকর্মীদের সংগ্রামমুখরতা নিয়ে রচনা ও প্রযোজনা করেন *টিনের তলোয়ার*। প্রযোজনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বিসর্জন*।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়েরচনা ও প্রযোজনা করেন*ঠিকানা*,তাঁর*ব্যারিকেড* নাটকেওঠে এসেছে ১৯৩০-এর দশকের জার্মানের ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা সিপাহী বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন *টোটা(মহাবিদ্রোহ)*, সমকালীন পশ্চিম বঙ্গের দুঃসহ পরিস্থিতি*দুঃস্বপ্নের নগরীর বিষয়; এবার রাজার পালা* (পলিটিক্যাল স্যাটায়ার) নাটকে উৎপল দত্ত তুলে

ধরেছেন সমকালীন রাজনীতির চিত্র (১৯৪৬-এ ভারতের মেচগীর রাজ্যের পটভূমিতে)। তিতুমীরের স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে *তিতুমীর*, কিউবার জনগণের মুক্তির লড়াই নিয়ে *ক্রুশবিদ্ধ কুবা*,স্তালিনের জীবনের বিশেষ অধ্যায় নিয়ে রচনা করেন *স্তালিন-১৯৩৪*,মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে *দাঁড়াও পথিকবর*, পথনাটক – *দিন বদলের দ্বিতীয় পালা*, *চক্রান্ত*, *সাদা পোশাক*, *কালো হাত*, *বর্গি এল দেশে*; অনুবাদ করেন শেকস্পিয়ারের *ম্যাকবেথ*, দারিও ফোর *অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অফ অ্যান অ্যানার্কিস্ট* অবলম্বনে রচনা করেন *বাংলা ছাড়ো* ইত্যাদি নাটক।

সত্তরের দশকে বাংলা নাট্যশালাসমূহের প্রযোজনা ছিল – বিজন ভট্টাচার্যের স্বর্ণকুম্ভ, *লাশ ঘুইরা যাউক*(একাঙ্ক),*আজ বসন্ত*, *সোনার বাংলা*, *চলো সাগরে*, *চুল্লী*(একাঙ্ক), *হাঁসখালির হাঁস*,শম্ভু মিত্রেরচাঁদ *বণিকের পালা*; ধনঞ্জয় বৈরাগীর *পরাজিত নায়ক*;অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরহে *উত্তাল সময়*,*সওদাগরের নৌকা*; বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়েরকমরেড; বাদল সরকারের*শেষ নেই*, *পাগলা ঘোড়া*, *স্পার্টাকুস*, *প্রস্তাব*, *মিছিল*, *লক্ষীছাড়ার পাঁচালী*, *রূপকথার কেলেঙ্কারী*, *যদি আর একবার*, *বাঘ*, *হট্টমালার ওপারে*, *ভোমা*, *সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস*;সমরেশ বসুর*কোথায় পাব তারে*, *সওদাগর*; শঙ্করের*চৌরঙ্গী*; আশাপূর্ণা দেবীর উত্তরণ; অনিল দে'র *রোদ্দুর*; নিমাই ঘোষের *সওয়াল*;চিনু দাসের *শেষ কণ্ঠস্বর*; অমিতাভ গুপ্তের *হিমালয় থেকে ভারী*, *প্রবাহ*; মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের *ক্যাপ্টেন হুররা*, *রাজরক্ত*, *পুষ্পকরথ*, *স্বদেশী নকশা*, *সোনার চাবি*, *আলিবাবা*, *মহাকালীর বাচ্চা*, *মাছি*, *লাঠি*;জোছন দস্তিদারের *কুমিরের কান্না*, *ঠ্যাঙারে*, *কর্ণিক*; নীতীশ সেনের *অরুন্ধুতির সন্ধানে*; সবিতাব্রত দত্তের *আলো দেখাও*; অমিত ঘোষের *স্কুলিঙ্গ*, দেবকুমার বসুর *মজার মজা*; সন্তোষ কুমার ঘোষের *অপার্থিব*; অরুণ মুখোপাধ্যায়ের *মারীচ সংবাদ*, *রামযাত্রা*, *কংক্রিট*, *জগন্নাথ*; দেবনারায়ণ গুপ্তের *বিদ্রোহী নায়ক*; শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর *জনপদ বধু*; সুশীল মুখার্জীর *তথাস্তু*; কুনাল মুখার্জী-এর *অনন্যা*; চিরঞ্জন দাসের *বৃহন্নলা*; বিমল মিত্রের *আসামী হাজির*; সলিল চট্টোপাধ্যায়ের *আপনি কে*; সুব্রতনন্দীর এ *মহাজাগরণ*; নারায়ণ সান্যালের *এক দুই তিন*; অলক রায় চৌধুরীর *এই দশকের অভিমন্যু*; মনোজ মিত্রের *বাবা বদল*, *কেনারাম বেচারাম*, *আত্মগোপন*, *শিবের অসাধ্যি*, *নরক গুলজার*, *পরবাস*, *পাখি*, *কাল বিহঙ্গ*, *তক্ষক*, *বাজপাখি*, *মেষ ও রাক্ষস*, *সাজানো বাগান*, *চোখে অঙুল দাদা*, *আমি মদন বলছি*; শিশির বসুর *অভিশপ্তা*, *লেম্পপোস্ট*; দেবাশিস মজুমদারের *দানসাগর*, *অমিত্রাক্ষর*, *সমাবর্তন*; অলক রায় চৌধুরীর *লাল লণ্ঠন*; তপেন্দু গাঙ্গুলির *সংগ্রাম*; তৃপ্তি মিত্রের *বলি*; সমরেশ বসুর *নাটের গুরু*; সুনীতি মুখোপাধ্যায়ের *বিষন্ন সকাল*; বিমল মিত্রের *জনগণ মন*; সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের *নাম জীবন*; প্রতিভা আগরওয়ালের *সুরদাস*; সুনীল গাঙ্গুলীর *কেন্দ্রবিন্দু*; কুন্তল মুখোপাধ্যায়ের *ইস্পাত*;সমর মুখার্জীর *প্রিয়ার খোঁজে*; তুষার দে'র *কালকেতু*;*অর্থ শিক্ষা বিচিত্র*; মধু গোস্বামীর *বিদ্রোহী নজরুল*, বিমল করের ঘুঘু; অসিত বসুর *রাংতার মুকুট*; অলক রায় চৌধুরীর *নকশাল আন্দোলন তার সজীবতা ব্যর্থতা*; পার্থপ্রতিম চৌধুরীর *একাকী সহসা* ছাড়াও অসংখ্য উল্লেখযোগ্য নাটককর্ম।

বিজন ভট্টাচার্যের *স্বর্ণকুম্ভ* নাটকে রূপকের আড়ালে সমকালীন অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, *আজ বসন্ত* নাটকে অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র রোমান্টিক আবহে রচিত। *সোনার বাংলা* বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। *চলো সাগরে*– জীবন বহতা নদীর মতো চলছে, থেমে নেই; এই চলমান জীবনে চলার পথ সকলের একরকম নয়, তবু মানুষ চলছে। নদীর যেমন সাগর আছে,মানুষের আছে মিছিল; নদী সাগরের দিকে

এগিয়ে যায়;মিলে যায় সাগরে,মানুষ এগিয়ে চলেছে,মানুষের মিছিলও এগিয়ে চলেছে – এই নিরন্তর প্রবহমাণতাই *চলো সাগরে* নাটকের বিষয়ভাবনা। এ-নাটকের আঙ্গিক-প্রকরণ,বিষয়বস্তু ভিন্ন ধরনের। চারটি তরঙ্গে এ-নাটকের ঘটনাপ্রবাহ কল্লোলিত। প্রথম তরঙ্গ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা;দ্বিতীয় তরঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ষাট-সত্তর দশকের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত; তৃতীয় তরঙ্গ নকশাল বাড়ি আন্দোলন; চতুর্থ তরঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক-মালিক সংঘাত চিত্রিত হয়েছে। এই নাটকে নাট্যকার এক একটি তরঙ্গে একেক ধরনের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। *চুল্লী* নাটকে শ্মশানঘাটে চুল্লির পাশে যারা বসে থাকে,যারা শেষকৃত্যের কাজ করে, সমাজের নিচুতলার সেইসব মানুষের জীবন। *হাঁসখালীর হাঁস*নাটকে শ্রমজীবীমানুষের জীবন সংগ্রাম। কলকাতায় পাতাল রেল তৈরি করতে আসা মাটিকাটার শ্রমিকরা এ-নাটকের পাত্র-পাত্রী। বঞ্চিত নিপীড়িত শ্রমিক জীবন *হাঁসখালির হাঁস* নাটকের বিষয়।

শম্ভু মিত্র(১৯১৫-১৯৯৭)-এর *চাঁদ বণিকের পালামনসামঙ্গল*-এর পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হলেও এর ভেতর দিয়ে সমকালের মানুষের জীবন-সংগ্রাম রূপায়িত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। চাঁদ বণিক সমস্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, হাজারও প্রতিবন্ধকতার ভেতরতার দুঃসাহসিক অভিযান থেকে বিচ্যুত হয় না; অভিযান চলতে থাকে তার। চাঁদের নিরন্তর সংগ্রামীলতা এ নাটককে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এ-নাটক লেখা হয়েছে ১৯৬৫ সাল থেকে, প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৮ সালে। ষাট-সত্তর দশকের অস্থিরকালের চিত্র এ-নাটকে এসেছে দ্রোহের সমস্ত উত্তাপ নিয়ে।

বাদল সরকারের *স্পার্টাকুস* নিপীড়িত নিষ্পেষিত ক্রীতদাসদের জীবন;*মিছিল*সত্তুর দশকের অস্থির সমাজ-সময়ের ছবি । আঙ্গিক বিচারে কাহিনীবিহীন নাটক, বিষয়বস্তুওসুনির্দিষ্ট নয়। নাটকের চরিত্রগুলোও প্রতীকি। সংখ্যা দিয়ে চরিত্র-নামায়ন পরিচয়। সুন্দরবন এলাকার এক জঙ্গলের কাঠুরে *ভোমা*নাটকের কেন্দ্র। ভোমা সংগ্রামী, পরিশ্রমী মানুষ। কিন্তু দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত ভোমার দিন কাটে অনাহারে অর্ধাহারে। আজ আর তার যৌবনের শক্তি নেই। নাটকের শেষাংশে ভোমাদের জাগরণের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। *সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস* নাটকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিপরীতে ভারতের সত্য ইতিহাস তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন নাট্যকার। *হট্টমালার ওপারে* নাটকে ধরা হয়েছে কল্পনার কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ছবি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪-)-এর তিনটি (*রাজরক্ত,স্বদেশি নকশা এবং মহাকালীর বাচ্চা*)নাটকেই শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। *রাজরক্ত*নাটকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা;*স্বদেশি নকশা*-য় স্বদেশের নেতাদের ভণ্ডামি এবং *মহাকালীর বাচ্চা*-য় নিপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল বর্ণিত হয়েছে।

মনোজ মিত্র(১৯০১-১৯৮৭)-এর *চাকভাঙা মধু* নাটকে সুন্দরবনের উপকণ্ঠে এক গ্রামের অভাবী মানুষেরা জোতদার অঘোর রায় কর্তৃক নিষ্পেষিত হতে হতে একসময় সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। *নরক গুলজার* নাটকে স্বর্গ-মর্ত্য এবং নরকের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।*সাজানো বাগান* নাটকে আছে সমকালের ছবি,সমাজের উঁচুতলার লোভাতুর মানুষ,সমাজের অবক্ষয় ও অধঃপতন।

মারীচ সংবাদ বিষয়ে নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৭-) যা বলেছেন তা থেকে নাটকের বক্তব্য সহজেই অনুমেয়।নাটকে প্রবলের দাপট, দুর্বলের অসহায়ত্ব, পৌরাণিক রূপকে বর্তমান সময় অবলম্বন করে তিনটি সমান্তরাল কাহিনীকে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে। সমকালীন রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন নাট্যকার। *জগন্নাথ* নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র জগন্নাথ একটু ব্যতিক্রমী চরিত্র। এ-নাটকে প্রতিবাদী চেতনা থাকলেও তা ভিন্ন ধরনের। এর প্রতিবাদ অন্তর্গত,বাইরের নয়। এই চরিত্রটির মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনা-ক্ষোভ-স্বপ্ন যেমন রূপায়িত হয়েছে, তেমনি এ-নাটকে রূপায়িত হয়েছে প্রতিবাদ। এদের ভেতরে স্ফুলিঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে বিপ্লবের সম্ভাবনা – এই সম্ভাবনার কথাই বলেছেননাট্যকার।

দেবাশিস মজুমদার (১৯৫০-)-এর *দানসাগর* নাটকের উপজীব্য সমাজের একেবারে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের নিদারুণ দারিদ্র্য। তাঁর*অমিতাক্ষর* নাটকে – পেটের দায়ে এক নকল বিপ্লবীর দিনে দিনে আসল বিপ্লবীর প্রতিবাদ ও দেশপ্রেম ফিরে পাওয়া।

আশির দশক থেকে নব্বইয়ের দশক বিশেষত ১৯৯৩ সাল নাগাদ (মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত) উৎপল দত্ত রচিত ও নির্দেশিত নাটকগুলো হল: *স্বাধীনতার ফাঁকি*, *কমিউনের দিনগুলি*(উৎপল দত্ত অনূদিত বের্টোল্ট ব্রেখট্-এর *ডী টাগে ডের কম্যুনে)*, ডেভিড সেলবার্ন রচিত ও শক্তি বিশ্বাস অনূদিত *দ্য ট্রায়াল অফ মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বা শ্রীমতীর বিচার*, *পেট্রোল বোমা,বিবিঘর,পান্ডবের অজ্ঞাতবাস*(গিরিশচন্দ্র ঘোষ),*তিলজলার জল* (ভাসিলি চিচকফ রচিত ভ.ই লানকিন অনূদিত) *অসমাপ্ত সংলাপ*, *মালোপাড়ার মা*, *শৃঙ্খল ছাড়া*, *৩১ শে অক্টোবর*, *আজকের শাজাহান*, *কুশপুত্তলিকা*, *মহাচীনের পথে*, *মুমূর্ষু নগরী*, *মুমূর্ষু বাংলা*, *কাঁচের ঘর,দামামা ঐ বাজে*, *বণিকের মানদণ্ড*, ব্রেখট্-বের্টোল্ট এর (মুট্টের কুরাজ উন্ড ইহরে কিন্ডের)অনুসরণে *হিম্মৎ বাই*, *দামামা ঐ বাজে*, *বণিকের মানদন্ড*, *অগ্নিশয্যা*, *দৈনিক বাজার পত্রিকা*, *নীল সাদা লাল*, *খুনী কে? হমে দেখনা হ্যায়*, *একলা চলো রে*, *কিরাতপর্ব*, *লালদুর্গ*, *সত্তুরের দশক*, *জনতার আফিম*, *ফুলবাবু*, *দিল্লী বিচিত্রা*, *মীর কাসিম,কৃপাণ* ইত্যাদি।

আশির দশকে বাংলা নাট্যশালার উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলো ছিল: বাদল সরকারের *মানুষে মানুষে*, *খাট মাট ক্রিং*, *চূর্ণ পৃথিবী*, *সিঁড়ি*, *জন্মভূমি আজ*, *শানা বাউড়ির কথকতা*, *পাখি উড়ে যায়*, *ভুল রাস্তা;* পবিত্র সরকারের *তেত্রিশতম জন্মদিন*, জগদীশ চক্রবর্তীর *সাড়ে নটা*, *আসল জিনিস*, *আত্মার শান্তি*, *সীতার অগ্নিপরীক্ষা*; চিররঞ্জন দাসের *মৃত্যুহীন বেঞ্জামিন*, *নয়নতারার মৃত্যু এবং...,তুমি আমি সবাই*, *পৃথিবীর জন্য*, *রক্তাক্ত রোমিও জুলিয়েট;* রমাপদ চৌধুরীর *খারিজ*, বাসুদেব বসুর *জনতার নেতা স্তালিন*, *এক জোট*, *শতাব্দীর ডাক*, *এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ*, *স্ট্রাইকার*; দেবাশীষ মজুমদারের *রক্তবীজ*, *অসমাপ্ত;* মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা;* জোছন দস্তিদারের *পরিচয়*, *এ এক ইতিহাস*, মনোজ মিত্রের *মেষ ও রাক্ষস*, *নৈশভোজ*, *রাজদর্শন*, *কিনু কাহারের খেটার*, *অলকানন্দার পুত্রকন্যারা*, *শোভাযাত্রা*; ধনঞ্জয় বৈরাগীর *ঈশ্বর;* পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মানুষ*, *বাণীবটিকা*, *বেঈমানী*; অশোক মুখোপাধ্যায়ের *বেলা অবেলা কালবেলা*, জোৎস্নাময় ঘোষের *স্বরবর্ণ*, রত্নাকর মাতকারির *লোককথা*, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের *কানামাছি খেলা*, *তোতারাম*, *আলিবাবা*, *দ্বীপের রাজা*; বিভাস

চক্রবর্তীর(দারিও ফো'র – *দ্য এ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অফ অ্যান এনার্কিস্ট অবলম্বনে) হচ্ছেটা কী*,*ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনেমাধব মালঞ্চী কইন্যা*,চন্দন সেনের *অনুবীক্ষণ*,*জ্ঞানবৃক্ষের ফল*; উমানাধ ভট্টাচার্যের *দিবারাত্র*, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দেওয়ালের লিখন*, মন্মথ রায়ের *এদেশে লেনিন*, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ব্রজ সংবাদ*, *একটি অবাস্তব গল্প*, *আয়না;* শৈলেশ গুহনিয়োগীর *একদিন স্বপ্নে*,অনির্বাণ চৌধুরীর *কার্ল মার্কস*, শ্যামল ভট্টাচার্যের *জেলেপাড়ার গান*, শিব শর্মার *রক্ত থেকে জন্ম*,*দরবারের গল্প*,অঞ্জন দত্তের *আলীজান*, চন্দ্রা দস্তিদারের *প্রত্যশা*, জীতেন্দ্রনাথ মুখার্জীর *পরিচয়*, গনেশ মুখোপাধ্যায়ের *কি বিভ্রাট*, প্রদীপ ভট্টাচার্যের *দংশন*, বিষ্ণু বসুর *মান্যবর ভুল করছেন* ইত্যাদি নাটক।

এ-সময়ের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার : বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, জগদীশ চক্রবর্তী(১৯২৫-১৯৮৪),বাসুদেব বসু(১৯৩৭-), চিররঞ্জন দাস(১৯৩৯-১৯৯৮), মোহিত চট্টোপাধ্যায়,ধনঞ্জয় বৈরাগী, দেবাশিষ মজুমদার, জোছন দস্তিদার, অশোক মুখোপাধ্যায়(১৯৪৮-), বিভাস চক্রবর্তী(১৯৩৭-) প্রমুখ।

বাদল সরকার তাঁর নাটকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর নাটকে ব্যক্তির সংকট থেকে ক্রমশ সমষ্টির সংকট এবং এইসব সংকটে আধুনিক মানুষের অসহায়ত্বের স্বরপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। মনোজ মিত্রতাঁর *মেষ ও রাক্ষস* নাটকে রূপকের আড়ালে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা উন্মোচন করতে চেয়েছেন, *নৈশভোজ* এবং *কিনু কাহারের থেটার* নাটকে গ্রামীণ পটভূমিতে মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ,প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রাম,জীবনের সংকট তুলে ধরেছেন যেখানে পুঁজিবাদ ও সামন্ত সমাজের দ্বান্দ্বিক রূপ সহজেই দৃশ্যমান। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের *তোতারাম* নাটকেও একই চিত্র লক্ষ করা যায়।

বিভাস চক্রবর্তীর *হচ্ছেটা কী* নাটকটি দারিও ফো-র *দ্য এ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অফ অ্যান এনার্কিস্ট* অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে সমকালীন রাজনীতি বিশেষত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়াবহতা উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার। অশোক মুখোপাধ্যায়ের *বেলা অবেলা কালবেলা* নাটকে একটু ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টিকে মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার এ-নাটকে।

সাধারণভাবে এ-পর্বের নাট্যকারদের নাটকে চল্লিশ-পঞ্চাশ এমনকি ষাট-সত্তরের দশকের সেই প্রতিবাদী চেতনা তেমন করে যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-সময় তথ্য-প্রযুক্তির যেমন উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব-ইউরোপের দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়েছে। মানুষকে মোকাবিলা করতে হয়েছে নতুন সংকট ও বিপর্যয়ের। মার্কসবাদে বিশ্বাসী মানুষের মনে দেখা দিয়েছে সংশয় ও দ্বিধা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লব সংঘটিত হওয়া যেমন সারাবিশ্বকে আলোড়িত করেছিল তেমনি এর বিনষ্টিও মানুষকে আন্দোলিত করেছে। একদিকে বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্যদিকে স্বদেশের পরিস্থিতি সব মিলিয়ে দিশেহারা অবস্থা। এইসময়ে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যদলেও দেখা দেয় ভাঙন; একদল ভেঙে অনেক নাট্যদলএবং থার্ড থিয়েটারের অস্তিত্ব লক্ষনীয়।এই অবস্থা থেকে উত্তরণে ঐ-সময়ের নাট্যকাররা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অনেকেই অনিকেতচারী।এই সময়ের নাট্যকর্মে নাট্যকারগণ নানান পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করেছেন।তাই আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের মত গণমানবকেন্দ্রিক নাটকের কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নাটকের তেমন প্রযোজনা আশি-নব্বইয়ের দশকে পরিদৃষ্ট হয় না। বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন নাটকে গণজীবনের ছবি বা লড়াইয়ের চিত্র উপস্থাপিত হলেও শতাব্দীর শেষান্তে এসে তা ক্রমশ ম্রিয়মাণ হতে থাকলো।শতবর্ষের ঐতিহ্যে লালিত রাজনৈতিক নাটক উৎপল দত্তের মাধ্যমে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যে-বিপ্লবী থিয়েটার অভিমুখে যাত্রারম্ভ করে, শতাব্দীর শেষান্তে উৎপল দত্ত তাঁর অবস্থানে ঠিক থাকলেও বাংলা নাটক যে-গতিতে এগুচ্ছিল সেই গতিময়তা পরিলক্ষিত হয় না।

উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী নাট্যকার যিনিতাঁর নাট্যদর্শনের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। গণনাট্য থেকে ফিরে, সেই চেতনা ধারণ করে, স্বদেশ-বিদেশের বিপ্লব-বিদ্রোহের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে গণমানবকেন্দ্রিক নাটক রচনার যে অঙ্গীকার ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে; আমৃত্যু সে-অঙ্গীকার তিনি তাঁর নাট্যসৃজন, মঞ্চায়নের প্রতিটি পর্যায়ে রক্ষা করে গেছেন। তিনি তাঁর নাট্যকার জীবনের প্রথম থেকে শুরু করে আশি-নব্বইয়ের দশকে, জীবনসায়াহ্নেও মানুষের বাঁচার লড়াই, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বিপ্লব-বিদ্রোহের নাটকই রচনা ও প্রযোজনা করেছেন।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা উৎপলের নাটকের একটি বড় দিক। একজন মার্কস্‌বাদী নাট্যকারের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক;মার্কস্‌বাদ সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করে না। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে *আনন্দমঠ*, *দেবী চৌধুরানী* উপন্যাসে ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহকে, যা ছিল হিন্দু-মুসলিম উভয়ের যুগপৎ আন্দোলন – অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করতে পারেননি,সেখানে উৎপল দত্ত *সন্ন্যাসীর তরবারী* পালায় ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহকে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের যুগপৎ আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। তা-ছাড়াও,তাঁর*জনতার আফিম* নাটক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদের স্বাক্ষর। উৎপল দত্ত অন্যান্য নাটকেও কীভাবে শাসকশ্রেণি নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য দাঙ্গা লাগায়,ধর্মকে ব্যবহার করে তা সুস্পষ্টভাবে দর্শক-পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

উৎপল দত্তের নাটকে দেশপ্রেমএসেছে বৈশ্বিক অনুভূতিতে এবং এই দেশপ্রেম তাঁর নাটকে নতুন মাত্রা পেয়েএকটি বিশেষস্থান দখল করে আছে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক,যাত্রাপালা, পথনাটক, একাঙ্ক নাটক এবং রূপান্তরিত নাটক সব ধরনের নাটক জুড়ে আছে দেশপ্রেম। যেভূখণ্ডের মানুষদের নিয়েই উৎপল নাটক রচনা করেছেন সেই ভূখণ্ডের মানুষেরা অর্থাৎ তাঁর নাটকের চরিত্ররা নিজের দেশকে ভালবাসার বেলায় বা তাদের দেশ নিয়ে যখন সুবিধাবাদীরা নানা ষড়যন্ত্র ও খেলায় মেতে ওঠেছে তখন তারা যে কোন মুল্যে তা প্রতিহত করতে প্রয়াসী হয়েছে।

বাংলা নাটকে উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী নাট্যকার রাজনীতিই যাঁর সমগ্র নাট্যরচনার মূলে কাজ করেছে। অন্য নাট্যকারদের মতো তিনি আর দশটা নাটকের ফাঁক-ফোঁকরে রাজনৈতিক নাটক লেখেননি। রাজনীতিই উৎপলের নাটকের প্রধান নিয়ামক। তিনি তাঁর পূর্বসূরী বা সমকালের নাট্যকারদের মতো ইতিহাস-পুরাণ বা

রূপক-সংকেতের আড়ালে রাজনৈতিক বিষয়কে লুকিয়ে রাখেননি। এখানেই উৎপল দত্তের সঙ্গে অন্যান্য নাট্যকারের মৌলিক তফাৎ। তাঁর নাটকে বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকলেও, স্থান-কাল বিচিত্র হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নাট্যদর্শনেঅটল ও অনঢ় ছিলেন, কেননা তিনি জীবনদর্শনেও ছিলেন আমৃত্যু অটল। ব্রেখট-এর মতো তিনিও বিশ্বাস করেন মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতা ছাড়া এ-যুগের কোনো থিয়েটারই জনগণের থিয়েটার হতে পারে না।

ফেরারী ফৌজ-নাটকে তিরিশের দশকের বিপ্লবীরা যে-সশস্ত্র লড়াই শুরু করেছিল শান্তি রায়ের নেতৃত্বে ভুবনডাঙায়; *রাইফেল* পালায় মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করে অবিনাশ বসুরা বহরমপুরে যে-বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ জ্বেলে গিয়েছিল; *কৃপাণ* নাটকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ২৩ নম্বর ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহের যে-অনালোকিত ও অনালোচিত কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে;১৯৪৬ সালে *কল্লোল* নাটকে শার্দুলরা যে-নৌবিদ্রোহ শুরু করেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে; ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলেও শতাব্দীর শেষান্তে রচিত *একলা চলো রে*নাটকে অনাথবাবুর ছেলেরা সেই দীপালিই জ্বেলে যায়।

ষাটের দশকে *মানুষের অধিকারে* দেশকালের সীমানা ছাড়িয়েউঠে এসেছিল আমেরিকার এলাবামা রাজ্যের বর্ণবৈষম্য। পূর্ব ইউরোপে নব্বইয়ের দশকে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের মধ্যেও চসেস্কু এবং তাঁর উত্তরসূরীরা (*লালদুর্গ*) মানুষের অধিকার তথা বাঁচার লড়াই-ই শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যায়। জীবন যতদিন থাকবে, মানুষ যতদিন বাঁচবে লড়াইততদিন চলবে;সে-লড়াইয়ের ধরন যাই-ই হোক না কেন; ইতিহাসের সমাপ্তি নেই, লড়াইয়েরও শেষ নেই। তাই উৎপলের নাটকের চরিত্ররা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যায়; যেমন শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যায়–*ঝড়* পালায় ডিরোজিও; মৃত্যুশয্যায়ও তিনি হার মানেন নি,হাল ছাড়েননি এবং তাঁর ছাত্র ও শিষ্যদের বলে গিয়েছেন; কাজ ছেড়ো না, লেখা ছেড়ো না - 'দ্য ফাইট গোজ অন'।

মহৎ শিল্পকর্ম তার কালকে ছাড়িয়ে যায়, সর্বকালের হয়। সে-নাটক ইতিহাস হয়ে যায়, যে-নাটক তার কালকে প্রতিফলিত করে; এ-প্রসঙ্গে স্তালিন বলেছেন:

> 'যে মহৎ সৃষ্টি নিজ যুগকে প্রতিফলিত করে তা সর্বকালের হয় – তা উৎপাদন সম্পর্ককে অতিক্রম করে। শেকসপিয়ার, গ্যাটে, মার্লো,শিলার,ইবসেন-এর নাটকে সমকালীন সমাজের দ্বন্দ্ব.সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলেই তারা তাদের কালকে অতিক্রম করে আজো বেঁচে আছেন। বর্তমানকে লঙ্ঘন করে চিরন্তনকে ধরা যায় না– অন্তত নাটকে না। বর্তমানের হয়েই সর্বকালের হতে হবে।'[২২]

উৎপলের নাটকের আলোচনান্তে স্তালিনের এই উক্তির যথার্থতা প্রতীয়মান হয়।

নানা ঘটনাপ্রবাহে উত্তাল উৎপলের সমকালীন পৃথিবী, ভারতীয় উপমসহাদেশ। নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলা নাটক গণমুখী চরিত্র অর্জন করে এবং পঞ্চাশ ষাটের দশকে এসে তা নতুন মাত্রা লাভ করে উৎপল দত্তের মাধ্যমে। উৎপল দত্ত বিশ্বনাট্য ও বাংলা নাটকের ঐতিহ্যে অবগাহন করে ঐতিহ্যকে আরও বেশি ঋদ্ধ করেন; বাংলা নাটকের গণমুখী ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান বহুদূর। উৎপল দত্ত

একদিকে বাংলা নাটকের প্রচলিত প্রথা ভেঙেছেন; অপরদিকে বিশ্বের রাজনৈতিক নাটকের মূলপ্রবাহের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বাংলানাটকে তিনি প্রলেতারিয়েতের মিথ নির্মাণ করেছেন।তাঁর কালকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে এগিয়ে গেছেন অনেকদূর।

আমাদের অভিসন্দর্ভের বিষয় 'সমকালীন বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্তের নাটকের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য'এবং বর্তমান অধ্যায়ের বিষয়ভাবনা উৎপল দত্তের কাল ও বাংলা নাটক। উৎপল দত্ত যদিও পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক নাট্যচর্চা করেছেন কিন্তু তা কেবল পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ থাকেনি; তাঁর নাটক ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে সময়ের সীমানা পেরিয়ে সর্বকালের সবমানুষের নাটক হয়ে ওঠেছে।গণমানুষের নাট্যকার বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের ধারাকে অবিচ্ছিন্ন এবং বিশ্বের সকল বিপ্লবীকে তাঁর নিকটাত্মীয় মনে করতেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময়ে উৎপল *জয়বাংলাওঠিকানা* দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের নাটকও যেহেতু বাংলা নাটকের অংশ তাই উৎপল দত্তের কালের বাংলাদেশের নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

নাটকের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত দেশকাল; এবং দেশ-কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পরই ১৯৪৮ সাল থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র। কিন্তু সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে সালাম,বরকত,রফিক,জব্বারসহ নাম না জানা (আরও অনেকে), বাংলার ছাত্র (তরুণ) সমাজ বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে মায়ের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৫৮ সালে জারী হওয়া সামরিক শাসন,'৬৮তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, '৭১-এরঅসহযোগ আন্দোলন এবংসবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।স্বাধীনতা বাঙালির অমর এবং অমূল্য অর্জন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই দুই যুগ ধরে বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রাম,ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের স্মরণকালের মধ্যে।

দেশবিভাগের আগ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ভারতবর্ষের অংশ থাকলেও ঢাকাকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার ধারাটি পশ্চিমবঙ্গের মতো সক্রিয় ও বিকশিত ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে চল্লিশের দশকে গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে যে গণমূখী ধারার নাট্যচর্চা শুরু হয় বাংলাদেশে তার যাত্রা আরম্ভ হয় সত্তরের দশকে। বাংলাদেশে মূলত নাট্যচর্চা ঢাকাকেন্দ্রিক হলেও মফস্বল শহরগুলোতেও নাট্যচর্চার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ১৯৪৭ থেকে '৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের নাট্যান্দোলনের একটি পর্যায় এবং ১৯৭১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আরেকটি পর্যায়ে বিন্যাস করে আলোচনায় অগ্রসর হতে চাই।

১৯৪৭সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিষয় ও প্রকরণে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররা হলেন; নুরুল মোমেন(১৯০৮-১৯৯০), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সিকান্দার আবু জাফর(১৯১৯-১৯৭৫),সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ(১৯২২-১৯৭১),মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) এবং সাঈদ আহমদ(১৯৩১-)।

১৯৪৪ সালে রচিত নুরুল মোমেনের ব্যতিক্রমী প্রয়াস *নেমেসিস*একাঙ্কিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকিয়ায় বাংলায় নেমে আসা দুর্ভিক্ষ,অর্থনৈতিক বিপর্যয়,মজুতদার মুনাফাখোর ও কালোবাজারিদের চক্রান্ত আর নিরন্ন মানুষের হাহাকার *নেমেসিস* একাঙ্কিকার পটভূমি। সৎ এবং সহজ,সরল স্কুল শিক্ষক সুরজিৎ নন্দী,চোরাকারবারি,দুর্বৃত্ত শ্বশুর নৃপেন বোসের চক্রান্তে বাধ্য হয় অন্ধকার পথে পা বাড়াতে; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে কালোবাজারি করে বিত্তশালী বনে যায়। ভালবাসার স্ত্রী সুলতাকে পাবার জন্যে শ্বশুরের নির্দেশে কালোবাজারি করলেও তার ভেতরের শুভবোধ মরে যায়নি। তাই তার ভেতরে রক্তক্ষরণ শুরু হয় – একদিকে এতদিনের লালিত আদর্শ,অন্যদিকে সুলতাকে পাওয়ার আকুলতায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শেষপর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নেয়সুরজিৎ। মৃত্যুর আগে সুলতার উদ্দেশ্যে সুরজিতের শেষ উচ্চারণ পাঠক,দর্শককে সচকিত করে তোলে –'আমার সঙ্গে সুলতার দেখা হল না,সে আমার পরম সৌভাগ্য। আমি জীবিত থাকলে সে এসে দেখতো তার সুরজিত মরে গেছে। আমি মরে যাওয়ায় সুরজিত জীবিতই রইল। সুলতার প্রার্থনা বৃথা যায়নি – আমার হীন অর্থ আমার বংশকে কলঙ্কিত করবে না। I paid the penalty with my life and saved my generations.'[২৩]নুরুল মোমেনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলো – *যদি এমন হতো*, *নয়াখান্দান*,*আইনের অন্তরালে*,*শতকরা আশি*, *যেমন ইচ্ছা তেমন*, *হিংটিং ছট* ইত্যাদি।

শওকত ওসমানবাংলাদেশের প্রগতিশীল নাট্যকারদের একজন; ১৯৪৫ সালে রচিত *তস্কর ও লস্কর* নাটকের পটভুমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয়। তাছাড়াও তিনি *কাঁকর মণি*এবং *আমলার মামলা*নামে দুটি প্রহসন এবং রূপক নাটক *বাগদাদের কবি* ইত্যাদি রচনা করেন।

সিকান্দার আবু জাফর*শকুন্ত উপাখ্যান* নামক রূপক নাটক(একাঙ্কিকা) রচনা করেছেন ১৯৬১ সালে।তা ছাড়া *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*,*মাকড়সা* ও *মহাকবি* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহনাট্যাঙ্গনেও কথাসাহিত্যের মতই বিজ্ঞানমনস্ক,আধুনিক ও নিরীক্ষাপ্রিয়। নাটকেও তিনি অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রয়োগ ঘটাতে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।*বহিপীর*,*সুড়ঙ্গ*,*তরঙ্গভঙ্গ* এবং *উজানে মৃত্যু*তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি।

বাংলাদেশের নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম নাট্যকারমুনীর চৌধুরী । ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁর নাট্যচর্চাকালে তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা ভাঙাগড়াকে এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশকে। মাত্র দু'দিনের জন্য তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ দেখে যেতে পারেননি। '৪৭-এ রচিত *মানুষ* নাটকের পটভূমি'৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৫০ সালে রচনা করেন *নষ্টছেলে* নামক একাঙ্কিকা।মুনীর

চৌধুরীর *কবর* নাটকের পরিপ্রেক্ষিত '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।তিনি কারাগারে বসে *কবর* নাটক রচনা ও অভিনয় করেন। মুনীর চৌধুরীর*কবর*এই জনপদের প্রথম প্রতিবাদী নাটক। এই নাটকের বিষয় যেমন বাস্তব ঘটনাভিত্তিক তেমনি এর শৈল্পিক দিক তথা প্রকাশরীতিও অভিনব। তাই মুনীর চৌধুরীর *কবর* বাংলা নাট্যধারার উল্লেখযোগ্য ওউজ্জ্বল সংযোজন।ড. আনিসুজ্জামান যথার্থই এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেন–'কবর' আর মুনীর চৌধুরীর নাম এক হয়ে গেছে।যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন নির্ভর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে কবরের নাম। 'কবর' মানে রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্দীপ্ত,জনমনে গভীরভাবে প্রোথিত প্রত্যয়বোধে ঋদ্ধ একটি সফল শিল্পরূপ।'[২৪]*কবর* ছাড়াও মুনীর চৌধুরী *রক্তাক্ত প্রান্তর*, *চিঠি*,*দন্ডকারণ্য*এবং *পলাশী ব্যারাক* ও *অন্যান্য*নাটক রচনা করেছেন। তিনি কয়েকটি নাটকের রূপান্তরও করেছেন।

নাট্যকার সাঈদ আহমদও নাটকে নিরীক্ষাপ্রিয়। তিনি তাঁর নাট্যত্রয়–*কালবেলা* ,*মাইলপোস্ট*এবং *তৃষ্ণায়* অ্যাবসার্ড নাট্য-আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন।

উপর্যুক্ত নাট্যকারদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছাড়া অন্য নাট্যকারগণ '৭১ পরবর্তীকালেও নাট্যচর্চা করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব বাংলাদেশে উপর্যুক্ত নাট্যকারদের পাশাপাশি নাট্যরচনায় দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেনআসকার ইবনে শাইখ(১৯২৫-১৯৯৪),আলী মনসুর(১৯২৫-),আনিস চৌধুরী(১৯২৯-১৯৯১),আলাউদ্দিন আল আজাদ(১৯৩২-),কল্যাণ মিত্র(১৯৩৯-) প্রমুখ। এঁরা যে ধরনের যে প্রকরণের নাটকই রচনা করূন না কেন; এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে উপ্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের বীজ এবং এই নাট্যকারবৃন্দ যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশেও নাট্যরচনায় দক্ষতা এবং সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

> স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাহিত্যের ,যে শাখাটি সবচেয়ে সমৃদ্ধও বিকশিত হয়েছে,নিঃসন্দেহে তা নাটক। স্বাধীনতাচেতনাকে মর্মমূলে লালন করে আমাদের সাহিত্যের ধারায় নাটক ইতোমধ্যেই নির্মাণ করেছে গৌরবোজ্জ্বল এক ইতিহাস।বস্তুত,১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাচেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য অভিন্ন সত্তায় গ্রথিত। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতিসত্তাকে নতুন চিন্তায় করেছে পুনর্জাত,শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো নাটকেও ঘটেছে এর উজ্জ্বল প্রতিফলন। স্বাধীনতার রক্তধারায় স্নাত হয়ে জন্ম নেয়া বাংলাদেশের নাটক এখন এক সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল।[২৫]

সত্তর দশকের শুরু থেকেই নাটক তথা শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টজনেরা এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, রাজপথের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাথে রাজনীতি সচেতন,প্রত্যয়ী ও সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ব্যাপক জনতা তথা গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাই গণমানুষের কাছে পৌঁছাবার হাতিয়ার হিসেবে তারা বেছে নিলেন নাটককে – কারণ নাটক হচ্ছে অপরাপর শিল্পমাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিস্ফোরণক্ষম হাতিয়ার। ঢাকা,চট্টগ্রামসহ সারাদেশের নাট্যকার-নাট্যকর্মী এবং শিল্পী,সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী সকলে সম্মিলিতভাবে আবৃত্তি,গান নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে

গণমানুষের কাছে সংগ্রামী চেতনা পৌঁছে দিতে তাদের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। দিনে দিনে এই প্রয়াস তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। 'উদীচী'-এরপথনাটক *শপথ নিলাম,রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য,*'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'-এর পথনাটক *ভোরের স্বপ্ন*(১৯৭১),*পোস্টার*(১৯৭১),'সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী'র *মা,বিপ্লবের টুকরো ছবি,দুনিয়া কাঁপানো দশদিন*(১৯৬৮), মমতাজউদ্দীন আহমদ-এর *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*(১৯৭১),*এবারের সংগ্রাম*(১৯৭১),*স্বাধীনতা সংগ্রাম*(১৯৭১) সেই প্রয়াসের উজ্জ্বল সংযোজন।

নিয়মিত নাটক প্রদর্শনের রেওয়াজ মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব বাংলাদেশে ছিল না। সৌখিন নাট্যদল 'ড্রামাসার্কল' ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো নাট্যদলের অস্তিত্ব ছিল না। নাটক প্রযোজনায় বিশেষ কোনো কমিটমেন্টও জোরালোভাবে লক্ষ করা যায় নি। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে গুণবান তারুণ্যের জন্ম হয়েছে সেই তারুণ্যই নব উদ্যমে নাট্যাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূতিকাগার যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপভাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলাদেশের নাট্যচর্চারও পথিকৃৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রুপ থিয়েটার ধারণার বিকাশ এবং ব্যাপ্তিও স্বাধীনতা-উত্তরকালে – 'নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়','থিয়েটার(বেইলী রোড)নাট্যদল','নাট্যচক্র','আরণ্যক', 'ঢাকা থিয়েটার', 'চট্টগ্রাম থিয়েটার','বহুবচন','নান্দনিক','পদাতিক নাট্য সংসদ','ব্যতিক্রম','ঢাকা পদাতিক','লোক নাট্যদল','তীর্যক','অরিন্দম','থিয়েটার আর্ট' ইত্যাদি এবং ১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন'প্রতিষ্ঠিত হয় ও আশির দশকে 'পথনাটক পরিষদ' গঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন একেকটি নাট্যদলকে কেন্দ্র করে একেকজন নাট্যকারের আবির্ভাব বাংলাদেশের নাট্যধারা ও নাট্যদলকে সমৃদ্ধ করেছে।

আনন্দ-বেদনার কাব্যের নাম মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ । আমরা জানি তিরিশ লাখ শহীদআর দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। একদিকে পাকহানাদারদের পরাস্ত করে ছিনিয়ে আনা স্বাধীনতা বাঙালির গৌরবের,অহংকারের,আনন্দের; অন্যদিকে তিরিশ লাখ শহীদের আত্মদান ও দু'লাখ মাবোনের সম্ভ্রম হারানো – বেদনার। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে প্রায় অর্ধশত নাটক রচনা করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং পরর্তীকালে সামরিক শাসকদের ক্ষমতায় আসীন হওয়া – বাংলাদেশের নাট্যঙ্গনে এর প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর কালের উজ্জ্বল নাট্যকারদের অন্যতম হলেন–মমতাজউদ্দীন আহমদ(১৯৩৫-), সৈয়দ সামসুল হক(১৯৩৫-), আবদুল্লাহ আল মামুন(১৯৪২-), মামুনুর রশীদ(১৯৪৮-),সেলিম আল দীন(১৯৪৮-২০০৭), রশীদ হায়দার, জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮), এস এম সোলায়মান(১৯৫৩-২০০১)আবদুল মতিন খান,কবীর আনোয়ার,আবদুল্লাহেল মাহমুদ, মান্নান হীরা প্রমুখ।

মমতাজউদ্দীন আহমদ ('৭১-এ রচিত তিনটি নাটক বাদে) স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচনা করেছেন রূপকধর্মী নাটক *স্পর্টাকাশ বিষয়ক জটিলতা,ফলাফল নিম্নচাপ*-এ অস্থির সমাজ-সময়ের হতাশা;*বিবাহ*নাটকের পটভূমি

ভাষা আন্দোলন;*কি চাহ শঙ্খচিল* নাটকের প্রতিপাদ্য মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী হায়েনাদের দ্বারা নারী ধর্ষণের ইতিবৃত্তও সব হারিয়ে নিঃস্ব রিক্ত নারীদের মর্মান্তিক পরিণাম এবংপরবর্তী সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক লুটতরাজ। তাঁর *রাজা অনুস্বারের পালা* সমকালীন সমাজ-রাজনীতির ইতিকথা।*সাত ঘাটের কানাকড়ি*নাটকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশএবং সমসাময়িক-সমাজের চালচিত্র এমন উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে যে তা বাংলা নাটকের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক বাংলা নাটকে পদচারণা করে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে তিনি রচনা করেন *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*কাব্যনাট্য।'ভাষার গতিময়তা,আঞ্চলিক শব্দের কুশলী প্রয়োগ এবংযুদ্ধকালীন জীবন-বাস্তবতার কাব্যিক উচ্চারণ –এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে*পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*বাংলাদেশেরনাট্যসাহিত্যে একটি পালাবদলকারী নাটক হিসেবে বিবেচিত।[২৬]*নুরুল দীনের সারা জীবন*-এ ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল বিরোধী লড়াইকে মুক্তিযুদ্ধের লড়াইয়ের সাথে একীভূত করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন,১৯৫২ এবং ১৯৭১ সালে বাঙালির যে জাগরণ সেটা ক্রমানুক্রমিকভাবেই ঘটেছে, সেটা কোনো বিয়োজিত ঘটনা নয়। *যুদ্ধ এবং যুদ্ধ*,*ঈর্ষা*,শেকসপিয়ারের *ম্যাকবেথ* এবং *ট্যাম্পেস্ট* অনুবাদ এবং *জুলিয়াস সিজার* অবলম্বনে *গণনায়ক* ইত্যাদি নাটক রচনা করেছেন সৈয়দ শামসুল হক।

বাংলাদেশের নাটককে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন আবদুল্লাহ আল মামুন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান একজন নাট্যকার। তিনি অসংখ্য নাটক রচনা করেছেন–'৭১ পূর্ববর্তী *শপথ* নাটক বাদ দিলে তাঁর প্রথম নাটক *সুবচন নির্বাসনে*। *এখন দুঃসময়* নাটকের পটভূমি সমকালীন দেশ ও সমাজের পরিস্থিতি;*এবার ধরা দাও*নাটকের পরিপ্রেক্ষিত তরুণ সমাজের বিপথগামীতা,*সেনাপতি*নাটকের বিষয় আমাদের দেশের রাজনীতির চালচিত্র। এই নাটকগুলো ছাড়াও আবদুল্লাহ মামুন বেশকিছু নাটক রচনা করে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন;যেমন-*ক্রশরোডে ক্রস ফায়ার*, *আয়নায় বন্ধুর মুখ*,*শাহজাদীর কালো নেকাব*,*চারিদিকে যুদ্ধ*,*এখনও ক্রীতদাস*, *আমাদের সন্তানেরা*, *তৃতীয় পুরুষ*, *দূরপালাল্লা*,*তোমরাই*,*কোকিলারা*, *আন্দু ও অভিষেক*, *দ্যাশের মানুষ*, *মেরাজ ফকিরের মা*, *বিবিসাব* ইত্যাদি।

বাংলাদেশের নাটকে শ্রেণিসংগ্রাম এবং শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম যাঁর নাটকে উচ্চকিত হয়েছে তিনি নাট্যকার মামুনুর রশীদ। *পশ্চিমের সিঁড়ি*,*গন্ধর্ব নগরী*,*ওরা কদম আলী*,*ওরা আছে বলেই*,*ইবলিশ*,*গিনিপিগ*, *এখানে নোঙর*, *খোলা দুয়ার*,*অববাহিকা*,*সমতট*,*উৎসব*, *মানুষ*,*পাথর*,*জয়জয়ন্তী*,*রাষ্ট্র বনাম*, *ঐ আসে*, *লেবেদফ*ইত্যাদি নাটক রচনা করে সাফল্যের সাক্ষর রেখেছেন।

ওরা কদম আলী,*ওরা আছে বলেই*,*ইবলিশ* নাট্যত্রয়ে শ্রেণিসংগ্রাম এবং প্রতিবাদ প্রতিরোধের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। *ইবলিশ* এবং *গিনিপিগ* নাটকদ্বয়ে ওঠে এসেছে সামরিক শাসন,আমলাতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন-শোষণ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত দুর্বল মানুষের হাহাকার।*অববাহিকা*,*সমতট*এবং *এখানে নোঙর* নাটকের মানুষেরাও সংগ্রামশীল, দুঃসাহসী।*পাথর* নাটকে সাম্প্রদায়িকতার বিপরীত কোটিতে

অসাম্প্রদায়িক চিত্র ফুটে ওঠেছে। *জয় জয়ন্তী* নাটকে ওঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন থেকে অনেক দূরবর্তী অবস্থান। মামুনুর রশীদের নাটকে বিষয়ভাবনা ও উপস্থাপন রীতিতে পৌনঃপুনিকতা লক্ষ করা গেলেও,'বঞ্চিত শোষিত মানুষের শ্রেণিসংগ্রামের রূপকার হিসেবে মামুনুর রশীদের নাটক সমকালীন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় সংযোজন করেছে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা।'[২৭]

সেলিম আল দীনের নাট্যাঙ্গনে আগমন ঘটেছে– *সর্প বিষয়ক গল্প*, *জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন*,*এক্সক্লোসিভ ও মূল সমস্যা*,*সংবাদ কার্টুন*ইত্যাদি নাটকের মাধ্যমে। *মুনতাসীর ফ্যান্টাসী*, *করিম বাওয়ালীর শত্রু* কিংবা *মূল মুখ দেখা*, *আতর আলীদের নীলাভ পাট*,*শকুন্তলা*ইত্যাদি নাটকের মাধ্যমে তাঁর অভিজ্ঞতাকে তিনি ঋদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।*কিত্তনখোলা*,*কেরামত মঙ্গল*,*হাতহদাই*,*চাকা*,*যৈবতী কন্যার মন*,*হরগজ*, *বনপাংশুল*, *প্রাচ্য*, *একটি মারমা রূপকথা*ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক।

সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* বিশাল আয়তনের নাটক;এ নাটকের কাহিনী বিশাল ও ঘটনাবহুল এবং অসংখ্য চরিত্রের সমারোহ। এ নাটকে আছে একদিকে সহজ,সরল গ্রামীণ মানুষ অন্যদিকে অর্থলোলুপ, দুর্বৃত্তরা। এ নাটকে বহু মানুষ - বহু মানুষের বিচিত্র জীবনাচরণ চিত্রিত হয়েছে। মানিকগঞ্জ জেলা ও তার আশপাশের এলাকার মানুষের জীবনাচরণ, লড়াই,সংগ্রাম,বিশ্বাস সংস্কার,দ্বন্দ্ব-সংঘাত সব অনুষঙ্গই এসেছে এই নাটকে।*কিত্তনখোলা* নাটকে পৌরানিক উপাখ্যান ও লোকজ ঐতিহ্যের মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে।

কেরামঙ্গল নাটকেও সংমিশ্রণ ঘটেছে লোকজ ঐতিহ্য এবং পৌরানিক উপাখ্যানের। কেরামতের সমগ্র জীবন এই নাটকে বিধৃত হয়েছে।নাটকটি বারটি খণ্ডে বিন্যস্ত;খণ্ডগুলোর নামও ভিন্নধরনের-যেমন; এক, সাম্প্রদায়িকতার দোজখ - নকলা খণ্ড;তিন,সামন্তবাদীদের সৃষ্ট দোজখেজমিদার,প্রজা সবাই দগ্ধ - ফইট্যামারী খণ্ড; আট, মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীরসৃষ্ট দোজখ - একিনপুর খণ্ড;নয়, রাষ্ট্রীয় মৌলবাদীদেরসৃষ্ট দোজখ - রাজাকারখণ্ড;দশ, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মানুষদের আশাভঙ্গের দোজখইত্যাদি বারটি দোজখ ক্রমে ক্রমে পার হয়ে যায় কেরামত। এক জায়গা থেকে অরেক জায়গায় যায় কেরামত, সবখানেই শিকার হয় লাঞ্ছনা-বঞ্চনার। নাট্যকার এই নাটকে কেরামত চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষে মানুষে শোষন,বঞ্চনা,সংঘাত-সংগ্রামের চিত্র এঁকেছেন অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে। সেলিমআলদীনের নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে কাজ করেছেঐতিহ্যানুসন্ধান। সে লক্ষ্যে তিনি বাঙালির নিজস্ব নাট্যরীতির প্রয়োগ করেছেন তাদের সুদীর্ঘকালের চেনা পরিচিত বাস্তবতাকে অবলম্বন করে। হাজার বছরের লোক ঐতিহ্য অন্বেষণ করতে করতে তিন পেয়ে যান 'নতুন প্রকরণ: কথানাট,নতুন দর্শন: দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পপ্রকরণ। আর তাই বাঙালির মধ্যযুগীয় নাট্য-ঐতিহ্যের সন্ধানে নেমেও সেলিম আল দীন সচেতনভাবে,অবিচলভাবে উদারভাবে ব্যবহার করেন বিশ্বভুবনের বিচিত্র সংস্কৃতি হতে আহরিত পুরাণ-কিংবদন্তী-লোকজ উপাদান।'[২৮]

এস এম সোলায়মান *এলেকশান ক্যারিকেচার*, *ইংগিত*, *গণিমিয়া একদিন*, *এই দেশে এইবেশে* ইত্যাদি নাটকগুলোতে সামাজিক অসংগতি,সাম্প্রদায়িকতা,কুসংস্কার তথা কূপমণ্ডূকতা,ধর্মের নামে ভণ্ডামী, সামরিক

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী অবস্থান গ্রহন করে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ,সুতীক্ষ্ণ সংলাপের মাধ্যমে প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা উপস্থাপনেপ্রয়াসী হয়েছেন।

জিয়া হায়দারের *শুভ্রা সুন্দর কল্যানী আনন্দ* মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালীন রচনা। *সাদা গোলাপে আগুন*এবং *পঙ্কজ বিভাস*নাটক দুটোতে '৭১-এ বন্দী নারীদের মর্মান্তিক যাতনা ও বেদনা প্রকাশে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার।

রশীদ হায়দার তাঁর *তৈল সঙ্কট* নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অস্থির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন।

আবদুল মতিন খান *মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব*, *সম্মেলন* দুটি নাটকেই রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ভণ্ডামী এবং এই ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও দ্রোহ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

কবীর আনোয়ার *জনে জনে জনতা*,*পোস্টার* নাটক দুটোতে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রকাশে উচ্চকিত ছিলেন।

আবদুল্লাহেল মাহমুদ *সাতপুরুষের ঋণ* নাটকে ইতিহাস থেকে উপাদান ব্যবহার করে সমকালীন মাত্রায় নিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর *নানকার পালা*নাটকের পটভূমি ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন - নানকার বিদ্রোহ। *প্রাকৃতজন কথা*'য় বিবৃত হয়েছে হাজার বছর আগের এই জনপদের কিছু প্রাকৃত মানুষের সংগ্রাম,ষড়যন্ত্র,সুখ-দঃখ,আনন্দ-বেদনা।

মান্নান হীরা পথনাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও *খেলা খেলা*, *আগুন মুখা* এবং *ময়ুর সিংহাসন* ইত্যাদি মঞ্চনাটক লিখেছেন। তাঁর *খেলা খেলা* নাটকের পটভূমি বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পতনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ; নীরবে নিভৃতে যারা দেশের জন্য কাজ করে গেছেন, নিজের জীবনবিলিয়ে দিতেও যারা কুণ্ঠা বোধ করেননি – সেইসব অজ্ঞাত বীরদের জীবনগাঁথা *ময়ুর সিংহাসন* নাটকের পটভুমি।

বাংলাদেশের পথনাটকের পথপরিক্রমায়আবদুল্লাহ আল মামুনের *আন্দু* ও *অভিষেক*;নাসিরউদ্দীন ইউসুফের *একাত্তুরের পালা*,মান্নান হীরার *মৃগনাভি*, *শেকল*, *আদাব*, *ঘুমের মানুষ* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

উপর্যুক্ত নাটক ছাড়াও বশীর আল হেলালের *স্বর্গের সিঁড়ি*, আলাউদ্দীন আল আজাদের *নিঃশব্দ যাত্রা*,নরকে লাল গোলাপ,বুলবন ওসমানের *পাণ্ডুলিপির আড়ত*, আতিকুল হক চৌধুরীর *দূরবীন দিয়ে দেখুন*,গোলাম আম্বিয়া নুরীর *কুমারখালির চর*,মোহাম্মদ এহসানুল্লাহর *কিংসুক যে মেরুতে*, নীলিমা ইব্রাহিমের *যে অরণ্যে আলো নেই*,*আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, আল মনসুরের *হে জনতা আরেক বার*, রনেশ দাশগুপ্তের *ফেরী আসছে*ইত্যাদি

নাটকে মুক্তিযুদ্ধ,মুক্তিযুদ্ধে নারীত্বের অবমাননা,সমকালীন সমাজ এবং জীবনের নানাছবি এবংদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে শিল্পিত স্বরগ্রামে।

উৎপল দত্তের কালের পশ্চিমবঙ্গের নাটক ও বাংলাদেশের নাটকের তুলনামূলক আলোচনায় আমরা দেখতে পাই – পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নাটক তথা গণমূখী নাটকের ধারা আগে থেকে থাকলেও মূলত তা ব্যাপ্তি লাভ করেছে গণনাট্য সংঘের(বিজন ভট্টাচার্যের)*নবান্ন* প্রযোজনার মাধ্যমে চল্লিশের দশকে; বংলাদেশে (ঢাকা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চা)এই নাট্যধারার শুরু সত্তরের দশকে।যুদ্ধোত্তর সদ্য স্বাধীন দেশে পশ্চিমবঙ্গের মতো নাট্য-প্রযোজনার সুযোগ-সুবিধা তেমন ছিল না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ মানুষের চেতনার যে রূপান্তর ঘটিয়েছে –যে গুণবান তারুণ্যের জন্ম দিয়েছে সেই চেতনা লালন ও ধারণ করে দেশের তরুণ নাট্যকর্মীরা সকল বাধা-বিপত্তি, সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে নাট্যপ্রযোজনায় এগিয়ে আসেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্নাত-সমৃদ্ধ নাট্যকর্মীরা অসাম্প্রদায়িক.গণতান্ত্রিক,শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে রচনা ও প্রযোজনা করতে লাগলেন নতুন নতুন নাটক। বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয় হিসেবে এসেছে;এসেছে সমকালীন জীবন,ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়,এসেছে দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি। মানুষে মানুষে বৈষম্য,শোষন,নিপীড়ন,প্রতিবাদ-প্রতিরোধেরকথা নাটকে এলেও এবং গণমূখী ধারার কিছু নাটক রচিত হলেও সমন্বিভাবে 'নাটক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার' কিংবা নাটকে শ্রেণিদ্বন্দ্বসেভাবে ওঠে আসেনি ।যদিও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনই বাংলাদেশে রাজনৈতিক ধারার নাটকের প্রচলন করেছে তথাপি তা সব প্রযোজনা বা দলে তা একই মাত্রায় ঘটেনি। বাংলাদেশের নাট্যান্দোলনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য,প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও শেষ পর্যন্ত কোথাও সুস্থির অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তর তফাৎ রয়েছে।

উৎপল দত্তনাটককে'সংগ্রামের হাতিয়ার'বলে মেনেছেন; তিনি হাটে-মাঠে ঘাটে, শ্রমিক-কৃষকের কাছে নাটক নিয়ে হাজির হয়েছেন। শোভা সেন বলেছেন; 'হাতিবাগানের বাজারে আলু,পটল বিক্রেতা সন্ধেবেলা বাজার গুটিয়ে থিয়েটার দেখতে আসে,তাদের ভালো লাগাতে হবে।'[২৯]অর্থাৎ প্রথমত তাঁরাআলু,পটল বিক্রেতা – তথা সাধারণ মানুষ মানুষসহ সবশ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য নাটক নির্মাণ করেছেন, দ্বিতীয়ত তাঁদের ভাল লাগার দিকেও তাঁরা খেয়াল রেখেছেন।উৎপল দত্ত ও শোভা সেন তাঁদের স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন,শেকসপিয়ারের *ম্যাকবেথ*,রবীন্দ্রনাথের *অচলায়তন* এবং (কার্লমার্কস ও বাডেন-বিপ্লবের উপর ভিত্তি করে উৎপল দত্ত রচিত)*শৃঙ্খল ছাড়া*ইত্যাদিসহ অসংখ্য নাটক অগণিত দর্শক উপভোগ করেছে শত অসুবিধা সত্ত্বেও;কারণ তাঁরা তাদের(সাধারণ মানুষদের) কাছে নাটক পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলাদেশে '৮০-র দশক থেকে 'ঢাকা থিয়েটার' 'গ্রাম থিয়েটার' কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশজ নাট্য-আঙ্গিক এবং নিজস্ব নন্দন প্রকরণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে প্রয়াসী হয়েছে; ১৯৮১ সালে 'আরণ্যক' নাট্যদলও জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য মুক্তনাটক – এমন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নাটক করতে প্রয়াসী

হয়েছে। কিন্তু দঃখজনক হলেও সত্য, এইসব প্রয়াস ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি এবং এগুতেও পারেনি অনেকদূর।

মধ্যবিত্তশ্রেণিইপশ্চিমবঙ্গেরাজনৈতিক নাট্যান্দোলনের সূচনা করেছে এবং সেই আন্দোলন তারা করেছেশ্রমিক-কৃষককে সঙ্গে নিয়েই; বাংলাদেশের মধ্যবিত্তরা তা করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে বামধারার তথা মার্কসবাদী রাজনীতির সাথে শ্রমিক-কৃষককে সম্পৃক্তকরতে নাট্য আন্দোলন যে সদর্থক ভূমিকা রেখেছে, বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন বা অন্য কোনো নাট্যদলকে গণনাট্য সংঘের মতো ভূমিকায় কার্যকরভাবে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশে গণমূখী ধারার নাটক রচিত, প্রযোজিত হলেও পশ্চিমবঙ্গের সাথে একই মাত্রায় তা সমান্তরালবর্তী হয়নি; দু'দেশের গণমূখীধারার নাট্যচর্চার তফাৎওপ্রায় তিনদশকের। উৎপল দত্ত যেহেতু মনে করতেন, যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সব ভুল; তাই তিনি বরাবরই গণমানবকেন্দ্রিক রাজনৈতিক নাটক রচনায় সচেষ্ট ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন শতবর্ষ ধরে বাংলায় রাজনৈতিক নাটকের অস্তিত্ব রয়েছে। এই রাজনৈতিক নাটককে রেভ্যুলিউশনারি (বিপ্লবী) থিয়েটারে উন্নীত করতে তিনি তাঁর নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন।

উৎপল দত্ত নিজদেশসহ গোটা পৃথিবীব্যাপী বিপ্লব-বিদ্রোহ,ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ-সম্বলিত গণনায়ক এবং গণমানুষের নাটকের যে ধারা তৈরি করেছেন মার্কসীয় দর্শনের আলোকে, বাংলাদেশে এরকম সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে নাটক রচনা ও প্রযোজনার সেরকম ধারা তৈরি হয়ে ওঠেনি। বাংলাদেশেগণমূখী ধারার নাটক রচনা প্রযোজনা হলেও; বাংলাদেশের নাটকে উৎপল দত্তের মতো মার্কসিস্ট নাট্যকার এবং রাজনৈতিক নাটককে রেভ্যুলিউশনারি (বিপ্লবী) থিয়েটারে উন্নীত করার প্রয়াস তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনায় হাজার বছরের বাংলা নাটকের ধারাবাহিকতায় উৎপল দত্তের স্বকীয়তা (উনিশ শতক বিশেষত বিশ শতকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে) নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে (বাংলাদেশের নাট্যর্চ্চাসহ)। হাজার বছর ধরে নানা রূপাঙ্গিকে বাংলানাটকের ধারাবাহিক ঐতিহ্য বহমান থাকলেও, এবং শতবর্ষ ধরে বাংলায় রাজনৈতিক নাটক থাকলেও, তা নিরেট রেভ্যুলিউশনারি(বিপ্লবী) থিয়েটারে উন্নীত হয়নি। উৎপল দত্ত রাজনৈতিক নাটক রচনায়, বিপ্লবী থিয়েটারে অসাধারণ সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছেন – নাটকের শিল্পগুণ অক্ষুণ্ন রেখেই। বিপ্লব-বিদ্রোহ, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ, সংগ্রামশীল মানুষের দাহচেতনা,তাঁর নাটকে নিয়ে এসেছেন; বিশেষ আদর্শে ঐ-সব ঘটনাপ্রবাহের সারসত্য উন্মোচন করেছেন তিনি। বিশেষত বলাযায়, মার্কসীয় তত্ত্বের বিষয়-কাঠামোয় নাট্যরূপায়ণের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটককে রেভ্যুলিউশনারী (বিপ্লবী) থিয়েটারে উন্নীত করার প্রয়াস-এর ভেতরেই নিহিত উৎপল দত্তের স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা।

তথ্য নির্দেশঃ

১. উৎপল দত্ত, *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*,কলকাতা,২০০৫,পৃ.২৩

২. উৎপল দত্ত,*গদ্যসংগ্রহ*(প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা- শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়,কলকাতা,১৯৯৮,দে'জ পাবলিশিং,পৃ.১৬৬

৩. উৎপল দত্ত,*শেকসপিয়ারের সমাজচেতনা*,কলকাতা,১৪০৫,এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স লি:,পৃ.২

৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত,*উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*,পার্ল পাবলিশার্স,কলকাতা,১৯৮৯,পৃ.১১

৫. পূর্বোক্ত,পৃ.০৭

৬. দর্শন চৌধুরী,*গণনাট্য আন্দোলন*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা,১৯৮২, পৃ.১৩

৭. পূর্বোক্ত,পৃ.০১

৮.উৎপল দত্ত,*গদ্য সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত,পৃ.২২৭

৯. পূর্বোক্ত,পৃ.২২৭

১০.পূর্বোক্ত,পৃ.১৭

১১. পূর্বোক্ত,পৃ.২১

১২., উৎপল দত্ত,যে নাটকের রাজনীতি ভুল,তার সব ভুল (সুরজিৎ ঘোষের নেয়া একটি সাক্ষাৎকার), *দেশ*, কলকাতা, ৩০.০৩.১৯৯১, পৃ.৪২

১৩. রাহমান চৌধুরী,*রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*,ঢাকা,২০০৭,বাংলা একাডেমী,পৃ.১৫৫

১৪.বিজন ভট্টাচার্য, *শতবর্ষের নাটক*,সৈয়দ শামসুল হক ও রশীদ হায়দার সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, নবান্ন,ঢাকা,১৯৯৪,বাংলা একাডেমী, পৃ.৮৭৩

১৫.তুলসী লাহিড়ী,*শতবর্ষের নাটক*,পূর্বোক্ত,২য় খণ্ড,ছেঁড়াতার,পৃ.৫৪১

১৬.উৎপল দত্ত *এক সামগ্রিক অবলোকন*,নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত,উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব২০০৫ কমিটি,কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ,পৃ.৯২

১৭.উৎপল দত্ত, *গদ্য সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২২৯

১৮.বাদল সরকার,*শতবর্ষের নাটক*,২য় খণ্ড,এবং ইন্দ্রজিৎ,পৃ.২৫৭

১৯. পূর্বোক্ত,পৃ.২৬০

২০. পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৫

২১. অজিতকুমার ঘোষ,*বাংলা নাটকের ইতিহাস*,কলকাতা,১৯৯৯,জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লি:,পৃ.৪৬১

২২.উৎপল দত্ত, *গদ্যসংগ্রহ*, পূর্বোক্ত,পৃ.৬৭

২৩.নুরুল মোমেন, *শতবর্ষের নাটক*,পূর্বোক্ত,২য় খণ্ড,নেমেসিস, পৃ.৭৭৮

২৪.বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ঢাকা, ২০০৯, আজকাল, পৃ.১৪৫

২৫.পূর্বোক্ত, পৃ.১৪১

২৬.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৩৯

২৭.পূর্বোক্ত,পৃ.১৫৪

২৮. সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, ঢাকা, ২০০৮,বাংলা একাডেমী,পৃ.৩৩

২৯. শোভা সেন,*স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*,কলিকাতা, ১৯৯৬, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ.৪৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
উৎপল দত্তের জীবন ও নাট্যচর্চা

উৎপল দত্তের জন্ম ও শৈশব :

উৎপল দত্তের পুরো নাম উৎপল রঞ্জন দত্ত, তিনি তাঁর নামের রঞ্জন অংশটুকু বাদ দিয়ে পরিচিত হয়ে ওঠেন উৎপল দত্ত নামে।ডাক নাম শঙ্কর,এ-নামটিও তিনি ব্যবহার করেননি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বে ১৯২৯ সালের ২৯শে মার্চ উৎপল দত্তের জন্ম। তাঁর পিতৃপুরুষের আদিনিবাস কুমিল্লা। নৃপেন্দ্র সাহা তাঁর 'উৎপল দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী'-তে উৎপল দত্তের জন্মস্থান বরিশাল উল্লেখ করেছেন। তবেতিনি(উৎপল)শিলং শহরকে জন্মস্থান বলে নির্দেশ করতে পছন্দ করতেন বলে নৃপেন্দ্র সাহা জানিয়েছেন। সৌমেন চট্টোপাধ্যায় 'উৎপল দত্ত জীবন কথা'য় উৎপলের জন্মস্থান বরিশাল বা শিলং উল্লেখ করেছেন। বরিশাল বা শিলং যেখানেই জন্ম হোক শৈশব বেলার স্মৃতি-প্রীতি বিজড়িত শিলং শহরকে নিজের জন্মস্থান বলে নির্দেশ করতে হয়তো উৎপল দত্ত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। উৎপল দত্তের পিতার নাম গিরিজারঞ্জন দত্ত, মা শৈলবালা রায়। গিরিজারঞ্জন দত্ত পেশাগত জীবনের শুরুতে অধ্যাপনা করেছেন কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে (ইংরেজি বিষয়ে),পরে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ছিলেন। পাঁচ ভাই তিন বোনের মধ্যে উৎপল ছিলেন চতুর্থ।

শৈশব-কৈশোর ও স্কুল জীবনঃ

উৎপল দত্তের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয় ১৯৩৫ সালে শিলঙে– সেন্ট এডমন্ড(ইংরেজি মাধ্যম) স্কুলে। গিরিজারঞ্জন দত্তের সরকারি চাকুরিসূত্রে বদলির কারণে উৎপলের স্কুল বদল হয়েছে কয়েক দফা– শিলঙের সেন্ট এডমন্ড স্কুলের পর অল্প সময় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল, তারপর কলকাতার সেন্ট লরেন্স স্কুলে পড়াশোনা করেন। সেন্ট লরেন্স স্কুলটি যুদ্ধের সময়ে সামরিক প্রয়োজনে অধিগৃহীত হয় এবং পরে স্কুলটি ওঠে যায় দমদমে। সবশেষে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে স্থিত হয়েছেন তিনি। ১৯৪৩ সালে উৎপল ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে নবম শ্রেণিতে। পরিবারের বসবাস তখন দক্ষিণ কলকাতা; সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের কাছাকাছি। ১৯৪৫ সালে উৎপল দত্ত ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করে একই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। ম্যাট্রিক্যুলেশন-এ ফলাফল ভালই ছিল,তবে প্রত্যাশা মতো নয়।

এক অভিনিবেশী পাঠকের নাম উৎপল। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন একাধারে মেধাবী, পরিশ্রমী ও অনুসন্ধানী। সাহিত্য সম্পর্কিত পড়াশুনায় খুবই আগ্রহী এবং কৌতূহলী ছিলেন। ওয়ার্ল্ড-ক্লাসিক পাঠেও উৎপল অসম্ভব আগ্রহী ছিলেন;তাঁর পড়ার বিষয় কেবল সাহিত্য ছিল না; রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন সবই অত্যন্ত

মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন। নানাবিধ পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ-অভ্যাসও তাঁর সেই কৈশোর থেকেই:

> ইস্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের মহান প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়ে চমকিত হতাম। স্তালিনের সহজ ও তীক্ষ্মভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়েছি। ইস্কুল শেষ হতে না হতে লেনিন, মার্কস, এঙ্গেল্‌স – এমন কী হেগেল, ফয়েরবাখ, কান্টে প্রমোশন নিয়েছি।[১]

নাটকের প্রতি আকর্ষণ উৎপলের আকৈশোর-আশৈশবের। সেন্ট লরেন্স স্কুলে থাকতেই নাট্যাভিনয়ে হাতেখড়ি। ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় – সেই সূত্রেই যাতায়াত ছিল সেন্ট জেভিয়ার্সে। নাটকের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণে পিটার ব্রুক, স্তানিস্‌লাভস্কি, শেকস্‌পিয়ার ছাড়াও বিশ্বের নাটক সম্পর্কিত যে-কোন গ্রন্থ যখনই যেখানে পেয়েছেন গভীর আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠার সাথে তা অধ্যয়ন করেছেন। উৎপল দত্তের পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত নাটক দেখতেন,তাঁদের সঙ্গে তিনিও নাটক দেখেছেন ছোটবেলা থেকেই। তাঁর ভাষায় :

> শুধু আমি না, আমি, আমার বাবা, আমার মা সকলে মিলে নাটক দেখতাম এবং তৎকালীন পেশাদার নাট্যশালায় যত নাটক হত সবই দেখতাম। সেটা ১৯৪৩-'৪৪-'৪৫ সাল।[২]

কলেজ জীবন: (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ পর্ব)

১৯৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষে উৎপল দত্তের কলেজ জীবন শুরু হয় সেন্ট জেভিয়ার্সেই। প্রথম বর্ষ ইন্টারমিডিয়েটে (১৯৪৫-৪৬) ভাল ফলাফলের জন্যতিনি কলেজে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন; দ্বিতীয় বর্ষেও ভাল ফলাফল করেছেন। সাম্মানিক ইংরেজি নিয়ে উৎপল স্নাতক শ্রেণিতে সেন্ট জেভিয়ার্সে প্রথম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পঞ্চম হন। ইতিহাস প্রিয় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি পড়েন কিছু বানিয়ে লেখার বাসনায়। ১৯৪৯ সালে তিনি ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ পাশ করেন। খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশেষত নাটকপ্রযোজনায় সেন্ট জেভিয়ার্সের ছিল সু-দীর্ঘ ঐতিহ্য। কলেজের শিক্ষকগণ এসব বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন।

কলেজ জীবনে বিতার্কিক হিসেবে উৎপলের খুব সুনাম ছিল। কলেজ ক্রিকেট একাদশে উৎপল দত্ত ও প্রতাপ রায় স্থান পেয়েছিলেন। ঐ-সময়ে আবৃত্তি জগতেরও উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন তিনি; কারণ আবৃত্তি ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয় বিষয়। খুব ছোটবেলা থেকে বাড়িতে বাবা-দাদার আবৃত্তি শুনে শুনে কান-মন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শেকস্‌পিয়ারের বিখ্যাত নাটকসমূহের বিখ্যাত উক্তিগুলো ছ'বছর বয়স থেকেই মুখস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি। চলচ্চিত্রেও উৎপলের আগ্রহ এবং আসক্তি কম ছিল না। ধ্রুপদী চলচ্চিত্র বা ভাল ছবি হলে একই ছবি অনেকবার দেখেছেন। ভিভিয়ান লে, লরেন্স অলিভিয়ের ও চার্লি চ্যাপলিন উৎপলের ভীষণ প্রিয় ছিল। রনাল্ড কোলম্যানের অভিনয় দেখেও তিনি ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। আইজেনস্টাইন, চ্যাপলিন, কুরোসাওয়া এবং সত্যজিৎ রায় পরবর্তীকালে তাঁর প্রিয় পরিচালক ছিলেন।

উৎপল দত্তের আগ্রহের আরেক এলাকা সঙ্গীত। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত তথা হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিকে উৎপলের ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তিনি বলেছেন,

> ভারতীয় মার্গসংগীত অর্থাৎ হিন্দুস্তানি ক্লাসিকাল মিউজিক খুব ছেলেবেলাতেই আমার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল আমার দিদির মাধ্যমে। দিদিকে গান শেখাতেন বাবা-মা...তাঁর গুরু ছিলেন প্রথমে বরিশালের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ দাস, তারপর মুর্শিদাবাদের উস্তাদ কাদের বকস্,আরেক ওস্তাদের নাম ছিল মুঞ্জু মিঞা।...তানপুরার আওয়াজ সারাক্ষণ বাড়িতে অনুরণিত হতো, সবসময়। আর দিদির এই রেওয়াজ শুনতে শুনতে আমারও ক্রমশ ভারতীয় সংগীতের কাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠতে লাগলো।[৩]

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে অনুরাগ কলেজ জীবন থেকে। প্রতাপ রায়, সলোমন বেখর ও উৎপল, তিন বন্ধু একসঙ্গে ওয়াটার লু স্ট্রিটের গ্রামোফোন ক্লাবের সদস্য হয়েছেন। সপ্তাহে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় ঐ-ক্লাবের কক্ষে এইচএমভি'র সর্বাধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হত। গুস্টাভ হোলৎস-এর প্ল্যানেট-সুইৎটা এক বুধবার শুনে এমন চমকিত হয়েছিলেন যে গানের রেকর্ড যৌথভাবে কিনে পালা করে একেক সপ্তাহ একেক বন্ধু শুনেছেন। সারা সপ্তাহ ধরে তারা বুধবারের অপেক্ষায় থাকতেন। তাদের বন্ধু সলোমন বেহালা বাজাতেন, তিনি স্কুল অফ মিউজিকের অর্কেস্ট্রায় যোগ দিতেন। সলোমনদের রিহার্সাল হতো ভোরবেলা থেকে। স্ট্যানলি গোমস এবং জনি মেয়রও বেহালা বাজাতেন।'কী মধুর হয়ে উঠত সকালগুলি সে লিখে বোঝানো যাবে না।'[৪]এই মধুময় সকালে ছটার রিহার্সাল শুনতে বালিগঞ্জ থেকে উৎপল আর আলিপুর থেকে প্রতাপ ট্রাম ধরে ছুটতেন কলেজ অভিমুখে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে। উৎপল কনসার্ট পিয়ানিস্ট হবার ইচ্ছা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন মিসেস গ্রীনহলের ক্যাবিনা দেলা মুজিকায়।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথম বর্ষের ছাত্র উৎপল দত্ত প্রথম লেখেন (জুলাই ১৯৪৬ সালে'A Glance atModern Russian Literature'এবং 'বাস্তবতাও বাংলা সাহিত্য'নামে দুটি প্রবন্ধ। দুটি প্রবন্ধই ছাপা হয়েছে কলেজ ম্যাগাজিনে। ২য় বর্ষে লেখেন দুটি প্রবন্ধ 'Three Bengali Novelists' ও 'সিম্ফনী'। এ-দুটি প্রবন্ধও কলেজ ম্যাগাজিন জুলাই ১৯৪৭ সংখ্যায় ছাপা হয়। ১৯৪৮ সালে ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবে উৎপল দত্ত লেখেন 'The Scepticism of Bertrand Russel'এছাড়াও'Production Manifesto' প্রবন্ধ লেখেন *রোমিও এন্ড জুলিয়েট*-এর অভিনয়ের স্মারক পত্রে ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৯-এ লেখেন 'Exultation' (four on poetry) ছাপা হয় সেন্ট জেভিয়ার্সের কলেজ ম্যাগাজিনে। এ-বছরই উৎপল লেখেন 'Shakespeare and the Modern stage'–এটি ছাপা হয় The Sunday Statesman-এ। *Betty Belshazzar*নামে একটি One act drama-ও লেখেন একই বছরে – যা ছাপা হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ম্যাগাজিনে।

১৯৪৫–১৯৪৯ (সাল পর্যন্ত) কাল পরিসরে উৎপলের লেখাগুলো একটি সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

রচনা	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকাল
A Glance at Modern Russian Literature	St. Xavier's Magazine	জুলাই ১৯৪৬

বাস্তবতা ও বাংলা সাহিত্য	ঐ	ঐ
Three Bengali Novelists	ঐ	জুলাই ১৯৪৭
সিম্ফনি	ঐ	ঐ
The Scepticism of Bertrand Russel	ঐ	১৯৪৮
Producation Manifesto	রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট অভিনয়ের স্মারকপত্র	০৬/০৩/১৯৪৮
Exultation (four on poetry)	St. Xavier's Magazine	জুলাই ১৯৪৯
Betty Belshazzar	St. Xavier's Magazine	ঐ
Shakespeare and the Modern stage	The Sunday Statesman	২৪/০৭/১৯৪৯

[তথ্যসূত্র: সৌমেন চট্টোপাধ্যায়,উৎপলদত্ত জীবন কথা, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন , পৃ. ৪৯৩।]

এই সারণীর ৯টি লেখার মধ্যে একমাত্র *Betty Belshazzar* একাঙ্ক, বাকি সবই প্রবন্ধ। লেখক উৎপল দত্তএ-পর্যায়ে মূলত প্রবন্ধই লিখেছেন।

উৎপল দত্তের শৈশব-কৈশোরের নাট্যাভিনয়ের আগ্রহের সাথে সেন্ট জেভিয়ার্সের নাট্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ তাঁকে আরও বেশি নাট্য-সম্পৃক্ত করেছে। ঐরকম পরিবেশে নাট্যাগ্রহী শিক্ষকদের সাহচর্যে থাকলে নাটকের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়াটাই আশ্চর্যের বলে মনে হয়েছে উৎপলের কাছে। যে-ফাদাররা উৎপলদের নাটক শেখাতেন তাঁদের মধ্যে ফাদার উইভার অন্যতম। গোগলের *ডায়মন্ড কাটস্ ডায়মন্ড* নাটকে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত ১৯৪৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। নাটকটির পরিচালক ছিলেন ফাদার উইভার। এ-বছরের ১৩ই ডিসেম্বর অভিনয় করেন মলিয়েরের *দ্য রোগারিজ অব স্ক্যাঁপা*-য়। এ-নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন ফাদার ফিস্‌জেরাল্ড। থিয়েটার সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল শিক্ষকবৃন্দ, সমস্ত যন্ত্রপাতি সমেত থিয়েটার, সেন্ট জেভিয়ার্সের সাংস্কৃতিক তথা নাট্য পরিমণ্ডল – উৎপলের নাটকের প্রতি আগ্রহকে আরও বেশি বিকশিত করেছে। 'সেন্ট জেভিয়ার্সে অভিনয়ের সময়েই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি থিয়েটারের লোক, থিয়েটারেই থাকব। সারাজীবন থিয়েটার করবো।'[৫] সেন্ট জেভিয়ার্সের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জীবনভর থিয়েটারেরই লোক ছিলেন উৎপল,সারাজীবন থিয়েটারই করে গেছেন।

উৎপল দত্ত '*লিটল থিয়েটার ও আমি*' স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন 'সেই ১৯৪৭ সালের জুন মাসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের থার্ড ইয়ারে আমার সহপাঠী প্রতাপ রায় এবং আমি স্থির করে ফেললাম – আমাদের পেশা হবে অভিনয়, আর কিছু হলে জীবনধারণ হবে অর্থহীন।'[৬] অভিনয় ছাড়া আর কিছু হলে যাঁর জীবন হয়ে পড়বে অর্থহীন–সেই উৎপল দত্ত আর নাট্যাভিনয় এবং নাটক একাকার হয়ে গেছে। শৈশব-কৈশোরে সেন্ট লরেন্স স্কুলে নাটকে নেপথ্যের কাজ কিংবা ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেই-যে নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন,সেই সংযুক্তি দিনে দিনে বেড়েছে;বেড়ে বেড়ে ছোট চারাগাছ হয়েছে বিরাট মহীরূহ। নিরন্তর নাট্যচর্চার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে উৎপল দত্ত হয়ে উঠলেন বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন, অভিনয়, প্রবন্ধ রচনা, আবৃত্তি, বির্তক, চলচ্চিত্র,সঙ্গীতে আগ্রহ, সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির নানান শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করে উৎপল নিজেকে একজন যথার্থ সংস্কৃতিবান প্রগতিশীল আধুনিক

মানুষ হিসেবে নির্মাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। বিশ্ব রাজনীতির নিবিড় পর্যবেক্ষক উৎপল যেমন ছিলেন রাজনীতি সচেতন তেমনি ভারত তথা বিশ্ব-রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ ছিল তাঁর নখদর্পণে। শৈশব-কৈশোরে প্রত্যক্ষ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ; কলেজে পড়ার সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ। দেশীয় এবং বিশ্ব রাজনীতির ঘটনা প্রবাহের তরঙ্গ উৎপলের মনোজগতকে তরঙ্গায়িত করেছে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সজাগ হয়েছে চোখ-কান-মন; বুদ্ধি হয়েছে দীপ্ত। সে-দীপ্তিতে পথ চলেই গভীর অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে উৎপল পৌঁছেছেন মার্কর্সবাদী জীবনবীক্ষায়।

নাট্যদল-সম্পৃক্তিঃ

'দ্য অ্যামেচার শেকস্পিয়ারিয়ান্স' :

১৯৪৫ সালে উৎপল দত্ত বন্ধু প্রতাপ রায়ের সঙ্গে : 'কলেজে পাঠ করার সময়েই আমরা স্থির করে ফেলি নাটকের দল গড়তে হবে এবং এমন নাটক করতে হবে যা দেখে সারা বিশ্ব চমকে যাবে।'[৭] সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের নাটকের পরিবেশ ও সুদীর্ঘ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কলেজি নাটকের চৌহদ্দি উৎপলদের অসহ্য মনে হতো। তাই তাঁরা কলেজীয় অভিনয়ে তৃপ্ত থাকতে চাননি এবং তৃপ্ত থাকতে পারেনও নি। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে উৎপল দত্ত, প্রতাপ রায় তাঁদের কলেজ বন্ধুদের নিয়ে কলেজের বাইরে নাট্যদল গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াসের ফলেই 'দ্য অ্যামেচার শেকস্পিয়ারিয়ান্স' এর গোড়াপত্তন হয়। 'দ্য অ্যামেচার শেকস্পিয়ারিয়ান্স'-এর প্রথম সম্পাদক শ্রী ই. এম. পুনাওয়ালা লিখেছেন 'The Amateur Shakespeareans are a private group formed by the members of 3rd B.A. and B.Com. Classes with the object of portraying the famous scenes of Shakepeare.'[৮]

'প্রতাপ রায়কে যেমন মনে পড়ে' স্মৃতিচারণায় উৎপল লিখেছেন, 'আমাদের প্রথম প্রযোজনা সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চ ভাড়া নিয়ে শেক্সপিয়ারের 'তৃতীয় রিচার্ড' নাটক। ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ প্রথম অভিনয়।'[৯]দ্য অ্যামেচার শেকস্পিয়ারিয়ান্স'- এর *তৃতীয় রিচার্ড* প্রযোজনা সম্পর্কে উৎপল দত্ত 'লিটল থিয়েটার ও আমি' স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন :

> সেদিন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন ভারত সফররত শেক্সপীয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানির অভিনেতৃবৃন্দ – জেফ্রি কেন্ডাল ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ। দশদিন বাদে ঐ সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চে তাঁদের কলকাতার অনুষ্ঠান শুরু হবে। ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল, এই জন্য আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ –'রিচার্ড দ্যা থার্ড' নাটক সেদিন মঞ্চস্থ হয় এ জন্য নয় – সেদিন চলতিভাষায় আমার গুরু লাভ হয়।[১০]

উৎপল দত্ত স্মৃতি থেকে বলতে গিয়ে, চকিত স্মৃতিতে অতীত রোমন্থন করতে গিয়ে কিছু তথ্য এলোমেলো করে ফেলেছেন। সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উৎপল দত্ত জীবন কথা-র সেন্ট জেভিয়ার্স পর্বে 'দ্য অ্যামেচার শেকস্পিয়ারিয়ান্স' সম্পর্কে পুনাওয়ালার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় 'The group made its first

debut on October 8, 1947...three scenes from `Romeo and Juliet' and two from `Macbeth.'[১১]'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ান্‌স' গ্রুপের প্রথম প্রযোজনা *রিচার্ড দ্য থার্ড* নয়; *রোমিও এন্ড জুলিয়েট* এবং *ম্যাকবেথ* নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য। *রিচার্ড দ্য থার্ড* নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস্' কোন প্রযোজনা করেনি। 'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস্' গ্রুপের প্রথম প্রযোজনার তারিখ ৮ই অক্টোবর ১৯৪৭ সাল। মধ্য আগস্টে জেফ্রি কেন্ডাল ভারতের শিলং-এ অবস্থান করছিলেন।

> 'তিনি লিখেছেন – 'We were in Shillong in Assam on Independence Day, 15 August 1947...By October it seemed safe to go to Calcutta, where we stayed until January 1948, playing at the Old Garrion Theatre in Park Street.'[১২]

জেফ্রি কেন্ডাল নয়, তাঁর দলের তিনজন সদস্য মিস আইলিন গার্নার, মিস জেনিফার ব্রাগ এবং মিস্টার জেফ্রি রিচার্ডস 'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস্'-এর অভিনয় দেখেছেন বলে পুনাওয়ালা জানিয়েছেন। মিস গার্নার এদের অভিনয় দেখে মন্তব্য করেছেন 'A very good evening, full of colour and harmony and excellent acting.'[১৩]জেফ্রি কেন্ডাল তাঁর দলের সদস্যত্রয়ের কাজ থেকে 'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিয়ারিয়ানস্'-এর সু-অভিনয়ের বিষয়ে অবহিত হয়েছিলেন। তাঁর দলে লোকের প্রয়োজন ছিল :

> তার আগে প্রশংসা শুনে এবং প্রয়োজনীয় স্থানীয় শিল্পীদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে তিনি কাউকে কিছু না বলে উৎপলদের 'রিচার্ড দ্য থার্ড' নাটকের মহলা দেখেছিলেন। জহুরির চোখ ছিল কেন্ডালের, মহলা দেখে জহর চিনতে ভুল হয়নি তাঁর।[১৪]

'শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি' ও জেফ্রি কেন্ডাল:

ব্রিটিশ নাট্যদল 'শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'-এর পরিচালক জেফ্রি কেন্ডাল, উৎপল দত্ত ও প্রতাপ রায়কে তাঁর দল 'শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'-তে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেন; যদি তাঁরা কলেজ, লেকচার, পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতির বিরক্তিকর মায়া কাটাতে প্রস্তুত থাকেন। উৎপল দত্ত জেফ্রি কেন্ডালকে 'পুরনো ধাঁচের ব্রিটিশ পেশাদার' বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর পান্ডিত্য ও শৃঙ্খলাবোধ উৎপলকে অভিভূত করেছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানির মত এমন একটি দলে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যোগদানের প্রস্তাব উৎপল সানন্দেই গ্রহণ করে তাঁর দলে যোগ দিলেন। কেন্ডালের দলে প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নাটক। সারাদিন পরের নাটকের মহড়া, সন্ধ্যেবেলায় অভিনয়। এই দলে এসে তিনি জেনেছেন মেকআপ, কণ্ঠস্বরের উঠানামার কৌশল, শিখেছেন দেহের ব্যায়াম, তলোয়ার খেলা। জেফ্রির সঙ্গে কাজ করে মনোভাবের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে উৎপলের। থিয়েটার ও নাটক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়; ভাসা ভাসা স্বপ্নালুতার জায়গা দখল করে নেয় থিয়েটারের

কঠোর বাস্তব সত্য। কেন্ডালের দলে মনটাকে প্রসারিত ও শিক্ষিত করতে শিখেছেন; যা থিয়েটারের খুঁটিনাটির চেয়েও বড় শিক্ষা বলে উৎপল মনে করেছেন।

জেফ্রি কেন্ডালের 'শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'-এর সঙ্গে উৎপল দত্ত দু'বার কাজ করেছেন। প্রথমবার ১৯৪৭-৪৮ সালে; দ্বিতীয়বার ১৯৫৩-৫৪ সালে।

'শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'তে(প্রথমবার)

উৎপল দত্ত অভিনীত নাটক ও চরিত্রসমূহঃ

নাটক	চরিত্র
গ্যাসলাইট	কনস্ট্যাবল
পিগম্যালিয়ন	দ্বিতীয় পথচারী
সি স্টুপস্ টু কঙ্গকার	স্যার চার্লস
মার্চেন্ট অব ভেনিস	অ্যান্টিনিও
ম্যাকবেথ	রস
হ্যামলেট	হোরাসিও
ওথেলো	রোডেরিগো
জুলিয়াস সিজার	ডিসিয়াস ব্রুটাস

[তথ্যসূত্র:দর্শন চৌধুরী,থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত,পৃ.৩৮৭-৩৮৮]

১৯৪৭ সালের ৯ই অক্টোবর থেকে ১৯৪৮ সালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত 'শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'-এর সাথে কাজ করেছেন উৎপল দত্ত। প্রথম কাজ করেন *মার্চেন্ট অব ভেনিস*-এ এন্টোনিওর পার্টে। এখানেই শিখেছেন বৈজ্ঞানিক মহড়া কাকে বলে, অভিনয় বস্তুটা কী। মনোযোগ কতটা একাগ্র হওয়া চাই, একটি বাক্যের কত রকম কথনভঙ্গি হতে পারে। উৎপল কেন্ডালের দলের সদস্যদের কাছ থেকে দেখেছেন – 'মানুষ সম্পর্কিত সব বিষয়ে ছিল তাঁদের অপরিসীম আগ্রহ ও কৌতূহল। সোভিয়েত ইউনিয়নে কী ঘটেছে,চীনেই বা দেশগঠন কতদূর এগুলো, গান্ধীহত্যার রহস্য কী–এসবও যেমন তাঁরা জানতেন, জানতে চাইতেন, তেমনই বিশ্বসাহিত্যের সব পড়ে ফেলার এক অবাস্তব অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁদের যেন পেয়ে বসেছিল।'[১৫]পড়াশুনায় অদম্য আগ্রহ ছাড়াও তাঁদের শৃঙ্খলাবোধ ছিল জগদ্বিখ্যাত। দলের লোক সংখ্যা মাত্র চৌদ্দজন – মঞ্চ ধোয়ামোছা থেকে শুরু করে সব কাজ দলের সদস্যদের করতে হত। উৎপল-গুরু কেন্ডাল পুরনো ধাঁচের ব্রিটিশ পেশাদার অভিনেতা, নিজে মার খেয়ে শিখেছেন, তাই অন্যদের শেখাবার বেলায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। শহর থেকে শহরে,ট্রেনে বাসে লরিতে দলের সিন্দুক ভর্তি জিনিসপত্র সবকিছু

অভিনেতারাই বহন করতেন। মহড়ার পাশাপাশি তাঁদের যে আড্ডা বসতো তাও ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁদের পরিশীলিত ও মার্জিত রুচি, চিন্তাভাবনা, জ্ঞানার্জনে আগ্রহ উৎপলকে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছে।

আবার 'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস্'-এঃ

'শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি' ভারতে অভিনয় শেষে দেশে ফিরে গেলে উৎপল দত্ত নিজের দলে ফিরে আসেন। তিনি 'শেকস্‌পিয়ারিয়ান ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'তে কাজ করলেও 'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস'-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন। গুরু কেন্ডাল ও তাঁর দলের কাছ থেকে যা কিছু শিখেছেন সবই উজাড় করে দিয়েছেন নিজের দলকে। শেকস্‌পিয়ারিয়ানার অভিজ্ঞতায় স্নাত ও সমৃদ্ধ করলেন 'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস্'কে,পরে এলটিজি,পিএলটিকে।

কেন্ডালদের দলে অভিনয়ের পর নিজের দলের প্রথম প্রযোজনা *ওথেলো*। শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল *ওথেলো* অভিনয় করে কলকাতার দর্শকদের মন জয় করার পর একটু দুঃসাহস করেই উৎপল তাঁর দলের জন্য *ওথেলো* প্রযোজনায় হাত দিলেন।'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস'-এর*ওথেলো*-ও দর্শকের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়। আর উৎপলের *ওথেলো* অভিনয় হয়েছিল অসাধারণ; যে-অসাধারণ অভিনয় উৎপলকে কিংবদন্তি করে তুলেছে। স্টেটসম্যানের নাট্য সমালোচকের ভাষায় -'It was Utpal Dutt as Othelo who dominated the play. Had Mr. Geoffrey Kendal of Shakapeareana been there last night he would have warmed his acting.'[১৬]*ওথেলো*-র পরে 'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস' প্রযোজনা করে *আ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম*।

'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস'-এর সমসাময়িক নাট্যপ্রযোজনাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ঐ-সময়ের নাট্যগোষ্ঠীগুলোর ইংরেজি নাট্য প্রযোজনার চিত্র ছিল নিম্নরূপঃ

{কলকাতার শৌখিন ইংরেজি নাট্য প্রযোজনাসমূহ (১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দ)} :

Date	Play/Author	Group	Stage
6-8/04/1948	Candida (George Bernard Shaw)	The Dramatic Club of Calcutta (DCC)	New Empire
12-13/06/1948	The Rivals(Sheridan)	The Artistes of Drama(AD)	St. Xavier's Theatre (SXT)
04/07/1948	Othello (Shakespeare)	The Amateur Shakespeareans (AS)	SXT
03/08/1948	The Rising of the Moon(Lady Gregory) The Mondey's Paw (W.W.Jacob) Riders to the Sea (Lady Gregory)	AD AD Loreto House	SXT SXT SXT
2-4/9/1948	Quiet Weekend (Esther Mc Cracken)	DCC Group	The New st. stage James' Hall (SJH)
13-14/11/1948	A Midsummer Night's Dream (Shakespeare)	AS	SXT
16-20/11/1948	An Inspector Calls (J.B. Priestley)	DCC	SJH
12-15/01/1949	Duet for Two Hands (Mary Hayley Bell)	DCC	SXT
27/1-3/2 1949	Moon and Stars (Ken Millage and Dougie Cunningham)	Calcutta Amateur Theatrical Society	New Empire
23-6/02/1949	I'll Leave it to You (Noel Coward)	AD	SXT
6-7/03/1949	Romeo and Juliet (Shakespeare)	AS	SXT
16-18/03/1949	Tony Drawa a Horse	DCC	New Empire
15-17/07/1949	Julius Caesar (Shakespeare)	AS	SXT
4-6/08/1949	Folls Rush in (Kenneth Horne)	DCC	SXT
2-3 & 07/09/1949	Twelfth Night (Shakespeare)	AS	SXT
06/11/1948	Distinguished Gathering (James Parish)	CUBE	New Empire

[তথ্যসূত্র:উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন,সৌমেন চট্টোপাধ্যায়,উৎপলদত্ত জীবন কথা,পৃ. ৫১০।]

তালিকায় ১৭টি নাটকের মধ্যে পাঁচটি নাটক Shakespeare-এর, ০২টি Lady Gregory-এর । বাকি ১০টি নাটকের নাট্যকাররা হলেন:George Bernard Shaw, Sheridan, W.W.Jacob, Esther Mc Cracken, J.B. Priestley, Mary Hayley Bell, Ken Millage and Dougie Cunningham, Noel Coward, Kenneth Horne, James Parish.

কমিউনিস্ট পার্টি যখন বে-আইনি, গ্রেপ্তার নির্যাতনযখন বেপরোয়া গতিতে চলছিল তখনও ড্রামাটিক ক্লাব, আর্টিস্টিকস্ অব ড্রামা, ক্যালকাটা অ্যামেচার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'র প্রযোজনায় সমকালের ছোঁয়া না লেগে সেই পুরানো বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। চল্লিশের দশকে রাজনীতি-অর্থনীতিসহ নানা ঘটনাপ্রবাহে যখন উত্তাল ভারতীয় উপমহাদেশ সেইসময়ে উৎপলের উপলব্ধি – '১৯৪৮ সালে কমিউনিট পার্টি বেআইনি হল। গ্রেপ্তার নির্যাতন, গুন্ডামি চলতে লাগলো বেপরোয়া। আর লিটল থিয়েটারের নিশ্চিন্ত নাট্যসাধনাকে ক্রমশ মনে হতে লাগল হাস্যকর, অকিঞ্চিৎকর এক ভন্ডামি।'[১৭] সামাজিক, রাজনৈতিক, অস্থিরতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে *রোমিও জুলিয়েট* অভিনয়ের প্রোগ্রামে প্রবল এক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ ছাপেন উৎপল। দ্য অ্যামেচার শেকস্পিয়ারিয়েন্স-এর পরের প্রযোজনা আধুনিক পোশাকে *জুলিয়াস সিজার*। এতে উৎপল ব্রুটাস চরিত্রে অভিনয় করেন। নাটকটি মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে এর অভিনয়পত্রীতে উৎপলদত্ত 'প্রোডাকসন

ম্যানিফেস্টো'নামে একটি প্রবন্ধলেখেন। শেকস্‌পিয়ারের একটি অক্ষর পরিবর্তন না করেও অত্যাধুনিক রাজনৈতিক নাটক হয়ে ওঠেছিল 'সিজার'। সিজারের মধ্যে যেন কালোর্দ্ধ দেশোর্দ্ধ এক ডিক্টেটারকে দেখতে পেয়েছিলেন শেকস্‌পিয়ার। এ-নাটক পরিণত হয়েছিল সমকালীন বিশ্বের দর্পণে। এ-বছরে দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস্ প্রযোজনা করে *টুয়েলফথ নাইট*। এতে উৎপল মালভোলিও চরিত্রে অভিনয় করেন। বছরের শেষের দিকে জেমস প্যারিসের *ডিস্টিংগুইশড গ্যাদারিং* প্রযোজনা করে কিউব; উৎপল ফলিক্স মন্টেগু চরিত্রে অভিনয় করেন।

উৎপল দত্ত অভিনীত/পরিচালিত 'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস্'-এর প্রযোজনাসমূহঃ

নাটক	নাট্যকার	প্রথম অভিনয়	অভিনীত চরিত্র	অভিনয় স্থান
রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট (নির্বাচিত অংশ)	শেকস্‌পিয়ার	০৮/১০/১৯৪৭		সেন্ট জেভিয়ার্স হল
ম্যাকবেথ (নির্বাচিত অংশ)	শেকস্‌পিয়ার	০৮/১০/১৯৪৭	ঐ	
মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর (নির্বাচিত অংশ)	শেকস্‌পিয়ার	০৮/১০/১৯৪৭		ঐ
রিচার্ড দি থার্ড	শেকস্‌পিয়ার	২২/১২/১৯৪৭	কিং/রাজা	ঐ
ওথেলো	শেকস্‌পিয়ার	০৪/০৭/১৯৪৮	ওথেলো	ঐ
মিডসামার নাইটস ড্রিম	শেকস্‌পিয়ার	১৩/১১/১৯৪৮	বটম	ঐ
রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট	শেকস্‌পিয়ার	০৬/০৩/১৯৪৯	মারকুশিও	ঐ
জুলিয়াস সিজার	শেকস্‌পিয়ার	১৫/০৭/১৯৪৯	ব্রুটাস	ঐ
টুয়েলফথ নাইট	শেকস্‌পিয়ার	০২/০৯/১৯৪৯	মালভোলিও	ঐ

[তথ্যসূত্র:দর্শন চৌধুরী,থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত,পৃ.৩৮৭-৩৮৮]

দ্বিতীয় দফায় কেন্ডালের দলে অভিনয় (১৯৫৩-৫৪ সালে):

১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেফ্রি কেন্ডালদের দলের আবার ভারত সফর শুরু হয়। উৎপল দত্ত এবারেও তাঁদের দলে যোগ দিয়ে অভিনয়ে অংশ নেন। ৫৪ সালে জেফ্রি কেন্ডালের দল ভারতে অভিনয় শেষ করে চলে গেলে উৎপল দত্ত নিজের দলে ফিরে আসেন।

'শেকস্‌পিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনালথিয়েটার কোম্পানি'তে দ্বিতীয়বার উৎপল দত্ত অভিনীত নাটক ও চরিত্রসমূহ :

নাটক	নাট্যকার	প্রথম অভিনয়	প্রযোজক/পরিচালক	চরিত্র
দ্যা মার্চেন্ট অব ভেনিস	শেকস্‌পিয়ার	১৯৫৩	এস আই টি সি জেফ্রি ক্যান্ডাল	গ্রাসিয়ানা
শি টুপসটু কংকার	অলিভার গোল্ডস্মিথ	১৯৫৩/৫৪	জেফ্রি ক্যান্ডাল	হাইক্যাসেল
স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল	শেরিডন	১৯৫৩/৫৪	জেফ্রিক্যান্ডাল	স্যার অলিভার
ম্যাকবেথ	শেকস্‌পিয়ার	১৯৫৩/৫৪	জেফ্রি ক্যান্ডাল	রস
হ্যামলেট	শেকস্‌পিয়ার	১৯৫৩/৫৪	জেফ্রিক্যান্ডাল	ক্লডিয়াস

[তথ্যসূত্র:পশ্চিমবঙ্গ উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা,১৪০৮,পৃ.২৪০]

এ-সময়ে উৎপল নাটকে অভিনয়, নাটক রচনা ও পরিচালনা, প্রবন্ধ লেখা, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি বিচিত্র বিষয়ে গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেকে খুব মজবুতভাবে তৈরি করার প্রয়াসে ব্যাপৃত ছিলেন।

'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' (এলটিজি):

১৯৪৯ সালে উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যদলের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলেন, 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' (এলটিজি)। প্রথম নাট্যদল 'দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ানস'-এর নামের সাথে 'অ্যামেচার' থাকলেও নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে উৎপল 'অ্যামেচার' ছিলেন না; ছিলেন দারুণ পেশাদার। উৎপলের কাছে থিয়েটার কমিটমেন্ট ও শৃঙ্খলার জায়গা। থিয়েটারের শৃঙ্খলাকে তাই উৎপল দত্ত সামরিক ব্যারাকের সাথে তুলনা করেছেন। অ্যামেচারশেকস্‌পিয়ারিয়ানস কিউব হয়ে এলটিজি-তে রূপান্তরিত হয়। কিউব-এর *ডিসন্টিংগুইস্‌ড গ্যাদারিং* নামক একটি প্রযোজনার কথাই জানা যায়। এলটিজি প্রথম দিকে ইংরেজি নাটকই মঞ্চস্থ করছিল।

উৎপল দত্ত অভিনীত,পরিচালিত এলটিজি'র ইংরেজি প্রযোজনাসমূহ:

Play/ Auther First Performance Group/Role/Others

*Waiting for Lefty*YWCA LittleTheatregroup(LTG)
(Clifford Odets)

*Othello*30.4.50
(Shakespeare)New Empire LTG,UtpalDutt(UD),Othelo

The Dark Lady of the sonnet *14.8.1950*
*(*Bernard Shaw*)*New EmpireLTG UD, (Shakespeare)

Androcles and the Lion
(Bernard Shaw) `` LTG,UD(Captain)

Till The Day I Die 9.11.1950
(Clifford Odets) New Empire LTG,UD

*The Merry Wives of Windsor*24.1.1951
New EmpireLTG,UD(Ford)
(Shakespeare)

Mrs. Warren's profession 2.9.1951 LTG,UD(Stage Manager)
(Bernard Shaw) St.Thomas Hall

Macbeth Nov 1951 LTG,UD(Macbeth)
(Shakespeare)

Othello 25.7.1952 LTG,UD,(Othello)
(Shakespeare) ITF pavillion

Arms and the Man 19.11.1952 LTG,UD,(Captain Bluntschli)
(George Bernard Shaw) St.Thomas Hall

Othello 25.7.1952 LTG,UD,(Othello)
(Shakespeare) Minerva

[তথ্যসূত্র:দর্শন চৌধুরী,থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত,পৃ.৩৮৯-৩৯০]

এলটিজির প্রথম প্রযোজনা১৯৪৯ সালে ক্লিফোর্ড ওডেট্স্ এর *ওয়েটিং ফর লেফটি*। *ওয়েটিং ফর লেফটি*-এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে উৎপল জানিয়েছেন :

> শেক্সপীয়ারে বা বার্নার্ড শ-এ আটকে থাকাটাই তখন অসহ্য লাগছিল। কারাগারে গুলিচালনার সংবাদে ক্রোধ যেন ব্যর্থ নিঃশ্বাস হয়ে ধাক্কা মারছিল বক্ষপঞ্জরে। কাকদ্বীপে নারীহত্যা, নয়ানপুরের মাটি লাল, ডিব্রুগড়ে গণনাট্যের অনুষ্ঠানে গুলিবর্ষণ, ময়দানে হাজরা পার্কে জনসমাবেশে বেপরোয়া গুলিচালনা, বউবাজারে নারী মিছিলের উপর গুলি আর লিটল থিয়েটার কীসের তপস্যায় মৌনী?[১৮]

উৎপল ভেবেছিলেন ইংরেজি নাটক করলে তা নিয়ে পুলিশ হয়ত মাথা ঘামাবে না।কিন্তু যখন নাটক আক্রান্ত হল তখন উপলব্ধি করলেন যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয় সেখানে কোনো সংস্কৃতিই টিকতে পারে না। এলটিজি প্রযোজনা করলো শেকস্পিয়ারের *ওথেলো* এবং বার্নাড শ এর *এন্ড্রুক্লিস এন্ড দ্য ম্যান*। এলটিজি এবারে মঞ্চস্থ করেছে নিষিদ্ধ এক কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনী ওডেটস এর *টিল দা ডে আই ডাই। টিল দা ডে আই ডাই* নাটকে জর্মন পার্টির বীরত্ব গাথা ৪৯-এর কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্টদের আত্মবলির কাহিনী হয়ে ওঠেছিল। ৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবার পর স্মার্টাগ্রাউন্ডের নাট্যোৎসবে লিটল থিয়েটার আমন্ত্রিত হয় *টিল দা ডে আই ডাই* করার জন্য। স্মার্টা গ্রাউন্ডে *টিল দা ডে আই ডাই* নাটক করার সুবাদেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে উৎপলের যোগাযোগ ঘটে।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' বা 'Indian People's Theatre Associotion' (IPTA):

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-তে যোগ দেয়া উৎপল দত্তের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এক সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত জানিয়েছেন :

> গণনাট্য আন্দোলনই তো সব। সেই তো মূল কেন্দ্র। তার থেকেই তো প্রেরণা আসছে চারদিকে।... থিওরিটিক্যালি অনেক কিছু পড়ে ফেলেছিলাম। তাই আমি তত্ত্বগতভাবে প্রস্তুত ছিলাম কোনও নাট্যসংস্থায় যোগদানের জন্য। কিন্তু শুধু তত্ত্বে তো হয় না। হাতে-কলমে কাজ করতে শেখালো গণনাট্য সংঘ।... গণনাট্য সংঘের সঙ্গে কাজ করে হাটে-বাজারে-গ্রামে-গঞ্জে-শহরে – জনসাধারণের জন্য নাটক করতে হবে সেটা শিখলাম ওদের কাছ থেকে।[১৯]

১৯৫১ সালে সলিল চৌধুরী ও IPTA সম্পাদক নিরঞ্জন সেনের আগ্রহে এলটিজি থেকে ছুটি নিয়ে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর সেন্ট্রাল স্কোয়াডে তিনি যোগ দেন। গণনাট্য সংঘ উৎপলকে এনেছে জনতার মুখরিত সখ্যে,তাঁর ভাষায় :'গণনাট্য সংঘ আমাকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে এলো। একটা আলোকিত জাগরণে মেতে উঠলাম।'[২০] উৎপল দত্তের গণনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ড শুরু হয় পানু পালের *ভাঙাবন্দর*নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।

গণনাট্য সংঘে উৎপল দত্ত অভিনীত ও পরিচালিত নাটকগুলো হল :

নাটক	নাট্যকার	প্রথম অভিনয়	প্রযোজক/পরিচালক	চরিত্র	অভিনয় স্থান
ভাঙাবন্দর	পানুপাল	১৭.৪.১৯৫১	ভারতীয় গননাট্য সংঘ	স্মাগলার	---------
বিসর্জন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২.১০.১৯৫১	ঐ(উৎপল দত্ত)	গোবিন্দ মানিক্য	মিনার্ভা/মুসলিম ইন্সটিউট
অফিসার	নিকোলাই গোগোল/ঋত্বিক ঘটক	১৬.১২.১৯৫১	ঐ (উৎপল দত্ত)	----------	ভবানীপুর তরুণসমিতি প্রাঙ্গন
চার্জশিট	উমানাথ ভট্টাচার্য	১৯৫১	ঐ (পানু পাল)	----------	হাজরা পার্ক

নাটক	নাট্যকার	প্রথম অভিনয়	প্রযোজক/পরিচালক	চরিত্র	অভিনয় স্থান
দলিল	ঋত্বিক ঘটক	১৯৫১/৫২	ঐ (ঋত্বিক ঘটক)	হরেন পন্ডিত	শ্রীভূপতিনন্দীর বাড়ির ছাদ
ভোটের ভেট	পানু পাল	১৯৫২	ঐ	----------	----------
গভর্ণমেন্টইন্সপেক্টর	নিকোলাই গোগোল /প্রমথনাথবিশী	১৯৫২	ঐ(উৎপল দত্ত)	ম্যাজিস্ট্রেট	----------
ম্যাকবেথ (নির্বাচিত দৃশ্য)	শেকসপিয়র/ নীরেন্দ্রনাথ রায়	২৩.৪.১৯৫২	ঐ (উৎপল দত্ত)	ম্যাকবেথ	শ্রীরঙ্গম বর্তমানে বিশ্বরূপা

[তথ্যসূত্র:পশ্চিমবঙ্গ উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা,১৪০৮,পৃ.২৩৮]

গণনাট্য সংঘে উৎপল দত্ত বেশি দিন থাকতে পারেন নি;মোটে দশ মাস – কিন্তু এই দশ মাসে উৎপলের সঞ্চয় বা অর্জন অতুলনীয়। তিনি সেখানে প্রত্যক্ষ করেছেন সর্বভারতীয় শান্তি উৎসবে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে আগত লোকশিল্পীর সমাবেশ, পাঞ্জাবি ভাংরা-আশ্রিত অপেরার লক্কর দিলাত্,ওমর শেখ আর গভংকরের গান, পৃথ্বীরাজ কাপুরের 'পাঠান', উর্দু কবিতার আসর থেকে রমেশ শীল-শেখ গোমানির কবির লড়াই, গুজরাতের ভাগুয়াই থেকে উত্তর প্রদেশের নৌটঙ্কি, অন্ধ্রের বুকভরা কথা থেকে কাশ্মীরের ব্যালে, অসমের বিহু থেকে ময়ুরভঞ্জের ছৌ–সে এক মিছিল। উৎপলের অনুভবে গণনাট্যের অঙ্গনে সারা দেশ এক দেহে লীন। ওই দশ মাসে উৎপল আরও দেখেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে গান লিখতে, উদার হাসি হেসে গানের স্কোয়াডকে শেখাতে, সব নতুন ও নবীনকে দু'হাতে জড়িয়ে নিতে। দেখেছেন বিজন ভট্টাচার্যকে ফকিরের বেশ পরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুরের বন্যা বইয়ে দিতে। সলিল চৌধুরীকে দেখেছেন তুড়ি মেরে হঠাৎ মনে আসা একটা আলগা সুরকে মুখরা-অন্তরায় বাঁধতে। মৃণাল সেনকে দেখেছেন ঘর্মাক্ত মুখে ছায়ানাট্যে আলো ফেলতে, আর তাপস সেনকে খালি গায়ে মধ্যমা আর তর্জনীর ফাঁকে সিগারেট ধরে মাচায় বসে স্পট ধরতে এবং দেখেছেন পানু পালকে।(দ্র:লিটল থিয়েটার ও আমি)

১৯৫১ সালে বন্দিমুক্তি আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে উমানাথ ভট্টাচার্য রচিত *চার্জশীট* নাটকে উৎপল অসংখ্য অভিনয় করেছেন, কখনো হিসাব করে দেখেননি কোন পথ-নাটিকার কতবার অভিনয় হয়েছে। জলপাইগুড়ি থেকে ক্যানিংহাটে, বাজারে,লরির ওপরে, রোয়াকে।এরপর ১৯৫২ সালের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পানু পাল রচিত ও পরিচালিত ভোটের ভেট নাটকে ঋত্বিক ঘটক, শান্তনু ঘোষ ও উৎপল দত্ত লরিটাকেই মঞ্চ বানিয়ে সারা কলকাতা ঘুরে ঘুরে অভিনয় করেছেন।

উৎপল দত্ত মনে করেন–গণনাট্য আন্দোলনই মূল কেন্দ্র,সেখান থেকেই প্রেরণা এসেছে চারদিকে; সেটাই সব। যে-গণনাট্য সংঘই সব, যে-সংঘ তাঁকে গণমানুষের কাছাকাছি এনেছে – সেই সংগঠনে তিনি কেন বেশিদিন থাকতে পারেননি সে-সম্পর্কে উৎপলের ভাষ্য :

> আমি গণনাট্য সংঘে থাকতে পারলাম না। নেতৃত্বের একাংশ কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাকে নানা উদ্ভট রাজনৈতিক বিচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করতে লাগলেন। তাও কখনো মুখের ওপর নয়,আড়ালে। একটা ব্যাপক ফিসফাস চালু হল।

বিসর্জনে অভিনয় করেছি, সুতরাং আমি স্বভাবতই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবধারা আমদানি করে গণনাট্যের সংগ্রামী ঐতিহ্য নষ্ট করতে চাইছি। পথ-নাটিকায় আমার উৎসাহ –সুতরাং স্বভাবতই আমি অতি-বামপন্থী ট্রটস্কিবাদী,প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে গণনাট্যকে জড়িয়ে ফেলে সংগঠন বিপন্ন করেছি। আমি একাধারে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বিচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়লাম। কোনও মিটিংয়ে বলতে চেষ্টা করেছি: গণনাট্য সংঘ একই সঙ্গে বিসর্জন এবং চার্জশীট অভিনয় করে তার প্রকৃত দায়িত্ব পালন করেছে, ক্লাসিক ও প্রচার পাশাপাশি বজায় রেখেছে, প্রোপাগান্ডা ও অ্যাজিটেশন, দুটিই চালু রেখেছে। উত্তর নেই, মৌন।

এরকম কিছু নেতা গণনাট্যের সমূহ ক্ষতি করেছেন। তাঁরা গাইতে জানতেন না, নাচতেও না, অভিনয় করতেন না, লিখতেন না। মনে হয় যারা গাইত, নাচত, অভিনয় করত, লিখত– তাদের তারা তেমন সইতে পারতেন না। পাতিবুর্জোয়া ঈর্ষা বড় তীব্র বিষ। ব্যক্তি থেকে তা সারা সংগঠনে ছড়িয়ে যায় অতি দ্রুত। অথচ এই নেতাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল বড়ই সীমিত। কোনও বিষয়ের গভীরেই তাঁরা কখনও যাননি। তখন যা নিয়ে সারা ভারত তোলপাড় হচ্ছে, 'লাস্টিং পিস' পত্রিকার সম্পাদকীয়,ডায়াকভের প্রবন্ধ,মাও-ৎসে তুং-এর 'নয়া গণতন্ত্র' প্যামফ্লেট–দিমিত্রভ–রাকোসি–পাভকার বিতর্ক, কথা বলে দেখেছি কোনওটিই তাঁরা পাঠ করেননি, ভাসা ভাসা শুনেছেন। স্তালিন-ট্রটস্কি মতাদর্শগত সংগ্রাম হয়েছিল কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। ঔপনিবেশিক বিপ্লবে চীনের পার্টির নতুন সংযোজন কী– প্রশ্ন শুনে তারা হাঁ হয়ে থাকতেন। আর মার্কস-এঙ্গেলসের বই তাঁরা কোনওদিন খুলে দেখেছেন বলে বোধ হয় না। সেইজন্য যারা মার্কসবাদী চিরায়ত সাহিত্য ও সাম্প্রতিক প্রবন্ধাবলী নিয়মিত পড়ত, তাদেরও তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না।[২১]

এ-ছাড়াও উৎপলকে 'কেরিয়ারিস্ট' এবং তাঁর আচরণ সম্পর্কে আরও নিম্নমানের বালখিল্য কথা বলা হয়েছে বলে উৎপল দত্ত লিখেছেন। গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক কাঠামোতে উৎপল দত্ত ছিলেন মাত্র দশ মাস;কিন্তু চেতনায় সম্পৃক্ত ছিলেন আমৃত্যু।

গণমানুষের নাট্যকার উৎপল দত্ত গণনাট্যসংঘের হাত ধরেই বাংলা নাট্যজগতে পদার্পণ ও ব্যাপক জনতার কাছাকাছি আসেন।স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মানুষের স্বপ্নভঙ্গ, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি,উৎপলের তাত্ত্বিক পড়াশোনা, গণনাট্য সংঘে যোগদান বিশেষ তাৎপর্যবহ। গণনাট্য সংঘের মাধ্যমেই হাটে-মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে কাজ করে বৃহত্তর জনতার কাছাকাছি আসেন তিনি। গণমানুষের নাট্যকার উৎপল দত্তের গণমানুষের কাছকাছি আসা তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সংঘে যোগ দিয়েই উৎপল বাংলা নাটকের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বাংলা নাটক অভিনয় ও পরিচালনা করেন। গণনাট্য সঙ্ঘের আলোকিত জাগরণে মেতে ওঠে, জনতার মুখরিত সখ্যে অবগাহন করে উৎপল দত্ত উপলব্ধি করেন সাধারণ মানুষ তথা বৃহত্তম দর্শকদের জন্য, তাঁদের ভাষায় (বাংলায়) নাটক করতে হবে।

নাটক হবে বাংলায়, নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা – সর্বস্তরের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।[২২]

এরপর থেকে গণমানুষকেই উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের উপজীব্য করলেন, নাটকে কইলেন সংগ্রামের কথা। নাটক পরিচালনা তথা নির্দেশনা ও নাট্য রচনায় উৎপল দত্ত সংগ্রামশীল মানুষের সংগ্রামের কথকতার একটি নতুন ধারার সূচনা করেন– এবং সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান।

এলটিজিতে প্রত্যাবর্তন:

স্বভাবতই উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘে থাকতে না পেরে প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁর নাট্যদল এলটিজিতে। এলটিজিতে তখন *মিসেস ওয়ারেন্স প্রোফেশন* নাটকের মহড়া চলছিল;তিনি সেখানে মঞ্চাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকরেন। এলটিজির পরের প্রযোজনা নবপর্যায়ে *ওথেলো* এবং *আর্মস এন্ড দ্যা ম্যান*।একদিকে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিবাজের স্বার্থে ইংরেজি নাটক করা অন্যদিকে বৈপ্লবিক তত্ত্ব কপচানো- এ দুটো যে এক সাথে চলতে পারে না এ বোধোদয় হবার পর ১৯৫০ সালের দিকে এলটিজি বাংলা প্রযোজনার দিকে মনোনিবেশ করে। নাটক করতে করতে উৎপলের অভিজ্ঞতা যতই ঋদ্ধ হচ্ছিল ততই তিনি এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সৌখিন দল ও (বিদেশি) ইংরেজি ভাষা নিয়ে ব্যাপক জনতাকে কাছে পাওয়া যাবে না। প্রতাপ রায়,রণেন রায় ও উৎপল দত্ত প্রমুখ কয়েকজন মিলে বাংলা দল তৈরি করেন। বাংলা দল তৈরির প্রধান কারণ, ইংরেজি নাটকের দর্শক তখন শোচনীয়ভাবে কমে যাচ্ছিল। যদিও শুরুতে ইংরেজি নাটকের প্রচুর দর্শক ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে দর্শক সংখ্যা এতই কমে যাচ্ছিল যে এইসব আয়োজন অকারণ সময় নষ্ট বলে প্রতিভাত হচ্ছিলো তাঁদের কাছে। তাই অকারণ সময় নষ্ট না করে গণমানুষের কাছে নাটক নিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষায় এলটিজি বাংলা প্রযোজনার সিদ্ধান্তনেয়। ১৯৫০ সালে প্রযোজনা করে শিউলি মজুমদার অনূদিত হেনরিক ইবসেন-এর *গোস্টস*। ১৯৫২ সালে প্রযোজনা করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত হেনরিক ইবসেনের *ডলস্ হাউজ (পুতুলের সংসার)*।

সিমনভ্ এর *রাশিয়ান কোশ্চেন* এর সরোজ দত্তকৃত (বাংলা অনুবাদ) *সাংবাদিক* নাটকের মধ্য দিয়ে এলটিজি পুরোপুরি বাংলা দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উৎপলের এ সময়ের উপলব্ধি–

> গণনাট্য সংঘ যে আদর্শে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সে আদর্শকে আঁকড়ে ধরার বাসনা আমাদের প্রায় সবাইকে পেয়ে বসেছিল। নাটক হবে বাংলায়, নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য,নাটক কইবে সংগ্রামের কথা – সর্বস্তরের সংগ্রাম, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। মিটিং করে স্থির করা হল লিটল থিয়েটার গ্রুপ সম্পূর্ণত বাংলা নাটকে মনোনিবেশ করবে। '[২৩]

সাংবাদিক(১৯৫২) নাটকে 'শেষ দৃশ্যে যখন হ্যারি শূন্য কক্ষে দাঁড়িয়ে রেডিওতে মার্ফির কণ্ঠ শুনছে, তখন তাপস সেনের হলদে আলো রেডিওর কাচের ডায়াল ভেদ করে মঞ্চকে বিষণ্ন হেমন্তের রঙে রাঙিয়ে প্রেক্ষাগৃহে আছড়ে পড়ে মার্কিন যুদ্ধবাজ সভ্যতার যেন অন্তিম ঘোষণা করেছিল।[২৪]

সাংবাদিক নাটকের পর *মার্চেন্ট অব ভেনিস*(নির্বাচিতদৃশ্য,১৯৫৩),*কেরানী*(১৯৫৩)প্রযোজনা; অতঃপর রবীন্দ্রনাথের *অচলায়তন*(১৯৫৩)মঞ্চস্থ করে এলটিজি। *অচলায়তন* উপভোগ করেন ৩৫,০০০ হাজার দর্শক। এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে উৎপল দত্ত লিখেছেন–

> রবীন্দ্রনাথ নতুন করে প্রাণ পাবেন মেহনতী মানুষের স্পর্শ পেয়ে। তারা ঠাকুর কবিকে বোঝে,তাঁর সঙ্গে হাসে-কাঁদে তাঁর জীবনদর্শন উপলব্ধি করে আলোচনায় মাতে। কতিপয় বুদ্ধিজীবীর সমাধি-সদৃশ আড্ডা থেকে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধার করে একদিন গ্রামে-কারখানায় ছড়িয়ে দেবে শ্রমিক শ্রেণি।[২৫]

এলটিজি ইংরেজি থেকে বাংলায় পরিবর্তিত হওয়ায় যারা বাংলা জানেন না তাদের দল ছাড়তে হয়েছে। অভিনেতার অভাব হয় না। অনেকেই অভিনয় করতে এগিয়ে এলেন। সুনীল রায়, রবি ঘোষ, রবি সেন গুপ্ত, শেখর চট্টোপাধায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, শ্যামল সেন। *ম্যাকবেথ*-এ শোভা সেন এলেন লেডি ম্যাকবেথ হয়ে। এলটিজির মূল টিম পূর্ণ হয় এতে। সত্য বন্দোপাধ্যায়, প্রতাপ রায় আগে থেকেই ছিলেন। তাপস সেনের আলোর যাদুতো ছিলই।

জেফ্রি কেন্ডালের দল আবার ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতে এলে উৎপল তাদের সঙ্গে কাজ করে এলটিজিতে ফিরে আসেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত শেকস্পিয়ারের *ম্যাকবেথ*(১৯৫৪) নাটক পরিচালনা করেন এবং নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। উৎপলের দৃঢ় ধারণা, স্বাতন্ত্র্যময় নানা ব্যক্তির এক টিমে সংঘবদ্ধ হতে সময় লাগে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মহড়া চললেও, ন্যূনতম তিন বছর। *ম্যাকবেথের* ৯৭টি অভিনয়ের দীর্ঘ পরিসরে এলটিজি সাবালকত্বে পা দেয়। এলটিজি কলেজ প্রাঙ্গন থেকে পাড়াগাঁয়ে সর্বত্র *ম্যাকবেথ* করে বেড়িয়েছে। শেকস্পিয়ার করতে গিয়েই যাত্রার সাথে শেকস্পিয়ারের সাদৃশ্য নির্দেশে উৎপলের উপলব্ধি যাত্রা আর শেকস্পিয়ার বহিরঙ্গের দিক থেকে এক। এ-বিষয়ে উৎপল একটি প্রবন্ধ লেখেন 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায়। স্তালিনকে উদ্ধৃত করে সেই প্রবন্ধে তিনি লেখেন -

> শিল্পকে রূপে হতে হবে জাতীয়, তাকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রথমত যাত্রাকেই প্রধান আশ্রয় করতে হবে, দ্বিতীয়ত, বাংলা নাট্যশালাকেও বাক্সবন্দি মঞ্চ ভেঙ্গে যাত্রার প্রভাবে অবগাহন করতে হবে। খোলা মাঠে ম্যাকবেথের অভিনয়ের সাফল্য আমার আত্মবিশ্বাসকে উচ্চকিত করেছিল।[২৬]

রবীন্দ্রনাথের *কালের যাত্রা*(১৯৫৫) আধুনিক পোশাকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রযোজনা করে এলটিজি। এ-বছরেই গলসওয়ার্দির *দ্য সিলভার বকস্*-এর রূপান্তর*চাঁদির কৌটো* মঞ্চস্থ করে এলটিজি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত *জুলিয়াস সিজার* (১৯৫৬)-এর (নির্বাচিত দৃশ্য) সাবেকি বাংলা সংস্করণও প্রধানত বাংলা নাট্যশালার অতীতকে বোঝার জন্য এলটিজি মঞ্চস্থ করেছিল। পশুপতি ভট্টাচার্য অনূদিত শেকস্পিয়ারের *টুয়েলফথ নাইট*-এর নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করে এলটিজি। পুরাতন ক্ল্যাসিককে মঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে এলটিজি ১৯৫৬ সালে বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ*(১৯৫৬) মঞ্চস্থ করে,এই প্রহসনে উৎপল দত্ত ভক্তপ্রসাদ চরিত্রে অভিনয় করেন; পরিচালনা করেন সুনীল রায়। ১৯৫৭ সালে

পলাশীযুদ্ধের দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শচীন সেনগুপ্তের *সিরাজউদ্দৌলা* মঞ্চস্থ করে এলটিজি। বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে আগে গভীরভাবে যুক্ত না হলে নতুন ঐতিহ্যের দিকে এক কদমও এগোনো যায় না এলটিজি মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করতো এবং এর মধ্য দিয়ে অভিনেতা নিজের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করার সহজ পথ পায়। ১৯৫৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গুরুবাক্য, সূক্ষ্ম বিচার*এবং বনফুলের *নবসংস্করণ* এবং ম্যাক্সিম গোর্কির *মা*উপন্যাসের আংশিক নাট্যরূপ *মে দিবস* মঞ্চস্থ করে এলটিজি।রবীন্দ্রনাথের *তপতী*, উমানাথ ভট্টাচার্য অনূদিত ম্যাকসিম গোর্কির *দ্য লোয়ার ডেপথস বা নীচের মহল*, শেকসপিয়ারের *দ্বাদশ রজনী(টুয়েলফথ নাইট)*মঞ্চস্থ করে এলটিজি ১৯৫৭ সালে। এলটিজি-র প্রথম নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় রঙমহল থিয়েটারে ১৯৫৭-এর জুলাই মাসে।মঞ্চস্থ হয় *তপতী, সিরাজউদ্দৌলা ও নীচের মহল*।উৎপল দত্ত *তপতী*-তে রাজা, *নীচের মহল*-এ গগন চরিত্র রূপদান করেন। *দ্বাদশ রজনী* পরিচালনা ও অভিনয় করেন। ১৯৫৮ সালে উৎপল দত্ত রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক *ছায়ানট* ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *অলীকবাবু*, রবীন্দ্রনাথের *শোধবোধ*,উৎপল দত্ত অনূদিত শেকসপিয়ারের *ওথেলো* নাটক মঞ্চস্থ করে এলটিজি ।

বিশ্বরূপা থিয়েটারে১৯৫৮ সালে ৮ থেকে ১০ই ডিসেম্বর এলটিজির ২য় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ-সময়ে মঞ্চস্থ হয় *ওথেলো,নীচের মহল ও ছায়ানট। ওথেলো*-তে উৎপল ওথেলো চরিত্রে এবং *ছায়ানট*-এ বিনয়েন্দ্র চরিত্রে অভিনয় করেন।
১৯৫৭-৫৮ সাল দুই বছর এলটিজি প্রচুর প্রদর্শনী করে বেড়িয়েছে বলে শোভা সেন জানিয়েছেন :

> শেকস্‌পিয়ার-এর ম্যাকবেথ,ওথেলো,জুলিয়াস সীজার এবং দ্বাদশ রজনী'র নির্বাচিত দৃশ্যাবলী,রবীন্দ্রনাথের তপতী,শোধবোধ ও অচলায়তন, রবীন্দ্রনাথেরই দুটি একাঙ্ক সূক্ষ্মবিচার ও গুরুবাক্য গিরীশচন্দ্রেরসিরাজদ্দৌলা–এই কটা নাটক নিয়ে আমরা সারা পশ্চিম বাংলার গ্রামগঞ্জ,শহরের মাঠঘাট চষে বেরিয়েছি। ১৯৫৭ সালে আগস্ট মাসে বাংলার বাইরে লখনউ গেছি 'নিচের মহল ও ম্যাকবেথ নিয়ে। সর্বত্র আমরা যে অভিনন্দন ও প্রশংসা কুড়িয়েছি তার তুলনা নেই।[২৭]

এত আয়োজনের পরও এলটিজি'র প্রতীক্ষা ছিল-কতদিনে স্বমূর্তি ধারণ করবে। কতদিনে গণনাট্য প্রদর্শিত পথে ভীমবেগে অগ্রসর হবে, কতদিনে মঞ্চে বিপ্লবের কথা বলবে। সেজন্য এলটিজি অন্য নাটকের পাশাপাশি বজায় রেখেছিল পথ-নাটিকার ঐতিহ্য।

মহেশতলার উপনির্বাচনে সুধীর ভাণ্ডারীর পক্ষে কাজ করার জন্য একটি স্কোয়াড তৈরি করে উৎপল দত্ত পানু পালকে সদিচ্ছা জ্ঞাপন করলে পানু পাল এই স্কোয়াডে কাজ করার জন্য একপায়ে খাড়া। এলটিজি থেকে উৎপল, প্রেমাশিষ, শেখর এবং শান্তনু ঘোষ যোগ দিলেন। কমরেড আবুল বাসের তাঁদের দুবাহু খোলা উদার আলিঙ্গনে বাঁধলেন। সারাদিন এলাকা ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে সন্ধ্যায় আবুল বাসেরের সাথে কোন দরিদ্র দর্জি শ্রমিক বা বিড়ি শ্রমিকের ভালবাসার জীর্ণ কুটিরে রাত্রিযাপন করতেন;যেখানে ঠিকমতো খাবারও জুটতো না কারণ ওই শ্রমিকরা নিজেরাই তিনবেলা খেতে পেতেন না। রাতে সেই জীর্ণ কুটিরে আলোচনা হতো পার্টি,

শ্রমিক আন্দোলন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে। মহেশতলার সংগ্রামী সাথী ও কমরেড বাসেরকে উৎপল শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করে লিখেছেন :

> রাজনীতি কত যে শিখেছি তাঁদের কাছে হ্যারিকেন জ্বালা রাত্রের অস্পষ্ট মায়ায় তা বোধ হয় তাঁরা নিজেরাও জানেন না।[২৮]

'মিনার্ভা থিয়েটার' পর্বঃ

মিনার্ভা থিয়েটার এলটিজি-র জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি উৎপল দত্তেরও। নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ১৯৫৯ সালের ৩রা জুলাই এলটিজি মিনার্ভা মঞ্চ লিজ নেয়, লেসি উৎপল দত্ত স্বয়ং। ব্যবস্থাটা ছিল বিপজ্জনক। লাভ দলের; লোকসান উৎপলের। শোভাসেন, তাপসসেন এবং এলটিজি-র সদস্যরা দলের সংকট মোকাবেলায় সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রুপকে সাহায্য করেছেন। নাটকের প্রয়োগ পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য স্থায়ী মঞ্চ অপরিহার্য, শোভা সেন জানিয়েছেন:

> এই সময় থেকেই আমাদের পরিচালক অনুভব করছিলেন, আমাদের নিজস্ব একটি থিয়েটার হল না হলে সত্যিকারের ভাল নাটক প্রযোজনা করা সম্ভব নয়। এমনিতেই যাযাবরের সৃষ্টি কোনদিনই যথার্থ উচ্চমানের হয় না। তাছাড়া উৎপলের চিন্তাভাবনা যে-স্তরে তখন এগিয়ে চলেছে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিজেদের মঞ্চ ছাড়া সম্ভব নয়। উৎপল তখনই নিজেকে একজন মার্কসবাদী নাট্যকার-পরিচালক হিসেবে তৈরি করতে শুরু করেছে। তার জন্য যে রাস্তায় যাওয়া উচিৎ যে ভাবে তার নাটক ও পরিচালনা রীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার পরীক্ষা হতে পারে কেবলমাত্র স্থায়ী মঞ্চেই। উৎপল জানতো স্থায়ী মঞ্চ পেলে সে দর্শককে আকর্ষণ করতে পারবেই। তার এই আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয় গ্রুপের সকলকে অনুপ্রাণিত করে।[২৯]

মিনার্ভা থিয়েটার উদ্বোধনী দিনে মঞ্চস্থ হয় *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*, তারপর *ওথেলো,ছায়ানট*। মিনার্ভায় *ছায়ানট ও ওথেলো* বেশিদিন চলেনি। তারপর *নিচের মহল*।ওটা ছিল এলটিজি-র *তুরুপের তাস*। নীচের মহল দর্শকদের ভালো লাগবেই এ ব্যাপারে আশাবাদী ছিল এলটিজি। আগে যেখানেই এলটিজি এই নাটক করেছে আশাতীত স্তুতি ও প্রশংসা পেয়েছে বলে আয়োজকদের মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না :

> কিন্তু তা হল না। আমাদের তখন ব্যবসায়িক বুদ্ধির বড়ই অভাব। ব্যবসায়িক থিয়েটারের দর্শক যে একেবারেই আলাদা এবং তাদের সংখ্যাই বেশি ছিল সে ধারণা আমাদের ছিল না। হাতিবাগানের বাজারে আলু,পটল বিক্রেতা সন্ধেবেলা বাজার গুটিয়ে থিয়েটার দেখতে আসে, তাদের ভাল লাগাতে হবে। চিন্তায় ভাবনায় আমরা অস্থির। নানা জল্পনা-কল্পনা আমাদের তখন রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।[৩০]

১৯৫৯ সালে বড়ধেমো কয়লাখনি দুর্ঘটনার পটভূমিতে মাত্র ১৫ দিনে উৎপল লেখেন বাংলা নাট্যসাহিত্যে আলোড়নসৃষ্টিকারী নাটক *অঙ্গার। অঙ্গার*-এর উদ্বোধন হয় ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৯ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে। এ-নাটকে উৎপল গফুর চরিত্রে অভিনয় করেন। মিনার্ভা থিয়েটার তথা এলটিজির ইতিহাসে সেটি একটি স্মরণীয় দিন। এই নাটকের উপর নির্ভর করছিল এলটিজির টিকে থাকার সম্ভাবনা। এ নাটক দর্শকের মন জয়

করলে এলটিজির মিনার্ভা থিয়েটার লীজ নেবার চ্যালেঞ্জ সফল হবে, না হলে এলটিজিকে মিনার্ভা ছেড়ে দিতে হবে।

উৎপল দত্তের দক্ষ পরিচালনায় *অঙ্গার* নাটকের সেট, আলো, সঙ্গীত সব মিলে অসাধারণ হয়েছিল। অভিনয় দেখে দর্শকরা ভীষণ মুগ্ধ হয়েছেন। শুধু শিল্পী ও কলাকুশলীর আত্মত্যাগ ও শপথবদ্ধ অঙ্গীকারই নয় এলটিজি-র সাথে সেদিন হাত মিলিয়েছিলেন রবিশঙ্কর, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অগণিত দর্শক এবং কমিউনিস্ট পার্টি। ঋণগ্রস্ত এলটিজি *অঙ্গার*-এর মাধ্যমে ঋণমুক্ত হয়েছে। *অঙ্গার*-এর শতরজনীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১০ই জুন ১৯৬০ (যদিও শততম রজনী ছিল ২৯শে মে)। তাতে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন বড়ধেমো কয়লা খনির সেই সাতজন মজদুর, যারা একুশদিন আটকে ছিলেন সুড়ঙ্গের মধ্যে,যাদের জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছিল *অঙ্গার*।

আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক *অঙ্গার*-এর পর *ফেরারী ফৌজ* আবারও সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। তিরিশের দশকের স্বাধীনতা আন্দোলনের আলেখ্য *ফেরারী ফৌজ*, উৎপল অভিনীত চরিত্র নীলমনি। ২৮শেমে মিনার্ভায় প্রথম মঞ্চস্থ করা হয় *ফেরারী ফৌজ*। ১৯৬২ সালে*ভি আই পি* ও *বাজি* মঞ্চস্থ করে এলটিজি, নাটক দুটো বেশি দিন না চলায় আবার *অঙ্গার* মঞ্চস্থ করেছে।

শেকস্পিয়ারের *A MidSummer Nights Dream*-এর ভাবানুবাদ (*চৈতালী রাতের স্বপ্ন*) প্রযোজনা করে এলটিজি। *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর নাট্যরূপ দেন উৎপল দত্ত। নির্মল চৌধুরী, শ্যামল ভট্টাচার্য্য তিতাসের গান করেন। সুর করেন বিজন ভট্টাচার্য। এ-নাটকে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর কর্মক্ষমতায় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। ১৯৬৩-এর ১০ই মার্চ *তিতাস একটি নদীর নাম*মঞ্চস্থ করে এলটিজি মিনার্ভায়, এটিও আবার সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়; তারপরমঞ্চস্থ করে*নবদুর্বাদলশ্যাম* নাটক ।

১৯৬৪ সালে শেকস্পিয়ার-এর (কাটার সেন্টিনারী) জন্মের ৪র্থ শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিটল থিয়েটার গ্রুপ এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞে মেতে ওঠে। মিনার্ভায় আয়োজিত উৎসবে *ওথেলো(ইংরেজি), চৈতালী রাতের স্বপ্ন,রোমিও জুলিয়েট, জুলিয়াস সিজার* প্রদর্শিত হয়। এছাড়া লিটল থিয়েটার 'জনতার শেকস্পিয়ার' নামে একটি অনুষ্ঠান করে।*প্রফেসর মামলক* মঞ্চস্থ হয় ১৮ তারিখ যুব উৎসব উপলক্ষে। *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর ফাঁকে ফাঁকে মামলকের অভিনয়ও করেছে এলটিজি, থিয়েটারের বাইরে।উৎপল দত্ত নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। এ-নাটকে সংগীতের ব্যবহারে কিছু সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে।

ভারতের নৌ বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে রচিত *কল্লোল* নাটকের প্রথম খসড়া লেখেন উৎপল দত্ত ১৯৫৬ সালে বিশুদ্ধ তথ্যমূলক দলিল হিসেবে।১৯৬৫সালে উৎপলের জন্মদিনে নতুন নাটক *কল্লোল*-এর প্রথম অভিনয় হয়।*কল্লোল*নাটকেউৎপল দত্ত একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বগাথা তুলে ধরেছেন অন্যদিকে কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতাও তুলে ধরেছেন। এই প্রযোজনা সম্পর্কে উৎপল দত্ত লিখেছেন–'স্বভাবতই ধনিক শ্রেণীর পত্রিকাগুলো শৃগালরবে সোচ্চার হল।... এ নাটকের অভিনয় বন্ধ করা উচিৎ,পুলিশ ঘোড়ার ঘাস কাটছে

কেন?... সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হল শোধনবাদী সিপিআই। লাল ঝাণ্ডাকে কেন নাটকে এত সম্মান দেখানো হয়েছে এমন প্রশ্ন তুলল - না, কংগ্রেসী মাস্তানরা নয়– সিপিআই-এর সব পত্রপত্রিকা,কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাই থেকে। নিজেদের অতীতকেও আর সহ্য করতে পারছিলেন না পূঁজিপতির এই লাল ঝাণ্ডাধারী কেরানিরা। তাঁরা সমস্বরে পুলিশকে উস্কানি দিতে লাগলেন গ্রেপ্তার ও নিষিদ্ধকরণে।...কিন্তু জনস্রোতে মিনার্ভা উদ্বেল হল।

অবশেষে '৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমি বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হই, এবং সব ধনিক পত্রিকায় [স্টেটসম্যান ছাড়া] লিটল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার 'সমাজতান্ত্রিক চাল' নাটিকা নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়,তার প্রকাশক হিসেবে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার সম্পাদক জোছন দস্তিদার গ্রেপ্তার হন।'৬৬-এর মার্চে বিপুল খাদ্যআন্দোলনের সংগ্রামে জনগণ সব রাজবন্দিকে ছিনিয়ে আনলেন কারাগার থেকে এবং ৭ মে মনুমেন্ট ময়দানে কল্লোল-বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়।'[৩১]

এই বিজয়োৎসব সম্পর্কে শোভা সেন লিখেছেন :

> ৭ মে কল্লোল-এর বিজয়োৎসব হয়। পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ মনুমেন্টের পাদদেশে। ময়দান সেদিন মানুষের কল্লোলে কল্লোলিত। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির সব নেতা সেদিন 'কল্লোল'-এর সেটে খাইবারের ডেকে বসে। সে এক অতুলনীয় দৃশ্য। ইতিহাসে এমন নজির নেই। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের চতুর্দিক থেকে মিছিলের জমায়েত। আমরা শিল্পী হিসেবে সেদিন গর্বিত বোধ করেছি ।[৩২]

উৎপল দত্তের কারামুক্তি ও *কল্লোল*-এর বিজয়োৎসব উপলক্ষে সারা পৃথিবী থেকে উৎপলের সমমনা নাট্যবোদ্ধা বন্ধু ও সহযোদ্ধা শিল্পীরা অভিনন্দন পাঠায়। এ-সময়ে গণতান্ত্রিক জর্মনি থেকে পাঁচজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শেষ মুহূর্তে ভারত সরকার উৎপল দত্তকে রাজনৈতিক কারণে যাবার অনুমতি দেয়নি বলে শোভা সেন জানিয়েছেন।

প্রায় একযুগ মিনার্ভা থিয়েটার চালিয়ে অনেক দেনার দায় নিয়ে এলটিজি মিনার্ভা ছেড়ে দেয়। ১৯৭১ সালের ২৮শে জুলাই মিনার্ভা থিয়েটার পুরোপুরি ছেড়ে চলে আসে এলটিজি এবং ছাড়ার আগে বাড়িওয়ালা কস্তুরচাঁদ জৈনকে জানিয়ে এসেছে তারা আর চালাতে পারছে না; বাধ্য হয়ে মিনার্ভা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। উৎপল-শোভা মিনার্ভা ছেড়ে এলেও মিনার্ভার ঝামেলা তাঁদের ছাড়েনি; মামলাসহ নানা ঝামেলা পোহাতে হয়েছে দীর্ঘদিন।

'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা' ('People's Artist Fedaration'):

১৯৬৫ সালের ৩০-৩১শে আগস্ট মিনার্ভা থিয়েটারে একটি আনুষ্ঠানিক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'('People's Artist Fedaration') গঠন করা হয়। এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন উৎপল দত্ত ও সম্পাদক ছিলেন জোছন দস্তিদার। গণনাট্য সংঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদেরই আরদ্ধকার্যের পরিপূরক

হিসাবে এই সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসের কথাএর দলিল ও ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' এবং 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'-এর মধ্যে সংগঠনগত প্রভেদ ছাড়াও মতাদর্শগত প্রভেদও ছিল।'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'-এর বক্তব্য ছিল:

> জনগণ যে শোষিত এইটাই আমাদের নাটকের একমাত্র বক্তব্য নয়। জনগণ যে এই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, সেইটাই হবে আমাদের নাটকের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, শ্রেণি সংঘর্ষকে বিশ্লেষণ করার সময় এই সংঘর্ষের অনিবার্য পরিণতি যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব,নাট্যকারের পক্ষে এই পরিপেক্ষিত অপরিহার্য।[৩৩]

এই সংস্থা এই প্রত্যয় ব্যক্ত করল;নাটক প্রথমত শ্রমিকের জন্য,দ্বিতীয়ত কৃষকের জন্য এবং তৃতীয়ত মধ্যবিত্তের জন্য। তাদের ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা হল:'প্রথমে শ্রমিক তারপরে কৃষক,তারপরে মধ্যবিত্ত। গুরুত্বের দিক থেকে এই ধারাক্রমই সঠিক। বিপরীতটা ভুল।'[৩৪]অন্যদিকে গণনাট্য সঙ্ঘের বক্তব্য:

> এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি,এই শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার [জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার] সংগ্রামের কর্মসূচী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীই একমাত্র সঠিক পথ।[৩৫]

উৎপল দত্তের গণশিল্পী সংস্থায় বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার এবং গণনাট্যের কিছু শাখাও সমবেত হয়। গণশিল্পী সংস্থায় কর্মশালার মত মিনার্ভার তিনতলায় ক্লাশ হতো। দূর-দুরান্ত থেকে প্রতিনিধিরা আসতেন। উৎপল দত্ত নিজেই নিয়মিত ক্লাশ নিতেন আরো অনেকের সাথে। প্রায় ৪০-৫০টি গ্রুপগণশিল্পী সংস্থায় ক্লাশ করতো। ঐ-সময়েঅনেকেই এই সংস্থায় দায়িত্ব পালন করেছেন। ষাটের দশকের চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, কমিউনিস্ট পার্টির বিভক্তি – এ-রকম দুঃসময়ে উৎপল দত্তের মতো রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি নতুন সংগঠনের চিন্তা করেন এবং এ-কাজে বহু আগ্রহী সহযোদ্ধা তাঁর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। তারপরও সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থাটিকে থাকতে পারেনি,ভেঙ্গে যায়। কিন্তু গণনাট্য সংঘ যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির কালচারাল উইং ছিল তাই ওই সংঘশেষপর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে।

ষাটের দশকে গণনাট্য আন্দোলন নানা সমস্যা, ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯৬২-তে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, কংগ্রেস সরকারের 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল' এবং আরও নানাবিধ সমস্যায় গণনাট্যসংঘের সর্বভারতীয়,রাজ্য এবং জেলা কমিটিগুলো প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৬-৬৭-র দিকে গণনাট্যের কর্মকাণ্ডে আবার গতি পেতে শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে গণনাট্য সংঘ ঘোষণাপত্র নিয়ে হাজির হয় ১৯৬৭-তে। গণনাট্যসংঘ পুনর্গঠিত হয় এবং সারারাজ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক গণসংগঠন হিসেবেগণনাট্যসংঘ তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। উৎপল যে-সময়ে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা গঠন করেন তখন তিনি অতি-বাম রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি অকপটে তা স্বীকারও করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এলটিজির কার্যক্রম অব্যাহতঃ

উৎপল দত্ত 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা' গঠন করলেও এলটিজির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিলেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত রোমাঁ রোলাঁ-এর ১৪ই *জুলাই*নাটক মঞ্চস্থ করে ১৯৬৬ সালের ৩০শে আগস্ট রোমাঁ রোলাঁ সমিতি ও এলটিজি। ৩১শে আগস্ট ১৯৬৬ সালে মিনার্ভায় নতুন নাটক *অজেয় ভিয়েতনাম* মঞ্চস্থ করে এলটিজি; উৎপল অভিনীত চরিত্র জেনারেল ফিৎস। *তীর* নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। প্রসাদুজোতে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গুলি চালিয়ে দু'জন ওরাঁও রমণীকে হত্যা করে; সে ঘটনা অবলম্বন করেই উৎপল দত্ত এ নাটক লিখেছেন। *তীর* নাটকের মাল মসলা সংগ্রহার্থে তাপস সেন, নির্মল গুহ রায় ও উৎপল দত্ত যান শিলিগুড়ি, নক্সালবাড়ী, প্রসাদুজোত,আলীপুর দুয়ার। চারু মজুমদার, সৌরিন বসু ও তীলক রায়ের কাছ থেকে দীর্ঘ সাাক্ষাৎকার নেন। কৃষক কমরেডদের গান রেকর্ড করেন। গুলিচালনার দিনের অভিজ্ঞতা শুনেন অনেকের কাছ থেকে। *তীর* সম্পর্কে উৎপলের মন্তব্য :

> মনে করেছিলাম প্রসাদুজোতে পুলিশের নৃশংস গুলি-চালনার বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে যেই সরকার থাকুক না কেন। আরও ভেবেছিলাম কৃষক যোদ্ধার বীরত্ব অমরগাথা হয়ে থাকবে, পথটা যদি ভুলও হয় তবুও থাকবে।[৩৬]

নাটকলেখা শেষ হলে মহড়া শুরু হয়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস নাটকে সুরারোপ করেন।

মানুষের অধিকারে লিটল থিয়েটার গ্রুপের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার একটি। ১৯৩১ সালের কুখ্যাত স্কটস্‌বরো মামলা অবলম্বনে মার্কিন মুলুকে কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নের এই নাটকটি উৎপল লিখেছেন ১৯৬২ সালে। আফ্রো-মার্কিন সঙ্গীতে, এলাবামার তুলার ক্ষেতের পারে, পেন্টরক রেল স্টেশনে ও ডেকাটুর শহরের আদালতের দৃশ্যসজ্জায়, পোশাকে, হাবভাবে, মেকআপে, সমবেত অভিনয়ে নাটকটা যথাযথ ও শক্তিমান হয়ে ওঠেছিল। জজের ভুমিকায় সমরেশ ও সরকারি এটর্নি টম নাইটের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ অভিনয় করেন। আর উৎপলের সবচেয়ে প্রিয় পার্ট ছিললীবোভিট্‌স। *মানুষের অধিকারে* মঞ্চস্থ হয় ১৪ই জুলাই ১৯৬৮ সালে।এ বছরেই *রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া* মঞ্চস্থ করে শিল্পীমন। বোরিসভিয়াঁর নাটক *লাগুতে দে জেনোরোঁ* ও বের্টোল্ট ব্রেখট-এর *শোয়েইক ইন জুভাইটেন ভেল্টক্রীগ* অবলম্বনে উৎপল রচনা করেন *যুদ্ধং দেহি*। মিনার্ভায় এলটিজি নাটকটি মঞ্চস্থ করে ২৪শে নভেম্বর ১৯৬৮ সালে।মিনার্ভা তথা এলটিজি এ সময়ে নানা সমস্যায় জর্জরিত। শোভাসেন জানিয়েছেন:

> ১৯৬৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে মিনার্ভা থিয়েটারে কোনোক্রমে প্রাণধারণের পাশাপাশি আমরা অনেক কিছুতে যোগ দিয়েছি – মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগের নানা বাহন অবলম্বন করেছি। আগস্ট মাস নাগাদ মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায়, মিনার্ভায় এলটিজি আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। ধার-দেনা, বদনাম, শত্রুপক্ষের উসকানি ইত্যাদিতে ঋণ বেড়েই যাচেছ। নাটক চালানো দায়। দিনের পর দিন ভাড়া না দিয়ে থিয়েটার চালানো যাবে ক'দিন! যেহেতু উৎপল লেসি,ঋণের বোঝা পুরো তারই ঘাড়ে। অথচ টাকাপয়সার লেনদেন অন্যদের হাতে। ঋণ যখন দেড় লাখ টাকা ছুঁই ছুঁই তখন সত্যিই প্রমাদ গুনলাম।[৩৭]

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত আন্তন চেখভ-এর নাটক *দ্য বেট (বাজি)* এলটিজি মঞ্চস্থ করে ১৯৬৯ সালে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রায় দেড়মাস এলটিজি আসাম সফর করে। তারপর ছয় মাস মিনার্ভায় শো বন্ধ। প্রায় ৮মাস পর ১৯৬৯ সালের ১৬ই নভেম্বর মিনার্ভায় *লেনিনের ডাক*মঞ্চস্থ হয়; উৎপল আফানসি চরিত্রে অভিনয় করেন ।

যাত্রায় উৎপল :

মিনার্ভায় গভীর সংকটের মুখোমুখী দাঁড়িয়েই উৎপল দত্ত-শোভা সেন এবং আরও কজন মিলে বিবেক যাত্রা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যাত্রায় উৎপলের আগমন আকস্মিক ও আচমকা নয়। যাত্রা জগতে উৎপল হঠাৎ এসে পড়েছেন এমন ধারণাও একেবারেই ভ্রান্ত। যাত্রার প্রতি উৎপলের দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। তাঁর নিজের কথায় :

> আমি যাত্রা দেখছি-টেখছি এবং স্টাডি করছি সেই একান্ন সাল থেকে। এতে যে একেবারে আচমকা গিয়ে পড়লাম তাও না। রেগুলার যাত্রা দেখতাম এবং পড়াশোনাও করেছি, বোঝবার চেষ্টা করেছি।[৩৮]

বিবেক যাত্রাসমাজ গঠন করে পঞ্চু সেনের আগ্রহ ও তাগিদে উৎপল দত্ত প্রথম যাত্রাপালা রচনা করেন *রাইফেল*। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ১৯৩০-এর দশকের ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াই – *রাইফেল* পালার পটভূমি। যাত্রাকে তিনি ভালবেসেছেন প্রাণের গভীর থেকে। সংস্কৃতির এ-শাখার প্রতি উৎপলের ছিল গভীর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা। গিরিশ ঘোষের মতো উৎপল দত্ত-ও ভেবেছেন যাত্রাপালার মাধ্যমে জনগণের খুব কাছে পৌঁছানো যাবে এবং পৌঁছা যাবে একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে। উৎপলের যাত্রাপালা রচনা ও নির্দেশনার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল–প্রথমত, তার রাজনৈতিক মতবাদ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেয়ার অভিপ্রায়, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে একইসাথে সচেতন ও আনন্দ দান; দ্বিতীয়ত, যাত্রা সম্পর্কে গিরিশের মৌলিক চিন্তার অনুপ্রাণনা।

রাইফেল-এর মাধ্যমে উৎপলের যাত্রা জগতে প্রবেশ। এক এক করে লিখেছেন আরও বিশটি যাত্রাপালা। *রাইফেল* প্রযোজনা করে 'নিউ আর্য অপেরা'। পঞ্চু সেনের অসাধারণ অভিনয় ও উৎপলের প্রয়োগ-পদ্ধতি সব মিলে *রাইফেল* যাত্রা জগতে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। শোভা সেনের কথায় :

> রাইফেল সেদিন যাত্রা জগতের চেহারা পালটে দিয়েছিল, হয়ে ওঠেছিল বছরের হিট পালা। কিন্তু সবচেয়ে দাগা দিল মালিক। এতবড় মিথ্যাবাদী লোক আর চোখে পড়েনি। এমনকী স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত মেরে দেবার চেষ্টা করেছিল। বহু চেষ্টায় সেটা আদায় করতে পেরেছিলাম। এতবড় শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর ঠিক করলাম, আর যাত্রা নয়, সমস্ত যাত্রা জগতের উপর বিতৃষ্ণা ধরে গেল।[৩৯]

'নিউ আর্য অপেরা'র মালিক *রাইফেল* যাত্রাপালার টাকা পরিশোধে প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এই অপেরার মালিকের শঠতা,প্রতারণা মিথ্যাচারের কারণে উৎপল দত্ত-শোভা সেনদের মনে যে বিতৃষ্ণা এসেছিল তা ভেঙে দেন শৈলেন মোহান্তি। সত্যাম্বর অপেরার মালিক শৈলেন মোহান্তির অনুরোধে ব্রিটিশের শঠতা আর

নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে উৎপল দত্ত রচনা করেন আরেক বিখ্যাত যাত্রাপালা *জালিয়ানওয়ালাবাগ*। এ-ছাড়াও এ-বছরে *শোন রে মালিক* পালা লেখেন। এ-প্রসঙ্গে শোভা সেন লিখেছেন :

> সত্যাম্বর অপেরার মালিক শৈলেন মোহান্তি একদিন উৎপলের কাছে এলেন,যাত্রায় আমাদের প্রথম যাত্রাতেই এক জোচ্চোর লোকের পাল্লায় পড়ে যাত্রায় আর পালা দেব না বলে স্থির করেছিলাম। কিন্তু শৈলেন বাবু অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ লোক। তিনি বললেন 'উৎপল বাবু, যাত্রাজগৎ সমন্ধে এই ভ্রান্তধারণা নিয়ে আপনাকে বিদায় নিতে দেব না। আপনাকে এ-বছরও নাটক দিতেই হবে। ওঁর পীড়াপিড়িতে আমরা রাজি হয়ে গেলাম। উনি এক কথার মানুষ। কোনদিন কোন কথারখেলাপ করেন নি। আমরাই আলোচনা করে ঠিক করলাম, 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' পালা লিখবে উৎপল। ... এ-নাটকের প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। প্রথম দিনেই এ-পালা দর্শকদের আশীর্বাদধন্য হল।[৪০]

যাত্রা অভিনেতাদের অভিনয় ক্ষমতা,বাচন ভঙ্গি, তাদের নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখে উৎপল দত্ত,শোভা সেন বিস্মিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শোভা সেন জানান :

> এই প্রথম একজন যথার্থ পরিচালকের হাতে পরিচালকের ভুমিকা এল। যাত্রার অভিনেতারাও তাই যথার্থ শিক্ষার্থীর মতোই উৎপলকে গুরু পেয়ে কৃতার্থ বোধ করলেন।[৪১]

১৯৬৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর টালিগঞ্জ অগ্রগামী ক্লাবের উদ্যোগে তাদের খেলার মাঠে *শোনরে মালিক*-এর প্রথম অভিনয় হয়। পরের দিন,১৯৭০ সালের জানুয়ারির ১ তারিখে, *রাইফেল* মঞ্চস্থ হয়। সে-বছরই বিবেক যাত্রাসমাজ বন্ধ হয়ে যায় কয়েকটি শো করার পর। ব্যবসাবুদ্ধির অভাবের জন্যই মূলত এই সংগঠনের কার্যক্রম বাধ্য হয়েই বন্ধ করতে হয়েছিল। এ-সময়ের অভিজ্ঞতার বয়ান দিয়েছেন শোভা সেন:

> বজবজ, জাঙ্গিপাড়া, চিত্তরঞ্জনে অবশ্য ব্যবহার ভালোই পেয়েছিলাম, টাকাও ঠিকমত দিয়েছিল। কিন্তু এগড়ায় মস্ত মার খেলাম। এতে অভিজ্ঞতা হল, এই যাত্রা চালাবার ব্যবসাবুদ্ধি আমাদের নেই। উদ্যোক্তারা কে কেমন আমরা জানি না। আমাদের ভদ্রতার সুযোগ ওরা পুরো মাত্রায় নিচ্ছিল। দলে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল। কারণ উদ্যোক্তারা কখনোই পুরো টাকা আগে দেয় না, দিতে পারে না। শো-এর আগে প্রতিশ্রুতি দেয়, শো-এর জায়গায় টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু একবার ওদের হাতে গিয়ে পড়লে স্বমূর্তি ধারণ করে।[৪২]

১৯৭০-এ উৎপল দত্ত ৪টি যাত্রাপালা লিখলেন, *নীল রক্ত*, *দিল্লী চলো*, *ভুলি নাই প্রিয়া*, *সমুদ্র শাসন*। *নীল রক্ত* ভারতী অপেরা, *দিল্লী চলো* ও *সমুদ্র শাসন* লোকনাট্য এবং *ভুলি নাই প্রিয়া* শ্রীমা অপেরা কিনে নেয়। উৎপল দত্ত প্রথম পালা *রাইফেল* লিখেছেন ১৯৬৮-তে আর শেষ (একুশতম) পালা *দামামা ঐ বাজে* লিখেছেন ১৯৮৮-সালে।

'পিপলস লিটল থিয়েটার'(পিএলটি):

উৎপল দত্ত এবারে নতুন নাট্যদল গড়লেন;'পিপলস লিটল থিয়েটার', সংক্ষেপে পিএলটি। এলটিজি'র গর্ভে জন্ম নেয় পিএলটি - আদর্শের ধারা অবিচ্ছিন্ন রেখেই। পিএলটি১৯৭০ সালের ১৯শে অক্টোবর নথিবদ্ধ হয়ে ঐ বছর থেকেই পুরোদমেই কাজ চালিয়ে গেছে। পিএলটির সাথে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেনউৎপল দত্ত, শোভা সেনসহ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,অসিত, অরূপ বক্সি, অনিল মণ্ডল, শ্যামল ভট্টাচার্য, সমর নাগ, চিত্ত পাল, মুকুল ঘোষ, সমীর মজুমদার, শান্তিগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রতীক রায়, কনক মৈত্র, বিশ্বনাথ সামন্ত, ভানু মল্লিক, আশু সাহা, মন্টু ব্রহ্ম প্রমুখ (সূত্র : লিটল থিয়েটার ও আমি,পৃষ্ঠা- ৪৩)।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিতে রচিত *ঠিকানা* নাটক পিএলটি মঞ্চস্থ করে ১৯৭১ সালের২রা আগস্ট একাডেমী অব ফাইন আর্টস মঞ্চে। শতবর্ষের বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্য, ত্যাগ-তিতীক্ষার ইতিবৃত্ত *টিনের তলোয়ার। টিনের তলোয়ার* উৎপল দত্ত রচিত, পরিচালিত, অভিনীত শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি। পিএলটি ১২ই আগস্ট রবীন্দ্রসদনে নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এ নাটকের বেনীমাধব চরিত্র উৎপলের অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।*সমুদ্রশাসন* পালার মঞ্চভাষ্য *সূর্যশিকার* নাটক পিএলটি মঞ্চস্থ করে ১৯৭১ সালের ১৩ই আগস্ট; সেদিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে একাডেমীতে সারারাত ধরে অভিনীত হয়েছে*সূর্যশিকার, ঠিকানা, টিনের তলোয়ার*। ১৯৭২ সালেবুড় *সালিকের ঘাড়ে রোঁ এবং একেই কি বলে সভ্যতা* নাটকের রিভাইভাল হয়েছে মর্মে শোভা সেন জানিয়েছেন। *ব্যারিকেড* নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন উৎপল দত্ত এ বছরেই ; এর প্রথম প্রদর্শনী হয়েছে কলামন্দিরে ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে।

১৯৭৩ সালের ৯ থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারিদিল্লিতে পিএলটির নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে আইফ্যাক্স্ থিয়েটারে *টিনের তলোয়ার, টোটা ও ব্যারিকেড* মঞ্চস্থ হয়। এই উৎসব দারুণ সফল হয়েছিল এবং বেঙ্গলি ক্লাব পিএলটিকে প্রচণ্ড সাহায্য করেছিল বলে শোভা সেন জানিয়েছেন। দিল্লিতে নাটক করতে গিয়ে দলের অনেক লোকের যাতায়াত; থাকা-খাওয়া ইত্যাদির জন্য একটু সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। এমন সময় কেন্দ্রের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি কান্তবাবুর প্রস্তাবে রাজি হয়ে স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে লাল কেল্লায় পিএলটি *টোটা* নাটক প্রযোজনা করে। এ-উৎসবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। লালকেল্লায় *টোটা*ছিলপিএলটি'র একটি অবিস্মরণীয় প্রযোজনা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অর্থাৎ রাজনৈতিক শ্রেণিশত্রুর সামনে *টোটার* প্রদর্শন নিয়ে বামপন্থী মহলে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়।

১৯৭৪-এর ১৬ মে কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে বেলা দুটোয় *দুঃস্বপ্নের নগরী'র* উদ্বোধন হয়। এ-সম্পর্কে শোভা সেন লিখেছেন–'সমস্ত শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। ... নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীরা পাড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। চারদিকে খুনোখুনি, চোরাগোপ্তা, ধর-পাকড়, পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানি চলছে ... এরই মধ্যে এল 'দুঃ স্বপ্নের নগরী' একটা বম-শেল এর মতো।'[৪৩] ২৬শে আগস্ট স্টার থিয়েটারে *দুঃস্বপ্নের নগরী* প্রদর্শনে গুণ্ডাদের বর্বর আক্রমনে শো বাতিল করতে হয়, বলা যায় শো পণ্ড হয়ে যায়। *'দুঃস্বপ্নের নগরী'*র অভিনয় করতে চারদিক থেকে ডাক আসতে লাগল। কংগ্রেসি হামলার বিপদের

মুখে নানা পাড়ায় লুকিয়ে, নাম বদলে শো হতে লাগল। ... টিকিটও বিক্রি হত লুকিয়ে। উদ্যোক্তারা সমস্ত পাড়া ঘিরে রাখতেন তাদের ভলান্টিয়ার দিয়ে।'[৪৪]

১৯৭৫ সালে অ্যামেরিকার গ্রুপ থিয়েটারের প্রখ্যাত পরিচালক হ্যারল্ড্ ক্লারমান কলকাতায় আসেন। কল্লোল-এ (উৎপল-শোভার বাড়ি)উৎপল দত্ত তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এ-সাক্ষাৎকার সর্ম্পকে শোভা সেন জানিয়েছেন:

> ২ ফেব্রুয়ারী আমাদের বাড়িতেই উৎপল এক ভি.টি.আর সাক্ষাৎকারে ক্লারমানের সঙ্গে থিয়েটার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করল। উৎপল আলোচনা শুরু করেছিল ক্লারমানকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানিয়ে, বলেছিল 'ডক্টর ক্লারমান' আপনার মুখোমুখি হয়ে আমার মুখে কথা জোগাচ্ছে না। কারণ আমরা যখন থিয়েটারে কাজ শুরু করি তখন আপনি ছিলেন আমাদের আদর্শ স্বরূপ। গ্রুপ থিয়েটারে আপনার নাট্যকর্ম এক সময় বলতে গেলে এদেশে সারা নাট্য আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিল।' স্তানিস্লাভ্স্কি-মতবাদী' বলে কথিত ক্লারমান উৎপলের সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমার মনে হয় না আমি স্তানিস্লাভ্স্কি -মতবাদী, এমনকি আমি এটা ও ভাবি না যে স্তানিস্লাভ্স্কি নিজেও স্তানিস্লাভ্স্কি -মতবাদী ছিলেন; কারণ তিনি তাঁর নাট্যভাবনাকে অবিরত বিকশিত করে গেছেন, অবিরত বদলে দিচ্ছিলেন, অবিরত নতুন করে নিচ্ছিলেন। আমরা স্তানিস্লাভ্স্কির কাছ থেকে যা পেয়েছি তা হল একটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, অভিনয় সংক্রান্ত কিছু চিরন্তন সমস্যার একটা মৌলিক বোধ। পরিচালনা সংক্রান্ত ততটা নয়, যতটা বিশেষ করে অভিনয় সংক্রান্ত।... আমি যদিও ওঁর লেখা পড়ে , ওঁর সঙ্গে কথা বলে, ওঁর প্রযোজনা দেখে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছি তবু যেভাবে সে প্রভাব আমাদের কর্মপদ্ধতিতে প্রকাশ পায়, তা আমাদেরই ব্যক্তিত্বমণ্ডিত,আমাদেরই ধ্যানধারণা...একজন যা শিখেছে তা আত্মস্থ করে নিজের ব্যবহারযোগ্য করে নিয়ে নিজের কাজে লাগানো উচিৎ। ... আমার মনে হয় স্তানিস্লাভ্স্কি হচ্ছেন ভিত্তিস্বরূপ, অপরিহার্য।[৪৫]

ক্লারম্যান অন্ধভাবে স্তানিস্লাভ্স্কিকে অনুসরণ বা প্রয়োগ করেননি। ক্লারম্যান তাঁর সাক্ষাৎকারে স্তানিস্লাভ্স্কির কাজকর্ম, মেথডসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন।

উৎপল দত্ত অনূদিত*ম্যাকবেথ* পুনঃপ্রযোজনা করে পিএলটি ২৭শে সেপ্টেম্বর,১৯৭৫ সালে। উৎপল ম্যাকবেথ চরিত্র রূপদান করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬-এ পিএলটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করে*লেনিন কোথায়*, উৎপলের অভিনীত চরিত্রস্তালিন। উৎপল দত্ত এরপর লিখলেন পলিটিক্যাল স্যাটায়ার *এবার রাজার পালা*। নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে ৬ই জানুয়ারি ১৯৭৭-এ। উৎপল অভিনীত চরিত্র কিশোরীলাল চামারিয়া। উৎপল রচিত-নির্দেশিত *তিতুমীর* নাটক মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্র সদনে ; নাট্যকার এই নাটকে ক্রুফোর্ড পাইরন চরিত্র রূপদান করেন। ১৯৭৮ সালের ১১ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর বোম্বেতে পিএলটির নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়;পাঁচটি নাটক মঞ্চস্থ করে পিএলটি বিভিন্ন মঞ্চে–*দুঃস্বপ্নের নগরী*, *টিনের তলোয়ার*, *ব্যারিকেড*, *তিতুমীর* এবং *এবার রাজার পালা*।

১৯৭৯ সালের শুরুতেই আলিপুর দুয়ারে*ব্যারিকেড* নাটকের শো করে পিএলটি । মে মাসে লুলেগাঁও বসে উৎপল রচনা করেন *দাঁড়াও পথিকবর* । *দাঁড়াও পথিকবর*-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শোভা সেন লিখেছেন :

> উৎপল আসলে 'দাঁড়াও পথিকবর' নাটক লেখা শুরু করেছে। নাটক লেখার সময় উৎপলের খুবই টেনশন আর দুশ্চিন্তায় কাটে। তখন ও অন্যকোন দিকে মন দিতে পারে না। অদ্ভুত চাঞ্চল্য ও অস্থিরতায় ও ভালো করে খেতে পারে না। কারো সাথে কথা বলতে ওর ভালো লাগে না। তখন ওর সমস্ত দেহ-মন নাটকের চিন্তায় মগ্ন থাকে।...উৎপল সারা দিন নাটক লিখে চলে,সন্ধেবেলায় হারিকেনের আলোয় আমাদের নাটক পড়ে শোনায়। শুনতে শুনতে বুঝতে পারি, দারুণ নাটক হচ্ছে। উৎপল প্রথম জীবনে মধু বসুর ছবিতে মাইকেল মধুসূদনের চরিত্রে অভিনয় করে প্রখ্যাত হয়েছিল। এবার এতদিন পর সেই চরিত্র নাটকে অভিনয় করবে। একটা নতুন দিগন্ত এসেছে মাইকেলের এই জীবনী নাটকে।...২১ মে নাটক লেখা শেষহল ।[৪৬]

পিএলটি *স্তালিন* ১৯৩৪নাটকটি মঞ্চস্থ করে ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৯ সালে। দারিও ফো-এর নাটক*অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অফ অ্যান আনার্কিস্ট* অবলম্বনে উৎপল রচনা করেন *বাংলা ছাড়ো*। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে ৪ অক্টোবর ১৯৮০ সালে। *দাঁড়াও পথিকবর* মঞ্চস্থ হয় ৪ঠা ডিসেম্বর। মাইকেল মধুসূদন চরিত্রে উৎপল অভিনয় করেন। ব্রেখট-এর *ডী টাগে ডের কম্যুনে* অবলম্বনে উৎপল দত্ত রচনা করেন *কমিউনের দিনগুলো*;এর নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করে পিএলটি ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে। পিএলটি এরপর প্রযোজনা করে শক্তি বিশ্বাস অনূদিত (ডেভিড সেলবোর্নের *দ্য ট্রয়াল অফ মিসেস ইন্দিরা গান্ধী)শ্রীমতির বিচার* ১৯৮২ সালের ২৭শে মার্চ। উৎপল দত্ত ৬ই নভেম্বর ১৯৮২ সালে গিরিশ ঘোষের নাটক *পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস* প্রযোজনা করেন, অভিনয় করেন কীচক চরিত্রে। উৎপল দত্ত ও শক্তি বিশ্বাস-এর সহযোগিতায় ভ.ই লানকিন অনূদিত চিচ্কভ-এর অ্যান *আনফিনিশড্ ডায়লগ* পিএলটি মঞ্চস্থ করে ২৮শে মে ১৯৮৩ সালে। নতুন নাটক *মালোপাড়ার মা*(দলিল নাট্য)একাডেমী মঞ্চে অভিনয় করে পিএলটি ১৩ই অক্টোবর ১৯৮৩ সালে। কার্লমার্কসজন্মশতবার্ষিকী উৎসবে (১৬ই নভেম্বর) *শৃঙ্খল ছাড়া* নাটকের উদ্বোধন করে পিএলটি। ১৭ই নভেম্বর ময়দানে খোলা মাঠে মার্কস-এর জীবনী নিয়ে লেখা *শৃঙ্খল ছাড়া* নাটকটি কুড়ি হাজার দর্শক শত অসুবিধা সত্ত্বেও নিঃশব্দে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন। কমিউনিস্ট ইশতেহারের সারমর্ম দৃশ্যত দেখা যায় এ নাটকে। উৎপল মার্কস চরিত্রে অভিনয় করেন। ২১শে এপ্রিল ১৯৮৫ সালে*আজকের শাজাহান* নাটকে উৎপল কুঞ্জবিহারী চরিত্রে অভিনয় করেন।*মহাবিদ্রোহ* (পূর্বনাম *টোটা*) ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ সালেমঞ্চস্থ হয়; উৎপল বাহাদুর শা জাফর চরিত্র রূপদান করেন। ঐ বৎসরই নির্বাচনী প্রচারে উৎপলের দল মুমূর্ষু *নগরী* ও মুমূর্ষু *বাংলা* নামে দুটো পথনাটিকা মঞ্চস্থ করে।

জেফ্রি কেন্ডালের আত্মজীবনী *শেকসপীয়রওয়ালা*সীগাল বুকস্ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে ১ মে।উৎপল দত্ত এ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। সীগাল-এর উদ্যোগে কলকাতার কলামন্দিরে জেফ্রি কেন্ডাল ও লরা কেন্ডাল অভিনয় করেন *ডিয়ার লায়ার*। এ-উপলক্ষে উৎপল-কেন্ডাল গুরু-শিষ্যের আবার মিলন হয়।

১৯৮৭ সালের প্রথম দিনই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিউট-এ*কল্লোল* অভিনয় করে পিএলটি; উৎপলের অভিনীত চরিত্র র‍্যাটট্রে। *কাঁচের ঘর* পথনাটক করে উৎপলের দল মার্চ মাসে। ব্রেখট্-এর *মাদার কারেজ* পরিচালনার জন্য বেনেভিটস্ উৎপলেরঅনুরোধে কলকাতায় আসেন ১৪ই নভেম্বর, ওঠেনকল্লোল-এ। ১৬ই নভেম্বর থেকেই বার্টল্ট ব্রেখট-এর *মাদার কারেজ* অবলম্বনে *হিম্মতবাঈ*-এর মহড়া শুরু হয়ে যায়। ৩০ ও ৩১শে মার্চ (১৯৮৮)

গোর্কী সদনে ব্রেখ্‌ট সোসাইটি ব্রেখ্‌ট-এর জন্মদিন পালন করে। ৩১শে মার্চ হিম্মতবাই-এর পাঁচটি দৃশ্য অভিনীত হয়।

রাজা রামমোহন ও সতীদাহ নিয়ে উৎপল দত্ত নাটক লিখলেন *অগ্নিশয্যা*। পিএলটি রবীন্দ্রসদনে নাটকটি প্রযোজনা করে নভেম্বরের ২৭শে তারিখ; উৎপল বেন্টিক চরিত্রে অভিনয় করেন। সরোজ দত্ত অনূদিত কনস্টানটিন সিমনভ-এর *দ্য রাশিয়ান কোয়েশ্চেন* অবলম্বনে উৎপল নতুন নাটক *দৈনিক বাজার পত্রিকা* রচনা ও পরিচালনা করেন; তাঁর অভিনীত চরিত্র গোপীবল্লভ। নাটকটি অভিনীত হয়েছে ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সালে। ফরাসি বিপ্লব নিয়ে উৎপল লিখেননীল *সাদা লাল*। ১৩ই এপ্রিল পিএলটি নাটকটি মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্র সদনে। ১৫, ১৬, ১৭ই এপ্রিল রবীন্দ্রসদনে তিনটি নাটকের একটি উৎসব হয় : *টিনের তলোয়ার, আজকের শাজাহান* এবং *নিচের মহল*। শেকস্‌পিয়ার-এর *এমিড সামার নাইটস্‌ ড্রীম* নাটকের অনুবাদ *চৈতালী রাতের স্বপ্ন*-এর মহড়া শুরু হয় ১৯শে সেপ্টেম্বর।

১ জানুয়ারি ১৯৮৯ সালে রবীন্দ্রসদনে *অগ্নিশয্যা* নাটক মঞ্চস্থ হয় ; ১৪ই জানুয়ারি একাডেমীতে। ১৫ই জানুয়ারিশেকসপিয়ারের *অ্যা মিড সামার নাইট ড্রিমস্‌*নাটকের রূপান্তর*চৈতালী রাতের স্বপ্ন*-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় রবীন্দ্রসদনে; বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে সকলকেই ভীষণ মুগ্ধ করে এ-প্রযোজনা। ২০শে ফেব্রুয়ারি কাঁচপাড়ায় *কল্লোল*-এর শো করে পিএলটি। ১৩ই এপ্রিল রবীন্দ্রসদনে *নীল সাদা লাল*-এর প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উৎপল দাঁতো চরিত্র রূপায়ণ করেন। ফরাসি রাষ্ট্রদূত ও তাঁর স্ত্রী নাটক দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। দেশবিভাগএবং গান্ধী হত্যা রহস্য নিয়ে উৎপল *একলা চলো রে* নাটক রচনা করেন। রবীন্দ্রসদনে নাটকটির উদ্বোধন হয় ২৫শে ডিসেম্বর। নাটকটি পরিচালনা করেন মৃণাল ঘোষ ও উৎপল আত্মজা বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত। উৎপল অনাথবন্ধু চরিত্রে অভিনয় করেন।রাজ্য নাট্যএকাডেমী উৎপল পরিচালিত ও অভিনীত *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* নাটকের ভিডিও ক্যাসেট করবার সিদ্ধান্ত নেয়। গৌতম ঘোষ ১১ ও ১২ই অক্টোবর এর ভিডিও গ্রহণ করেন।

২৫শে নভেম্বর ১৯৯০ সালে রবীন্দ্রসদনে *লালদুর্গ* নাটকের উদ্বোধন হয়;পাশ্চাত্য সংগীতে উৎপলের জ্ঞান ও দখল পণ্ডিতসম।বিটোফেনসহ আধুনিক দেশি-বিদেশি সুরকারদের সংগীতব্যবহার করেঅনন্য আবহ-পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রযোজনাটিকে সমৃদ্ধ করেনউৎপল। বছরটা শেষ হয় ৩১শে ডিসেম্বর *লালদুর্গ*-এর শো দিয়ে। কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উৎসবে ২৭শে জানুয়ারি স্টেডিয়াম মঞ্চে *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ ও একেই কি বলে সভ্যতা*-য় উৎপল অভিনয় করেন; ভক্তপ্রসাদ চরিত্র রূপায়ণ উৎপল দত্তের অসাধারণ অভিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

মৌলবাদ,সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ *জনতার আফিম* নাটকের উদ্বোধন হয় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে। উৎপল অনূদিত শেকসপিয়ারের *(মেরী ওয়াইভস অফ উইন্ডসর) ফুলবাবু* নাটকের প্রথম অভিনয় করে পিএলটি ১০ই জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে রবীন্দ্রসদনে।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশ ভ্রমণ :

উৎপল দত্তের নাট্যদর্শন, নাট্যবোধকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর বিদেশ ভ্রমণ। বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে অসংখ্য নাটক,চলচ্চিত্র,নাট্যশালা,নাটকের মহড়া ও নানা প্রদর্শনী দেখে এবং স্বনামধন্য নাট্যকার,পরিচালক ও অভিনেতৃবৃন্দেরসঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা উৎপল দত্ত প্রয়োগ করেছেন তাঁর পরবর্তী নাটক রচনা ও পরিচালনায়।

কারাবাসও মুচলেকা প্রসঙ্গ :

উৎপল গণমানুষের নাটক করতে গিয়ে দু'বার কারারুদ্ধ হয়েছেন। প্রথমবার ১৯৬৫-তে নৌবিদ্রোহভিত্তিক নাটক *কল্লোল*-এর জন্যে; দ্বিতীয়বার *তীর*-এর জন্যে। প্রথমবার কারাবরণের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে উৎপল লিখেছেন :

> কল্লোল নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবিক ও মজদুরদের বীরত্বগাথাই শুধু বলেনি, বলেছিল কংগ্রেসি বেঈমানদের দেশদ্রোহিতার কথা। অহিংস সত্যাগ্রহ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালালি, অস্ত্র ছাড়া যে জয় নেই, এ-কথাও বলার প্রয়াস হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অতীত যে গৌরবময, দেশপ্রেমিক সংগ্রামে সে যে ছিল প্রথম সারিতে, একথা সজোরে বারবার বলার দরকার আছে।শাসক শ্রেণির কুৎসা চিরদিন পার্টির তথাকথিত দেশদ্রোহিতার বিশ্লেষণেই মূঢ়ভাবে সীমাবদ্ধ। নানা নাটক মারফৎ ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে ধরে কমিউনিস্ট পার্টির ত্যাগ ও আপসহীন লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতেহবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের অবিছিন্ন ও নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার ধারাটাকেও সবলে ছুঁড়ে মারতে হবে কুৎসাকারীদের মুখে। স্বভাবতই ধনিকশ্রেণীর পত্রিকাগুলো শৃগালরবে সোচ্চার হল। তবে নেহাৎই গণ্ডমূর্খ বলে সমালোচকেরা যুৎসই কোনও জবাব পেলেন না, মূর্খতাই প্রকাশ করতে লাগলেন। তবে মূল সুরটি স্পষ্ট– এ-নাটকের অভিনয় বন্ধ করা উচিৎ, পুলিশ ঘোড়ার ঘাস কাটছে কেন? ... সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হল শোধনবাদী সিপিআই। লালঝাণ্ডাকে কেন নাটকে এত সম্মান দেখানো হয়েছে এমন প্রশ্ন তুলল–না, কংগ্রেসি মাস্তানরা নয়– সিপিআই-এর সব পত্রপত্রিকা, কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই থেকে। নিজেদের অতীতকেও আর সহ্য করতে পারছিলেন না পুঁজিপতির এই লাল ঝাণ্ডাধারী কেরানিরা। তাঁরা সমস্বরে পুলিশকে উস্কানি দিতে লাগলেন গ্রেপ্তার ও নিষিদ্ধকরণে।[৪৭]

অবশেষে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে উৎপল দত্ত বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। স্টেটস্‌ম্যান ছাড়া সব ধনিক পত্রিকায় লিটল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে উৎপলের *সমাজতান্ত্রিক চাল* নাটিকাটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় জোছন দস্তিদারকে ঐ-নাটিকার প্রকাশের জন্যে। কিন্তু সিপিএমের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এক বিপুল আন্দোলন – 'কল্লোল চলছে চলবে'। মফস্বলের দেয়াল ভরে যায়– 'কল্লোল দেখুন' পোস্টারে পোস্টারে। কমরেডরা মুখে মুখে ও পথসভা করে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। এলটিজি'র

শিল্পীরা সমস্ত বাধা-বিপত্তি,ভয়-ভীতিকে তুচ্ছ করে নাটক চালিয়ে যেতে থাকে। গণনাট্য সংঘ মশাল মিছিল করে ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মিনার্ভা পর্যন্ত। দিনের পর দিন মিনার্ভা পাহারা দিয়ে রেখেছিল ছাত্র,শ্রমিক আর এলটিজির সদস্যরা।

জেলখানায় রচিত উৎপল দত্তের দুটো নাটিকার অভিনয় হয়েছে– ৭ই নভেম্বরে *কংগোর কারাগারে* ও স্তালিনের জন্মদিনে *লৌহমানব*। *কল্লোল*-এর সমর্থনে ও উৎপলের মুক্তির দাবিতে দেশে তো বটেই এমনকি বিদেশেও সাড়া পড়ে যায়; বিবৃতি দেন – সোভিয়েত কবি দোলমাতোভস্কি, জর্মন নাট্যকার ফন কুবা ও পরিচালক হান্স পের্টেন, প্রাগে দুসান জ্বাভিতেল, লন্ডনে ওয়াল্টার নান, অবজার্ভার-গার্ডিয়ান-টাইমস প্রভৃতি পত্রিকা, মার্কিন আন্ডারগ্রাউন্ড থিয়েটারের জোসেফ সেলবি প্রমুখ। ভারতে সত্যাজিৎ রায়, মধু বসু ও মন্মথ রায়ের যুগ্ম আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন অসংখ্য বুদ্ধিজীবী। উৎপল-গুরু জেফ্রি কেন্ডাল জাপান থেকে জেলখানায় উৎপলের কাছে একটি পত্র পাঠান। সেন্সরের কালিতে ক্ষতবিক্ষত সে-পত্র থেকে একটিমাত্র বাক্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন উৎপল –'সরকারের আতিথ্য গ্রহণ করলে বিশ্রামটা ভালো হয় নিশ্চয়ই।'[৪৮]

১৯৬৬ সালের মার্চে বিপুল খাদ্য-আন্দোলনের সংগ্রামে জনগণ সব রাজবন্দিকে ছিনিয়ে আনে কারাগার থেকে। উৎপলও মুক্ত হন তাঁদের সঙ্গে। ৭ মে মনুমেন্টের ময়দানে কল্লোল-এর বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়– কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ মানুষের সামনে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সেইসব মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে যাঁরা কল্লোলকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সে-দিনের বর্ণনা দিয়েছেন উৎপল দত্ত:

> মিছিল আসছিল চারদিক থেকে। রবীন্দ্রনাথের 'কিষাণের জীবনের শরীক যে জন' উদ্ধৃতি বিরাট পোস্টার লিখে বহন করে আনছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। রোবসনের চিত্র আনছিলেন আর এক দল। গোর্কির শ্রমকঠিন মুখ জেগে ছিল আর এক মিছিলের মাথায়। মঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়েছিল খাইবার জাহাজের বাইশ ফুট উঁচু প্রতিকৃতি; তার ডেকে অভিনীত হল কল্লোলের একটি দৃশ্য। সামনের ছোট মঞ্চে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা অভিনয় করল মৃত্যুর অতীত। আর নানা নাট্য সংস্থা ফুলে ফুলে ভরে দিলেন মঞ্চ ও আমাদের মন।[৪৯]

যেহেতু যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধেই *তীর* নাটকের বক্তব্য তাই উৎপল কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের শত্রু বনে যান। *তীর*-এর মহড়া চলাকালে নভেম্বরে উৎপল দত্তের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় আবারও। তিনি আত্মগোপন করেন;সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালক হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এখানে ওখানে লুকিয়ে থেকে উৎপল সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে পত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। সাদা পোশাকি গোয়েন্দাদের সামনে দিয়ে উৎপল থিয়েটারে গেছেন, থিয়েটার থেকে নিজের আস্তানায় ফিরেও গেছেন, এমনকি একদিন সন্ধ্যা থেকে পরদিন ভোররাত পর্যন্ত মিউজিক রেকর্ড করেছেন তবু গোয়েন্দারা উৎপলকে ধরতে পারেনি। উৎপল নিজ নামে বোম্বের তাজ হোটেলে উঠলে গোয়েন্দাদের পক্ষে উৎপলকে গ্রেপ্তারকরা সম্ভব হয়। ইতোমধ্যে *তীর* নাটক মঞ্চস্থ হয়ে যায়। নিজে থেকে ধরা না দিলে গোয়েন্দারা হয়ত উৎপলকে ধরতেই পারতো না। উৎপল দত্ত জানিয়েছেন :

> আমি ধরা দেই স্বেচ্ছায়। বেলা দুটো থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত ক্রফোর্ড মার্কেটে গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তরে আমাকে জেরা করা হয়। সে-সব ভয়ঙ্কর প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছিল বোম্বাইয়ের পুলিশ আমাকে কোনও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতা বলে ঠাউরেছেন। মাঝে মাঝে হেসে ফেলছিলাম। আমি যে একজন সামান্য অভিনেতা এটা বোঝানো দায় হয়ে ওঠেছিল। প্লেনে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে এল কলকাতায়, দমদম থেকে সোজা দমদম জেলে। চার্জ ছিল: আমি পাড়ায় ছেলেদের সংগঠিত করে পুলিশের ওপর বোমা মেরেছি। আসল চার্জ ছিল অন্য, সেটা বোম্বে পুলিশের জেরায় বুঝলাম। কিন্তু কোনও প্রমাণ তাঁদের হাতে নেই বলেই যত ক্রোধ।[৫০]

১৯৬৭-তে দ্বিতীয়বার যখন উৎপলকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন তিনি একটি বড় ধরনের আন্তর্জাতিক কেম্পানির সঙ্গে কাজ করছিলেন। এই সময় ইসমাইল মার্চেন্ট ও জেমস আইভরির গুরু চলচ্চিত্রের নাম ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন উৎপল দত্ত। *তীর* নাটকের মহড়া শেষ করে প্রোগ্রাম মাফিক উৎপল ট্রেনে ছদ্মবেশে দিল্লি চলে যান *গুরু* ছবিতে কাজ করতে। *গুরু* ছবির সংগীত পরিচালক ওস্তাদ বেলায়েত খাঁ। উৎপল বেলায়েত খাঁর ভাই ইমারত খাঁর কাছে সেতার শিখছিলেন। *গুরু* ছবির সেতারের চর্চা ও মহড়া যখন পুরো দমে চলছিল তখনই মূলত বোম্বে অবস্থানরত উৎপলকে ২৪শে ডিসেম্বর রাতে তাজ হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করে ২৬শে ডিসেম্বর কলকাতায় দমদম জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। উৎপলের গ্রেপ্তারে গুরু ছবির কর্তাব্যক্তিরা সঙ্কটে পড়ে যায়। ১৯৬৮ সালে ইসমাইল মার্চেন্ট কলকাতায় এসে আন্তর্জাতিক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রাভিনয়ের শর্তে উৎপলকে কারামুক্ত করেন। কিন্তু সরকারের লোকজন ৯ই জানুয়ারি কাগজে সই করতে না করতেই রেডিওতে প্রচার করে দেয় উৎপল দত্ত মুচলেকা দিয়েছে। এই দুঃসময়ের বর্ণনা দিয়েছেন শোভা সেন :

> জেল থেকে উৎপলকে তুলে বোম্বাই এর ট্রেনে রওনা করে দিয়ে সবে বাড়িতে ঢুকেছি, এমন সময় দেবেশ খবর দিল, এইমাত্র রেডিওতে এই ঘোষণা হল। চারিদিকে ছি ছি, সর্বত্র ধিক্কার। আমার অবস্থা শোচনীয়। এমন ফল হবে জানলে উৎপলকে এ কাজ করতে দিতাম না, উৎপলও সই করত না। আমরা ভেবেছিলাম দু'মাসের ব্যাপার, ছবি শেষ হলেই আবার কাজ শুরু করা যাবে, এমনিতেই তো এই দু'মাস উৎপল অন্য কিছু করতে পারত না। থিয়েটারে গিয়ে দেখি সেখানেও সকলের অন্যমূর্তি। উৎপলকে না পেয়ে সকল গালাগাল আর ধিক্কার আমার উপরই বর্ষণ করেছে। এতবড় দুর্দিন আমাদের জীবনে আর আসেনি। পাশে কেউ নেই। ওদিকে উৎপলের অবস্থাও শোচনীয়।[৫১]

উৎপল দত্ত তাঁর কারামুক্তি ও এ-সম্পর্কিত কুৎসারবিষয়ে লিখেছেন :

> আমার কারামুক্তি ও গুরু ছবিতে অভিনয় নিয়ে শত্রুরা অনেক কুৎসা গেয়েছে, বন্ধুরাও কম যাননি। শত্রুর রটনা বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং যেভাবে রেডিওতে সংবাদপত্রে প্রচার চলেছিল তাতে আমি অন্তত স্থির নিশ্চয় হয়েছিলাম যে শত্রুরা আমার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাকে ভয় পায়, নইলে এমন কুৎসার হাট বসাবে কেন? 'তীর' নাটকের জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, হয়েছিল অন্য কারণে যা প্রকাশ করা এখনই সমীচীন নয়। মুক্তির প্রক্রিয়াটাও যেভাবে প্রচারিত সেরকম ঘটেনি। ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ অভিনেতার একদিকে যেমন হাত বাঁধা থাকে, অন্যদিকে তার একটা সুযোগ থাকে অত্যাচার এড়াবার,বিশেষত যদি সেটা হয় বিরাট আন্তর্জাতিক কোম্পানি যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর ওপরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেই যে শত্রুর খিল খিল হাস্যসহ আস্ফালন: উৎপল দত্ত লিখে দিয়েছে আর রাজনৈতিক নাটক করবে না – তার জবাবে শুধু বলি কাঁচকলা খাও। কিন্তু শত্রুর অপপ্রচারে লিটল থিয়েটার টলেনি।[৫২]

মুচলেকা বিষয়ে উৎপলের বিরুদ্ধে এলটিজি এতই সোচ্চার হয়ে ওঠেছিল যে উৎপল দত্তের জন্যে শোভা সেনকে এলটিজি থেকে বহিষ্কার করেছিল। উৎপল দত্ত ও শোভা সেনকে বাদ দিয়ে এলটিজি এমনিতেই বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। তাঁদের অনুপস্থিতিতে এলটিজিতে নানা সঙ্কট দেখা দিল। যারা শোভা সেনকে বহিষ্কার করেছিল তারাই আবার তাঁকে দলে ফিরিয়ে নিল। দলের ততদিনে বোধোদয় হয়েছে উৎপল-শোভা ছাড়া এ-থিয়েটার চলতে পারে না। তাই বহিষ্কারাদেশ তুলে তাঁদের ফিরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু উৎপল দত্ত ঠিক কী মুচলেকা দিয়েছিলেন বা কী লিখেছিলেন সেই মুচলেকায় তা আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।যদিও শোভা সেন লিখেছেন :

> এর জন্য উৎপলকে শুধু লিখে দিতে হল,এই শুটিং চলাকালীন উৎপল আর কলকাতায় আসতে পারবে না, কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়াবে না। প্রযোজকদের ক্ষতির কথা ভেবে এই সাময়িক আপস করতে আমাদের কিছু খারাপ মনে হয়নি। কারো সঙ্গে কনট্রাক্ট সই করলে সেখানেও একটা দায় থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলাম ততটা সহজ হল না।[৫৩]

জেল থেকে ফিরেই উৎপল *মানুষের অধিকারে* নাটক লিখেছেন এবং আবারো*তীর* নাটক চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। উৎপল দত্ত-এর*তীর* নাটকের পরের নাটকগুলো হল*লেনিনের ডাক, যুদ্ধং দেহি, বর্গী এলো দেশে*(পথনাটক), *অস্ত্র*(একাঙ্ক) ইত্যাদি। এই সময়ে উৎপল তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহেও সরাসরি রাজনীতির কথাই বলেছেন। উৎপল যদি *তীর* নাটকের জন্যে 'আর রাজনৈতিক নাটক করবেন না'বলে মুচলেকা দিতেন তাহলে ফিরে এসে আবার নিশ্চয়ই একইভাবে রাজনৈতিক প্রচারে নামতেন না। তবে নকশালবাড়ি রাজনীতির জন্য সিপিআই[এম]-এর সমর্থন হারান উৎপল। আবার এই সময়েই নকশালবাড়ি রাজনৈতিক দলও উৎপলের উপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। মোটকথা এই মুচলেকা বিতর্ক নিয়ে দুই রাজনৈতিক শিবিরেরই সমর্থন হারান উৎপল।

উৎপল দত্তের অতি কাছের মানুষ ও দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুচলেচা সম্পর্কে জানিয়েছেন :

> মুচলেকা দিয়ে কারামুক্তি সম্বন্ধে যা শোনা যায়, ওটার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু মুচলেকার ব্যাপারটা কেউ আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারলেন না। যেটা আমি জানি, সেটা হচ্ছে এই যে, কোটি কোটি টাকার ইনভলভমেন্ট ছিল যাদের এখানে [গুরু চলচ্চিত্র নির্মাতাদের] তারা সরাসরি গেলেন ইন্দিরা গান্ধীর [তদানীন্তন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী] কাছে,সত্যজিৎ রায়ের কাছে। এবং রিলিজটা করে নিলেন যাতে কাজটা করে নিতে পারেন। মুচলেকায় কি ছিল তা আজ পর্যন্ত বেরুল না কিন্তু। ছাপাও হল না। মাঝখান থেকে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।[৫৪]

রাজনৈতিক নাটক এবং এলটিজি-পিএলটি:

উৎপল দত্ত আর দশটা বিষয়ের ফাঁকফোঁকরে রাজনৈতিক নাটক লিখেন নি। শুরু থেকেই রাজনীতিকেই তিনি তাঁর নাটকের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁর রাজনীতি মানেই গণমানুষ তথা সর্বহারার রাজনীতি।

তাঁদের অধিকার ও বাঁচার লড়াই। উৎপল দত্তের আগে বাংলা নাটকে এরকম রাজনীতি পরিলক্ষিত হয়নি।'নাট্যজীবনের আদিপর্বেই উৎপল দত্ত সর্বহারা শ্রেণির অধিকার,ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামকে তাঁর নাটকের মূলবস্তু করে তুলেছিলেন।'[৫৫] আর আমৃত্যু রাজনৈতিক তথা আদর্শিক বিশ্বাসে তিনি স্থিত ছিলেন। যৌবনে যেমন তিনি পৃথিবীব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার দেখেছেন তেমনি তাঁর জীবনের ক্রান্তিকালে (অসুস্থশরীরে) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্রান্তিকাল এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ও প্রত্যক্ষ করেছেন নব্বইয়ের দশকে। কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুলও নড়েননি বরং বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করে এই বিপর্যয়কে সাময়িক বলে আখ্যায়িতকরেছেন। লিটল থিয়েটার গ্রুপ(এলটিজি) এবং এরই গর্ভে জন্ম নেয়া পিএলটি নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উৎরাই, উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত এবং তাঁর দল যা শিখেছে সে-সব সুসংহত করে আবার এবং বারংবার রাজনৈতিক নাটক করে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন তিনি।

লিটল থিয়েটার গ্রুপ(এলটিজি) ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্য-আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে তার একটা ফিরিস্তি উৎপল দত্ত তাঁর নিজ ধারণা মতো তুলে ধরেছেন'লিটল থিয়েটার ও আমি'স্মৃতিচারণমূলক লেখায়–যা থেকে উৎপল দত্তের নাট্যচর্চার একটা চিত্র পাওয়া যায় – নাটককে শুধুমাত্র প্রগতির আবেদনে আবদ্ধ না রেখে এলটিজি চেয়েছে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু, প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ভিতসুদ্ধ উপড়ে ফেলার কথা। এলটিজি নাটকে এনেছে মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের আলোচনা, শ্রেণি-রাষ্ট্র-যুদ্ধ-অস্ত্রের তাৎপর্য।টিমওয়ার্কের নতুন ব্যখ্যা এনেছে এই নাট্যদল। ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিকে আসল নায়ক করার চেষ্টা করেছে; একজন বড় আকারের মানুষের পরিবর্তে মেহনতী শ্রেণিকে ইতিহাসের স্রষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে।এলটিজি বিশাল ও আধুনিক মঞ্চসজ্জার প্রবর্তক। আধুনিক নাট্যশালার দৃশ্যসজ্জাও যে একটি অপরিহার্য অঙ্গ এ-সত্য গণনাট্য আন্দোলনে এলটিজি প্রতিষ্ঠিত করেছে; ন'ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্ম, কয়লাখনির পিটহেড ও খাদ, যুদ্ধজাহাজ,তিতাসপারের মেলা,মেঘনাবক্ষে মালোদের অভিযান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের রেলস্টেশন,ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্র– সব ধরার চেষ্টা করেছে শিল্পসঙ্গত রেখা ও রঙে। পথনাটিকাকে নতুন গতি ও রূপ দিয়েছে পঞ্চাশের দশকের এই নাট্যদল। একাধারে স্থায়ী মঞ্চ চালিয়েছে ও প্রবল গতিশীল থেকেছে,একইসঙ্গে গভীর বিপ্লবী তত্ত্ব বলেছে এবং তাৎক্ষণিক রাজনীতির প্রচার করেছে;একই সঙ্গে প্রোপাগান্ডা ও এ্যাজিটেশন দুই-ই চালিয়েছে। অভিনয় শিল্পেএকটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেছে এলটিজি। বৈজ্ঞানিক মহড়া ও শিক্ষাপদ্ধতিসে-ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।এলটিজি থিয়েটারশিল্পকে সামগ্রিকরূপ দিয়েছে; দৃশ্য, সংগীত, আলোক, পোশাক,মেকআপ ইত্যাদি প্রতিটি দিককে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে।

প্রোপাগান্ডিস্ট, অ্যাজিটেটর এবং পার্টির মেম্বারশিপ প্রসঙ্গঃ

উৎপল দত্ত নিজেকে প্রোপাগান্ডিস্ট হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেছেন – 'আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোনও আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রোপাগান্ডিস্ট। এটাই আমার মূল পরিচয়।'[৫৬] তিনি নাটকের মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর আদর্শকে প্রচার করতে চেয়েছেন; তাঁর আইডিয়ার

প্রপাগান্ডায় প্রয়াসী ছিলেন। উৎপল তাঁর আদর্শ প্রচারের প্রশ্নে প্রপাগান্ডিস্ট। নিজেকে তিনি প্রপাগান্ডিস্ট হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন:

> I am a propagandist for revolution.I propagate ideas, We try to fight ideas of the rulling class with ideas of the proletariat.[৫৭]

গণনাট্য সংঘে যোগদানের ভেতর দিয়ে গণমানুষের জন্য নাটক– এ্যাজিটপ্রপ-এর মাধ্যমে এই আইডিয়ার বাস্তবায়ন করেন। উৎপল দত্ত পানুপালকে বাংলা পথনাটকের পথিকৃৎ বললেও অনেকেই উৎপল দত্তকে পথনাটকের পথিকৃৎ বলে থাকেন। তাৎক্ষণিক ইস্যু এবং নির্বাচনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বেশকিছু পথনাটক রচনা করেছেন এবং এইসব পথনাটক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন হাটে-মাঠে-ঘাটে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সর্বত্র। পথনাটকের এ্যাজিটেশনের উত্তাপ তাঁকে এ্যজিটেটরে পরিণত করে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিনিরপেক্ষ শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। তাই সমাজপ্রগতির লড়াইয়ে বিশ্বাসী লেখক শিল্পীরা সঙ্গতকারণেই সর্বহারা বিপ্লবের লক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শের লড়াইয়ে আস্থা পোষণ করেন। সে-জন্যই নিঃশঙ্ক চিত্তে উৎপল উচ্চারণ করেন–

> I am a partisan, not neutral, and I believe in political struggle.The day I cease to participate in political struggle,I shall be dead as an artist too.[৫৮]

পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে উৎপল লিখেছেন :

> অনেক দলেই দেখেছি, পার্টির সঙ্গে যোগাযোগটা চেপে যেতে যেতে এমন এক পর্যায়ে আসে যখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্টির যে আদৌ কোনো ভূমিকা ছিল বা আছে এই সত্যটাকেও বেমালুম অস্বীকার করা হয়, এবং চূড়ান্ত সুবিধাবাদের পথ প্রশস্ত হয়।[৫৯]

উপনির্বাচনে সুধীর ভান্ডারীর বিজয় আর প্রতিপক্ষ নীহাররেন্দু দত্ত মজুমদারের বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজয়ের পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের (উৎপল দত্ত ও তাঁর নাট্যদল) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। উৎপল দত্ত লিটল থিয়েটারে পার্টির অবদান প্রসঙ্গে জানিয়েছেন :

> আমি স্পষ্টাক্ষরে বলতে চাই, লিটল থিয়েটারের উত্থানের পেছনে মহত্তম ভূমিকা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এবং ১৯৬৪-র পর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির। কখনও কোনও হস্তক্ষেপ পার্টি করেনি, নিঃস্বার্থভাবে শুধু প্রচার করেছে, আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে, সারা বাংলার মানুষের কাছে লিটল থিয়েটারকে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। কোনওদিন মাস্টারি করেনি কিন্তু শিখিয়েছে সর্ব সময়ে। কখনও কিছু চায়নি শুধু দিয়েছে। কখনও পার্টি এসে বলেনি, পথ-নাটিকা করতে হবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় যখন করেছি পার্টি দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের বুকে নিয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে হাঁটতে শিখিয়েছে।[৬০]

এতটা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার পরও উৎপল দত্তের মত লোকের পক্ষে কোনো পার্টির মেম্বারশিপ গ্রহণ না করাটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। উৎপল লিখেছেন :

> If I were asked; are you a card holding member of the communist party? I would understand the question and tell him;No, and I don't think I shall ever be eligible for such membership: I do not think am good enough, but through my own craft which is theatre, which I know,I shall be right in the middle of active politics as long as I am able to work.[৬১]

এ-প্রসঙ্গে শোভা সেন জানান, 'পার্টির বাইরে থেকে পার্টির জন্য আরও বেশিকিছু করার সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। তিনি আরও বলেন, পাটির মেম্বারশিপ গ্রহণ করা বা না করার চেয়েও বড় বিষয় পার্টি এবং জনগণের প্রতি কমিটমেন্ট। সেই কাজটা ঠিকমত করাটাই আসল কথা।' (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-১)

'ইন সার্চ অফ থিয়েটার', ('ওথেলো') ও চলচ্চিত্র পরিচালনা এবং চলচ্চিত্রাভিনয় :

'ইন সার্চ অফ থিয়েটার':

ভারতের নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাস দূরদর্শনে বর্ণনা করার পরিকল্পনায় উৎপল দত্ত 'ইন সার্চ অফ থিয়েটার'চিত্রনাট্য নির্মাণ করেন।এই চিত্রনাট্যে স্থান পেয়েছে বাংলা নাট্য-ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য। কিন্তু এর জন্যে স্পন্সর খুঁজে পাওয়া যায়নি। শেষত, দূরদর্শন প্রযোজনাটি কিনে নেয়। মোটবায়ান্ন পর্বে এটি নির্মাণের প্রস্তাব দেয়া হলে দূরদর্শন প্রথমে পাঁচপর্ব, তারপর তিনপর্ব, অবশেষে চারপর্বে সম্মত হয়। যদিও তিনপর্ব প্রচারের পর আকস্মিকভাবে ৪র্থ পর্বটি আর দেখানো সম্ভব নয় বলে দূরদর্শন জানিয়ে দেয়।'ইন সার্চ অফ থিয়েটার'-এরচারপর্ব যথাক্রমে:'এ রাশান ইন ক্যালকাটা','টুওয়ার্ডস-এ ন্যাশনাল থিয়েটার','লার্জার দ্যান লাইফ','ভায়োলেনস্ ইন দি আর্টস্'।

চলচ্চিত্র পরিচালনা

দূরদর্শনের জন্য পরিচালিত'ওথেলো' (ইংরেজিতে) ছাড়াও তাঁর অপর পাঁচটি চলচ্চিত্র যথাক্রমে : 'মেঘ'(২৫শে মে ১৯৬১), 'ঘুম ভাঙার গান'(২৩শে এপ্রিল ১৯৬৩),'বৈশাখী মেঘ' (৭ই আগস্ট ১৯৮১),'ঝড়' (৮ই জানুয়ারি ১৯৮২), 'মা'(৩০শে নভেম্বর ১৯৮৪)।প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,পরিচালক গৌতম ঘোষ উৎপল দত্তের কর্ম ও নাট্যজীবন নিয়ে 'থিয়েটারের সন্ধানে'নামক একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন, যাতে উৎপলের জীবন ও কর্ম তাৎপর্যময়ভাবে ধরা পড়েছে।

চলচ্চিত্রে অভিনয়:

ভারতীয় চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্রাভিনেতা উৎপল দত্ত এক কিংবদন্তি। আমাদের আলোচনার এলাকা যদিও তাঁরনাটক ও নাট্যচর্চা তথাপি চলচ্চিত্রে অভিনয় তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উৎপল দত্তের চলচ্চিত্রাঙ্গনে আগমন ঘটে ১৯৫০ সালে মধু বসু পরিচালিত 'মাইকেল মধুসূদন' ছায়াছবিতে নাম ভূমিকায় ও কালীপ্রসাদ ঘোষের 'বিদ্যাসাগর' ছায়াছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে। ছবি দু'টি মুক্তি পায় যথাক্রমে ১৪ই জুলাই এবং ২৯শে

সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে। উৎপলের জীবনের ঘটনাক্রম আলোচনা করলে দেখা যায় গোড়া থেকেই তিনি ধ্রুপদী চলচ্চিত্র-প্রেমিক ছিলেন।

উৎপলের জীবনের প্রথম চলচ্চিত্র'মাইকেল মধুসূদন';এর নাম ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে সমাদৃত হয়ে যান। হিন্দি চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে 'সাত হিন্দুস্তানি'-র মাধ্যমে। উৎপল দত্ত বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালকদের চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন ; ভারতের অন্যান্য ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।বাংলা থেকে হিন্দি – অসংখ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে একটি বিশেষ আসন ও পরিচিতি অর্জন করেছেন, তিনি৩৫০টিরও বেশিচলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। অনেকের কাছেই বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয় ছিল যে, উৎপল দত্তের মতো একজন বিশুদ্ধ মার্কসিস্ট নাট্যকার কী-করে বাণিজ্যিক হিন্দি ছবিতে কিংবা নিম্নমানের বাংলা ছবিতে কাজ করেছেন। শোভা সেন প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন:

> অনেকে উৎপলকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কী করে সিনেমার ঐ-পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়ান ? ও উত্তর দেয়, 'আমি তো যে-টুকু সময় কাজ করি তার চেয়ে বেশি সময় ওখানে বসেই পড়াশোনা করি। তাই ওসব আঁচ আমার গায়ে লাগে না'।[৬২]

অর্থাৎ সিনেমায় কাজ করার সময়কে উৎপল মঞ্চের প্রস্তুতির স্বার্থেই ব্যবহার করেছেন। আবার এমনও অনুমান করা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের সিনেমায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একটা সর্বভারতীয় পরিচিতি অর্জন করা সম্ভব যার মাধ্যমে ব্যাপক জনতার চেনা মানুষ হিসেবে খুব সহজে তাদের কাছে পৌঁছানো যায়। বিচিত্র চরিত্রে অভিনয় করে অভিনয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াসও তাঁর একটি অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে কাজ করতে পারে বলে আমাদের ধারণা এবং তাঁর চলচ্চিত্রাভিনয় তাঁর নাট্যচর্চাকে ব্যাহত বা বাধার সৃষ্টি করেছে বলে আমাদের মনে হয় না।

সুরজিৎ ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে বাংলা, হিন্দি ফিল্মে অভিনয় তাঁর সিরিয়াস থিয়েটারকে কতটা অ্যাফেক্ট করে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে উৎপল দত্ত এর উত্তরে জানান; 'না, আমার একেবারেই করে না,কেন না আমি যখন বোম্বাই মার্কা ছবিতে অভিনয় করি, ঠিক যেমন একজন ব্যাঙ্কের কেরানী যখন লেজারে চাকুরি করে,সে যখন ওই হিসেবটা কষে দিয়ে ওঠে আসে তারপরে কি সারাদিন কখনও তার মাথায় ওই হিসেবটা আসে? আসে না তো। আমারও কখনও ওইসব ছবিতে কী ডায়লগ বলেছি, কী চরিত্রে অভিনয় করেছি, ছবিটার নাম জিজ্ঞেস করলে পর্যন্ত বলতে পারি না। কিন্তু আমি কখনও এ কথা বলি না, বলব না যে বোম্বাইটা একটা ভয়াবহ জায়গা, সে বিশ্রী, সে এ, সে তা, যেমন ওই উন্নাসিকরা বলে থাকেন। আমি বলি যে আমি বোম্বের চলচ্চিত্রজগৎকে, চলচ্চিত্রজগতের প্রতিটা মুহূর্ত আমি এনজয় করেছি, প্রতিটা মুহূর্ত আমার ভালো লেগেছে, সেখানে বহু মানুষ, তাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছি। সারা ভারতবর্ষ থেকে সেখানে অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসেন, শ্রেষ্ঠ কলাকুশলীরা আসেন, সেখানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যানরা কাজ করছেন,

তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন, এমনকি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমি যে সব কথা জানতে পারি, তার ফলে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আরও গভীর হয়, সমৃদ্ধ হয়।' (তথ্যসূত্র: দেশ,কলকাতা,৩০.০৩.১৯৯১)

উৎপল দত্ত-শোভা সেন উৎপলের চলচ্চিত্রাভিনয় সম্পর্কে যা বলেছেন;তাতেচলচ্চিত্রাভিনয় তাঁর নাট্যচর্চাকে ব্যাহত করেছে বলে মনে হয় না;এমনকি আদর্শের দিক থেকেও কানো বিচ্যুতি ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। নাটক ও চলচ্চিত্র দুটো মাধ্যমে তিনি আলাদাভাবেই কাজ করেছেন; তাই একটি আরেকটিকে 'অ্যাফেক্ট' করেনি। নাটকের বেলায় যেমন উৎপলদত্ত 'কমিউনিজম প্রচারকে তাঁর ধর্ম' বলে মেনেছেন এবং তিনি নিজেকে 'পার্টিজান', 'এ্যাজিটেটর', 'প্রপাগাণ্ডিস্ট' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন চলচ্চিত্রের বেলায় তিনি সে-ধরনের কথা বলেননি।

উল্লেখযোগ্য বক্তৃতাসমূহঃ

কলেজ জীবন থেকেই বাগ্মী এবং সুবক্তা হিসেবে উৎপল দত্তের খ্যাতি ছিল। দেশে-বিদেশে বাংলা ও ইংরেজিতে অসংখ্য বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৬৪ সালে শেকস্পিয়ারের চারশত বৎসর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে তিনি লন্ডনে স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভনে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে 'শেকসপিয়ার অন ইন্ডিয়ান স্টেজ' বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৭৯ সালে উৎপল পুনার ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিউটে বক্তৃতা করেছেন। গ্রুপ থিয়েটার দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৯৮০ সালের ১৪ই জুন কলামন্দিরে বক্তৃতা দিয়েছেন; বক্তৃতার বিষয়ছিল: 'জনগণের থিয়েটারের উন্নয়ন ও প্রসারের প্রশ্নে নাট্যকর্মীদের রাজনৈতিক ভূমিকার তাৎপর্য।' ১৯৮১ সালে উৎপল দত্তকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'গিরিশঘোষ' বক্তৃতামালার জন্য মনোনীত করে; বক্তৃতা করেছেন ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯শে নভেম্বর। ১৯৮৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি গোর্কি সদনে ব্রেখট-এর জন্মদিন ও এপিক থিয়েটার পত্রিকার কুড়ি বছর পূর্তি পালন উৎসবে উৎপল দত্ত বক্তৃতা করেন। ১৯৮৪-এর মে মাসে কলকাতার শিশির মঞ্চে 'মার্কস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেছেন তিনি।

১৯৮৫ সালে পূর্ব জার্মানিতে আমন্ত্রিত-বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেছেন উৎপল দত্ত। ১৯৮৬-তে দিল্লির শ্রীরাম সেন্টারে ১৩, ১৪ ও ১৫ই জানুয়ারি উৎপলের বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়;বক্তৃতার বিষয় ছিল : 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' (লেনিনের বিখ্যাত বই থেকে নামটা নেয়া)। সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯৮৭ সালে উৎপলদত্ত আমন্ত্রিত হয়েবক্তৃতা করেছেন। কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে বক্তৃতা দিয়েছেন ১৯৮৮ সালের ৩০শে আগস্ট ম্যানডেলা দিবসে।

১৯৮৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এসএফআই-এর সেমিনারেবক্তব্য রেখেছেন উৎপল দত্ত । ২৮শে মে মুক্তাঙ্গনে মার্কসীয় দৃষ্টিতে নাটকের ব্যাখ্যা করে শিশির কুমার ভাদুড়ীরওপর বক্তৃতা করেছেন তিনি। ১৬ই জুলাই শিলিগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ একাডেমি আয়োজিত আলোচনাচক্রে উৎপল অংশ নিয়েছেন ;আলোচনার বিষয়: 'বাংলা নাটক ও সমাজ বাস্তবতা'। ১৯৯০-এ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমিতে

'ভারতের থিয়েটারে পরম্পরার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ'বিষয়ক সেমিনারে বক্তৃতা করেছেন।এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে সাহিত্য আকাদেমি আয়োজিত 'নাটক বিষয়ে'বক্তৃতায় অংশ নিয়েছেন উৎপল। ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডের লাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক থিয়েটার সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন; বিষয় : 'ভারতে থিয়েটার ও মতাদর্শ'। উক্ত আলোচনা সভা ও কর্মশালার মেয়াদ ছিল ৫ থেকে ৯ই এপ্রিল ১৯৯০। বিশ্বের তুখোড়সব নাট্যকার,প্রয়োজক, পরিচালক ও তাত্ত্বিকগণ ঐ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯১-এর ২০-২৪শে ফেব্রুয়ারি সাহিত্য একাডেমির জাতীয় সাহিত্য সেমিনারে (নয়াদিল্লি)'ইনোভেশন এন্ড এক্সপেরিমেন্টেশন ইন থিয়েটার' নিবন্ধ পাঠ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাট্য একাডেমি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে নাট্যবিষয়ক বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণ (তিনটি) করেছেন উৎপল; বিষয় ছিল :'বাংলা নাটকের আদি পর্বে ইউরোপের প্রভাব' (২৭ ও ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯১); 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ইউরোপীয় দর্শন' (৯-১০ই মার্চ ১৯৯২); 'নাট্যকার দীনবন্ধু : মোহমুক্তির খতিয়ান' (২১ ও ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২)। এই বছরেরই (১৯৯২) মে মাসে 'রেনেসাঁস বিষয়ক' বক্তৃতা করেছেন তিনি। এ-ছাড়াও উৎপল দত্ত বিভিন্ন বিষয়ে আরো অসংখ্য বক্তৃতা করেছেন।

সংবর্ধনা, পুরস্কার ও সম্মাননাঃ

উৎপল দত্ত ১৯৬৩ সালে *ফেরারী ফৌজ* নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে 'সংগীত নাটক একাডেমি'পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৬৬ সালে*কল্লোল* নাটক পরিচালনার জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে 'সংগীত নাটক একাডেমি' কর্তৃক পুরস্কৃত হলেও সঙ্গত কারণে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। কারণ, বিশুদ্ধ রাজনৈতিক নাটক *কল্লোল*-এর জন্যেই তাঁকে জেল খাটতে হয়েছিল। ১৯৭০ সালে 'ভুবনসোম'চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসেবে'ভরত পুরস্কার' লাভ করেন তিনি।১২ই জুলাই ১৯৮৬ সালে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' বছরের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে উৎপল দত্তকে 'সত্যেন মিত্র' পুরস্কার প্রদান করেছে। ১৯৮৬ সালেই চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা হিসেবে 'ফিল্মফেয়ার পুরস্কার'লাভ করেছেন। ১৯৮৯ সালে ৩রা জুন উৎপল দত্ত রাজ্য নাট্যএকাডেমীর 'দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার' গ্রহণ করেছেন নন্দন প্রেক্ষাগৃহের এক অনুষ্ঠানে। ১ ডিসেম্বর সায়ক প্রদত্ত (প্রশ্নোত্তরমূলক) সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন উৎপল দত্ত। ১৯৯০ সালে ১৮শে এপ্রিল দিল্লিতে 'সঙ্গীত নাটক একাডেমী'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উৎপল দত্ত একাডেমীর ফেলোশিপে সম্মানিত হন। একই অনুষ্ঠানে উৎপল-গুরু জেফ্রি কেন্ডালও পুরস্কৃত হন।১৯৯০-এ কেন্দ্রীয় সরকার উৎপলকে 'পদ্মভূষণ' খেতাব দিতে চাইলে উৎপল দত্ত সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ১৯৯১ এবং ১৯৯৩ সালে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন উৎপল দত্তকে 'শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রাভিনেতার পুরস্কার' প্রদান করে'পথ ও প্রাসাদ' এবং'আগন্তুক'-এর জন্যে। ১৯৯২ সালেআবারও বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট পুরস্কার লাভ করেন চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য। ১৯৯৩ সালের ২৫শে এপ্রিল উৎপল দত্তকে শিরোমণি পুরস্কার দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় উৎপল দত্তকে 'সাম্মানিক ডি.লিট ডিগ্রি' এবং ১৯৯৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক'ডি.লিট উপাধি' (মরণোত্তর) প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

এলটিজি-পিএলটি ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনিক তৎপরতা :

উৎপল দত্ত ১৯৬৪ সালে সেন্সর বোর্ড ও ন্যাশনাল ফিল্ম ইনস্টিউটের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৪-তে ব্রেখ্‌ট সোসাইটি অব ইন্ডিয়া গঠনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। ৬৫'র আগস্টে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা গঠন করেন এবং এর সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন নাট্যদলের মুখ্য শিল্পী-কলাকুশলীদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে এবং কিছু কর্মশালা পরিচালনা করার পর নিজস্ব প্রযোজনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে একাডেমী। পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপল দত্তকে প্রথম প্রযোজনার পরিচালক মনোনীত করা হয়। ১৯৮৬–৮৯ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত একাডেমির কর্মসমিতির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। নন্দন-এর উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আমৃত্যু। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাট্য একাডেমির ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা এবং নাট্যবিষয়ক ও অন্যান্য লেখালেখিঃ

উৎপল দত্ত 'পাদপ্রদীপ'(১৯৫৭), 'এপিক থিয়েটার'(১৯৬৪) এবং 'প্রসেনিয়াম' (১৯৬৫) ইত্যাদি প্রকাশনাসমূহের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মনোরঞ্জন মাইতি, ভাস্কর গুপ্ত, রফিকুল ইসলাম এবং অর্জুন গুপ্ত এ-সব ছদ্মনামে উৎপল লিখেছেন অসংখ্য বিষয়ে অসংখ্য লেখা।

মৌলিক নাটক, যাত্রাপালা, পথনাটক, একাঙ্ক এবং অনুবাদ নাটকের পাশাপাশি *চায়ের ধোঁয়া*, *জপেন দা জপেন যা* এর মতো অসাধারণ নাট্যতর্ক, *স্তানিস্‌লাভস্কির পথ*,*স্তানিস্‌লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট*, *হোয়াট ইজ টু বি ডান*,*গিরীশচন্দ্র ঘোষ*,*শেকস্‌পিয়ারের সমাজচেতনা*, *ব্রেখট ও মার্কসবাদ*, *গিরীশ মানস* জাতীয় নাট্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ; *টুওয়ার্ডস এ রেভুলেশনারি থিয়েটার* জাতীয় আত্মজৈবনিক রচনা এবং *প্রতিবিপ্লব ও আশার ছলনে ভুলি*-র মতো সমাজসচেতন ও রাজনীতিক গ্রন্থ মননশীল গবেষক ও প্রাবন্ধিক উৎপল দত্তের সৃষ্টিশীলতার দূরবিস্তৃত দিগন্ত। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী*টুওয়ার্ডস্ এ হিরোইক সিনেমা ও চীন যাত্রী* এবং*অনুবাদ গল্পগ্রন্থএংকোর* ছাড়াও *লিটল থিয়েটার ও আমি* নামক স্মৃতিচারণমূলক লেখা সৃষ্টিশীল মনের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধিকে উন্মোচন করে।

উৎপল দত্ত কবি নন। কাব্যযশপ্রার্থী ছিলেন বলেও জানা যায় না। তবু, *শাহেনশাহ তোমার পুরস্কার তোমারই থাক*,*সাতকড়ি দত্ত*, *একটি কাহিনী বলি*, *শোভার অভিনয় দেখে*, *শোভাকে*, *একজন কমরেডকে হারিয়ে*,*স্বপ্নভঙ্গ(বিদায় কনক)*,*পথনাটিকা*, *ডাক দিল মাও সে-তুং*,*আবেগে অনুভবে*,*একটি ইংরেজি গান*,*পলাতকা*,*রূপসী পাহাড়*,*জয়সলমের*, *নাথুলা*, *মন্দার বাজার*, *নামহীন-১*, *নামহীন-২*, *নামহীন-৩*, *চকিত সনেট*,*পুরোনো ঢং-এ*, *একা*, *মস্কোয়*, *পিয়াকে*, *কালো কবর*, *কনসার্ট*, *মস্কো*, *কলকাতা*, *দুঃস্বপ্নের*

নগরী,কলকাতার গান:১, *কলকাতার গান:২*, *কলকাতার গান:৩* –এ-সব কাব্যপ্রচেষ্টা তাঁর সৃজনশীল মনের বিস্তৃতি ও গভীরতাকে উন্মোচন করে। রাজনৈতিক নাটকের নিয়ত ও বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে ব্রেখ্‌ট অনুরাগ তাঁর মজ্জাগত। জর্মন ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ ব্রেখ্‌ট-এরউত্তরকালের *প্রতি*, *বেচারা আমি,বই-পোড়ানো উৎসব*, *নাট্যকারের গান*, *শেকসপিয়ারের হ্যামলেট*, *নির্বাসিতা অভিনেত্রী*ইত্যাদি কবিতা সেই অনুরাগ ও দায়ের প্রকাশ। এইসব কবিতা নিয়ে উৎপলের কাব্যগ্রন্থ *দিন বদলের কবিতা* প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে।

ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনঃ

শোভা সেনের সঙ্গে উৎপল দত্ত বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন ১৯৬১ সালের ২৯শেমার্চ নিজের ৩২তম জন্মদিনে। বয়সে শোভা উৎপলের চেয়ে বড়, বিশেষত তিনি ছিলেন বিবাহিতা। স্বামী ডাঃ দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গেশোভার বিবাহবিচ্ছেদ হয় ১০ই মার্চ। একই অঙ্গনে, একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে শোভার সাথে উৎপলেরঅন্তরঙ্গ বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল। ব্যাক্তিগত জীবনের এই ভাঙাগড়া প্রসঙ্গে শোভা সেন : 'একটা সম্পর্ক ভাঙল, অন্যদিকে উৎপলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও আমাদের পরস্পরের ভালবাসার অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হল।'[৬৩]শোভা ছিলেন আদিঅন্তপ্রাণ নাট্যকর্মী – নন্দিত ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী। একমাত্র আত্মজা বিষ্ণুপ্রিয়াও(জন্ম ১০ই নভেম্বর ১৯৬১) কর্মজীবনে এর বাইরে যেতে পারেননি। শিক্ষকতার পাশাপাশি নাট্যাভিনয় ও নাট্যপরিচালনায় নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন।

শোভা সেন সংসারের সব দায়িত্ব বহন করেছেন। উৎপলকে গার্হস্থ্য বিষয়ে নির্ভার রেখেছেন। যাতে,একজন গুণী শিল্পী তার যোগ্যতা ও ক্ষমতার সবটুকু দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে, নিশ্চিন্তে নাটক লিখতে ও পরিচালনা করতে পারেন; নাট্যকার্যে উৎপল যাতে তাঁর পূর্ণ-সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন, তার যাবতীয় আয়োজন শোভা সেন করে রাখতেন। *অঙ্গার* নাটক লেখার স্মৃতিচারণায় শোভা সেন লিখেছেন :

> এবার নাটক লেখা শুরু হল। উৎপল যাতে নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে সকাল থেকে বসে সমস্ত মনঃসংযোগ দিয়ে একটানা নাটক লিখে যেতে পারে, তার সুযোগ করে দিলাম আমি। দরজা বন্ধ করে চলল লেখা। সে এক তপস্যা। অন্য কোনো কাজ বা কোনো কথা,এমনকী খাওয়াদাওয়াতেও ওর মন থাকে না এই সময়। কোনো বড় সাংসারিক সংকট,অর্থনৈতিক সমস্যা, সবই থাকত ওর অজ্ঞাত।[৬৪]

শুধু সংসারিক কাজে নয়; শোভা সেন-এর এই আন্তরিক সাহচর্য্য, সহযোগিতা সহযোদ্ধার ভূমিকাতেই আজীবন পেয়েছেন উৎপল। একমাত্র আত্মজা বিষ্ণুপ্রিয়াও দেশ-বিদেশের উচ্চতর পাঠ-প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন শিল্পী বাবা-মার পাশে থেকে। উৎপলের অসুস্থতায়দলের মহড়া,প্রযোজনা ও অন্যান্য কাজে সর্বতোভাবে সম্পৃক্ত থেকেছেন তাঁরা দু'জন। বিশ্বাসে মার্কসবাদী উৎপল নারী-পুরুষকে আলাদা করে দেখেননি কখনো। স্ত্রী-কন্যাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহযোদ্ধার ভূমিকায় গ্রহণ করে সে-বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রকাশ

রেখেছেন। তাঁদের কাজে,স্বাধীনতায় কখনো হস্তক্ষেপ করেননি, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত রাখার চেষ্টা উৎপলের প্রতিনিয়ত ছিল।

শোভা সেন লিখেছেন : 'উৎপল নাটক লেখা, পরিচালনা ও অভিনয় করে চলেছে,অর্থাৎ সর্বক্ষণের কর্মী,আমিও তাই।'[৬৫] নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয়, নাট্যরচনা, পরিচালনা, নির্দেশনা এবং নাট্যবিষয়ক লেখালেখি, সভা-সেমিনারে বক্তৃতা, বিবৃতি ইত্যাদি নিয়েই উৎপলের সারাবেলার ভাবনা, ব্যস্ততা – এর বাইরে তাঁর অন্য কোন জীবন ছিল না। খুবই অল্পসময়ের জন্যে যুক্ত হয়েছিলেন সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে– একবার স্টেটসম্যান পত্রিকার রিপোর্টার, দু'বার সাউথপয়েন্ট স্কুলের শিক্ষক; কিন্তু এর কোনোটাই বেশিদিন স্থায়ী হয়নি তাঁর জীবনে।

তিনি ছিলেন 'ফুলটাইম' নাটক করার পক্ষে – হয় চাকুরি নয় নাটক, একটা কিছু বেছে নিতে হবে। কিছু সময় নাটক, কিছু সময় অন্য কাজ এ-রকম হলে পুরো মনোযোগ নাটকে দেয়া যায় না,তাই তিনি সার্বক্ষণিক নাটক করার পক্ষে। তাঁর এই পেশাদারি মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যখন বন্ধু, সহকর্মী প্রতাপ রায় জেফ্রি কেন্ডালের দলে পেশাদার অভিনেতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তার প্রতিক্রিয়ায় :

> তাঁরা 'রিচার্ড' অভিনয় দেখলেন এবং আমাকে ও প্রতাপকে প্রস্তাব দিলেন অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার। আমাদের তিনি নিজের দলভুক্ত করে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তক্ষুণি রাজি,কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে শুনলাম প্রতাপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপর সাতদিন ধরে প্রতাপ ও আমি বচসায় মেতে উঠলাম এবং জীবনে প্রথম বাক্যালাপ বন্ধ হয়েছিল। আমি বোঝাতে চাইলাম শৌখিন অভিনেতার কোনো ভূমিকাই নেই সভ্য থিয়েটারে, একমাত্র পেশাদারই পারে জীবনপণ করে থিয়েটারে আত্মনিয়োগ করতে।[৬৬]

পাঠাভ্যাস ও পাণ্ডিত্যেও উৎপল দত্ত ছিলেন অনন্য। পড়াশুনার বিষয় বিশেষত কি পড়তে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন –সুরজিৎ ঘোষের এমন এক প্রশ্নর জবাবে তিনি জানিয়েছেন; 'আমিদর্শন পড়তে ভালবাসি। মার্কস এঙ্গেলস এগুলো তো ফিলসফির বই। আমি ভারতীয় ফিলসফিও পড়ি।বর্তমানে ঠিক এই মুহূর্তে 'বিবেকানন্দ' পড়ছি'[৬৭] এবং বিবেকানন্দ পড়তে তাঁর অসাধারণ লাগছিল। নিজস্ব সংগ্রহ ও তাঁর লাইব্রেরিটি দেখলে বোঝা যায় কী বিপুল ছিল তাঁর অধ্যয়ন। বাংলা,হিন্দি,ইংরেজি,জার্মান,ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় উৎপলের অসাধারণ দখল ছিল।

শারীরিকবিপর্যয়ঃ

সাতচল্লিশ বছর বয়সে উৎপল দত্তের ডায়াবেটিস ধরা পড়ল। খাঁটি শিল্পীর বদগুণগুলো তাঁরও ছিল – শরীরের উপর ভয়ানক অত্যাচার; নিয়ম-কানুনে পরোয়াহীন। ১৯৮৩-৮৪'র দিকে উৎপলের শরীর আরও খারাপ হয়।

১৯৮৯ সাল থেকে, বলা চলে শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল তাঁর; ১৯৯০-৯১ সাল থেকে আরও বিপর্যস্ত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে শোভা সেন জানিয়েছেন –

> উৎপলের স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে না। নানা রকম উপসর্গ, ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবেটিস, এই দুই রোগই ওর শরীরটাকে কবজা করে ফেলেছে। ওকে সাবধানে রাখাও শক্ত, ডাক্তাররা যা যা করতে বলবে, মেনে চলতে বলবে, বা খেতে নিষেধ করবে, ও তা কিছুতেই মানবে না। ও ভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই ও খুঁজে পায় না।[৬৮]

১৯৯৩ সালের ৩০শে জানুয়ারিডায়ালিসিসের জন্য কলকাতায় বেলভিউ নার্সিং হোম-এ উৎপলকে ভর্তি করা হয়। ফেব্রুয়ারীতে বাসায় আসলেও শরীর খুবই খারাপ। ৩রা মার্চ আবার হাসপাতালে ভর্তি, ৪ মার্চ থেকে ডায়ালিসিস শুরু হয়। ৯ই মার্চ ডায়ালিসিসের পর একটু সুস্থ। ডাক্তারের অভিমত কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের উদ্দ্যেশে ২২শে মার্চ বোম্বে গেলেন। অপারেশন সম্ভব নয়, তাই ওখানে ডায়ালিসিস চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত–হোম ডায়লিসিসের, অপারেশন হবে না। এরই মাঝে হাসপাতাল থেকে বোম্বের ফ্ল্যাটে এসেই উৎপল তাঁর রাজনৈতিক রচনা *প্রতিবিপ্লব* বিপুল উদ্যমে লিখতে শুরু করেন। এই বই তাড়াতাড়ি শেষ করার তাগিদ বোধ করেছেন উৎপল। যেদিন ফ্ল্যাট-এ আসেন, সেদিনই প্রতিবেশী বসন্ত ইন্দোলকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন ; টেবিল, চেয়ার দিতে। বারান্দায় বসে লিখবেন। যেদিন ডায়ালিসিস থাকে না সেদিন সকালে ওঠেই চা খেয়ে লিখতে শুরু করেন। খানিকক্ষণ লেখেন, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করেন এভাবেই *প্রতিবিপ্লব* লেখা দ্রুত এগিয়ে চলে । কলকাতায় পৌঁছেই উৎপল এম সি সরকারকে পুরো পাণ্ডুলিপি দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন । ওদিকে সপ্তাহে তিনদিন বম্বে হাসপাতালে ডায়লিসিস চলতে লাগল। ১৪ই এপ্রিল কলকাতায় ফিরে এলে কলকাতার পিজি হাসপাতালে সপ্তাহে তিনদিন ডায়লিসিস করতে যেতেন । শরীর যখন প্রচণ্ড খারাপ তখনও কেউ শরীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সবসময়ই একটা উত্তর দিতেন উৎপল–'ফার্স্টক্লাস নো কমপ্লেইন'। ৫ই জুলাই উৎপল চোখ দেখাতে সস্ত্রীক গেলেন বোম্বে। বোম্বে হাসপাতালে ডায়ালিসিসও করলেন। ১২ই জুলাই কলকাতায় ফিরে চোখের ডাক্তার দেখালেন। নাট্যযোদ্ধা উৎপল শারীরিক অসুস্থতার জন্যে বেশ কিছু দিন নাটক করতে না পেরে অস্থির হয়ে ওঠেন। ডাক্তারদের সাথে কথা বলে অনুমতি নিয়ে *একলা চল রে* নাটকে ২১শে জুলাই-এর শো-তে অভিনয় করেছেন বলে শোভা সেন জানিয়েছেন। 'উৎপল দত্ত: সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি'তে নৃপেন্দ্র সাহা জানিয়েছেন–২রা আগস্ট রবীন্দ্রসদনে *একলা চল রে* নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। ২১শে জুলাই হোক আর ২রা আগস্টই হোক *একলা চল রে* নাটকেই তাঁর শেষ অভিনয়। ১৮ই আগস্ট রাত ৮টা পর্যন্ত *ব্যারিকেড* পুনঃপ্রযোজনার মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছেন তিনি।

মহাপ্রয়াণঃ

১৯শে আগষ্ট পি জি হাসপাতাল থেকে ডায়লিসিস শেষকরে উৎপল দত্তকে বাসায় নিয়ে আসা হয় বলে শোভা সেন জানিয়েছেন;আগের দিন রাত থেকেই জ্বর নিয়েও খুব কষ্ট করে 'নন্দন' এর জন্য একটা লেখা তৈরি

করছিলেন তিনি। ডায়লিসিসের পর উৎপল খুব জ্বর নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ডায়লিসিসের মধ্যে আগেও জ্বর হওয়াতে শোভা সেন তেমন দুশ্চিন্তা করেননি। শোভা সেন উৎপল দত্তের জীবনের সায়াহ্ন-বেলা সম্পর্কে লিখেছেন–

> বাড়িতে পৌঁছে আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। নিচে বসল না। একেবারে ওপরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়বে। যেমন রোজকার রুটিন। কিন্তু দেখছি বেশ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সঙ্গে একটা অস্বস্তি খেতে বসে খেতে পারলো না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। আমি কাছে এসে একটু স্যুপ খাওয়ার চেষ্টা করলাম । জিভের নিচে সরবিট্রেট দিলাম। বিছানায় শুয়ে বুকের যন্ত্রণা বাড়ল। ওঠে ও যন্ত্রণা। শুয়ে বসে ও যন্ত্রণা, প্রচণ্ড বুকের ব্যথা ও গলায় ঘর ঘর আওয়াজ - কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। স্যুপটা দু চামচ খেতে না খেতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, যন্ত্রনা কমেছে, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এ যে তার শেষ নিদ্রা বুঝতে পারিনি।[৬৯]

উৎপল দত্তের মৃত্যুর খবর পেয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে খ্যাত অখ্যাত অসংখ্য মানুষ এসেছেন তাঁদের প্রিয় উৎপলকে দেখতে। উৎপল দত্তের মৃত্যুতে শোভা সেন একা হয়ে গেলেও তাঁরঅসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ ব্যক্ত করেছেন।

বাংলা নাটকের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত চৌষট্টি বছরের জীবনে অর্ধশতাব্দীব্যাপী অভিনয়, নাট্যরচনা,পরিচালনার ত্রয়ীকর্মে কেবল ছুটেছেন, ছুটেছেন এবং ছুটেছেন। নিরন্তর ছুটে চলা দুরন্ত নাট্যযোদ্ধা – একবারই থেমেছেন,একেবারে মহাপ্রয়াণে; কলকাতার টালিগঞ্জের কল্লোলে ১৯৯৩ সালের১৯শে আগস্ট, রোদেলা দুপুরে ৩টা ৩০ মিনিটে।নিকোলাই অস্ত্রভস্কি তাঁরই*স্পা*তউপন্যাসে মন্তব্য করেছেন –'জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এই জীবন মানুষ পায় মাত্র একবারই।তাই এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ বলতে পারে তার সমগ্র জীবন,সমগ্র শক্তি সে ব্যয় করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো আদর্শের জন্যে মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে।'[৭০] উৎপল দত্তের জীবন ও নাট্যচর্চার দিকে আলোকপাত করলে আমরা দেখতে পাই, তিনিওতাঁর সমগ্র জীবন,সমগ্র শক্তি ব্যয় করেছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো আদর্শ, মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের মতবাদ মার্কসবাদকে বাংলা নাটকে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটককে রেভ্যুলিউশনারী থিয়েটারে উন্নীত করার প্রয়াসে।

তথ্য নির্দেশঃ

১.উৎপল দত্ত, *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*,কলকাতা,২০০৫,নাট্যচিন্ত, পৃ.১৫
২.উৎপল দত্ত, যে নাটকের রাজনীতি ভুল,তার সব ভুল (সুরজিৎ ঘোষের নেয়াএকটি সাক্ষাৎকার), *দেশ*,কলকাতা, ৩০.০৩.১৯৯১,পৃ.৩৫
৩.*উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন*,নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি,কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ, পৃ. ৪৯০
৪. পূর্বোক্ত,পৃ.৪৬৪-৬৫
৫ *দেশ*, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৫
৬.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত,পৃ.০৯
৭.*উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন*,পূর্বোক্ত,পৃ.৪৬৪
৮.পূর্বোক্ত, পৃ.৫০৬
৯.পূর্বোক্ত, পৃ.৪৬৫
১০.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.১০
১১.*উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন*,পূর্বোক্ত, পৃ.৫০৬
১২.পূর্বোক্ত,পৃ.৫০৬
১৩.পূর্বোক্ত, পৃ.৫০৭
১৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৫০৭
১৫.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩
১৬.*উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন*,পূর্বোক্ত, পৃ.৫১১
১৭.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত,পৃ.১৫
১৮.পূর্বোক্ত, পৃ.১৭
১৯.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯
২০.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯
২১.পূর্বোক্ত, পৃ.২০
২২.পূর্বোক্ত, পৃ.২১
২৩.পূর্বোক্ত, পৃ.২১
২৪.পূর্বোক্ত, পৃ.২২
২৫.পূর্বোক্ত, পৃ.২২
২৬.পূর্বোক্ত, পৃ.২৩
২৭.শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লালদুর্গ*, কলকাতা,১৯৯৬,এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, পৃ.৪২
২৮.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত,পৃ.২৪
২৯.শোভা সেন,পূর্বোক্ত,পৃ.৪২
৩০.পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫
৩১.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
৩২.শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৮২
৩৩. দর্শন চৌধুরী, *থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত*, কলকাতা, ২০০৭, সাহিত্যপ্রকাশ, পৃ.৩৫১
৩৪.পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫১
৩৫.পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫১
৩৬.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৮
৩৭.শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৭
৩৮.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৫
৩৯ শোভা সেন,পূর্বোক্ত, পৃ.৯৪
৪০.পূর্বোক্ত, পৃ.৯৮-৯৯

৪১.পূর্বোক্ত, পৃ.৯৯
৪২.পূর্বোক্ত, পৃ.১০০
৪৩.পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭
৪৪.পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭-১৮
৪৫.পূর্বোক্ত, পৃ.১২০-২১
৪৬.পূর্বোক্ত, পৃ.১৮২
৪৭.উৎপল দত্ত,পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪-৩৫
৪৮.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৬
৪৯.পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬
৫০.পূর্বোক্ত, পৃ.৩৮-৩৯
৫১.শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৯০
৫২.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯
৫৩.শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯
৫৪.দর্শন চৌধুরী,পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬০
৫৫.উৎপল দত্ত,ভূমিকা,*নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লি:, পৃ. ৫
৫৬.উৎপল দত্ত, উদ্ধৃত (নাট্য আকাদেমির স্মরণসভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাব),*পশ্চিম বঙ্গ*,উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা,১৪০৮, পৃ.০৭
৫৭..Utpal Dutt,*Towards A Revolutionary Theatre*,Calcutta,1995,M.C. Sarkar & Sons LTD, page. 35
৫৮.ibid,page. 34
৫৯.উৎপল দত্ত, *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫
৬০.পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
৬১.Utpal Dutt, ibid, page.36
৬২.শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯২
৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ.৪৮
৬৪.পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫
৬৫.পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
৬৬.সৌমেন চট্টোপাধ্যায়,পূর্বোক্ত,পৃ.৪৬৭
৬৭.সুরজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত,পৃ.৪৫
৬৮. শোভা সেন,পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৪
৬৯.পূর্বোক্ত, পৃ.৩৮০-৮১
৭০.নিকোলাই অস্ত্রভস্কি,*ইস্পাত*,দ্বিতীয় ভাগ,তাসখন্দ,১৯৮৬,রাদুগা প্রকাশন, পৃ.২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক

নাট্যকার উৎপল দত্ত শতাধিক নাটক লিখেছেন;যার মধ্যে রয়েছে – পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক, যাত্রাপালা, পথনাটক, একাঙ্ক এবং রূপান্তরিত নাটক। তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকের সংখ্যা একত্রিশ; নাটকগুলো হল :*ছায়ানট*, *অঙ্গার*, *ফেরারী ফৌজ*, *কল্লোল*, *অজেয় ভিয়েতনাম*, *একটি তলোয়ারের কাহিনী*, *তীর*, *মানুষের অধিকারে*, *রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া*, *ক্রুশবিদ্ধ কুবা*, *লেনিনের ডাক*, *সূর্যশিকার*, *ঠিকানা*, *টিনের তলোয়ার*, *মহাবিদ্রোহ(টোটা)*, *দুঃস্বপ্নের নগরী*, *লেনিন কোথায়*, *এবার রাজার পালা*, *তিতুমীর*, *স্তালিন-১৯৩৪*, *দাঁড়াও পথিকবর*, *আজকের সাজাহান*, *মহাচীনের পথে*, *বণিকের মানদণ্ড*, *অগ্নিশয্যা*, *নীল সাদা লাল*, *একলা চল রে*, *লালদুর্গ*, *জনতার আফিম*, *মীর কাসিম*, *কৃপাণ*।

উৎপল দত্ত এক যুগেরও বেশি সময় নাট্যাভিনয়,নাট্যপরিচালনার প্রায়োগিক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে ব্যাপক অধ্যয়নজাত তত্ত্বগত প্রস্তুতির পর গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। গণনাট্য সংঘই গণমানুষের নাট্যভাবনায় উৎপলকে উদ্বেল করে তোলে। চেতনার এই রূপান্তরের পর যে ধরনের নাটক উৎপল দত্তরচনা ও প্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন তার অনুপস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তাঁকে নাটক লিখতে হয়েছে। নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যকার হিসেবে অভিষেক হওয়ার উপলব্ধি ও অনুভবের কথা জানিয়ে লিখেছেন :

> প্রধানত শোভা সেনের নাছোড়বান্দা তাগিদে আমি মৌলিক নাটক লিখি- 'ছায়ানট'। নাটক লেখা আমার কল্পিত ভবিষ্যৎ-ছকে কোনওদিনই ছিল না। পথ-নাটিকা লিখতাম, কিন্তু মঞ্চের পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার যোগ্যতা আমার আছে এমন চিন্তাও মাথায় আসেনি। এখনও আসে না। কিন্তু উর্দুতে বলে – মজবুরন। নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম, কেননা অনেক খুঁজেও আমরা যে নাটক চাই তা পাইনি। কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল তৎকালীন গণনাট্য। 'প্রগতিশীল নাটক' বলতে যা বোঝায় তা অন্য কোন দল করলে সাধুবাদ জানাতে কার্পণ্য করিনি। কিন্তু লিটল থিয়েটার চাইছিল মৃদু প্রগতির ফিসফিস নয়, টালমাটাল বিপ্লবের কর্কশ হুঙ্কার। 'ছায়ানট' আমার হাতে খড়ি মাত্র। ভবিষ্যতে বৈপ্লবিক কিছু লিখতে গেলে আগে সহজ কিছুতে হাত পাকানো উচিত – এরকম একটা আইডিয়া মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল শোভা, এবং ঘড়ি ধরে কাজ আদায় করে নাটক সম্পূর্ণ করেছিল।[১]

*ছায়ানট*কে উৎপল দত্ত তাঁর হাতেখড়ি বললেও তাঁর জীবন ও নাট্যচর্চায় আলোকপাত করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই ইংরেজিতে ছাত্রজীবনে লেখা *Betty Belshazzar*-ই তাঁর প্রথম মৌলিক নাট্যরচনা তারপর পথনাটক এবং *ছায়ানট*-এ হাত পাকিয়ে *অঙ্গার* লিখে সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছেন;বাকি জীবন ওই চূড়াতেই

অবস্থান করেছেন, তবে সবসময় যে পরিবেশ অনুকূলে ছিল তা নয়; অনেক সময়ই তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে বিরুদ্ধ বাস্তবতা ওপ্রতিকূল পরিস্থিতির।

নাট্যকার উৎপল দত্তের পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকের অভিষেক ঘটে - কলকাতার চিত্রজগতের চিত্রতারকাদের উত্থান-পতনের নেপথ্যলোকের কাহিনী-নির্ভর নাটক*ছায়ানট*দিয়ে। *ছায়ানট*-এর পটভূমি কলকাতার চিত্রজগৎ। এ-নাটকেদেখা যায়'সিনেমার হিরো' মনোজের হঠাৎ উত্থান ও হঠাৎ পতন, সুচরিতার মত উচ্চাভিলাষী নায়িকা; আরও নানান চরিত্র। *ছায়ানট*-এ অর্থলোলুপ প্রযোজক গোবর গণেশ, চুরি বিদ্যায় পারদর্শী চিত্রনাট্যকার ও সঙ্গীতপরিচালক, উদ্ভট সংবাদ-সন্ধানী মিথ্যা রোমাঞ্চ খোঁজার প্রয়াসে ব্যস্ত পত্রিকা সম্পাদকের ভূমিকা পাঠক-দর্শকের কাছে হাস্যকর বলেই প্রতিভাত হয়েছে। *ছায়ানট* ১৯৫৮ সালের ১০ ডিসেম্বর লিটল থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়েছে। পপুলার লাইব্রেরি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৯ সালে পরে উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ডে ১৯৯৪ সালে।

বড়ধেমো কয়লাখনির শ্রমিক জীবনের আলেখ্য *অঙ্গার*-এর রচনাকাল ১৯৫৯ সাল। আসানসোল শেলডন কোলিয়ারীতে শ্রম-ঘাম-শোণিতে কাজ করে দীনু, বিনু, সনাতনসহ আরো অনেকে, আর স্বপ্ন বুনে মনে মনে, যেমন বুনেছিল কোলিয়ারি শ্রমিক বিনু – শুশুনিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে ছোট্ট একটু বাগান আর একখানা বাড়ি, মা তুলসী তলায় প্রদীপ দেবে, বোন সুমী শাঁখ বাজাবে। এদের প্রায় সবারই আছে স্বজন-সংসার। বিনু এক স্বাপ্নিক যুবক, ভালবাসে পুষ্প-প্রেমিক স্বাপ্নিক কিশোরী রূপাকে; রূপাও স্বপ্ন দেখে, বাগান করবে, ফুল ফুটাবে।

শটফায়ারার দীনু (দীননাথ) পরম মমতায়, আদরে-শাসনে বিনুকে শটফায়ারের কাজ শেখায়। খাদে গ্যাস জমা হয়েছে, বাতিতে নীলচে আভা; গ্যাস জমা হলে যে-কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকেই যায়। অথচ মাইন ইন্সপেক্টার বলছে গ্যাস নেই। কিন্তু শটফায়ারিং সর্দার দীনু মুখুয্যের ভুল হয়নি। তাকে খাদে পাঠানো হল এবং যথারীতি দুর্ঘটনাও ঘটল;দীনুর অনুমানই ঠিক ছিল, কয়লার খাদে গ্যাস জমেছিল; দুর্ঘটনার পর খাদে রেসকিউ টিম দীনুকে উদ্ধার না করে বরং মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছে। কোম্পানি শুধু দীনুর মৃত্যুর ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়নি মৃত্যুর পর আলামত নষ্ট করেছে, তার মুখ ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করেছে। নিযামপুর বাজারের কাছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে উলঙ্গ করে শটফায়ারার দীনুনাথ ও তার সহকারী কালুসিংয়ের লাশ ফেলে দিয়েছে। ঘটনা তদন্তের সময় এ্যাডভোকেট দুর্গাদাসের প্রশ্ন এবং প্রশ্নের শেষের দিকে তার বক্তব্য থেকে কোম্পানির কর্মকাণ্ড তথা শোষণের চেহারা সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়:

> কোম্পানি দুই অপরাধে অপরাধী। প্রথম, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে গ্যাস জমতে দিয়ে তারা খনিটাকে একটা বারুদের গাদায় পরিণত করেছেন এবং বিনা ল্যাম্পে সে খনিতে শট্ফায়ারিং করতে পাঠিয়ে দীননাথ মুখুয্যে ও তার সহকারী কালু সিংকে তারা পরোক্ষভাবে হত্যা করেছেন। দ্বিতীয়, ক্ষতিপূরণ দেয়া এড়াবার জন্য এবং সরকার তথা

> দেশবাসীর কাছে তাদের কলঙ্ক ঢাকবার জন্য তারা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেন ও কেউ যাতে সনাক্ত করতে না পারে সেজন্য নিষ্ঠুরভাবে তারা মৃতদেহের মুখ বিকৃত করে দিয়েছেন।[২]

দীননাথের মৃত্যুর কোনকিছু প্রমাণ করা যায়নি।তাই তদন্তের ফলাফল মালিকের পক্ষেই যায়। খাদে আবার গ্যাস জমে। সবমজুররা খাদ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। খাদ যেন মরণ ফাঁদ, শ্রমিকরা উত্তেজিত; কিন্তু মি.দত্ত জানান কোম্পানির বড় বড় এক্সপার্টরা যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে বলেছেন খাদে গ্যাস নেই। দীননাথকে খাদে পাঠাবার সময়ও একই কথা বলা হয়েছিল।শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নেয় যতদিন না গ্যাস পরিষ্কার হচ্ছে ততদিন হরতাল –পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে মজুররা যখন বিপর্যস্ত তখনই কোম্পানির পক্ষ থেকে এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মি. দত্ত ও সুবাদার মহাবীর সিং আসে লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে – কোম্পানি একজন শট্ফায়ারার ও এক গ্যাং মালকাটা চায়। এদেরSpecial Bonusদেওয়া হবে, প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে এবং সেই সঙ্গেstrike period-এর পুরো পাওনা time rate হিসেবে ধরে দেওয়া হবে। এতকিছু দেয়ার উদ্দেশ্য হল খাদে যে গ্যাস নেই এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা। শ্রমিকদের আরও একটি টোপ দেয় মি. দত্ত – মহাবীর সিং ম্যানেজারের নির্দেশে মজুরদের সঙ্গে খাদে যাবে।

মজুরদের একদিকে দেড় মাস ধরে অসহনীয় দুর্ভোগ, ঘরে ঘরে অন্নের হাহাকার; অন্যদিকে লোভনীয় প্রস্তাবে দ্বিধাগ্রস্ত শ্রমিকরা; এমন পরিস্থিতিতে বিনুরা খাদে নামবে বলে কনট্রাক্ট সই করে। ইতোমধ্যে খবর আসে এদেরই এক শ্রমিকভাই কুদরতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এরকম পরিস্থিতিতে বিনু ঘোষণা দেয় – খাদে তারা নামবে না। শ্রমিকদের মধ্যে গনেশের দুটো বাচ্চা ইতোমধ্যে মরে গেছে, হৃষিকেশেরও মরার অবস্থা, আর কেউ মরলে বিনুই দায়ী হবে বলে আরিফ শাসায় বিনুকে। মালিকের টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে বলে বিনুর মা-ও ভুল বুঝে বিনুকে। খেতে বসে না খেয়ে বিনু ওঠে চলে যায়;নরখাদে নামে বিনু, সঙ্গে আরও ছ'জন ।

খাদে বিস্ফোরণ হয়; আগুন লাগে। রেসকিউ টিম খাদের মুখ বন্ধ করে দেয়, সেই সাথে ভূগর্ভস্থ জলের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। গ্যাস জমে থাকায় খাদেনামা ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও মালিকের মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের প্রয়োজনে বিষাক্ত খাদে নামে বিনুরা। দুর্ঘটনা ঘটার পর মালিকপক্ষ খাদের মুখ সিল করে জলের প্লাবন তৈরি করে, আর ব্যাকুল প্রতীক্ষারত শ্রমিকদের স্বজনদের সঙ্গে করে প্রতারণা–যেন তাদের উদ্ধার করার জন্যই এতো আয়োজন। মালিকের খনিরক্ষার লোভনীয় আবর্তে জলের প্লাবনে হারিয়ে যায় বিনুরা সাতজন। মালিকের লোভ-লালসায় বিনুর স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়।মালিকের কাছে শ্রমিকের জীবনরক্ষার চেয়ে খনিরক্ষাই বড়। মালিক বুঝে শুধু মুনাফা;তাদের কাছে মুনাফার চেয়ে বড় কিছু নেই।মালিক পক্ষ শ্রমিকদের বাঁচাবার চেষ্টা না করে কয়লা বাঁচাবার চেষ্টা করেছে; তাদের তুলতে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তার চেয়ে অনেক বেশিপরিমাণ লাভ হবে কয়লা আগুন থেকে রক্ষা পেলে। মজুরদের জীবনের মূল্যের চেয়ে কয়লার মূল্য মালিকের কাছে অনেক বেশি। খনিগর্ভের অতল জলে ডুবে যেতে যেতে মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে সনাতন ডাক দিয়ে যায় এভাবে যেন আর কোন শ্রমিককে জীবন দিতে না হয়। জলের ঢেউ সকলকে(সাতজনকে) গ্রাস করার মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি।

অঙ্গার-এর আগে কোলিয়ারি শ্রমিকদের জীবনের এতো নিখুঁত, বাস্তব ও অনুপুঙ্খ চিত্র বাংলা নাটকে দেখা যায়নি। শোষকশ্রেণি তথা মালিকপক্ষের মুনাফা তথা অর্থলোলুপতা এবং শ্রেণিস্বার্থ কতটা নগ্ন হতে পারে তার পাশাপাশি শ্রমিকদের জীবনে নেমে আসা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির সুনিপুণ চিত্র এ-নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বাস্তব চিত্র উপস্থাপনের জন্য (কিছুদিন আগে বড়ধেমো কয়লাখনি দুর্ঘটনা এবং তার আগে চিনাকুড়ি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে) উৎপল দত্ত চলে যান বড়ধেমো কয়লাখনিতে;সঙ্গে ছিলেন রবি ঘোষ, নির্মল গুহ রায়, তাপস সেন ও তার সহকারী রবিন দাস আর উমানাথ ভট্টাচার্য। তাঁরা দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে সবকিছু দেখে-শুনে শ্রমিকদের চাল-চলন,কথাবার্তা তাদের জীবনাচরণ, খনির ভেতরের-বাইরের পরিবেশ, নানারকম শব্দতরঙ্গ ধারণ করে নিয়ে আসেন।

> এবার নাটক লেখা শুরু হল।...দরজা বন্ধ করে চলল লেখা। সে এক তপস্যা। ...এইভাবে দিনপনেরো লাগলো নাটক লেখা শেষ করতে।[৩]

উৎপল দত্তের পরিচালনায় নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে **৩১**শেডিসেম্বর **১৯৫৯** সালে। ঐ বছরই গ্রন্থম কর্তৃকপ্রকাশিতহয়; পরে নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ডে। নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে চিত্ত চৌধুরীকে– যিনি এ-নাটককে মঞ্চে রূপায়িত করে তোলার প্রধান ঋত্বিক; 'কালো হীরে' নাম বদলে *অঙ্গার* নামকরণ করে যিনি নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে নাট্যকারের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। *অঙ্গার*-এর শততম রজনীর উৎসবে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন কোনো 'সেলিব্রেটি' বা 'বিশেষ ব্যাক্তিত্ব' নয়– এসেছিলেন বড়ধেমো কয়লাখনির সেই সাতজন মজদুর যাঁরা একুশদিন আটকে ছিলেন সুড়ঙ্গের মধ্যে – যাঁদের জীবনকাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছিল *অঙ্গার*। রবিশঙ্করের সঙ্গীত,তাপস সেনের আলো, নির্মল গুহ রায়ের মঞ্চসজ্জা, কোরিওগ্রাফি আর সকলের সমবেত অভিনয়ে *অঙ্গার* সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছিল।*অঙ্গার* একদিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে এনেছে আর্থিক সাফল্যও। এলটিজি-র টিকে থাকা না থাকা নির্ভর করছিল *অঙ্গার* নাটকের উপর। দেনার দায়ে অবস্থা তখন এমন হয়েছে যে এ-নাটক সফল হলে এলটিজি-র মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নেয়ার চ্যালেঞ্জ সফল হবে আর না হলে এলটিজি-কে মিনার্ভা ছেড়ে দিতে হবে। *অঙ্গার*-এর অভিনয় দেখে দর্শকবৃন্দ ভীষণ মুগ্ধ হয়েছেন। নাটকের সেট ও আলো এনেছে বিপ্লব, সংগীত দিয়েছে অসাধারণ প্রাণ। আর উৎপল দত্তের পরিচালনার মুন্সিয়ানার কথা বলাই বাহুল্য।

> এই প্রথম শ্রমিক জীবন ওঠে এল ভারতীয় তথা বাংলা মঞ্চে। আমরা প্রথম থেকেই টের পাচ্ছিলাম দর্শকের ভলোলাগার স্পর্শ। প্রতি শো-এর পর নজন শ্রমিকের জন্য চোখে জল নিয়ে অভিভূত দর্শকেরা স্তব্ধ হয়ে সীটে বসে থাকতেন কিছুক্ষণ। একএক দিন কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে গেছে। শেষ দৃশ্য এতই হৃদয়বিদারক, তার সঙ্গে রবিশঙ্করের সঙ্গীত এমনই শ্বাসরোধকারী যে দর্শক নাটকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যেতেন। ...মালিকের নির্মম লোভ শ্রমিকদের জীবনে প্রতিনিয়ত কী বিপদ কী অনিশ্চয়তা টেনে আনে তা এই প্রথম দর্শক দেখল, জানল, বুঝল।...ভাঙা চেয়ার, ভাঙা হাউস যার চাল দিয়ে বর্ষায় জল পড়ে, গরমে মানুষ সেদ্ধ হয়, বাথরুমের দুর্গন্ধ। কিন্তু দর্শকের ভলোবাসায় সে-সব তুচ্ছ হয়ে যায়। আমরা ঋণগ্রস্ত দল এবার ঋণমুক্ত হলাম।[৪]

এত অসাধারণ সফল নাটকের বিরুদ্ধেও বিষোদগার থেমে থাকেনি। বড়লোকদের পত্র-পত্রিকার অভিযোগ শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার হয় তা মিথ্যা। গণনাট্যেরনেতৃস্থানীয় কিছু কর্মী নাটকে কলাকৌশলগত প্রাধান্যের অভিযোগও তোলেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন:

> অভিনয়কে নাকি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যান্ত্রিক কলাকৌশল। পক্ষান্তরে হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রায় টেবিল চাপড়ে লিটল থিয়েটারকে সমর্থন করলেন; বললেন: বিষয়বস্তুর দিক থেকে একটুও আপোষ না করে পেশাদার থিয়েটারের সাম্রাজ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে লিটল থিয়েটার। আসলে যাঁরা রব তুলেছিলেন আঙ্গিকের স্টিমরোলারের তলায় পবিত্র নাটক-বস্তুটি গুঁড়িয়ে গেছে, তাঁরা থিয়েটারের সামগ্রিকতাই কোনওদিন বোঝেননি। তাঁরা থিয়েটার বলতে চিরকাল বুঝেছেন,শুধু নাটক ও অভিনেতা। তাঁরা প্রাচীন স্বেচ্ছাসেবী একক অভিনেতাদের যুগের মানুষ,আধুনিক যুগের নন। তাঁরা কখনও শেখেননি,থিয়েটার হচ্ছে পরিচালকের হাতে একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম যার মধ্যে দৃশ্য, আলো, সংগীত, অভিনয়, নেপথ্য-ধ্বনি সব একত্রীভূত।তা ছাড়া অঙ্গারের অভিনয় আঙ্গিকের তলায় হারিয়ে তো যায়ইনি, আঙ্গিকের সোপান বেয়ে আরও সহজে আরোহণ করেছিল সাফল্য শিখরে। ১১৫০টি অভিনয়ে কোনও দিন কোনও আসন খালি ছিল বলে মনে পড়ছে না। শত শত চিঠিতে ভরে গেল মিনার্ভার দপ্তরের টেবিল,ক্রমশ চাপা পড়ে গেল 'আঙ্গিক-আঙ্গিক' আর্তরব। শত ত্রুটি সত্ত্বেও অঙ্গার সংগ্রামী শ্রমিকদের নায়ক করে মঞ্চে তুলেছিল, বিদ্রোহী মজদুরদের ধর্মঘটের শ্লোগানে গিরিশবাবুর মিনার্ভার ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন হয়নি,পূর্ণ ও সার্থক হয়েছিল,এই আমাদের ধারণা।[৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রক্তকরবী*ও খনি শ্রমিকদের নিয়ে লেখা। উৎপল দত্ত*জপেন দা জপেন যা* গ্রন্থে রবি ঠাকুরের মূর্তি প্রবন্ধে *রক্তকরবী* সম্পর্কে লিখেছেন –

> রক্তকরবী দৃষ্টিগ্রাহ্য কতকগুলি ঘটনা ও প্রতীকের সাহায্যে অতি মনোহর খাঁটি বাংলা ভাষায় এমনভাবে তুলে ধরেছে এ-যুগের শ্রেণীসংগ্রামের সারবস্তুটিকে যা শুধু মগজে আঘাত করে না,হৃদয় আলোড়িত করে।... শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য মজদুরকে কী করে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে বাধ্য করে পুঁজিপতিরা তার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন মার্কস। তিনি দেখাচ্ছেন প্রক্রিয়াটা বৃত্তাকার সীমাহীন ঘানিতে বাঁধা বলদের মতন। এই অনাদি অনন্ত শ্রমের ফলে মজদুর বিয়োজিত হয় সব সুকুমার বৃত্তি থেকে, হারায় ব্যক্তিত্ব,রুচি,কৃষ্টি,ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এমনকী ফিউদাল শোষণে ভূমিদাসের যে গ্যারান্টিগুলি ছিল, পুঁজিবাদের সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক শোষণে শ্রমিক সে গ্যারান্টিও হারায়। এই তত্ত্বই 'রক্তকরবী'তেএসেছে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করে। যক্ষপুরীর শ্রমিকদের নাম গেছে হারিয়ে, পিঠে আঁকা ৪৭ ফ আর ৬৯ জ সংখ্যাই তাদের পরিচয়। তাদের মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়েছে,তারা এক অন্ধ শোষণযন্ত্রের নাটবল্টু।
>
> বিশু যখন বলে–
> একদিনের পর দুদিন,দুদিনের পর তিন দিন; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি,এক তালের পর দু তাল,দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোন অর্থে পৌঁছায় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা।[৬]

রক্তকরবী-র শ্রমিকদের যেমন ব্যক্তি মানুষের পরিচয় মুছে যায়, তারা যেমন হারিয়ে যায় সংখ্যায়, তেমনি *অঙ্গার*-এর শ্রমিকদেরও পরিচয় নির্ণীত হয়েছে সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উৎপল দত্তের শ্রমিকদের কথা

বলার ভঙ্গী ভিন্ন হলেও মূলত তাদের জীবন ও জীবনের সঙ্কট অভিন্ন। *অঙ্গার* নাটকের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবেই কয়লাখনি নিয়ে লেখা হ্যারল্ড ব্রিগহাউসের *দি প্রাইস অফ কোল* এবং জো কোরির *হিউআর্স অফ কোল* (একাঙ্ক)-এর কথা স্মরণে আসে।

ফেরারী ফৌজ নাটকের পটভূমি তিরিশের দশকের বাংলার ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলন। মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয় ২৮মে ১৯৬১ সালে। প্রথম প্রকাশিত হয় গ্রন্থম কর্তৃক ১৯৬১-তে পরে নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ডে। এ-নাটকে ইতিহাস আছে সত্য, কিন্তু প্রচলিত অর্থে আমরা যাকে ঐতিহাসিক নাটক বলি *ফেরারী ফৌজ* তা নয়। তিরিশের দশকের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড এ-নাটকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার; নিয়ে এসেছেন বর্তমান সময়ের সমান্তরালে - সমকালকে স্পর্শ করে। উৎপল দত্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে নাট্যকারের কথায় জানিয়েছেন:

> ফেরারী ফৌজ ঐতিহাসিক নাটক নয়। অথচ অন্য অর্থে ঐতিহাসিকও বটে। কোনো বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে এ নাটকে চিত্রিত করা হয়নি। আবার তিরিশ দশকের প্রথম ভাগের পূর্ব বাংলায় জেগে ওঠা যুবকদের বজ্রকঠিন মুখগুলোকে সাধারণভাবে সামগ্রিকভাবে এ নাটকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে।[৭]

নাটকের প্রথম দৃশ্যে,শুরুতেই রয়েছে মঞ্চসজ্জার বর্ণনা। গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করে বিবেক, গানের মাঝে সূর্যসেনের মুক্তিপথের নিশানায় মিলিত হবার ও অর্থ-সাহায্যের আহবান জানায়;আবার গান ধরে বিবেক। এমনি দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে উৎপল দত্ত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সাথে যাত্রার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। যাত্রার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় – যে-পরিবেশে অভ্যস্ত দীর্ঘকাল ধরে বাংলার দর্শক, সেই চিরচেনা অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্য দিয়েই উৎপল দত্ত বিবেকের একবার মাত্র আগমনের মাধ্যমে নাট্যঘটনায় প্রবেশ করান কুশীলবদের, সেই সাথে দর্শকও একাত্ম হয়ে যায় ঐ পরিবেশে। এই বিবেক চরিত্রটি দর্শকের চেনা, বাংলার চারণ কবি মুকুন্দ দাশ।

ভুবনডাঙায় শান্তি রায়ের নেতৃত্বে অশোক,জ্যোতির্ময়, কুমুদ, বিপিন, সিরাজুল,অধ্যাপক দেবব্রত ঘোষ এবং শান্তি রায় প্রমুখ দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে দৃপ্ত শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। ইংরেজ তথা ব্রিটিশরা এমনি এমনি এদেশ ছেড়ে যাবে না। সশস্ত্র পথ ছাড়া ব্রিটিশরা ভারত ছাড়বে না। তাই ভারতে ব্রিটিশ তথা ইংরেজ অফিসারদের জীবন এমন বিপন্ন করতে হবে যাতে তারা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়। বিপ্লবীদের বিশ্বাস একটা স্ফুলিঙ্গথেকেই অগ্নিকাণ্ড হয় – তাদের পিস্তলের আগুন থেকেই পুরো দেশে দাবানল লেগে যাবে;তাই এদেরকে বিশেষত অফিসারদের হত্যা করে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা ভারত ছেড়ে চলে যায়। অশোকদের আয়োজন বিচ্ছিন্ন হলেও এ-থেকে জ্বলে উঠবে স্ফুলিঙ্গ– এই আশা ও স্বপ্ন নিয়ে ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্বজন-সংসার-ঘরবাড়ি সব ছেড়ে বিপ্লবীরা এই পথ বেছে নেয়।

অশোকদের প্রথম অপারেশন পুলিশ সুপার উইলমট হত্যা। পুলিশ এ হত্যাকাণ্ডে অশোককে 'আইডেন্টিফাই' করতে পারতো না যদি না জমিদার ব্রজেন চৌধুরী অশোককে'আইডেন্টিফাই' করতেন। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবীরা গোপনে মিলিত হয় বস্তিতে, রাধার ঘরে (রাধা শান্তি রায়ের শিষ্য, জগতের প্রাচীনতম ব্যবসায়ে লিপ্ত)। শান্তিরায়ের নির্দেশে এঁদের পরবর্তী পরিকল্পনা রাধার ঘর থেকে সুড়ঙ্গ কেটে ঐ বটগাছটার তলা পর্যন্ত যেতে হবে। তাতে তিনমাস অসহ্য পরিশ্রম করতে হবে। পালা করে সুড়ঙ্গ কাটতে হবে, দিনে-রাতে। তারপর সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হলে বোমার স্তুপ সাজাতে হবে কবরখানার তলায়। এরপর আরেকজনকে খতম করতে হবে। তাকে গোর দিতে আবার জমা হবে সবাই এস.পি,ডি.এস.পি,এ.এস.পি, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট,আর্মস ইনসপেক্টার, স্টিমার কোম্পানির এজেন্ট। এক আঘাতে এ-এলাকার সব ক'টা শাসককে শেষ করার এই উপায় – এর উপর সকলের মতের ভিত্তিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব পাস হলেও প্রশ্ন থেকে যায়।অশোক প্রশ্ন করে :

> এই হত্যাকাণ্ডের আবশ্যকতা কি? প্রয়োজন কি? উদ্দেশ্য কি? একজন উইলমটকে মারলাম। তার জায়গায় আরেক পুলিশ সুপার আসবে। সে হবে উইলমটের চেয়েও হিংস্র, উন্মত্ত, নিষ্ঠুর। মেরে মেরে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে?[৮]

একের পর এক এরকম হত্যাকাণ্ড নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা, যুক্তি-তর্ক শেষে যে যার আস্তানায় ফিরে যায়। পার্টির তথা শান্তি রায়ের নিষেধ সত্ত্বেও স্ত্রী-কন্যা,মা-বাবার সাথে বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে অশোক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। পুলিশের নৃশংস, পৈশাচিক নির্যাতন এমনকি তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করার পরও অশোকের মুখ থেকে কোনো কথাই পুলিশ বের করতে পারেনি কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে নিজের অজান্তে বলে ফেলে– তাদের সাক্ষাতের স্থান,বিপ্লবীদের আত্মগোপনের জায়গা রাধার ঘরের কথা। পুলিশ রাধার ঘরের খোঁজ পেয়ে এবার অন্য চাল চালে;রটিয়ে দেয়–অশোক সব বলে দিয়েছে। কুমুদের মাধ্যমে পুলিশ এদের অপারেশনের খবর পেলেও যেহেতু সেজে-গুজে সুন্দর কাপড়-চোপড় পরা অশোককে পুলিশের গাড়িতে দেখা যায় তাই মা-বাবাসহ সকলেই অশোককে ভুল বুঝলে অশোক জানায়–

> আমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরো কাহিনীটা ওদের একটা ভাঁওতা, আমার মন ভেঙে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। এবং ওরা কৃতকার্য যে হয়নি একথা বলতে পারি না। রাতের পর রাত আমার চোখে ঘুম নেই। আমি নিঃসঙ্গ একা। দিন হলেই এইসব জামা কাপড় পরিয়ে বসিয়ে দেয় জনসন সাহেবের গাড়িতে। কিন্তু কেউ কি জানে তখন আমার পা থাকে সীটের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা? পাশে থাকে সশস্ত্র প্রহরী? তারপর যখন ওরা জানতে পারল আমি দল থেকে বিতাড়িত,লাঞ্ছিত, মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত, তখন আমাকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করল। জানে এখন আর আমার যাওয়ার জায়গা নেই। যেখানেই যাই,সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই প্রাণভয়ে ভীত মানুষটা পালিয়ে আসবে পুলিশ ক্যাম্পে, কারাগার তার কাছে আশ্রয় এখন। বন্ধুর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় শত্রুর কারাগার।[৯]

সেই সুড়ঙ্গ কাটা যখন শেষ পর্যায়ে তখন রাধার ঘরে তথ্য সংগ্রহে যেয়ে হিতেন আর ফিরে আসে নি, তাকে গুম করে ফেলে বিপ্লবীরা। এদের পরের অপারেশন জনসন হত্যা। রাত দেড়টায় যে পুলের উপর দিয়ে জনসন সাহেবের যাবার কথা রয়েছে সেই পুলের কাছে দেবব্রত, জ্যোর্তিময়, বিপিন, কুমুদ, সিরাজুল প্রমুখ একত্রিত

হয়েছে তাকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে। এ-সময়ে জনসন না এসে আসে ফাদার ফ্ল্যানগান। দেবব্রতের ছোঁড়া বোমায় নিহত হন ফাদার ফ্ল্যানগান। পরবর্তী করণীয়ের জন্য রাধার ঘরে মিলিত হয় সবাই। দেবব্রত সেই হত্যাকাণ্ড থেকে বেহুঁশ। রাধা ছাড়া কেউই শান্তি রায়কে দেখেনি। কেউই জানতো না পুলিশের গুপ্তচর হিসেবে পরিচিত এই নীলমনিই শান্তিরায়। বিপ্লবীদেরই একজন কুমুদ-এর কাছ থেকে তথ্য পেয়ে দেবব্রত আর রাধাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। জনসন সাহেব ঢাকা যাবার পথে তাকে শেষ করার পকিল্পনা নিয়ে অপারেশনে নামলে এই অপারেশনের খবর আগেই কুমুদ ফাঁস করে দেয়ায় নীলমনিরূপী শান্তি রায়, জ্যোতির্ময় পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়। অশোককে গুলি করার পর শান্তি রায় মৃত্যুর আগে জানতে পারে অশোক বিশ্বাসঘাতক নয় – কে যে এদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক, কে বিকিয়ে দিল সমিতিকে, দেশকে, তার নেতাকে?এ কথা অজানাই রয়ে গেল শান্তি রায়দের কাছে।

আপাতদৃষ্টিতে অশোকদের অপারেশন ব্যর্থ মনে হলেও ভারতবর্ষের অসংখ্য শান্তি রায় ও অশোকরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ইংরেজদের জীবন বিপন্ন করেছিল বলেই ইংরেজরা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। বিপ্লবীরা একদিকে স্বজন, সংসার, সমাজ সব ছেড়ে পরাধীন দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে অন্যদিকে তাদের পিছুটান 'লাইফ ইজ বিউটিফুল' –এই দ্বন্দ্বের, টানাপোড়েনের নিখুঁত রূপ দিয়েছেন উৎপল দত্ত *ফেরারী ফৌজ* নাটকে।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের এই আত্মত্যাগ ভারতের ইতিহাসে সেভাবে স্থান পায়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের অবদান,ভূমিকার কথা প্রচলিত ইতিহাস যথাযথভাবে তুলে ধরেনি। প্রচলিত ইতিহাস ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে–স্বাধীনতা এসেছে অহিংস পথে। উৎপল দত্তের ইতিহাসবীক্ষা প্রচলিত ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে আসল ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। তিরিশের দশকের অগ্নিযুগ ও বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড এই নাটকের মাধ্যমে জনতার সামনে উন্মোচন করেছেন নাট্যকার।*ফেরারী ফৌজ* নাটকে মঞ্চকে বহুস্তরে সাজিয়ে যবনিকার ব্যবহার বাদ দেয়া হয়েছিল।*অঙ্গার*-এর মতো *ফেরারী ফৌজ* নাটকেও মঞ্চসজ্জায় অভিনবত্ব ছিল। *ফেরারী ফৌজ* নাটকে রবিশংকরের ধ্রুপদী সংগীত *অঙ্গার*কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল বলে উৎপলের ধারণা। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর বিখ্যাত কবিতার নাম নাটকের সঙ্গে যুক্ত করার অনুমতি দিতে স্বয়ং গিয়েছিলেন *ফেরারী ফৌজ* নাটকের উদ্বোধনী রজনীতে। সে-প্রেক্ষাগৃহে বসেছিলেন বাংলার একশত জন বিপ্লবী, গলায় রজনীগন্ধার মালা পরে, প্রশান্ত চোখে দেখছিলেন তাদের অতীতকে কীভাবে চিত্রিত করেছে আজকের নাটক। ডক্টর দত্ত ইতিহাসের একটা শূন্যস্থান পুরণ করায়, 'শাবাস' বলে উৎপল দত্তকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। *ফেরারী ফৌজ* শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে সঙ্গীত নাটক একাডেমি এ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে নানা বিতর্ক আজও বিদ্যমান। ভারতবর্ষের মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যকে নির্মূল করার জন্য শাসকশ্রেণি অত্যন্ত সুকৌশলে প্রচার করে চলেছে – ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে অহিংস উপায়ে। ছাগলের দুধ খাওয়া, চরকায় সুতো কাটার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। উৎপল দত্ত লিখেছেন :

> আমরা মনে করি, আমাদের আজকের যে লড়াই হচ্ছে ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামেরই উত্তরসূরী, আর ওঁদের যে রাজনীতি আজকে, সেটা হচ্ছে ব্রিটিশের যে দালালি করে ভারতবর্ষকে দুভাগ করেছিলেন, সেই রাজনীতিরই ওঁরা হচ্ছেন উত্তরসূরী। সুতরাং ওঁরা আমাদের রাজনীতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবেন এবং নিজেদের রাজনীতিকেই ওপরে তুলে আনবেন। ... এর বিরুদ্ধে আমাদের ধরতেই হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেইসব অধ্যায়গুলি, যেগুলি ওরা মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে। কারণ ওরা জানে যে এই সমস্ত ইতিহাস যদি মানুষ স্মরণ করে, তাহলে পরে সেই বিরাট মিথ্যাটা ধ্বসে যাবে যে, ভারতবর্ষের মানুষ হচ্ছে অহিংস।...এইটাই ওরা বোঝাতে চেয়েছে যে, ভারতবর্ষের মানুষ – তোমার পেছনে কোনও সংগ্রামী ঐতিহ্যই নেই,তুমি শুয়ে থাকো যাতে আমার শোষণের চক্র শোষণের রথ তোমার উপর দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে চলে যেতে পারে। তা এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্ষেত্রে প্রতিরোধ করতে হবে। শুধু এক-এক জায়গায় নয়,এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে।[১০]

উৎপল দত্ত ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসকে মূল্যায়ন করেছেন বলে তিনি দেখতে পেয়েছেন দিনের পর দিন মিথ্যা ইতিহাস কীভাবে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই মিথ্যাচার চলতে দেয়া যায় না। মানুষের অমেয় সম্ভাবনায় আস্থাশীল দ্রোহী উৎপল তাই ইতিহাস পুনর্নির্মাণ বা নবনির্মাণ করলেন তাঁর নাটকে – তিরিশের যে বিপ্লবীরা নিজের জীবন, স্বজনদের জীবন বিপন্ন করে দেশমাতৃকার মুক্তির মিছিলে সাহসী সদর্প অংশগ্রহণ করলেন সেই পদচারণা যাতে ইতিহাস থেকে মুছে না যায় তাই ধরে রাখলেন*ফেরারী ফৌজ* নাটকে। *ফেরারী ফৌজ* নাটকের ভূমিকা লিখেছেন মন্মথ রায়। তিনি লিখেছেন :

> দেখলাম, নাটক নয়, মহানাটক। বাংলার অগ্নিযুগটি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাঙালীর রাত্রির তপস্যাকে এমন করে কেউ কখনো এমন রক্তোৎপল অর্ঘ্য দেয়নি এর আগে... 'ফেরারী ফৌজ' দেখে গোটা দেশই শুধু অভিভূত হয় নি, সঙ্গীত নাটক আকাদেমীও হয়েছেন মুগ্ধ। আকাদামি পুরস্কার পেয়েছে 'ফেরারী ফৌজ'।কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এ যুগের বাঙালী পেয়েছে অগ্নিযুগের এক সার্থক আভাস, একসার্থক আস্বাদ। ইতিহাসও যা হয়ত করতে পারবে না, নাটক তা পারবে। 'ফেরারী ফৌজ' বাংলার সেই অগ্নিযুগকে বাঁচিয়ে রাখবে,প্রেরণা যোগাবে ভবিষ্যৎ বিপ্লবে – যার পদধ্বনি কান পাতলে শোনা যাবে আজকের এই দুঃসহ জীবন যন্ত্রণায়।[১১]

উৎপল দত্তের অসামান্য রচনা *কল্লোল* /মিনার্ভায়*কল্লোল*প্রথম অভিনীত হয়১৯৬৫ সালে নাট্যকারের ছত্রিশতম জন্মদিনে।*কল্লোল* লেখার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–

> নৌবিদ্রোহ নিয়ে 'কল্লোল' নাটকের প্রথম খসড়া লেখা হয়েছিল ১৯৫৬ সালে,বিশুদ্ধ তথ্যমূলক একটি দলিল হিসেবে। বিদ্রোহী নাবিকদের লেখা প্যামফ্লেট-প্রবন্ধ জোগার করেছিলাম কিছু, কয়েকটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার কাহিনীও লিপিবদ্ধ করেছিলাম বোম্বাইয়ের ওয়াটারফ্রন্টে ও কলকাতার মেটেব্রুজে। এমনকি গুটিকয়েক নিষিদ্ধ প্যামফ্লেট সংগ্রহ করেছিলাম এমন স্থান থেকে যা পুলিশের কাছেও অকল্পনীয়।[১২]

সূত্রধারের ভাষণের মধ্য দিয়ে নাটক শুরু হয়েছে। সুত্রধার রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির নাবিকের পোশাক পরে হাতে মাউথ অর্গান নিয়ে জাহাজের গ্যাংওয়ের ওপর রেলিং-এ দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন হওয়া তথা অহিংস আন্দোলনের ধাপ্পাবাজি এবং সশস্ত্র আন্দোলনের কথা অতঃপর ১৯৪৬ সালের বোম্বাইয়ের নাবিকদের কথা বলেছে :

Dhaka University Institutional Repository

আজ বলবো ঐ নৌবিদ্রোহের কাহিনী চুপি চুপি
... আসলে ও-পতাকা রক্ত লাল
বোম্বায়ের নাবিকদের, ক্রুদ্ধ ছোটলোকদের রক্তে ॥
...আমার গল্পের নায়ক একটি জাহাজ
সামরিক ভাষায় ক্রুজার। তার নাম 'খাইবার'।[১৩]

এই খাইবার(ভারতীয় জাহাজ)-এর নাবিকদের কাহিনী নিয়েই *কল্লোল*। আসলে প্রায় প্রতি জাহাজই খাইবার। খাইবার এখানে তাই প্রতীকধর্মী। সব বিদ্রোহী জাহাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে খাইবার। সমুদ্রে এই জাহাজের নাবিকরা ইটালিয়ান জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করলেও যুদ্ধে প্রাণ হারায় রফিকুল, আহত হয় সাতওয়ালেকর এবং খাইবার জাহাজ ও এর নাবিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এদিকে ওয়াটারফ্রন্ট বস্তিতে বসবাস করে নাবিকদের আত্মীয়-স্বজনরা। তারা তাদের নিখোঁজ স্বজনদের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন। দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগহীন। নাবিকদের পরিবারে অর্থাভাবের কারণে অভাব অনটন দেখা দিয়েছে। খাইবার-এর গানার শার্দুলের স্ত্রীলক্ষ্মী, অভাবের সাথে লড়াই করেআত্মসম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকা যখন রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে তখন তার পাশে সহযোগিতার হাত বাড়ায় নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত পঙ্গু সৈনিক সুভাষ দেশাই। স্বামী শার্দুলকে প্রচণ্ড ভালবাসা সত্ত্বেও জীবনের প্রয়োজনে, বেঁচে থাকার তাগিদে,সুভাষের সঙ্গে লক্ষ্মী একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। খাইবার ফিরে এলে, শার্দুল বস্তিতে গিয়ে সব দেখে শুনে, অভিমানে মা ও স্ত্রীকে ফেলে ফিরে যায় জাহাজে।

১৯৪৬ সালে বোম্বের নাবিকরা তাদের উপর যুগ যুগ ধরে যে-অন্যায়-অবিচার চলেছে তার নিরসন, ভারতীয় নাবিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ,রয়্যাল নেভি ও রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির মধ্যে খাদ্য ও বেতনের বৈষম্য দূর করা,উচ্চপদস্থ অফিসারদের দুর্ব্যবহার বন্ধ করা ইত্যাদি দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলনে নামে। মৌলিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে শুরু হওয়া আন্দোলন ক্রমশ রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। এইচ.এম.আই.এস. খাইবার অর্থাৎ 'হিজ ম্যাজেস্টিস ইন্ডিয়ান শিপ' খাইবার-এর গানার শার্দুল সিংয়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আপোষহীন লড়াই রূপান্তরিত হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে।খাইবার জাহাজের নাবিকরা অফিসারদের বন্দি করে। খাইবার করাচী না গিয়ে যাবে বোম্বাই; চালিয়ে নেবে নাবিকরাই। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সমস্ত নাবিক হরতালে শামিল হয়েছে। 'তলোয়ার' নামক অন্য একটি জাহাজ থেকে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি সাকসেনা জানান সব জাহাজ থেকে আটটি দাবি উত্থাপিত হয়েছে। তবে ঐ দাবিতে ব্রিটিশদের ভারত ছাড়া, ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার দাবি অনুপস্থিত দেখে শার্দুল বলেওঠে :

> আমাদের ধারণা ছিল এটা স্বাধীনতার লড়াই। দাবী হবে একটাই–ভারত ছাড়ো – বিনা শর্তে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।[১৪]

সাকসেনার কাছ থেকে নাবিকরা আরো জানতে পেরেছে বোম্বাই-এর সাধারণ মানুষ যে সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছে কংগ্রেস ঐ সাধারণ ধর্মঘটকে নিন্দা জানালেও শার্দুলের কণ্ঠে আশাবাদ ধ্বনিত হয় –

> বোম্বাইয়ের মজুররা জেনারেল স্ট্রাইক ডেকেছে। মারহাটা ফৌজ গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। আর কি চাই? ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় আগুন জ্বলে যাবে রাজগুরুজী। ডাঙার লড়াই আর জলের লড়াই এক হয়ে যাবে।[১৫]

গোরা ফৌজ কাস্‌ল ব্যারাক্‌স আক্রমণ করে নিরস্ত্র জাহাজিদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করছে।তলোয়ারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে খাইবার-এর কামান গর্জন করে ওঠে – দুশমনের মেশিনগান পোস্ট ধ্বসে যায়। দুশমন পালাতে শুরু করে। এইভাবে খাইবার জাহাজের নাবিকরা অস্ত্র তুলে নেয় হাতে। ক্যাসল ব্যারাকের এই আক্রমণ প্রতিহত করার ঘটনায় অন্য জাহাজের জাহাজিরাও অনুপ্রাণিত হয়। বৈষম্য ও অসম্মান দূর করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখা ও অস্ত্রহাতে এগিয়ে যাবার বার্তা বেতার মারফত পৌঁছে যায় সব জায়গায়; বিদ্রোহের শিখা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র ।

ওদিকে নাবিকদের পরাস্ত করতে না পেরে তাদের বস্তিতে অত্যাচার চালায়; নিহত হয় নাজিম আলী, মোতিবিবিসহ আহত হয় অনেকে। বস্তির মানুষরাও তৈরি হয় পরিস্থিতি মোকাবিলায়। তলোয়ার জাহাজ থেকে কোনো সাহায্য- সহযোগিতা এমনকি যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়। খাইবার জাহাজ জলবন্দি হয়ে পড়ে;তাদের খাবার নেই পানি নেই। কেবল পঙ্গু সুভাষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাবার পৌঁছে দেয় খাইবারে।

বিদ্রোহীদের অব্যাহত লড়াইয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। কংগ্রেস যে রক্তপাতহীন অহিংস স্বাধীনতা চায় এর রূপ ভিন্ন। অহিংস লড়াইয়ে বিশ্বাসী কংগ্রেস হাত মেলায় তাদের প্রভু ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে বোম্বাই প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি সর্দার মগনলাল জজোরিয়া ভাষণ দেন:

> বন্ধুগণ, বোম্বাই-এর নাগরিকবৃন্দ,নৌবহরের বীর জাহাজী ভাইরা, আমাদের অতি প্রিয় বোম্বাই শহরে আজ এক নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৮ই তারিখ থেকে দেশপ্রেমিক জাহাজীরা এক অভূতপূর্ব হরতাল হাসিল করেছেন। খাদ্য বস্ত্র ন্যায়বিচারের জন্য তাদের এই বীরত্বপূর্ণ শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তাঁদের আশু দাবী দাওয়ার প্রতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ,সক্রিয় ও শর্তহীন সমর্থন জানাচ্ছে এবং এ আশ্বাস আমি প্রতিটি জাহাজী ভাইকে দিচ্ছি যে তাঁদের দাবী পূরণ না করে অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের কোনো উপায় নেই। কিন্তু কংগ্রেস গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছে, জাহাজীদের মধ্যে কেউ কেউ এই সংগ্রামকে এমন একটা জঘন্য সহিংস রক্তারক্তির রূপদিতে চেষ্টা করছে যে তাতে জাহাজীদের দাবী আদায়ের পথই রুদ্ধ হতে বসেছে। যেমন নাকি আজ ভোরবেলায় ''খাইবার'' নামক জাহাজের অতর্কিত অবিমৃষ্যকারিতায় বহু নিরীহ বৃটিশ সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে কাসল্ ব্যারাকস্ এলাকায়। জাহাজী ভাইদের কাছে কংগ্রেসের আবেদন, অহিংস প্রতিরোধের পথ ত্যাগ করে সর্বনাশ ডাকবেন না। কংগ্রেস আরও লক্ষ করছে বোম্বাই শহরে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি জাহাজীদের ন্যায্য দাবীগুলোর সুযোগ গ্রহণ করে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। আজ তারা অতর্কিতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল...বামপন্থীরা আবার কালকেও সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে আজ সন্ধ্যা ৭টা থেকে সরকার সারা

> বোম্বাই-এ সামরিক আইন জারী করেছেন। আমার আবেদন, কংগ্রেসের আবেদন, সাধারণ ধর্মঘট থেকে দূরে থাকুন। শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনুন। বামপন্থীদের সর্বনাশা ফাঁদে পা দেবেন না।[১৬]

মগনলালের এই ভাষণেই নাবিকদের আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে যায়। পুরো বোম্বে বামপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে এজন্য ব্রিটিশরা যতখানি উদ্বিগ্ন তারচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন কংগ্রেসি মগনলালরা। তাই মগনলালরা যে কোন মূল্যে এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে চায়। আন্দোলন এভাবে চলতে থাকলে বামপন্থী কমিউনিস্টদের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এটা কোনোক্রমে মানতে রাজি নয়। ব্রিটিশ পুঁজি ভারতে যাতে অবাধে খাটতে পারে তার গ্যারান্টি দিচ্ছেন মগনলাল ও কংগ্রেস। তাই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপোষ আলোচনার প্রস্তাব দেন এডমিরাল র‍্যাটট্রের কাছে। মগনলাল র‍্যাটট্রেকে পরামর্শ দেয় খাইবারকে বাকি বহর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, এখনকার মতন কিছু দাবি মানতে হবে, পরে আবার ভেবে দেখা যাবে। খাইবারকে শেষ করার এই সুযোগ কাজে লাগাতে চান কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি সাকসেনার মাধ্যমে। মগনলাল র‍্যাটট্রে, আর্মস্ট্রংরা যে ষড়যন্ত্র করেছেন তা সাকসেনার অগোচরেই রয়ে যায়। সাকসেনাসহ মিটিং-এ বসে র‍্যাটট্রে, আর্মস্ট্রং। জাহাজিদের আটটি দাবির মধ্যে প্রথম ও শেষটি ছাড়া বাকি ছ'টি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেয় কিন্তু সাকসেনা সম্মত হয় না। মগনলালও দুটো দাবির দায় বামপন্থীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় – যাতে আপস-আলোচনা ব্যর্থ হয়। রাজবন্দিদের ছেড়ে দেয়া এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় ফৌজ সরিয়ে আনার জন্য ভারত সরকার ও বড়লাট বাহাদুরের কাছে নৌবহরের পক্ষ থেকে জোরালো আবেদন এদের সাথে এক হয়ে করার ঘোষণা দেন আর্মস্ট্রং। বাকি সব দাবিও (লিখিতভাবে) মিটিয়ে দেয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে আর্মস্ট্রং জানান – যেই মুহূর্তে খাইবার আত্মসমর্পণ করবে সেই মুহূর্তে চুক্তিপত্রে সই করা হবে। কিন্তু সাকসেনা ভাল করেই জানে শার্দুলরা তথা খাইবার আত্মসমর্পণ করবে না, তাই সাকসেনা জানায়,'ওরা কোনো আইন মানে না ওরা তার নাগালের বাইরে।' সাকসেনা শার্দুলদের মত কমরেড বা বিপ্লবী না হলেও মগনলালের মত দালাল, বেঈমান নয়। তাইতো সাকসেনার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়– 'আমি চাই না এ রক্তপাত, নারীহত্যা, শিশুহত্যা – এ আমি চাই না। ব্রিটিশ ফৌজের হাতে রোজ কত মরছে জানেন?'[১৭]

কংগ্রেস সমর্থক শ্রমিক নেতা সাকসেনা যেখানে দেখে ব্রিটিশ ফৌজের হত্যাযজ্ঞ, কংগ্রেস নেতা মগনলাল জজোরিয়া সেখানে খাইবারকে দায়ী করে বলে :

> তার জন্য দায়ী খাইবার জাহাজ। ওরাই এই রক্তপাতের আসল উদ্বোধক। ওদেরকে বহিষ্কার করো। ঘোষণা করো ওদের সঙ্গে স্ট্রাইক কমিটির কোন যোগাযোগ নেই। তারপর বৃটিশ জাহাজ ওদের মোকাবিরা করবে।[১৮]

সাকসেনার অনুভবে–

> ওরা নৌবহরের গৌরব,ওরা জাহাজীদের খাপখোলা তলোয়ার, ওরা স্বাধীন ভারতের নিশান।[১৯]

সাকসেনা বিপন্ন বোধ করে। শার্দুলরা আপস-আলোচনায় রাজি নয়, আবার ব্রিটিশদেরও বিশ্বাস করা যাচ্ছেনা; এদিকে মগনলালও আলোচনা ভেঙে দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। এরকম ত্রিবিধ দ্বন্দ্বে সাকসেনা তবুও

খড়কুটোর মতো একটা কিছু অবলম্বন করতে চায়, ব্রিটিশ নয়;সাকসেনা চায়– মগনলালের গ্যারান্টি। মগনলাল জজোরিয়ার গ্যারান্টি থাকলে খাইবারের নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় উপস্থিত করতে চেষ্টা করবে সাকসেনা। মগনলাল সাকসেনার সাথে খাইবার জাহাজে গিয়ে গ্যারান্টি দিতে রাজি হয়। কিন্তু খাওয়া পরার দাবি মেনে নেয়াকে বিজয় বলে মানে না শার্দুল। আটটি দাবির মধ্যে ছয়টি দাবি মেনে নেয়ার জন্য তলোয়ার-এর পক্ষ থেকে হরতাল প্রত্যাহার করে নেয়া হলে শার্দুল জানায়–

> সারা ভারতে লড়াই শুরু হয়ে গেছে জানেন না? বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিমান বাহিনী ধর্মঘট করেছে। বিহারে পুলিশ ধর্মঘট শুরু হয়েছে। কলকাতা সাতদিন ধরে একরকম স্বাধীন হয়ে আছে। বোম্বাই এখনো লড়ছে। দেখছেন না ধোঁয়া? মারাঠা রেজিমেন্টকে বৃটিশ ফৌজ দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়েছে।[২০]

এই হরতালকে শার্দুলরা বিদ্রোহের দিকে নিয়ে যেতে চায়। মহেশ সাকসেনা ও বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সর্দার মগনলাল জজোরিয়া হরতাল প্রত্যাহারের খবরসহ খাইবার-এ এসেছে আপস-আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে। শার্দুলরা নৌবহরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খাইবারে বসেই আলোচনা করতে চায়। ফ্ল্যাগ অফিসার এখানে আসবে না জানা কথা তাই কংগ্রেসের পক্ষে মগনলাল গ্যারান্টি দিলেও শার্দুলরা রাজি হয় না এমনকি তার মা ও আসাদের বাবাকে হস্টেজ হিসেবে গ্রেপ্তারের খবর শুনেও শার্দুলরা মাথা নোয়ায় না। শার্দুলদের কাছে :

> তাঁকে বাঁচানোর চেয়ে বড় হল লড়াইটাকে বাঁচানো। ভারতের সংগ্রামী মানুষ যেন এ কথা বলতে না পারে জাহাজীরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বাধীনতার লড়াইকে বিসর্জন দিয়েছিল।[২১]

খাইবার জাহাজের নাবিকদের স্বজনদের বসবাস যে-ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তিতে সেই বস্তি আক্রমণ করে গোরা সৈন্য। খাইবার থেকে পাঠানো অস্ত্র যে-কোন মূল্যে (শার্দুল প্রতিবার বাড়ি আসার সময় অস্ত্র আনতো) উদ্ধারের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে রেবেল ও ডেনহাম; শাস্ত্রীজিকে বেদম প্রহার, শার্দুলের মা কৃষ্ণাবাঈসহ অন্যদের বন্দি করে, শার্দুলের স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈকে হাত করার চেষ্টা করেছে।

শার্দুলরা কোনক্রমেই আপস-আলোচনায় রাজি না হওয়ায় তাকে সেক্রেটারির পদ থেকে সরিয়ে রাজগুরুজিকে সে পদে বসানো হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গ্যারান্টিতে রাজগুরু, শার্দুল এবং গফুর আলোচনায় আসে র‍্যাটট্রের বাংলোয়। আলোচনার টেবিলে প্রতি চেয়ারে কার্ডে নাম লেখা দেখে সবাই বসে অস্ত্র রেখে। ব্রিটিশ নাবিকরা পর্দার আড়াল থেকে বন্দুক উঁচিয়ে রেটিংদের ঘিরে ফেলে, ওদের গ্রেপ্তার করে। সাকসেনা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করে গোরারা রেটিংদের নিয়ে যায় – বেঈমানি করে তার সাথে, তার গ্যারান্টির সাথে, কংগ্রেসের গ্যারান্টির সাথে। নিজের কাজে অনুতপ্ত সাকসেনার শেষ উপলব্ধি– 'আমিও বেঈমান। বিশ্বাসঘাতক!নিজের অজ্ঞাতেই কখন যেন নিমকহারাম দালাল হয়ে গেছি। আমি ... আমি এর প্রতিবাদে অনশন করবো–'[২২] সাকসেনার অনশনের কথা শুনে র‍্যাটট্রেরা তাকে ব্যঙ্গ করে। মগনলাল গলায় ফুলের মালা পরে, সামনে মদের

গেলাস নিয়ে প্রেসম্যানদের আলোচনার সফলতার খবর দিয়ে ছবি তোলে। র‍্যাটট্রে জানায় আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে সভাপতি সাকসেনার সহযোগিতার কোনো তুলনা হয়না।আর্মস্ট্রং সাকসেনাকে 'ভারতের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের সামনে এক জীবন্ত আদর্শ' হিসেবে উল্লেখ করে বলে 'যে নিষ্ঠার সঙ্গে রক্তাক্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে বিপুল এক শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করলেন, তা ভারতের সামনে এক দৃষ্টান্ত।'[২৩]সাংবাদিকরা সভাপতি সাকসেনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইলে বরাবরের মত 'আমি বড় ক্লান্ত' বলে এড়িয়ে যান।

এদিকে লক্ষ্মীকে হাত করেছে র‍্যাবেল; যদি অস্ত্রের কথা বলে দেয় তাহলে শার্দুলকে বিচারের আগে বন্দি শিবিরে মেরে ফেলা হবে না। একদিকে স্বামীর প্রাণ অন্যদিকে অস্ত্রের কথা বলে ফেলার ঝুঁকি – কি করবে লক্ষ্মী বুঝতে পারে না। কিন্তুলক্ষ্মী-ই কেবল স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে পারে, শুধু একটা কথা কইলেই ওর প্রাণ বেঁচে যায় –তাই লক্ষ্মী বলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় – স্বামী শার্দুলকে প্রাণ ভরে দেখা ও প্রাণ ভরে তাঁর কণ্ঠ শোনার বাসনায় ব্রিটিশের ফাঁদে পা দেয় লক্ষ্মী, অস্ত্রের খবর বলে দেয়। রেবেলঅস্ত্র উদ্ধার করে,লক্ষ্মীকে মুলন্দ বন্দি শিবিরে নিয়ে যায় শার্দুলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য। স্বামীকে এক ঝলক দেখা,তাঁর কণ্ঠস্বর শুনার ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর স্ট্রেচারে করে কম্বলে ঢাকা শার্দুল আসে লাশ হয়ে। কংগ্রেস-এর হঠকারিতায় ব্রিটিশের চক্রান্তে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা নাবিকদের আন্দোলন ব্যর্থতায় মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে ব্যর্থতার মধ্যে নাটকের সমাপ্তি টানেননি উৎপল দত্ত,খাইবার জাহাজ আত্মসমর্পন না করে শেষ পর্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে। পশ্চিম প্রান্তের উদ্যত মশাল আবার জ্বলে উঠবে নূতন বিদ্রোহের দীপ্তিতে,এই আশাবাদ ব্যক্ত করে নাটকের সমাপ্তি টেনেছেন উৎপল। কারণ বিদ্রোহের লাল ঝাণ্ডাকে কাঁধে তুলে নেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন শার্দুলের মা কৃষ্ণাবাঈ। ম্যাক্সিম গোর্কির দ্য মাদার উপন্যাসের মায়ের কথা আমাদের মনে পড়ে। এই নাটকে সূত্রধার বিশেষ ভূমিকা পালন করে নাটকের শুরুতে এবং শেষে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষায়।

নাটকে সর্দার মগনলাল ইতিহাসের সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, সাকসেনা স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি এম.এস.খান। মুসলিম লীগের মুহম্মদ আলী জিন্না,কংগ্রেসের সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল নাবিকদের আত্মসমর্পণের জন্য বলেছিলেন; জহরলাল নেহেরুর মনোভাব প্রথমদিকে কিছুটা ইতিবাচক থাকলেও শেষের দিকে তিনিও তাদের সঙ্গে হাত মেলান। আসলে নৌ-সেনাদের বিপ্লবের বিউগলে কংগ্রেস ও লীগনেতারা ভয় পেয়ে যান। তারা ভাবলেন নেতৃত্ব বা আন্দোলন বামপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে, তাই তাঁরা দরদস্তুর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা সেদিন ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন বলেই ব্রিটিশদের পক্ষে এ-আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয়েছিল। উৎপল দত্ত এদের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন :

> কল্লোল নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবিক ও মজদুরদের বীরত্বগাথাই শুধু বলেনি, বলেছিল কংগ্রেসি বেঈমানদের দেশদ্রোহিতার কথা। অহিংস সত্যাগ্রহ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালালি, অস্ত্র ছাড়া যে জয় নেই, একথাও বলার প্রয়াস হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অতীত যে গৌরবময়, দেশপ্রেমিক সংগ্রামে সে যে ছিল প্রথম সারিতে, একথা সজোরে বারবার বলার দরকার আছে। শাসক শ্রেণির কুৎসা চিরদিন পার্টির তথাকথিত দেশদ্রোহিতার বিশ্লেষণেই মূঢ়ভাবে সীমাবদ্ধ। নানা নাটক মারফৎ ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে ধরে কমিউনিস্ট পার্টির ত্যাগ ও আপসহীন

> লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতে হবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন ও নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার ধারাটাকেও সবলে ছুঁড়ে মারতে হবে কুৎসাকারীদের মুখে।[২৪]

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে নৌবিদ্রোহ ব্যর্থ; কল্লোল নাটকে সেরকম পরিণাম দেখাতে চাননি নাট্যকার। উৎপল দত্ত নৌবিদ্রোহকে অন্যসব বিদ্রোহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। চলচ্চিত্রকার সের্গেই আইজেনস্টাইন তাঁর 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিম' চলচ্চিত্রে আত্মসমর্পণ দেখাননি যদিও বাস্তবে পোটেমকিম আত্মসমর্পণ করেছিল। নৌবিদ্রোহের বেলায়ও তাই ঘটেছে; বাস্তবে খাইবার আত্মসমর্পণ করেছিল কিন্তু উৎপল তাঁর নাটকে খাইবারের আত্মসমর্পণ দেখাননি। এ-প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত বলেছেন:

> তারা বৈপল্বিক সত্যের দৌবারিক,তথ্য যাই হোক না কেন? পোটেমকিন ১৯১৭ সালের সফল বিপ্লবেরঅগ্রদূত;'খাইবার'–ভারতের স্বাধীনতার। তারা আত্মসমর্পণ করলে তথ্য সম্মানিত হতো,কিন্তু বৃহত্তর সত্য হতো লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত।[২৫]

এই নাটকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তিনটি স্থানে – খাইবার জাহাজ,ওয়াটারফ্রন্ট বস্তি এবং ব্রিটিশ নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার রিয়াল এডমিরাল র‍্যাটট্রে-এর বাংলোয়। তিনটি স্থানের জন্য তিনটি সেট ব্যবহার করা হয়েছে নাটকে– মঞ্চের মাঝখানে খাইবার জাহাজের বিরাট একটা সেট; যেন জলের উপর ভাসছে -উপকূলে নোঙর করে আছে, জাহাজের নিচের দিকে আলোর কৌশলে সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের খেলা। জাহাজের ডেক আর মাস্তুল। ওয়াটারফ্রন্ট বস্তির সেট-এ আছে নাবিকদের আত্মীয়স্বজনদের জীবন। এ-ধরনের অসাধারণ মঞ্চসজ্জা বাংলা থিয়েটারে আগে দেখা যায়নি। এ-নাটক যাত্রা ও প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সূত্রধার এ-নাটকে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে;ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। দর্শকের সঙ্গে নাটকের একাত্মতা ঘটানো, নাটকের ঘটনাক্রম বুঝতে সূত্রধারের বর্ণনা দর্শকের জন্য অনুকূল হয়।

উৎপল দত্ত কোনো ধরাবাঁধা নিয়মে এই নাটকের দৃশ্যসজ্জা করেননি–প্রয়োজন-মাফিক কখনো বাস্তবানুগ,কখনো বাস্তবোত্তর, আবার কখনো দুটোর মিশেল করেছেন। এ-বিষয়ে উৎপল দত্ত লিখেছেন :

> হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহারাষ্ট্রের পোয়াডা ও লাউনি সুরে পশ্চিমপ্রান্তের মহান মেহনতি মানুষের অন্তরের কথাগুলো যেন সাজিয়ে দিলেন পুষ্পস্তবকের মতোন। সুরেশ দত্ত সৃষ্টি করলেন খাইবার ক্রুজার ও বস্তির দৃশ্য;তাপস সেনের আলো। আর সংগীতে আমরা জর্মন,রুশও চীনা বিখ্যাত নৌবিদ্রোহের গান কয়েকটি ব্যবহার করেছিলাম। আর অবশ্যই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগীত।...বিদ্রোহের দৃশ্যে প্রথমে তেরঙ্গা ও লীগের ঝাণ্ডা ক্রুজার খাইবারের মাস্তুলে ওঠে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। তারপর ইন্টারন্যাশনাল গানের সঙ্গে লাল নিশান এসে,সদর্পে উড়তে লাগল আলোকবৃত্তের মধ্যস্থলে,এবং ঘন ঘন স্লোগানে মুখরিত হতে লাগলো প্রেক্ষাগৃহ।... লিটল থিয়েটারের বহু বছরের ত্যাগ ও শ্রম যেন ওই মুহূর্তে কেন্দ্রবিন্দুতে এসে রোমাঞ্চিত সার্থকতায় পূর্ণ হল।[২৬]

ভারতের নৌ বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত *কল্লোল* কল্লোলিত করেছিল ষাটের দশকের বাংলা নাট্যশালাকে। আর একবার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল এই নাটক। এই নাটক এতটাই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, শাসকশ্রেণি ভীত হয়ে ওঠে এবং নানারকম ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে *কল্লোল* বন্ধ করতে। স্বাধীনতা হঠাৎ পাওয়া ছেলের হাতের মোয়া নয়। স্বাধীনতা অহিংসার পথে আসেনি; নিরন্তর আপোষহীন লড়াইয়ের ফসল স্বাধীনতা। ব্রিটিশ শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে শত-বছরের লড়াই চালিয়ে গেছে ভারতের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী সমাজের নানাস্তরের পেশাজীবী শ্রমজীবী মানুষ। এই ধারাবাহিক সংগ্রামেরই অংশ নৌবিদ্রোহ। *কল্লোল* নাটকের বিপ্লবী সেনানীরা ভারতের নৌবাহিনীর সদস্য।

কল্লোল নাটকের জন্য উৎপল বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন, স্টেটসম্যান ছাড়া সব ধনিক পত্রিকায় লিটল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হয়। সিপিএম নেতৃত্ব দেয় 'কল্লোল চলছে চলবে'। পার্টির কমরেডরাও মুখে মুখে এবং পথসভা করে *কল্লোল*-এর পক্ষে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। গণনাট্য সংঘ *কল্লোল*-এর পক্ষে মশাল মিছিল করে। আর লিটল থিয়েটারের শিল্পীরা গ্রেপ্তারের ভীতি প্রদর্শন ও প্রত্যক্ষ প্রত্যাহারের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে প্রবল উৎসাহে নাটক করে যেতে থাকেন। ছাত্র-শ্রমিকরা দিনের পর দিন মিনার্ভা পাহারা দিয়ে *কল্লোল*-এর অভিনয় চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন। *কল্লোল* নাটকের জন্য উৎপল যখন জেল খাটছিলেন,তখন জেলে থেকে দুটি নাটিকা রচনা করেন *কঙ্গোর কারাগারে* ও *লৌহমানব;* অভিনয় করেন উৎপল, জোছন দস্তিদার ও ছাত্র ফেডারেশন-এর সভ্যবৃন্দ।

উৎপলের কারামুক্তি ও *কল্লোল*-এর বিজয়-উৎসব সম্পর্কে উৎপল লিখেছেন :

> ৬৬-র মার্চে বিপুল খাদ্য-আন্দোলনের সংগ্রামে জনগণ সব রাজবন্দিকে ছিনিয়ে আনলেন কারাগার থেকে এবং ৭ মে মনুমেন্ট ময়দানে কল্লোল বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়।অন্যূন পাঁচ লক্ষ মানুষের সামনে আমরা সংবর্ধিত করি কমরেডস্ বি.টি রণদিভে, জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার,সুরজিৎ,সুন্দরাইয়া প্রমুখকে।এবং এভাবে লিটল থিয়েটার জানাতে চাইল যে কল্লোলকে বাঁচিয়ে রাখার প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, এই বিজয়োৎসবে তাঁরাই মধ্যমণি।
>
> মিছিল আসছিল চারদিক থেকে। রবীন্দ্রনাথের 'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন' লিখা বিরাট পোস্টার লিখে বহন করে আনছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। রোবসনের চিত্র আনছিলেন আর এক দল। গোর্কির শ্রমকঠিন মুখ জেগে ছিল আর এক মিছিলের মাথায়। মঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়েছিল খাইবার জাহাজের বাইশ ফুট উঁচু প্রতিকৃতি;তার ডেকে অভিনীত হল কল্লোলের একটি দৃশ্য। সামনের ছোট মঞ্চে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা অভিনয় করল 'মৃত্যুর অতীত'। আর নানা নাট্য সংস্থা ফুলে ফুলে ভরে দিলেন মঞ্চ ও আমাদের মন।[২৭]

কল্লোল নাটক পরিচালনায় সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে সঙ্গীতনাটক একাডেমী উৎপল দত্তকে পুরস্কৃত করলেও তিনি তা গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬৬ সালে নভেম্বর সংখ্যা *দেশব্রতী* পত্রিকায় এ-সম্পর্কে তিনি একটি কবিতা লেখেন, *শাহেনশা তোমার পুরস্কার তোমার থাক* শিরোনামে। *কল্লোল* নাটক লিখতে গিয়ে উৎপল নৌবিদ্রোহের উপর রচিত শাহাদৎ আলীর পুস্তিকার সাহায্য নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন;তাছাড়া

কল্লোল নাটকে রাশিয়ার চলচ্চিত্র সের্গেই আইজেনস্টাইন-এর*'ব্যাটলশিপ পোটেমকিম'*এবং ভিসনেভস্কির *'দ্য লাস্ট অফেনসিভ'*-এর প্রভাবের কথা উৎপল অস্বীকার করেননি। এছাড়াও আর্নেস্ট টোলার-এর *Draw The Fires* এবং ত্রেতিয়াকভ-এর*Roar China* নাটক দুটির ছায়া এ-নাটকে পড়েছে বলে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

*অজেয় ভিয়েতনাম*নাটকে উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত ও তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। লিটল থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ৩১ শে আগস্ট ১৯৬৬ মিনার্ভা থিয়েটারে। ঐ বছরই জাতীয় সাহিত্য পরিষদ নাটকটি প্রকাশ করে;পরে নাটক সমগ্র তৃতীয় খণ্ডে ১৯৯৫ সালে।

নাটকের শুরুতে দেখা যায় ভিয়েতনামের কু-চি শহরে মার্কিন জেনারেল এন্টনি ফিট্‌স্-কোল্টন-এর দপ্তরে জেনারেল তার মার্কিন সামরিক অফিসার অ্যালবার্ট ই ফিনি, মার্ক হুইলার, কলিন এস নাইট ও পিটার কাউফম্যানকে ভিয়েতনামের ম্যাপ দেখিয়ে 'ডরেকশান' দিচ্ছেন। জেনারেল প্রথমে ভিয়েতনামের মুক্ত এলাকা সম্পর্কে অফিসারদের অবহিত করেন :

> আপনারা দেখছেন এই বিরাট লাল চিহ্নিত ভূখণ্ডকে, ওরা বলে মুক্ত এলাকা। এই এলাকায় কুড়ি লক্ষ হেক্টর জমি ওরা চাষীদের হাতে বিলিয়েছে, ঋণ মকুব করেছে, প্রত্যেক গ্রামে একজন ডাক্তার নিয়োগ করেছে, প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে মেডিকেল কলেজ খুলেছে, তিনটে বড় কেন্দ্রীয় মেডিকেল কলেজ খুলেছে, ইস্কুল করেছে অসংখ্য, মূর্খ এশীয় চাষী বলতে যা বোঝায় সে মালটিকে আর পাওয়া যাচ্ছে না দক্ষিণ ভিয়েতনামে। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব সাংস্কৃতিক দল করেছে। একটা চলচিত্র সংস্থা আজ পর্যন্ত তিরিশটি সংবাদচিত্র ও কুড়িটি দলিল চিত্র তুলেছে। এই এলাকায় চল্লিশটি দৈনিক, সতেরোটি সাপ্তাহিক এবং চল্লিশটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়। লিবারেশন রেডিও প্রতিদিন পাঁচটি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করছে। কর্ণেল হুইলার, দক্ষিণ ভিয়েতনামের জমির পাঁচ ভাগের চার ভাগ ওদের দখলে, লোকসংখ্যার তিনভাগের দু ভাগ ওদের এলাকায় বাস করে।[২৮]

এরপর জেনারেল ফিট্‌স্-কোল্টন কোন এলাকায় অপারেশন চালাতে হবে, কীভাবে সেখানে পৌঁছানো যাবে এ বিষয়ে 'ব্রিফ' করেন। এরপর জেনারেল ভিয়েট বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদের কায়দা সম্পর্কে অবহিত করে বলেন :

> যে ত্রাক আর দুইয়েৎ-এর ভয়ে আপনারা কেঁপে উঠছেন, সেই গেরিলাদের নিকেশ করতেই আপনারা যাচ্ছেন। অতএব কেঁপে লাভ নেই। হো-বো গ্রামে ঢুকে আমাদের কাজ হবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা। প্রত্যেককে। আপনারা জানেন, গেরিলারা গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য পায় বলেই লড়তে পারে। অতএব গ্রামবাসীদের জেরা করেই বার করা যাবে কোথায় ওরা লুকিয়ে আছে। জেরার উপায় – চার্ট দেখুন – প্রথম– ছুরি, একটু একটু করে ঢুকিয়ে। দ্বিতীয় – কাঁটাতারের ফাঁস, গলায় পরিয়ে চাপ। তৃতীয় –বন্দুকের কুঁদো দিয়ে হাতের আঙুল ছেঁচে দেয়া। চতুর্থ – চোখের সামনে ফ্লেমথ্রোয়ারের ফিউম ছেড়ে চোখ গলিয়ে দেয়া। পঞ্চম থেকে একাদশ – মনস্তাত্ত্বিক চাপসৃষ্টি, যথা মায়ের সামনে ছেলেকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, বা অন্যান্য আত্মীয়ের সামনে আত্মীয়কে নির্যাতন।... দ্বাদশ বিষয়টি লক্ষ করুন– মার্কিন মিলিটারী ইনটিলিজেন্স্-এর আবিষ্কার – ইলেকট্রিক শক। এই ব্যাটারী আপনাদের কিট্-এর সঙ্গে দেয়া

> হবে।... ঐ তার দুটো বেঁধে দিতে হবে – চার্ট দেখুন – মেয়েদের স্তনে আর পুরুষদের জননেন্দ্রিয়ে। ... (এবারের চার্ট : "যুদ্ধ গ্যাসের তালিকা")
>
> আজ পর্যন্ত ভিয়েতনামে চার লক্ষ লোককে দুটি গ্যাসে পঙ্গু করে দেয়া গেছে। চার্ট দেখুন– ক্লোরোঅ্যাসেটোফেনোন ও ফেনারসাজিন ক্লোরাইড – আমরা বলি যথাক্রমে সি-এন ও ডি-এম। আপনারা হো-বো-র দিকে এগুবার আগে ঐ এলাকায় দুশ বি-ফিফটি-টু বমার প্রচণ্ডভাবে এই গ্যাসদুটি বর্ষণ করবে। তাতে প্রথমত সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে ভিয়েটরা কাহিল হবে। দ্বিতীয়ত অন্ততঃ হাজারখানেক লোক জখম বা নিহত হবে। বাচ্চাগুলোই বেশি মরে এ গ্যাসে। আর বুড়োরা। এতে করে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হবে ও এলাকায় তাতে আপনাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। তাই গ্যাস-মুখোস দেয়া হবে প্রত্যেককে।[২৯]

জেনারেল ফিটস্-কোল্টনের 'ডিরেক্শান' মোতাবেক হো-বো গ্রামে মার্কিন অফিসারদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় মাদাম ত্রান থি লান হু। হো-বো গ্রামে নদীর ধারে উঁচু পাহাড়ের গায়ে গুহা কেটে তৈরি হয়েছে হাসপাতাল; যেখানে ডাঃ ভান ভিন, নার্স নগুয়েন থি মাও ও ডাঃ লে-চি-কে নিয়ে আহতদের চিকিৎসা দেন। ভিয়েতনামি গেরিলা কমান্ডার দুইয়েৎ এর নেতৃত্বে কিম, ভিন, ত্রান দুয়ং, খিয়েন, মুয়ন, বুই, মাও, থুয়ান গোপন সভা করে স্থির করে – হো বো প্রথমে লড়বে না। চুপচাপ আত্মসমর্পণ করবে। তারপর অপেক্ষা করবে।

মার্কিন বাহিনী কর্তৃক হো-বো গ্রাম আক্রান্ত হয়। অত্যাচারের বিশেষ মার্কিন 'মেথড' অনুযায়ী এক প্লাটুন সৈন্য দু সার বেঁধে দাঁড়াবে; মাঝখান দিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে মহিলাদের মার্চ করে যেতে হবে – এরকম লজ্জাজনক অশোভন নির্দেশও পালন করেছে কিম যুদ্ধ জেতার আশা নিয়ে – কারণ, কিম মনে করেন, এতে কোনো লজ্জা নেই সতীত্ব আর নারীর অভিমান ফিরে আসবে যুদ্ধ জেতার পর,স্বাধীন দেশে। বোমা বর্ষণ করে হো-বোর সমস্ত আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে মার্কিনীরা। আক্রান্ত হয় হাসপাতালসহ সকলেই। নার্স থি মাও কে ধর্ষণ করে ইলেকট্রিক শক দিয়ে হত্যা করা হয়, ডাঃ ভিনের চোখ গলিয়ে দেয়া হয়,বৃদ্ধ ও তামকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে রক্ষীরা টেনে নেয়, থুয়ানকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে, কিম এর ছোট্ট শিশু নাতনী পুপুকে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এমন সময় মাদাম হু ঘটনাস্থলে পৌঁছলে হুইলার তাকে স্বাগত জানিয়ে ত্রাককে এনেছে কি না জানতে চাইলে মাদাম হু জানায় – তিনিই ত্রাক। এরপর কিম একগুলিতে সার্চলাইট ভাঙলে সেই সিগন্যাল পেয়ে গেরিলারা মার্কিনীদের আক্রমণ করে। হো-বো এলাকার যুদ্ধে ২৫০০ মার্কিন সেনার মধ্যে দুহাজার হতাহত বা বন্দি হয়। মার্কিনীদের ভয়ঙ্কর নির্যাতনেও শেষপর্যন্ত কিম-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আশাবাদ :

> এ দুঃস্বপ্ন দুদিনের। দস্যুদের দিন ফুরিয়েছে সারা দুনিয়া জুড়ে। তারপর আবার ফসল ফলবে।[৩০]

এই আশাবাদ আর দৃঢ় মনোবলের কারণেই ভিয়েতনাম অজেয়। মার্কিনীদের ভয়াবহ অত্যাচার,নির্যাতনেও ভিয়েতনামের মানুষ তাঁদের মাতৃভূমিকে দখলদার মুক্ত করতে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গেছে। ইস্পাত-কঠিন দৃঢ় সংকল্প,আপোষহীন মনোভাব আর দেশপ্রেম ভিয়েতনামের জনতার জয় সুনিশ্চিত করেছে।

অজেয় ভিয়েতনাম-এর ইংরেজি অনুবাদ*'ইনভিন্সিবল ভিয়েতনাম'* এবং জর্মন অনুবাদ*'উনবেসিগবারেস ভিয়েতনাম'*প্রকাশিত হয়েছে । পূর্বজার্মানের রস্টক শহরে আনসেলম পের্টেন-এর নির্দেশনায় ফোলক্স্ থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হয়েছে।

*একটি তলোয়ারের কাহিনী*নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল নন্দন পত্রিকায়। এ-নাটক উৎপল দত্ত কখনও মঞ্চস্থ করেননি। ১৯৯৩ সালে উৎপল দত্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'নাট্যচিন্তা' উৎপল দত্ত সংখ্যা-য় নাটকটি প্রকাশিত হয়। *একটি তলোয়ারের কাহিনী* নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দিলীপ বিশ্বাস শ্রমিকশ্রেণির নাড়ি-ছেঁড়া ধন,তাঁদের ঘরের ছেলে। কমরেড দিলীপ বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিয়েছে ইয়াছিন,প্রভাত,প্রভাতের স্ত্রী, বিপ্লব এবং আরো কমরেডরা। তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন হলেও দিলীপ কোথায় এ-তথ্য পুলিশকে দেয়নি। ১৯৫২ সালের ভারতের আইনসভার নির্বাচনে কলকাতার শ্রমিকনেতা কমরেড দিলীপ বিশ্বাস প্রার্থী হয়। প্রভাতবাবুর সভাপতিত্বে নির্বাচনী সভায় দিলীপ বিশ্বাস তার বক্তৃতায় বলে :

> আইনসভার লড়াইটা গৌন,বাইরের গণসংগ্রামই আসল। আমাকে আপনারা বুর্জোয়াদের আইনসভায় পাঠাতে চাইছেন কিন্তু মনে রাখবেন আমি আপনাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাথীই থাকব,চিরদিন। আপনাদের বিপ্লবকে ভাষা দেওয়ার জন্য যেতে চাই লোকসভায়,একই লড়াইয়ের অন্য রূপ। শেষপর্যন্ত ময়দানেই হবে ফায়সালা।[৩১]

দিলীপ বিশ্বাস নির্বাচনে জিতে লোকসভায় যায়; প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক মন্ত্রী,এমপি,রাষ্ট্রদূত,এলপি কারখানার মালিক লালা প্রসাদের সঙ্গে চলাফেরা,খাওয়দাওয়া,ওঠাবসা করে। এলপি কারখানার লকআউটের বিষয়ে কৌশলে লালার সঙ্গে দিলীপকে ভিড়িয়ে দেওয়াহয়– সেখানে মদ, মেয়েমানুষ আরো অনেক কিছু। সবই হয়েছে এখন দিলীপের;অর্থবিত্ত, বাড়ি-গাড়ি,মদ,মেয়েমানুষ সবই। সে ক্রমশ প্রধানমন্ত্রী,শিল্পপতি লালাপ্রসাদ,বুর্জোয়ার দালাল কির্লোস্কার,আমেরিকার স্পাই প্রেমা জিজিভাইয়ের গিনিপিগে পরিণত হয়। দিনে দিনে দিলীপ দেখলো এসব তার খারাপ লাগছে না। এই মন্দ না-লাগা ধীরেধীরে 'ফাউন্ডি'র ধোঁয়ার মতন গ্রাস করল, অন্ধ করল দিলীপকে; শ্রেণিযোদ্ধা দিলীপ বিশ্বাস 'পরলোকগত' (!) হয়।দিলীপ তার প্রিয় কলকাতা, তার নির্বাচনী এলাকায়ও আজকাল আর যেতে আগ্রহ বোধ করে না। নানা অছিলায় কলকাতা যাওয়া থেকে বিরত থাকে। লালা ও লালার স্ত্রীর উপহার, প্রেমার সঙ্গে সম্পর্ক এসব দিলীপ উপভোগ করে, ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে জার্মানে ইঙ্গে কুর্গেলমানের সঙ্গে অশোভন (যৌন) আচরণ করে দেশে ফেরে।

লোকসভায়ভারত রক্ষা আইন পাশ হতে চলেছে– যে-আইনে বিনা বিচারে আটক,গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার বিধান আছে; সেই ভারত রক্ষা আইনকে দিলীপ শর্তহীন সমর্থন জানায়। ওদিকে এলপি কারখনায় ১৩২জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে, দিলীপের একসময়ের অতি আপনজন বিপ্লব, বজরং দিল্লি এসে দিলীপের সঙ্গে দেখা করে। সামনে ১৮ তারিখ থেকে যে-স্ট্রাইক শুরু হতে যাচ্ছে, তাতে সঙ্গে পেতে চায় তাকে; প্রভাতবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিলীপ বিমানে করে কলকাতায় এসে শ্রমমন্ত্রী,ম্যানেজার,পুলিশ অফিসার বনবিহারী রায়ের সঙ্গে আলোচনা চালায়। শ্রমিকরা পিকেট দিয়েছে,দিলীপ ওপরে ওপরে ভাব দেখায়

শ্রমিকদের জন্য কত দরদ! কিন্তু আসল উদ্দেশ্য– বিপ্লব, বজরংদের চরমপন্থী রাজনীতির কবর দেয়া, শ্রমিকদের থেকে ওদের বিচ্ছিন্ন করা, নিঃসঙ্গ করা। দিলীপ নিজে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাই অন্যদের বিচ্ছিন্ন করতে তার এই অপপ্রয়াস। দিলীপ গ্যারান্টি দিয়ে পিকেট উঠিয়ে নিয়ে বিপ্লব, বজরংকে ধরিয়ে দিয়েছে একদিকে, অন্যদিকে আখতারদের বলেছে উত্তেজিত না হতে, বুর্জোয়াদের ফাঁদে পা না-দিতে। লালাপ্রসাদ আর পুলিশ অফিসার বনবিহারী মিলে যে-ষড়যন্ত্র করে,দিলীপ সেই ষড়যন্ত্রই কার্যকর করে। থানায় দালালদের জড়ো করে, সে-দালালরা পুলিশের গাড়িতে চড়ে কারখানায় ঢুকে গুলি করতে করতে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় দিলীপের প্রিয়তমা বৌদি। যে-আখতার দিলীপের পক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছিল সে-আখতারই দেখল কীভাবে দিলীপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের সঙ্গে;দিলীপের নির্দেশে আখতারকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি।

যে দিলীপ বিশ্বাস আইনসভার লড়াইয়ের চেয়ে গণসংগ্রামই আসল বলেছিল,বুর্জোয়াদের আইনসভার চেয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাথীদের সাথে চিরদিন থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল,যেদিলীপ বিশ্বাস বিপ্লবকে ভাষা দেওয়ার জন্য লোকসভায় যেতে চেয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ময়দানেই ফয়সালার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল – সেই দিলীপ বিশ্বাস দিনে দিনে কীভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেল তারই ইতিবৃত্ত *একটি তলোয়ারের কাহিনী*। নাট্যকার অত্যন্ত নিখুঁতভাবে একজন বিপ্লবীর বিচ্যুতিকে এই নাটকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

নকশালবাড়ি কৃষক-বিদ্রোহের পটভূমিকায় উৎপল দত্ত রচনা করেন *তীর*। মিনার্ভা থিয়েটারে এ-নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। গ্রন্থাকারে নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র' ৩য় খণ্ডে।

এ নাটকে বির্সা ওঁরাও,শুক্রা টুডু, গজুয়া ওঁরাও, সানঝো ওরাইন, সোমারী, রণবাহাদুর থাপা, গেব্রিয়েল সাঁওতাল, উপাসু সিং, শনিচারোয়া ওঁরাও, মংলু, গাংগী ওঁরাও, এবং কেরকেটুসহ অত্নেশ্বরীকে সিপিএম নেতা শিবেন রায় (কমরেড)কথা দেয় অত্যাচারী জোতদার সত্যবান সিংকে অত্নেশ্বরীর সামনে গাছে বেঁধে মারা হবে।এঁরা যখন ধান কেড়ে নেয়ার জন্য তৈরি তখন শিবেন আসে ভোট চাইতে।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার জয়লাভ করে। শিবেন মন্ত্রী হয়। এ-খবর শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ে অত্নেশ্বরী, উপাসু, গজুয়া, বির্সা, জোনাকু, গেব্রিয়েল, সানঝো, সোমারি, ফাগুনি, কেরকেটু, শুক্রা –সবাই। তাদের শিবেন মন্ত্রী হওয়ায় এবার আর তাদের না খেয়ে মরতে হবে না; এবারে তাদের দুঃখ ঘুচাবে শিবেন। শিবেন অত্নেশ্বরীকে কথা দিয়েছিল অত্যাচারী জোতদার সত্যবান সিংকে গাছের সঙ্গে বেঁধে চাবুক মারবে। নির্বাচনের আগে সত্যবানদের সাথে শিবেনদের বিরোধ থাকলেও নির্বাচনের পরে সবাই এক হয়ে যায় – শিবেনকে মাল্যভূষিত করেশ্রী সত্যবান সিং। নির্বাচনের পরে বোল পাল্টে যায় কমরেড শিবেনের। শিবেন বলে :

> নকশালবাড়ি অঞ্চলে যারা আন্দোলন চালাচ্ছে তারা চীন বা পাকিস্তানের গুপ্তচর নয়। তারা আমেরিকার গুপ্তচর, সি আই এর এজেন্ট ! ...নকশালবাড়ির আন্দোলন হঠকারী, উগ্রপন্থী। কৃষকরা হঠকারী নেতাদের প্ররোচনায় উগপন্থার আশ্রয় নিয়েছেন !...নকশালবাড়ি আন্দোলন বন্ধ করতে না পারলে ভারতের বিপ্লব ধ্বসে যাবে, আর একটা ইন্দোনেশিয়া সৃষ্টি হবে।...নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের নেতারা মার্কিন গুপ্তচর ! ... আন্দোলন বন্ধ করো।[৩২]

দেবীদাস ও আবদুল কাদেরের নেতৃত্বে 'বিপ্লবী পরিষদ'-এর মাধ্যমে ওঁরাওরা তৈরি হতে থাকে। দেবীদাস কাশবনের মধ্যে মাওসেতুং-এর জনযুদ্ধের নীতি, মুক্তিফৌজ, মুক্তাঞ্চল বিষয়ে ক্লাশ নেন; আবদুল কাদের তত্ত্বাবধান করেন বির্সার তীরের ফলা, রণবাহাদুর থাপার চাঁদমারি অভ্যেস। কৃষকরা গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় বন্দুক চালাতে শেখে আর তাদের বর্শা, তীর লাঠি, বল্লমসহ নিজস্ব প্রথাগত অস্ত্রশস্ত্র ও মাদল-নাকাড়া নিয়ে পুরোপুরি তৈরি হয়। দূর থেকে নাকাড়ার শব্দ শুনে এরা সত্যবান সিং-এর বাড়ি ঘেরাও করে। আঞ্চলিক বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে সত্যবানকে শর্ত দেয়া হয়। সত্যবান শর্ত ভঙ্গ করে শাড়ি পরে কোনমতে পালিয়ে বাঁচে।বাড়ি দখল করে নেয় আঞ্চলিক বিপ্লবী পরিষদ।

আন্দোলনে কৃষকদের সাথে যোগ দেয় রেল-শ্রমিক ও চা বাগানের শ্রমিক। পুলিশ সংগঠিত জনতার প্রতিরোধের কাছে পেরে উঠছে না দেখে শিবেন বলে :

> যুক্তফ্রন্ট সরকার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ বড় রাস্তা ধরে, তাও যতক্ষণ বেলা থাকে – খানিক টহল দেয়া ছাড়া পুলিশ আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি। করার মতন মনোবল নাকি ওঁদের নেই। সুতরাং এ অঞ্চলের পুলিশ ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্-এর জয়েন্ট অপারেশনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে লেফটেনান্ট কর্ণেল ত্রিলোক সিংকে। এবার সরকার আশা করেন যে...নকশালবাড়ির স্ফুলিঙ্গটা ভারতব্যাপী দাবানলে পরিনত হওয়ার আগেই নিভে যাবে। ওদের...ওদের শেষ করে দিন। শুট টু কিল।[৩৩]

ধনিক শ্রেণি বা শোষকের যে শ্রেণিচরিত্র কমরেড শিবেনের মধ্যে সেই চরিত্র অতিদ্রুতই ব্যাপ্তিলাভ করে। এতদিন যারা তার কাছের মানুষ ছিল – অত্নেশ্বরী, উপাসু, গজুয়া, বির্সা, জোনাকু, গেব্রিয়েল, সানঝো, সোমারি, ফাগুনি, কেরকেটু, শুক্রা প্রমুখ; নির্বাচনে জেতার পর তাদের চেয়ে অত্যাচারী জোতদার সত্যবান বেশি কাছের ও প্রিয় হয়ে ওঠে। অত্নেশ্বরী, বির্সা ওঁরাওদের রক্ষার চেয়ে জোতদার সত্যবান সিংকে রক্ষায় বেশি দায় বোধ করে শিবেন।

তাইমন্ত্রী শিবেনের মধ্যে কমরেড শিবেনকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

উৎপল দত্ত নিজে যদিও এ-নাটককে পরবর্তীকালে শোচনীয় ভ্রান্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তথাপি সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ছায়াপাত এমনভাবে এ-নাটকে পড়েছে যে-কারণে এ-নাটকটি পর্যালোচনার দাবি রাখে। উৎপল লিখেছেন :

> যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পরেই নকশালবাড়ি বিদ্রোহ,জুন '৬৭, এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে লিটল থিয়েটারের পদক্ষেপ। রাস্তায় ভায়ে-ভায়ে সংঘর্ষ চলছে,আর শত্রু হাসছিল। সিপিএমের সঙ্গে সিপিআই(এম-এল)-এর সদস্যদের রক্তাক্ত বিরোধ। আমাদের তীর নাটকের মালমসলা সংগ্রহার্থে তাপস,নির্মল গুহরায় ও আমি যাই

> শিলিগুড়ি,নকশালবাড়ি,প্রসাদুজোত,আলিপুরদুয়ার ।মনে করেছিলাম প্রসাদুজোতে পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে,যেই সরকারে থাকুক না কেন। আরও ভেবেছিলাম, কৃষক-যোদ্ধার বীরত্ব অমরগাথা হয়ে থাকবে,পথটা যদি ভুলও হয় তবু থাকবে। চারু মজুমদার, সৌরিন বসু এবং তিলক রায়ের কাছ থেকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিই,কৃষক-কমরেডদের গান রেকর্ড করি,গুলিচালনার দিনকার অভিজ্ঞতা শুনি অনেকের মুখে। 'তীর' নাটক লেখা হল, মহলা চালু হল,হেমাঙ্গদা সুর দিলেন। আর রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত আরও যেন গুলিয়ে গেল মাথার মধ্যে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অধৈর্যপনা ও অতি-বামপন্থী ধ্যানধারণা আমাদের অনেককে পেয়ে বসেছিল। লিটল থিয়েটারের সদস্যবৃন্দের অনেকেই আমাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না,কিন্তু 'তীর' নাটক একান্তভাবে জোতদারের অত্যাচার, কৃষকের প্রতিরোধ ও পুলিশের জুলুমে আবদ্ধ থাকায় সেটা মঞ্চস্থ করতে সকলে সহযোগিতা করছিলেন।[৩৪]

*মানুষের অধিকারে*উৎপল দত্তের অসাধারণ সৃষ্টি। বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী নাটক *মানুষের অধিকারে*। এ-নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত লিখেছেন : '*মানুষের অধিকারে* লিটল থিয়েটার গ্রুপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। ১৯৩১ সালের কুখ্যাত স্কটস্‌বরো মামলা অবলম্বনে মার্কিন মুলুকে কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নের এই নাটকটি লিখেছিলাম অনেক আগে, বোধ হয় ৬২ সালে।'[৩৫] নাটকটির প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮ সালে গন্ধর্ব পূজা সংখ্যায় এবং পরে এপিক থিয়েটার অষ্টম সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে নাটক সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। এলটিজি মিনার্ভা থিয়েটারে *মানুষের অধিকারে* প্রথম মঞ্চস্থ করে ১৪ জুলাই ১৯৬৮ সালে।

১৯৩১ সালের আমেরিকার স্কটস্‌বরো মামলা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ থেকেই উৎপল দত্ত কুখ্যাত স্কট্‌সবরো মামলা অবলম্বনে রচনা করেন *মানুষের অধিকারে*। শেতাঙ্গ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নের দলিল *মানুষের অধিকারে* নাটক। এ-নাটক তাই দেশকালের সীমানা পেরিয়ে শৃঙ্খলিত সকল মানুষের নাটক হয়ে ওঠেছে। সাদা মানুষেরা কীভাবে কালো মানুষদের উপর নির্যাতন করতো, ঘৃণা করতো, বিদ্বেষ পোষণ করতো - সেই নির্মম চিত্র নিখুঁতভাবে দর্শক-পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেননাট্যকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গপীড়ন কাহিনী যেন গোটা বিশ্বের নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের কাহিনী। এ-নাটকের সব পাত্র-পাত্রী বিদেশি,সাদা-কালো।

কাহিনির শুরু১৯৬৭ সালের ডেট্রয়েট শহরে; পরিশিষ্টেও ৬৭-র ডেট্রয়েট শহর। ১৯৬৭ সালের ঘটনার সূত্র ধরে নাটক পেছনে ফিরে যায়, ১৯৩১ সালের এলাবামার তুলোক্ষেতের পাশে পেন্টরক স্টেশনে। নাটকটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথমে প্রস্তাবনা : ডেট্রয়েট শহর, আগস্ট ১৯৬৭ সাল। দেখা যায়, ব্র্যান-এর দায়ের করা অভিযোগে মার্কিন (শেতাঙ্গ) সৈনিক গ্রানভিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে ফিরে এনিটা হুইটনি নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েকে ধর্ষণের জন্য অভিযুক্ত। বিচারক স্টিভ যুদ্ধ ফেরত সৈনিক গ্রানভিলকে মৃত্যুদণ্ড দেন। যুদ্ধফেরত সৈনিক বলে গ্রানভিলের মৃত্যুদণ্ডে সকলে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলে বিচারক স্টিভ ছাব্বিশ বছর আগের স্কট্‌সবরো (১৯৩১) মামলার কথা মনে করিয়ে দেয়। নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে স্কট্‌সবরো মামলাকে কেন্দ্র করে। ঘটনাক্রম মামলার বিচারদৃশ্য। ডেট্রয়েট শহরের অভিযুক্ত গ্রানভিল সাদা, স্কট্‌সবরোর অভিযুক্তরা ছিল কালো; এক নিগ্রো বালক হে- উড প্যাটারসন,কথিত ধর্ষিতা দুই শ্বেতাঙ্গিনী – ভিক্টোরিয়া ও রুবি বেট্‌স।

অতঃপর নাট্যকার ফিরে যান এলাবামা রাজ্যের পেন্টরক স্টেশনে ২৫ শে মার্চ ১৯৩১ সালে। হে-উড প্যাটারসন,ওলেন মন্টগোমারী, রয় রাইট, এণ্ডি রাইট, ইউজিন উইলিয়ামস, উইলি রোবারসন, ক্ল্যারেনস্ নরিস, চার্লি উইমস এবং ওজি পাওয়েল প্রমুখ কিশোর কাজের সন্ধানে এলাবামার চ্যাটানুগা এলাকা থেকে ট্রেনে চড়ে মেমফিস্ শহরে যাচ্ছিল। ট্রেন স্টিভেনসন স্টেশন ছাড়তেই সাদা-কালো কিশোরদের মধ্যে মারামারি বাধে। সাদারা আগে কালোদের মারে তারপর কালোরা সাদাদের। মারামারির খবর পৌঁছে যায় পেন্টরক স্টেশনে। পেন্টরক স্টেশনে ট্রেন পৌঁছবার আগেই স্টেশন মাস্টার ক্রসবি চারদিকে ফোন করে হুলস্থুল বাঁধিয়ে লোক জড়ো করেন; গ্রামশুদ্ধ সব জোতদার ডেকেছেন কিন্তু পুলিশ ডাকেননি। আসে গ্রীন, প্রেন্ডিক,বিল ও ডেপুটি শেরিফ হিলসহ বহু জনতা। জনতা এই কালো কিশোরদের উপর ক্রুদ্ধ। এখানে কালোরা সাদাদের নিচে থাকবেএটা ভগবানের নিয়ম বলে দাবি করেন সাদারা, কারণ তারা ঈশ্বরের সৈনিক। জনতা উত্তেজিত, কালোদের এরা কচুকাটা করতে চাইছে। কিশোরদের মারামারি থেকে বিষয়টা এবার ভিন্ন দিকে মোড় নেয় ।কালো কিশোরদের ওপর অভিযোগ, তারা ভিকটোরিয়া প্রাইস ও রুবি বেট্স্ নামে দু'নারীকে ধর্ষণ করেছে(হিল যাদের যৌনব্যাধিগ্রস্ত বাজারের মাগী বলে অভিহিত করে)। হে-উড্সহ তার বন্ধুদের এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা সংগত কারণেই তাদের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। উন্মত্ত জনতার উল্লাস,বিকট চিৎকার, উত্তেজনার মধ্যেই হিল এই কিশোরদের দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে শেরিফ ওয়ারেন এ-কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন।ওয়ারেন বলেন, দুটো বেশ্যার জবানবন্দি, তার জন্য আদালত আছে।

এরপর ডেকাটুর আদালত। এ-নাটকে আদালতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গোটা নাটকই আদালতের বিচারদৃশ্য। অতুলনীয়, অসাধারণ বিচারদৃশ্য তিনটি তারিখে বিন্যস্ত করেছেন নাট্যকার–১৯৩১ সালের ২৫ মার্চ, ১৯৩৩ সালের ২০ নভেম্বর এবং ১ ডিসেম্বর। প্যাটারসনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার মিস্টার স্যামুয়েল লীবোভিট্স। আদালতে উপস্থিত হয়েছেন শেরিফ, খবরের কাগজের রিপোর্টার,সরকারি উকিল, এটর্নি জেনারেল টম নাইট,সঙ্গে সহকারি এ.ই বেইলী আর অসংখ্য দর্শক। এদিকে মামলা নিয়ে মস্কোয়, বার্লিনে, পিকিঙে, লন্ডনে,প্যারিসে মিছিল বেরিয়েছে। বিশ্বের নানা দেশের মানুষ কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

মিস্টার লীবোভিট্স ও তাঁর স্ত্রী, আসামির মা জেনি প্যাটারসন,বিচারক ক্যালাহ্যান আদালতে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলে অভিযুক্ত হে-উড প্যটারসনকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। বিচার কার্যের শুরুতেই দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী মামলায় নিগ্রো জুরিম্যান নিয়োগের কথা থাকলেও এলাবামা রাজ্যের এই বিচারে তা করা হয়নি। কেন করা হয়নি ? এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে জুরি কমিশনার টাপম্যান-এর জালিয়াতি। এরপর নাইট যে-দীর্ঘ ভাষণ দেন তা স্পষ্টতই সাদাদের পক্ষে, পক্ষপাতদুষ্ট – 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাদাদের রাজ্য' তাঁর বক্তৃতার পুরোটা জুড়ে ছিল উগ্র বর্ণ বিদ্বেষ।

বিচারকার্য শুরু হলে একে একে সাক্ষীদের ডাকা হয়। প্রথমেই স্টিভেনসন-এর অধিবাসী, তারপর স্টেশনমাস্টার মাইক টেরান্ট, স্টিভেনসন-এর জোতদার ওরি ডবিনস্, বেকার যুবক অরভিল গিলি, কথিত ভিকটিম ভিক্টোরিয়া প্রাইস ও রুবি বেটস্এবং সবশেষে হে উড প্যাটারসনকে। জেরা,পাল্টা জেরা,সওয়াল জবাব, ঘটনার বর্ণনা, নথি, তথ্যপ্রমাণ, সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় হে উড প্যাটারসন নির্দোষ। কিন্তু সরকারি উকিল এটর্নি জেনারেল টম নাইট সবকিছু দেখেশুনেও যখন বলেন :

> প্যাটারসনকে ইলেকট্রিক চেয়ারে পাঠান। আমি বলছি ওকে সরিয়ে ফেলুন, আমাদের চোখের সামনে থেকে ওকে অপসৃত করুন। তাকিয়ে দেখুন ওর চেহারা কালো, বীভৎস রং আর সাপের বাচ্চার মত চুল। ওকে শেষ করে দিন।চিড়িয়াখানায় ঐ জীবটিকে যেন আর না দেখতে পাই। সব শুনানী আপনাদের সামনে হয়েছে – আমি বলি দোষী হোক, নির্দোষ হোক, ওকে খতম করুন। কারণ ও অনুগত বশংবদ নিগার নয়। ঐ একটা নিগারকে শেষ করে পুরো পৃথিবীকে জানিয়ে দিন এলাবামা শ্বেতাঙ্গদের দেশ। এখানে নিগাররা টুঁ শব্দ করলে তার টুঁটি চেপে ধরি আমরা।[৩৬]

মামলার রায় কোনদিকে যাবে তা বুঝতে বাকি থাকে না কারও, তাই লীবোভিট্সের কণ্ঠে শোনা যায় মানুষের অধিকারের কথা –

> "ভদ্রমহোদয়গণ ! আমেরিকা এমন এক দেশ – পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে মুক্ত করতে একদিন একটা লড়াই করেছিল সাদা মানুষেরা। কারণ তারা ভেবেছিলthe white man is not free as long as his black brother is in chains! ঐ প্যাটারসন – বালকমাত্র – ওকে এটর্নি জেনারেল বলেছেন নিগার। আমি ওর দিকে তাকিয়ে কি দেখছি জানেন– দেখছি he is a black brother in chains!আমার কালো ভাই, কে যেন তাকে শিকল পরিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে যদি হত্যা করেন, তবে হত্যা করবেন একটা আদর্শকে একটা স্বপ্নকে। ওকে যদি মুক্ত না করেন তবে এ দেশের সমস্ত মানুষ এই এলাবামা থেকে পেনসিলভেনিয়া পর্যন্ত বন্দি হয়ে পড়বে। যাক, এটর্নি জেনারেল – মামলার আর কিছু বাকী নেই আপনারা দেখেছেন। রুবি বেটস্-এর সাক্ষ্যের পর নিতান্ত মূর্খ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না যে প্যাটারসন দোষী। একমাত্র ভিক্টোরিয়ার মুখের কথা এখন প্যাটারসনের একমাত্র শত্রু। ভিক্টোরিয়ার কথা! ভদ্রমহোদয়গণ, ভিক্টোরিয়াকে এগারবার আমরা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছি, আরো দরকার আছে ? ভিক্টোরিয়া শ্বেতকায় আর প্যাটারসন কৃষ্ণকায়, এই ত এখন সরকারের একমাত্র যুক্তি, একমাত্র অস্ত্র ? ভদ্রমহোদয়গণ, এটাই হোলো জগতের সবচেয়ে ঘৃণ্য জঘন্য অস্ত্র – জাতি বিদ্বেষ। বর্ণ বিদ্বেষ। মিনতি করছি, প্যাটারসনের ভাগ্য নির্ধারণ করার সময়ে বর্ণবিদ্বেষ মন থেকে মুছে ফেলে তবে রায় দেবেন। আমরা প্রতিবাদী নই, আত্মরক্ষকারী নই। আমরাই বাদী, অভিযোগকারী। আমাদের অভিযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটিপতি শাসকদের বিরুদ্ধে যারা ভাতৃঘাতী দাঙ্গায় আমাদের বিভক্ত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করে। মার্কিন শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে যারা ক্রমশ সমগ্র কালো ও পীত মানুষের দুনিয়ায় আমেরিকার পবিত্র নামকে কালিমালিপ্ত করে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট করে দিচ্ছেন। সরকারের বিপক্ষে জঘন্য বর্ণবিদ্বেষ যারা জিইয়ে রাখছেন, জাগিয়ে তুলছেন তাদের বিরুদ্ধে। আপনারা বিচার করুন কিন্তু মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবেন না।"[৩৭]

এরপরও স্বয়ং বিচারক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন :

> এ বিচার এলাবামা রাজ্যের আইন অনুযায়ী হচ্ছে। আর এলাবামার আইনে শ্বেতাঙ্গবাদীর কথা কিন্তু চরম। যদি অন্য কোনো প্রমাণে সে কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন না হয়, তবে বাদীর মুখের কথায়ই কৃষ্ণাঙ্গ আসামীর সাজা হয়ে থাকে।[৩৮]

শেষ পর্যন্ত নির্দোষ প্যাটারসনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে জানানো হলে, হে-উড প্যাটারসন জানায় :

> ভুল করছেন। আগে মরবে আমার হত্যাকারীরা প্রত্যেকে,তারপর মরবো আমি। যেদিন আমার সাথীদের হাতে উঠবে রাইফেল, সেদিন যে আমি আবার বেঁচে উঠবো।[৩৯]

কেবল কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার অপরাধে প্যাটারসনের ফাঁসি হওয়ায় কৃষ্ণাঙ্গরা এতদিনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, শেতাঙ্গদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা বা দয়া চেয়ে লাভ নেই; হত্যার বদলে হত্যা, হিংসার পরিবর্তে হিংসা, ক্রোধের পরিবর্তে ক্রোধ প্রকাশ করেই তাদের মোকাবিলা করতে হবে, তাই তারা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। নাটকের শুরুতে যে ব্র্যান গ্রানভিলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিল কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের বেলায় তা খুঁজে না পেয়ে নাটকের পরিশিষ্টে সেই ব্র্যানই সাব মেশিনগান দিয়ে গুলি করে গ্রানভিলকে হত্যা করে। সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তির আর কোনো পথ নেই, তারা সশস্ত্র পথেই তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বেছে নেয়। নাটকের শুরুতে প্রস্তাবনায় স্টিভ বলেছিলেন–'স্কট্সবরোর সেই কচি কচি কালো ছেলেগুলো– ধরো তোমরাই–ধরো তোমরাই সেখানে উপস্থিত। পার্থক্য শুধু একটি– ওখানে তোমাদের হাতে ছিল না অস্ত্র!'[৪০] নাটকের পরিশিষ্টে স্টিভ প্যাটারসন শেষ কথা উচ্চারণ করে –'যেদিন আমার সাথীদের হাতে উঠবে রাইফেল, সেদিন আমি বেঁচে উঠবো আবার!'১৯৬৭ সালের ডেট্রয়েট শহরের ঘটনা, প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত করে নাট্যকার এক তাৎপর্যপূর্ণ সমকালীন মাত্রা নিয়ে আসেন নাটকে। আমেরিকার একটি রাজ্যের বর্ণবিদ্বেষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনভাবে নাটকটি রচনা করলেন;যা সর্বকালের বর্ণবিদ্বেষের ঘটনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এভাবেই নাটকটি কেবল ইতিহাসের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়েই থাকে না কেবল, তা সর্বকালের শেকল পরা সকল নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে যায়।

মানুষের অধিকারে নাটকের ঘটনাপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রথাগত নয়;ব্যতিক্রম। জেরা, পাল্টা জেরা, আইনের বুদ্ধিদীপ্ত, সূক্ষ্মপ্রয়োগ, তর্ক-বিতর্ক,লীভোভিট্সের মতো আইনজ্ঞের সওয়াল-জবাব দর্শককে চরম উত্তেজনা-উৎকণ্ঠায় পৌঁছে দেয়। নাট্যকার ইতিহাসের ঘটনাকে অবলম্বন করলেও পুরো ইতিহাস তিনি নাট্যঘটনায় ব্যবহার করেননি;যদিও চরিত্রগুলো মোটামুটি ঐতিহাসিকই। কৃষ্ণাঙ্গ বালকেরা শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছিল বলে ইতিহাসে কথিত আছে। কিন্তু উৎপল তাঁর নাটকে ইতিহাসের ঘটনা হুবহু অনুসরণ করেননি, প্রয়াজনমতো গ্রহণ-বর্জন করেছেন। তাই, এ-নাটক আমেরিকার এলাবামা রাজ্যের বর্ণবিদ্বেষের নাটক হয়েও সমগ্র পৃথিবীরনিপীড়িত,নিগৃহীত, শোষিত,অত্যাচারিত সকল মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে যায়। এজন্যে এ নাটক কেবল আদালতের বিচারের নাটক নয়,মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নাটক। নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আদালতে মুক্তি মেলেনি।কালো নিপীড়িত মানুষেরা আর তাই বুঝে নেয়, মুক্তি দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়,ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র প্রতিরোধই নিয়ে আসবে প্রকৃত মুক্তি।

এ নাটকের সংগীতায়োজন করেন উৎপল স্বয়ং এবং সকলের সমবেত অভিনয়ে নাটকটি মঞ্চ-সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছিল। উৎপল দত্তের অভিনয় জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলোর অন্যতম এ-নাটকেরইস্যাম লীভোভিটস;তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন।এই নাটক মঞ্চস্থ হবার পর পত্র-পত্রিকায়নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এলটিজি যে ৬৯পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন 'জবাব' নামে, তা-ও বাংলার নাট্য ইতিহাসের একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

*রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া*নাটকটি উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র ৪র্থ খণ্ডে ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।ইন্দোনেশিয়ায় ষাটের দশকের শেষ দিককার ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ইতিবৃত্ত *রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া*। এ-সময় বামপন্থী, বিশেষত অতিবাম এবং ডানপন্থী ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার এবং উগ্র জাতীয়তাবাদীরা নিরন্তর লিপ্ত ছিল সংঘর্ষে। সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়া-আইনব্যবস্থার সমবেত তৎপরতায় জনজীবনে চলতো কঠোর রাষ্ট্রীয়নিপীড়ন। আইনি প্রক্রিয়ায় তদন্তের নামে চলতো প্রহসন। বিচারের আগেই নির্ধারণ করা হতো শাস্তি।জাকার্তা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান সিরিমাত্তাকে সহকারী লেফটেনেন্ট হামিদ বুর্জা জানায় :

বুর্জা : ক্যাপ্টেন, পরোয়ানা সাজিয়ে রেখেছি। এবার যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের নামগুলো বলে যান, এখানে বসিয়ে দিতে পারি।

সিরিমাত্তা : ঐ টেবিলেই আছে– লাল ফোল্ডারে পুরো তালিকা রয়েছে।

বুর্জা : পুরো তালিকা!!

সিরিমাত্তা : হ্যাঁ। মৃত্যুদণ্ডের আদেশগুলো। বিচারের আগেই ওগুলো লিখে রেখেছিলাম। তালিকা দেখে নামগুলো বসিয়েযাও। তারপর সই করবো। তারপর কর্ণেল বেন্দ্রার হাতে দিয়ে দাও।[৪১]

পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভীতি, যে-কোন উপায়ে ক্ষমতা দখলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা; কঠোর দমন পীড়ন – সব মিলিয়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র*রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া* নাটক।

*ক্রুশবিদ্ধ কুবা*নাটকটিপ্রকাশিত হয় এপিক থিয়েটার পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯৬৭ ও জানুয়ারি ১৯৬৮ সংখ্যায়। উৎপল দত্তের পরিচালনায় পিএলটি*ক্রুশবিদ্ধ কুবা* মঞ্চস্থ করে ১২সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সালে। পুস্তকাকারে এটি উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র ৩য় খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে।নাটকের ভূমিকাংশে নাট্যকার কিউবার বিপ্লবী কবি হোজে মার্তি, কিউবায় নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল ই.টি. স্মিথ এবং ফিদেল কাস্ত্রোর উক্তি ব্যবহার করেছেন।*ক্রুশবিদ্ধ কুবা* পলিটিক্যাল থ্রিলারের আঙ্গিকে রচিত। কিউবার জনগণের মুক্তির লড়াই এ-নাটকের উপজীব্য ।

লেলিনের ডাক প্রথম প্রকাশিত হয় (ব্রেখ্ট্ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার মুখপাত্র) 'এপিক থিয়েটার'-এ লেলিন শতবার্ষিকী সংখ্যায়। পরবর্তীতে জাতীয় সাহিত্য পরিষদের প্রকাশনায় ১৯৭০ সালের ১ মে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।সবশেষে ১৯৯৬ সালে নাটক সমগ্র চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয় নাটকটি। ১৯৬৯ সালের ১৬

নভেম্বর এলটিজি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ করে। লেলিনের ভূমিকায় অভিনয় করেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি উৎপল উৎসর্গ করেছেন দীর্ঘদিনের মঞ্চ-সহকর্মী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে।নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার উৎপল দত্ত যে তথ্য জানিয়েছেন তাই-ই নাটকের মূল বক্তব্য :

> মহামতি লেনিনের সৃষ্টিমুখর জীবনের একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় মাত্র এই নাটকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি। ১৯১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে একাধারে বিদেশী ফৌজ, দিশী প্রতিক্রীয়াশীল শ্বেতফৌজ এবং দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি, সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অসমসাহসিক সংগ্রাম ও জয়লাভকে এই নাটকে তুলে ধরার প্রয়াস হয়েছে। প্রাক বিপ্লব যুগের সংগঠক ও শিক্ষক লেনিনকে বিপ্লবোত্তর যুগের রাষ্ট্রনায়ক লেনিনের মধ্যে অবশ্য দেখতে পাওয়া উচিত। যদি না পেরে থাকি, অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না, কারণ মহান লেনিনের বহুমুখী প্রতিভার সামনে লেখনী বারবার স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাহিনীর চেয়ে সত্য এ ক্ষেত্রে ঢের বেশি চমকপ্রদ, প্রায় অবিশ্বাস্য।[৪২]

সূর্যশিকার সত্যসন্ধানী উৎপল দত্তের ব্যতিক্রমী প্রয়াস।নাটকটির রচনাকাল ১৯৭০। প্রথম প্রকাশিত হয় 'সত্যযুগ' পত্রিকায় ১৩৮২ সনের শারদীয় সংখ্যায়;পরেনাটক সমগ্র পঞ্চম খণ্ডে ১৯৯৭ সালে । প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭১ সালের ১৩ই আগস্ট একাডেমী মঞ্চে।

*সূর্যশিকার*সাতটি দৃশ্যে বিন্যস্ত নাটক।এ-নাটকের পটভূমি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়কাল, প্রাচীন ভারতবর্ষ। অযোধ্যার প্রধান রাজপথে বিপণি-মার্গে দাস কেনাবেচা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাটকের শুরু। বৈশালীর ভূস্বামী সূর্যবর্মা তার দাসী মধুকরিকাকে সন্তান(বীরক)সহ সহস্র দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করে মহামন্ত্রী বসুবন্ধুর কাছে। এরপর হাজির করা হয় গোহিলকে। সম্রাটের সেনাপতি হয়গ্রীব, দাস গোহিলকে সাত শ দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করে রওনা হওয়ার সময় বিজ্ঞানী কল্হন শিষ্যা ইন্দ্রাণী বাধ সাধে। ইন্দ্রাণী যাজ্ঞবল্ক্য শাস্ত্র উদ্ধৃত করে দুটি গাভীর মূল্যের বিনিময়ে বাল্যসঙ্গী গোহিলকে মুক্তির অনুরোধ জানালে ইন্দ্রাণীর বুদ্ধিমত্তায়, বাকচাতুর্যে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে সেনাপতি হয়গ্রীব রাজগুরু বিরূপাক্ষ ও মহামন্ত্রী বসুবন্ধুর বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্রীতদাস গোহিলকে মুক্তি দেয়। বৈচিত্র্যের লোভে ইন্দ্রাণীর প্রতি আসক্ত হয়ে হয়গ্রীব তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে রাজগুরু বিরূপাক্ষ জানান ইন্দ্রাণীর নামে পরোয়ানা আছে – কারণ ইন্দ্রাণী প্রচার করেছে যে, পৃথিবী গোল;পৃথিবী গোল বলার অর্থ,শাস্ত্র মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা; ইন্দ্রাণী ধর্মদ্রোহী,রাষ্ট্রদ্রোহী। বিরূপাক্ষ পরোয়ানার জোরে ইন্দ্রাণীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চায়। আর হয়গ্রীব বাহুবলে ইন্দ্রাণীকে ভোগের নিমিত্ত নিয়ে যায়। সেনাপতি হয়গ্রীবের কাছে তারা হার মানতে রাজি নয়। তারা এবার ভিন্ন পথে এগোয়; হয়গ্রীবের প্রণয়-আকাঙ্ক্ষী সম্রাজ্ঞী উর্মিলার মাধ্যমে সম্রাটের কাছে এই খবর তারা পৌঁছে দিতে চান। সম্রাজ্ঞী যেহেতু হয়গ্রীব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন তাই হয়গ্রীব ও ইন্দ্রাণীকে এই সুযোগে শায়েস্তা করতে চান। বিজ্ঞানী কল্হন ইন্দ্রাণীকে মুক্ত করতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে জানান ইন্দ্রাণী তাঁরই মতবাদ প্রচার করেছে, বন্দি করতে হলে তাকেই করা হোক আর ইন্দ্রাণীকে ছেড়ে দেয়া হোক। সমুদ্রগুপ্ত ইন্দ্রাণীকে ছেড়ে দেয়ার আগে পৃথিবী যে গোলাকার এটা কল্হনকে প্রমাণ করতে বলেন। পৃথিবী যে গোলাকার তার একশ পঁচিশটি প্রমাণ সম্বলিত পাণ্ডুলিপি তিনি সম্রাটের কাছে অর্পণ করেন। সম্রাট দূরবীণ দিয়ে চাঁদ দেখে বললেন :

> চাঁদ হাতে পেয়েছি,হাত বাড়ালেই চাঁদ স্পর্শ করতে পারি মনে হচ্ছে! শাস্ত্রে এত মিথ্যা কথা কেন লেখা আছে? চন্দ্র নামক দেবতা কোথায়? কেন ওখানে দেখলাম শুধু তুষারাবৃত প্রান্তর?[৪৩]

রাজগুরু বিরূপাক্ষও দেখেন;মন্ত্রী বসুবন্ধুও মনে করেন কল্‌হনের একশপঁচিশটি প্রমাণই সত্য। অতঃপর কল্‌হন আশা করতেই পারেন তারা ঘোষণা করবেন পৃথিবী গোলাকার কিন্তু বসুবন্ধু জানায় :

> না,অসম্ভব। তোমার বস্তুবাদী দর্শন প্রচারিত হলে বেদ-ব্রাহ্মণ-ধর্ম ধ্বসে যাবে। শূদ্র দাসরা বিদ্রোহ করবে![৪৪]

এদিকে বসুবন্ধু বৈজ্ঞানিক হয়েও রাষ্ট্রের সেবায় পৌরাণিক রূপকথা প্রচার করবেন।সত্যকে স্বচক্ষে দেখেও কী কারণে তা অস্বীকার করবেন, বিজ্ঞানী কল্‌হনের এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে বসুবন্ধু বলেন:

> মিথ্যারও প্রয়োজন আছে। লক্ষ লক্ষ দাস-শূদ্র-অনার্যদের জন্য মিথ্যার প্রয়োজন।[৪৫]

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কল্‌হনকে যে-প্রমাণের জন্য ডেকেছিলেন কলহন তা যথার্থই প্রমাণ করার পরও বসুবন্ধু ও বিরূপাক্ষ কল্‌হনকে বন্দি ও হত্যা করতে সম্রাটকে প্ররোচিত করেন। সম্রাট এদের কথায় সায় না দিলেও বলেন :

> শেষ পর্যন্ত আমি জানি কলহন মরবেন, মরতেই হবে তাকে কেননা 'সূর্যশিকারে' শুধু সম্রাটের অধিকার, সামান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর সে অধিকার নেই। কিন্তু নিভৃতে নিজের কাছে তুমি কি বলবে,ব্রাহ্মণ?একথা কি স্বীকার করবে, আজ শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে এক বৌদ্ধ ঋষি অবলীলাক্রমে দেবতাদের ঝেঁটিয়ে আকাশ থেকে বিদায় করে দিয়ে গেছে?...মনে মনে তো জানব,ব্রাহ্মণ, যে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ শ্রমণ এক লহমায় বেদ-উপনিষদ-পুরাণরাশিকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। এ কথা তো জানব, আত্মা নেই,স্বর্গ নেই, দেবতা নেই, ব্রাহ্মণত্ব নেই– নেতি, নেতি–স্থূলবস্তুর কারাগারে আমাদের উদয় ও বিলুপ্তি। আর কিছু নেই – কিছু নেই।[৪৬]

এদিকে দিগ্‌বিজয়ী অসম সাহসী যোদ্ধা সেনাপতি হয়গ্রীবের নবজন্ম হয়েছে ইন্দ্রাণীকে ভালবেসে; লম্পট,মদ্যপ, চরিত্রহীন,কামনাতাড়িত, ক্ষমতার নেশায় উন্মত্ত, যার প্রতিরাতে নতুন নারীর প্রয়োজন,আর রাত ফুরিয়ে গেলে বাসি ফুলের মতো ত্যাগ করা যার স্বভাব, সেই হয়গ্রীব ইন্দ্রাণীর কাছে নতজানু হয়ে প্রণয়ভিক্ষা করেছে,

> জীবনে যা করি নি তাই করছি।আমি করজোড়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি–আমাকে ভালবাসা দাও,ভালবাসতে দাও!অহমিকার বর্ম ভেঙে ফেলতে আমায় সাহায্য করো। তুমিই বা তোমার ভালবাসা নিয়ে এত গর্ব করছ কেন? সেনাপতি হয়গ্রীবকে ভূতলে শায়িত দেখে তোমার মুখে হাসি কেন। সেটা কি দম্ভ নয়?দিনরাত্রির এই লাঞ্ছনা থেকে আমায় মুক্তি দাও,নারী। আমাকে ভালবেসে এই অপমান ঘুচিয়ে দাও!

ইন্দ্রাণী জানতে চায় :

> সেনাপতি! আপনি সত্যিই সব দম্ভ এভাবে ত্যাগ করলেন? আপনি সত্যিই ভালবাসেন?উত্তরে সেনাপতি জানায় –ভালবাসা কাকে বলে তাই জানি না। যদি অষ্টপ্রহর বুকের মধ্যে ছুরিকাঘাতের মতন জ্বালার নাম ভালবাসা হয়, তবে ভালবাসি। যদি মাথার মধ্যে অগ্নিশিখার সুতীব্র দহনের নাম ভালবাসা হয়, তবে ভালবাসি। সে ভালবাসা সকলের অলক্ষে এখানে তোমার পায়ে নিবেদন করলাম।

ইন্দ্রাণীকে তিনি মুক্তি দিতে চান; ইন্দ্রাণী ভালবেসে যদি কোনদিন তার কাছে ফিরে আসে সে অপেক্ষায়ই থাকবে হয়গ্রীব। হয়গ্রীবের এই রূপান্তর দেখে ইন্দ্রাণীর অনুভব :

> তুমি এত মহৎ সেনাপতি? তোমার মধ্যেকার মানুষটা তার মায়া-মমতা-ভালবাসা নিয়ে এতদিনে বেরিয়ে এসেছে প্রাচীর চূর্ণ করে!

হয়গ্রীব জানায়:সেটা – সেটা বোধ হয় সম্ভব হয়েছে তোমার জন্য। তোমায় ভালবেসে।[৪৭]

সম্রাট হয়গ্রীবের গৃহে আসেন। ইন্দ্রাণীকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে, প্রশ্ন করে, তিনি বুঝতে পেরেছেন ইন্দ্রাণী কল্হনের যোগ্য শিষ্যা। কল্হনকে স্তব্ধ করতে হলে ইন্দ্রাণীর সাহায্য প্রয়োজন। ইন্দ্রাণী বহু বৎসর গুরুগৃহে থেকেছে। তাই রাজা তাকে আদেশ করেন কল্হনের চরিত্র হননের। যে-ইন্দ্রাণী সত্য ও ন্যায়ের উপাসক;বিজ্ঞানী কল্হন যাঁর জীবনের আদর্শ,যিনি ঋষি,মহাপুরুষ,যিনি পিতৃতুল্য, যাঁর চরিত্র নিষ্কলুষ সেই কল্হনের চরিত্র হননের রাজাদেশ কোনোক্রমেই পালন করতে রাজি হয় না ইন্দ্রাণী। সম্রাটের কাছে সেনাপতি ইন্দ্রাণীর প্রাণভিক্ষা চায়;সম্রাট প্রাণভিক্ষায় সম্মত না হলে সেনাপতি বাহুবলে তাকে রক্ষা করার কথা জানালে রাজা তার প্রিয় সেনাপতিকে বন্দি করতে উদ্যত হয়। যে-নারীর জন্যে সেনাপতি সম্রাটের বুকে কৃপাণ উদ্যত করতে চেয়েছে সেই নারীকে ধরাধামে না রাখাই শ্রেয় বিবেচনা করে তাকে নিষ্ঠুর নির্যাতনের উদ্দেশ্যে ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে প্রেরণ করা হয়। আর দিগ্বিজয়ী বীর সেনাপতি হয়গ্রীবকে তার আনুগত্য প্রমাণের জন্য পাঠানো হয় কল্হনের গৃহে। সেনাপতি কল্হনকে ইন্দ্রাণীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে এবং কল্হনই তার মতবাদ মিথ্যা বলে ইন্দ্রাণীকে মুক্ত করতে পারে বলে মনে করে হয়গ্রীব। কল্হন জানায় :

> সেটা সত্যের অবমাননা,বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। ইন্দ্রাণী অমন মুক্তি চাইবে না – বিজ্ঞানের সম্মান ধুলায় মিশিয়ে ও বাঁচতে চাইবে না– আমি আমার কন্যাকে চিনি।... সেনাপতি, আমাদের বিজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে ভারতের ভবিষ্যৎ পথ। অনাগত সেই উত্তরপুরুষদের জন্য সঞ্চয় করে রেখে যাচ্ছি সত্যের পুঁজি। আজ কল্হন যদি তার মতবাদকে নিজ মুখে মিথ্যা অ্যাখ্যা দিয়ে যায়,তবে জানি না কত শতাব্দী জুড়ে চলবে আপনাদের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের রাজত্ব। ভাবীকালের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা আমরা করব না। সে বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে ইন্দ্রাণীকে মুক্ত করে আনলে, ইন্দ্রাণী নিজে তার গুরুকে ধিক্কার দেবে, সেনাপতি।[৪৮]

কল্হন মিথ্যা বলতে রাজি না হওয়ায় হয়গ্রীবের সৈন্যরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র চূর্ণ করে,সব পুস্তক, পাণ্ডুলপি পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে ফিরে আসে। শর্বরিকা পল্লীতে দাসরা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে থাকে দাস গোহিলের নেতৃত্বে – এই গুরুতর সংবাদ নিয়ে এসেছে সূর্যবর্মা। রাজপ্রাসাদে এইসব সংবাদ শুনতে

শুনতে সম্রাট আদেশ করেন বন্দি ইন্দ্রাণীকে তার সামনে উপস্থিত করতে; কাষ্ঠচক্রে আবদ্ধ, প্রায় সংজ্ঞাহীন, রক্তাক্তদেহ, ইন্দ্রাণীকে হাজির করা হয়, বলা হয় – ঋষি কল্‌হন কর্তৃক সে ধর্ষিত হয়েছে এমন কথা বলতে। ঋষি কল্‌হন ইন্দ্রাণীর পরম পূজনীয়,তাঁর পিতার মত; মরে গেলেও এমন কলঙ্ক সে পিতার নামে লেপন করতে পারে না। সমুদ্রগুপ্তের নির্দেশে চক্র ঘোরাতে থাকে প্রহরীরা; যদিও ইন্দ্রাণীর আর বেশি অস্থি অবশিষ্ট নেই। সমুদ্রগুপ্ত এই পৈশাচিকতা উপভোগ করেন আর কবিতা লিখেন। এরই মধ্যে সেনাপতি মরকতকুঞ্জ পল্লীতেও দাসরা সশস্ত্র বিদ্রোহে সমাবিষ্ট হয়েছে মর্মে খবর নিয়ে আসে। বিদ্রোহ দমনে সেনাপতি হয়গ্রীবকে পাঠানো হয়; সেনাপতি সফলভাবে বিদ্রোহ দমন করে ফিরে আসে। দাসবিদ্রোহে কল্‌হন সমর্থন ও মন্ত্রণা দিয়েছেন, সম্রাট তাই কল্‌হনকে বন্দি করে আনার নির্দেশ দেন। কল্‌হন এসে দেখেন, কন্যাসমা প্রিয় শিষ্যা সম্রাটের নিষ্ঠুর নির্যাতনে মৃতপ্রায়। কল্‌হনের চরিত্র হননের জন্য দাসী মহাশ্বেতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় অন্য এক রাজদাসী মধুকরিকা। কারাকক্ষে সে তার ছেলে বীরককে নিয়ে গেলে বীরকের মাধ্যমে ইন্দ্রাণীর পুঁথিগুলো মথুরানগরে আচার্য প্রসেনজিতের কাছে নিয়ে যেতে বলে ইন্দ্রাণী :

> বেঁচে রইল। বিজ্ঞান বেঁচে রইল বীরকের হাতে। কলহন আর ইন্দ্রাণী বেঁচে রইল বীরকের মধ্যে। ওরা কিছুতেই বিজ্ঞানকে নাশ করতে পারবে না।[৪৯]

কারাকক্ষে হয়গ্রীব ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করে জানায়, সে তাকে মুক্ত করে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে এসেছে। ইন্দ্রাণী এ-প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না, তবে জানায় যে সে হয়গ্রীবকে ভালবাসে। একথা শুনে, হয়গ্রীব বলে,'তুমি আমায় অমৃতের আস্বাদ দিয়ে গেলে। তুমি আমার জীবনের একটা অর্থ দিয়ে গেলে।'[৫৪] ইন্দ্রাণীর মরণযাত্রায় সঙ্গী হয় হয়গ্রীব। পাগলা হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে দুজন একসঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। রাজপ্রাসাদের চত্বরে শৃঙ্খলিত ঋষি কল্‌হনকে রাজবেশে উপস্থিত করা হয় বিচারের উদ্দেশ্যে। অবশ্য তার আগেই সম্রাটের নির্দেশে কল্‌হনের জিহব্বা কর্তন করা হয়। যেহেতু কল্‌হনকে বাকরুদ্ধ করা হয়েছে,তাই সমুদ্রগুপ্ত যখন শাস্তি ঘোষণা করেন, মুখ ব্যাদান করা বীভৎস কিছু শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হয় না কল্‌হনের কণ্ঠ থেকে :

> প্রজাবৃন্দ,এঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আমি তা পাঠ করছি। কিন্তু এ বিচারের আর প্রয়োজন নেই। আচার্য কল্‌হন তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছেন,তাঁর বিজ্ঞানবাদকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন।...আমার হাতে তার স্বীকারোক্তি রয়েছে। মহর্ষি কলহন বলেছেন দ্বাদশ বৎসর মৌনব্রত পালন করে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্য করবেন। সুতরাং তিনি কথা কইতে পারছেন না,আমি বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে তাঁর স্বীকারোক্তি পাঠ করবো। এই পত্রে তিনি বলেছেন–পৃথিবী গোলাকার নয়,পৃথিবী সমতল। পুরাণই সত্য,বিজ্ঞান মিথ্যা...চন্দ্র এক দেবতা,ঋকবেদই সত্য,বিজ্ঞান মিথ্যা।... ঈশ্বর আছেন, দেবতারা আছেন, বেদ সত্য,বিজ্ঞান মিথ্যা। ''আমি মহাপাপী,মিথ্যাবাদী। বিজ্ঞানকে আজি থেকে বিসর্জন দিলাম। ধর্মের জয় হোক!"...এরপর থেকে মহর্ষি কল্‌হন রাজকুলজ্যোতিষ উপাধিতে ভূষিত হলেন এবং রাজর্ষির মর্যাদায় এ প্রাসাদে বাস করবেন।[৫০]

সম্রাটের ঘোষণা শুনে সকলে সম্রাটকে সাধুবাদ জানায়। আসল সত্যটা জনতা বুঝতেই পারেনি। অসহায় কল্‌হন অবশ্য মধুকরিকার মাধ্যমে জেনে যায় তাঁর বিজ্ঞান মরেনি বেঁচে আছে;বীরক পুঁথি নিয়ে চলে গেছে

দেশান্তরে।'না পিতা,আপনার বিজ্ঞান মরেনি।...আপনার বিজ্ঞান বেঁচে আছে।...আজ হোক, কাল হোক, শতবর্ষ-সহস্রবর্ষ পরে হোক–পৃথিবী জানবে যে পৃথিবী গোলাকার।'[৫১]এই আশাবাদের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি। বিজ্ঞানমনস্ক কল্‌হন আর ইন্দ্রাণীর সত্যানুসন্ধান,হয়গ্রীবের চরিত্রের রূপান্তর, প্রেমিক সত্তায় উত্তরণ,তার মহিমান্বিত প্রেম *সূর্যশিকার* নাটকের ভরকেন্দ্র।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত আসল সত্য জেনেও শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার্থে সত্যপ্রচারক, সত্য-উপাসক বিজ্ঞানী কল্‌হন ও তার শিষ্যা ইন্দ্রাণীকে পৈশাচিক,নির্মম,নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করেছে। প্রজারা যদি আসল সত্য জেনে যায় তাহলে তারা আর সম্রাটকে মানবে না; সম্রাটের পক্ষে রাজ্য চালানোই দুরূহ হয়ে পড়বে। অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারে জীর্ণ সাধারণ মানুষের মন। আসল সত্য জানলে এই জীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসবে সাধারণ মানুষ, তার চেয়ে বরং কুসংস্কারচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী এইসব মানুষকে শাসন-শোষণের শৃঙ্খলে রেখে নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করা যাবে। সত্য ও বিজ্ঞানের সাথে ধর্ম ও রাজশক্তির চিরকালের দ্বন্দ্ব নাটকটিকে বাস্তবানুগ করেছে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘটনার ঠাসবুনট,বর্ণাঢ্য চরিত্রসৃষ্টি সবমিলিয়ে এক অসাধারণ সৃষ্টি *সূর্যশিকার*। ধর্ম এবং সংস্কারের দ্বন্দ্ব,শ্রেণিস্বার্থের দ্বন্দ্ব, শোষকএবং শোষিতের দ্বন্দ্ব, ভোগ এবং প্রেমের দ্বন্দ্ব,বিজ্ঞানের সঙ্গে কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব,ক্ষমতার সঙ্গে সাধকের দ্বন্দ্বকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপল দত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপায়ণ করেছেন সূর্যশিকার নাটকে।

বিজ্ঞান ও সত্যপ্রচারের অপরাধে কল্‌হনের জিভ কর্তিত হলেও, ইন্দ্রাণী হাতির তলায় পিষ্ট হলেও, সত্য এবং বিজ্ঞান বেঁচে থাকে কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সমুদ্রগুপ্তের (পুরাণ তথা বেদ ও শাস্ত্রের দোহাইয়ের) সাম্রাজ্য একসময় ধ্বংস হয়ে যায়। রাজা যায় রাজা আসে,কিন্তু সত্য যাওয়া আসা করে না; সত্য চিরন্তন,অবিনশ্বর।

উৎপল দত্তের *সূর্যশিকার* ও ব্রেখ্‌ট-এর *গ্যালিলেও গ্যালিলাই* নাটকের সাদৃশ্য রয়েছে। এই দুটি নাটকেই বিজ্ঞানের সাধনার সঙ্গে কুসংস্কার বা অবিজ্ঞানের দ্বন্দ্বচিত্রিত হয়েছে। উৎপলের কল্‌হন বিজ্ঞানসাধক; ব্রেখট্‌-এর গ্যালিলিও বিজ্ঞানসাধক। দু'জনের বিজ্ঞানই বেঁচে ছিল তাঁদের স্বদেশ থেকে বহুদূরে। গ্যালিলিও তাঁর বিজ্ঞানকে বাঁচাবার জন্য এবং ভবিষ্যতে আরও বিজ্ঞানচর্চার জন্য নিজের অর্জন বা আবিষ্কারকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কল্‌হন কোনোক্রমেই এমনকি প্রাণপ্রিয় ইন্দ্রাণীর প্রাণ বাঁচাতেও নিজের আবিষ্কারকে মিথ্যা বলতে রাজি হননি। ব্রেখ্‌ট-এর*গ্যালিলেও গ্যালিলাই*-এর চেয়ে উৎপলের *সূর্যশিকার*-এরস্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব এখানেই।

উৎপলের অন্যতম প্রিয় নাটক *সূর্যশিকার*। *সূর্যশিকার* উৎপল দত্তের অসামান্য রচনা শুধু নয়, পিএলটিরও অসামান্য প্রযোজনা। আলো,আবহ সঙ্গীত,মঞ্চসজ্জা, সমবেত অভিনয় সবমিলে নাটকটি দর্শকদের অভিভূত করতে পেরেছিল। স্বয়ং উৎপল সমুদ্রগুপ্তের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন।*সূর্যশিকার* ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত ও অভিনীত হয়েছে।*সূর্যশিকার*–এর নামকরণে পিটার শ্যাফার-এর দ্য *রয়াল হানট অফ দ্য সান* এর প্রভাব ও ব্রেখট্‌-এর *গ্যালিলিও গ্যালিলাই* নাটকের বিষয়বস্তুর অনুপ্রেরণা আছে বলে

সমালোচকেরা মনে করেন। *সমুদ্রশাসন* যাত্রাপালার মঞ্চভাষ্য *সূর্যশিকার*। ইতিহাসে সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের সময়কে স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার অন্ধকার দিক তথা কালো অধ্যায়গুলো *সমুদ্রশাসন* পালায় উন্মোচন করেছেন পালাকার। মঞ্চের জন্য *সমুদ্র শাসন* পালার রূপান্তরকালে উৎপলের মনে বস্তুবাদ ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্বকে নিয়ে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক নাট্যনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা জাগে, *সূর্যশিকার* সেই আকাঙ্ক্ষারই নাট্যরূপ।

*ঠিকানা*নাটকের পটভূমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ২রা আগস্ট ১৯৭১-এ, একাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ মঞ্চে। ভারতের ব্রেখ্‌ট সমিতির নাট্যশাখা পিপলস লিটল থিয়েটারের এটি প্রথম প্রযোজনা। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় এপিক থিয়েটার মে দিবস উনবিংশ সংখ্যায় (১৯৭২);পরে নাটক-সমগ্র পঞ্চম খন্ডে। এ-নাটকে উৎপল দত্ত স্টেফান হাইম-এর ঋণ স্বীকার করেছেন।

'পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা' ৭১-সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করেছে এ-শ্লোগান। ঠিকানা নাটকের পরিপ্রেক্ষিত ১৯৭১ সালে মানিকগঞ্জ শহরে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও বর্বর অত্যাচার । সামরিক বাহিনীর কারাগারে আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখী কিছু সাধারণ মানুষের মরণজয়ী আত্মদানের কাহিনী নিয়েই *ঠিকানা* নাটক।

পাক হানাদার বাহিনী মানিকগঞ্জ শহরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। স্কুল-কলেজের বইপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। মানিকগঞ্জ কলেজে ছাত্রদের হাত বেঁধে চোখ বেঁধে লাইন করে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করেছে; ছাত্রীদের সম্ভ্রমহানি করেছে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে।

গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা মকবুল ও (রশিদা) নানীর কথোপকথনে জানা যায়, স্টেশনে বারুদভর্তি মালগাড়ি এসেছে,যাবে রাজশাহী, গেরিলা কৃষক ও মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার জন্য। মকবুলরা তাই বারুদভর্তি গাড়ি যে-কোন মূল্যে উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একজন লোক এসে নানীর দোকানে নানীকে একটি ঠিকানা দিয়ে যাবে– যে-ঠিকানায় ডিনামাইট পাওয়া যাবে।

ঠিকানা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৃদ্ধা রশিদা নানী। নানী 'সাঙ্গুভেলি রেস্টুরেন্ট' নামে ভাঙ্গাচোরা ছোট্ট একটি চায়ের দোকানের মালিক। রোজকার মত আজও তার দোকানে চা খেতে এসেছে শিল্পপতি সাহাবুদ্দিন,ডা: আনিসুজ্জামান, যাত্রাভিনেতা যামিনী সেন এবং হাসেম। হঠাৎখান সেনারা সেখানে উপস্থিত। কাপুরুষ লেফটেনেন্ট বোখারী দোকানের পেছনে নদীর কিনারে মাতাল অবস্থায় প্রস্রাব করতে গিয়ে আর ফিরে আসে না। শুরু হয় হানাদারদের অভিযান। নানী,তাঁর কিশোরী নাতনী হাসিসহ দোকানে আসা আরো অনেককে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়তাদের ক্যাম্পে।

কারাকক্ষে নানী একের পর এক গল্প বলে যায়। এ-গল্প যেন বাংলার লোকজীবনের স্বভাবজ অফুরন্ত কাহিনী প্রবাহ। ডিনামাইটের ঠিকানা নিয়ে নানী কারাকক্ষে প্রহর গুনতে গুনতে কর্ণেল ওয়ালীউল্লাহর কাছে এবার একটি বিশ্বাসযোগ্য গল্প ফাঁদে। মৃত্যুর আগে বোখারী নানীকে একটি চিঠি দিয়েছিল পোস্ট করতে; যে-চিঠিটি নানী ফেলে এসেছে তার দোকানে। অতঃপর সেনা প্রহরায় চিঠি উদ্ধারের জন্য নানীকে নিয়ে যাওয়া হয় তার দোকানে। দীর্ঘ সময় ধরে চিঠি খোঁজে নানী, আর ঘরের নানা জঞ্জালের মধ্যে রেখে যায় সেই কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা মকবুল নানী চলে যাবার সঙ্গেই সঙ্গেই ঠিকানাটা লুফে নেয়। চিঠিবিহীন নানীকে দেখে ক্রোধে জ্বলে ওঠে কর্ণেল ওয়ালীউল্লাহ। শুরু হয় নানীর ওপর দখলদার বাহিনীর অমানুষিক নির্যাতন। নানীকে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করে তার চোখ উপড়ে নিয়ে তাতে এসিড ঢেলে জিজ্ঞাসাবাদকরে চলে কর্ণেল ওয়ালীউল্লাহ।

বন্দিদের জানানো হয়েছে রোববার ২৫শে এপ্রিল ভোর ছটায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে তাদের। তারা যখন অনাকাঙ্ক্ষিত, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন মনোবিজ্ঞানী ডাঃ আনিসুজ্জামান 'মৃত্যুভয়ের প্রতিক্রিয়া' বিষয়ে একটি থিসিস লেখেন; ডাঃ আনিসের গবেষণায় রশিদা নানী ধরাই দিলেন না। নানী ঐ-মনোবিজ্ঞানীর চোখে বীরত্বের প্রতীক।

অবশেষে সেই ভোর আসে–ফায়ারিং স্কোয়াডে সাহাবুদ্দিন, আনিস, যামিনী, হাসমত ও নানীর মৃত্যুদণ্ড একের পর এক কার্যকর হয়। মৃত্যুর সময় হাশমত বলে যায়, 'বাংলাদেশের জয় হোক' ।যামিনী বলে, 'আমার রক্তে বাংলার মাঠ উর্বরা হোক; উপ্ত হোক চিরবিদ্রোহের বীজ–' ।নানীর শেষ উচ্চারণ,'মকবুল! এদের জানিয়ে দে, বাংলাদেশ চিরস্বাধীন।'[৫২] বাবুদের গাড়ি উড়িয়ে দেবার যে-পরিকল্পনায় নাটকের শুরু সেই গাড়ির বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে মাটি, তার ঝিলিকে চারদিক শাদা হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি।

এ-নাটকে কারাগারে ছ'জন বন্দিকে টেনে এনেছে দুটি ঘটনাবর্ত– একটি ঐতিহাসিক অন্যটি ব্যক্তিগত। একদিকে মুক্তিযুদ্ধ অন্যদিকে এক কাপুরুষ প্রেমের উপাখ্যান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উৎপল *ঠিকানা* দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন। এই যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে রচিতনাটকে উৎপল একদিকে পাকিস্তানী হায়েনাদের বর্বরতা,নৃসংশতা অন্যদিকে এই হায়েনাদের মোকাবিলা করতে বাংলার মানুষদের মরণপণ লড়াইয়ের চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে *টিনের তলোয়ার* এক উল্লেখযোগ্য ও ব্যতিক্রমী প্রযোজনা। এ-নাটকের প্রেক্ষাপট একশ বছরের বাংলা নাট্যশালার ইতিবৃত্ত। বাংলা নাট্যশালার নাট্যকর্মীদের শতবর্ষের ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সংগ্রামশীলতার ফসল আধুনিক নাট্যশালা। যাঁরা শ্রম-ঘাম দিয়ে, লাঞ্ছনা, বেদনা সয়ে থিয়েটারকেই আঁকড়ে থেকেছেন তাঁদেরকে নিয়েই *টিনের তলোয়ার*। উৎপল দত্ত বাংলা রঙ্গালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসকে গভীর শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় স্মরণ করেছেন এ-নাটকে। নিজস্ব মঞ্চ,কথার স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে থিয়েটার করার স্বপ্ন তাড়িত করেছে গিরিশ ঘোষ,শিশির কুমার, বিনোদিনীদের। তাঁদের তিলতিল সংগ্রাম,স্বপ্ন আর ত্যাগের ফসল

বাঙালির নাট্যশালা। তাই এঁদের ত্যাগের ইতিহাস একই সঙ্গে গৌরবের ও লাঞ্ছনা-বেদনার। শতবর্ষের বাংলা থিয়েটারের এসব দিকই অত্যন্ত নিখুঁত ও অসাধারণ নৈপুণ্যে উৎপল দত্ত *টিনের তলোয়ার*-এ তুলে ধরেছেন।

উনিশ শতকের বাঙালি নাট্যকর্মীদের শপথ উৎপল দত্তের ইতিহাস-বীক্ষায় নতুন মাত্রা লাভ করেছে। নাট্যশালার প্রচলিত ইতিহাস নয়; নাট্যকর্মীরা কীভাবে অপমানে জর্জরিত হয়েও থিয়েটারকে ছাড়েনি,নিরন্তর বৈরী পরিবেশের মুখোমুখী হয়েও পিছপা হননি,সেই ছন্নছাড়া সৃষ্টিশীল মানুষের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বাঙালির নাট্যশালা – সেই সৃষ্টির ইতিহাস উৎপলের হাতে নবরূপ পেয়েছে। এ-নাটকের ভূমিকায় উৎপল দত্ত পূর্বসূরীদের প্রতি ঋণ-স্বীকারের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে লিখেছেন :

> বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে– যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই। যাঁহারা পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয়-বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি ॥ যাঁহারা বহু পত্রপত্রিকা, বহু বাচস্পতি-শিরোমণি,বহু রাজা-মহারাজার শত পদাঘাতে জর্জরিত, যাঁহারা অপাঙক্তেয় ছোটলোকের আর্শীবাদ-ধন্য,যাঁহারা ভালবাসার বিশাল আলিঙ্গন উন্মুক্ত করিয়া জনগণের গভীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ॥ যাঁহারা সৃষ্টিছাড়া, বেপরোয়া, বাঁধনহারা ॥ যাঁহারা মাতাল, উদ্দাম, সৃষ্টির নেশায় উন্মাদ ॥ যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালির নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্র ॥ যাঁহারা আমাদের শৈলেন্দ্র-সদৃশ পূর্বসূরী ॥[৫৩]

সাতটি দৃশ্যে বিন্যস্ত *টিনের তলোয়ার* ।*টিনের তলোয়ার* নাটকের ঘটনাস্থল কলিকাতা-চিৎপুর-বৌবাজার এবং শোভাবাজারস্থ নাট্যশালা। কলকাতার রাজপথের দেয়ালে দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার কাপ্তেন বেনীমাধব এবং নটবর রোহীন্দ্র চৌধুরীর 'ময়ুর বাহন' নাটকের পোস্টার সাঁটানোর মধ্য দিয়ে নাটকের শুরু। মাতাল বেণীর সঙ্গে দেখা হয় কলকাতার নীচের তলায় থাকা মেথরের– ঐ মেথর জানতে চায় যুবরাজ ছেড়ে তার মতো মানুষদের নিয়ে নাটক লিখতে পারবে কি-না। ঐ-রাতেই আলু-তরকারি বিক্রেতা, 'ডি-শার্পে'গান গাওয়া ময়নার সঙ্গে দেখা হয় বেণীর।

চিৎপুরে গ্রেট বেঙ্গল অপেরার নাটক মঞ্চায়নের প্রস্তুতি এগিয়ে চলে, মহড়াও চলছে জোরকদম। দলে অর্থসংকট তীব্র,ঘরে একটা পয়সাও নেই,বেচবার মতো আর বিশেষ কিছু নেই; গ্রেট বেঙ্গল অপেরার নাট্যপরিচালক বেনীমাধব ওরফে কাপ্তানবাবু,বসুন্ধরা,জলদ,নটবর,যদু প্রমুখ নট-নটী নির্মম দারিদ্র্যের ভেতরেও কোনরকমে দল চালিয়ে নিচ্ছেন। দলে নায়িকা সংকটও তীব্র, এই দলের নায়িকা মানদাসুন্দরীকে গ্রেট ন্যাশনাল ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। এরই মাঝে ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিভূ প্রিয়নাথ মল্লিক পলাশীর যুদ্ধ,বৃটিশ দস্যু জালিয়াৎ ক্লাইভের মুখোশ উন্মোচন-এর উপর ভিত্তি করে একটি নাটক লিখে কাপ্তেনবাবুকে দেখতে দিয়েছেন,ফেরত নিতে এসে দেখেন নাটক তো পড়েই দেখেননি,দলের সদস্যরা নাটকের ম্যানুস্ক্রিপ্টের পাতা দিয়ে মুড়ির ঠোঙা বানিয়েছে। এ-অবস্থায় প্রিয়নাথের মর্মভেদী চিৎকার করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। দেশ যখন বিদেশির পদানত,চারিদিকে যখন নিরন্ন মানুষের হাহাকার, তখন ময়ূর বাহনের মত অকিঞ্চিৎকর

নাটক মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ প্রশ্ন তুললে বেণীমাধবের মনে পড়ে যায় মেথরের প্রশ্নের কথা। তখন থেকে প্রিয়নাথ এঁদেরকে 'রিফরমেশনের আলোকে টেনে আনার' লক্ষ্যে এই দলেই থেকে যায়।

'ময়ুর বাহন' নাটকের মহড়া এবং নায়িকা সংকটের মাঝেই আলু,পটল বিক্রেতা ময়নার আগমন। মদ্যপ অবস্থায় রাতের দেখা আলাপচারিতায় ময়নাকে দিনের আলোয় ঘুমের ঘোরে প্রথমে স্মরণ করতে না পারলেও ময়না রাতের ঘটনা মনে করিয়ে দিতেই বসুন্ধরার উপর দায়িত্ব পড়ে ময়নাকে অনুরাধার বেশে হাজির করতে। ময়না অনুরাধার ভূমিকায় অভিনয় করবে শুনে দলের অনেকেই বিস্মিত হলেও বেণীর সদর্প উত্তর 'শিখিয়ে নেব। বেণীমাধব চাটুয্যে বলছে, শিখিয়ে নেবে ! বেণীমাধব চাটুয্যে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে,কাষ্ঠপুত্তলির চক্ষু উম্মীলন করে দিতে পারে, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পারে। '...আমি শিক্ষক। আমি স্রষ্টা। আমি তাল তাল মাটি নিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়ি। আমি একদিক থেকে ব্রহ্মার সমান। আমি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।'[৫৪] (দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার মালিক) উগ্র, রুচিহীন,বাবুজনোচিত পোশাক-পরিহিত বীরকৃষ্ণদাঁ অনুরাধাবেশী ময়না ওরফে শঙ্করী দেবীর রূপে অভিভূত – 'এমন রূপ চক্ষেতে বহুকাল পড়েনি' তার। ময়না বীরকৃষ্ণসহ সকলের সামনে রাজকুমারী অনুরাধার বেশে হাজির হলেও তার মুখ থেকে নির্গত হতে থাকে তার আদি ভাষা, যদিও বেণী ওসবকে নাটকের পার্ট বলে চালিয়ে নেয়। বীরকৃষ্ণ মুগ্ধ নয়নে পুলকিত চিত্তে আগামীকাল আসবে বলে চলে যায়। এবার বেণী ময়নাকে শেখাতে আরম্ভ করেন। ময়না 'র' 'শ' উচ্চারণ করতে পারে না। ময়না বলে : 'থিয়েটার মানে ভেবেছিলাম অং মাখবো, সুন্দর একটু সাজবো, একটু হাঁটবো ফিরবো। এ যে শালা ইস্কুলের মতন।'[৫৫] বেণী মেরে পিটে অবিরাম চেষ্টায় ময়নাকে তৈরি করে নেয়।

গ্রেট বেঙ্গল অপেরা 'ময়ুরবাহন' মঞ্চস্থ করে। মঞ্চ এবং নেপথ্যভূমি একই সঙ্গে দৃশ্যমান। নেপথ্যে নাটক মঞ্চায়নের ছুটাছুটি-প্রস্তুতি।অনুরাধাবেশী ময়না 'ভালবেসে এত জ্বালা সই' গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করে। প্রথমদিকে কলকাতার বাবুদের নানা মন্তব্যে একটু নার্ভাস থাকলেও শেষপর্যন্ত ভালভাবেই চালিয়ে নেয় ময়না। নাটক তথা বেণীর সিন শেষ হবার আগেই বীরকৃষ্ণ শঙ্করীকে হাত ধরে টেনে মঞ্চে আনলে ময়না জোড়হাতে বাবুদের আর্শীবাদ গ্রহণ করে। এরপর আর ময়নাকে পেছনে তাকাতে হয়নি, কেবলই এগিয়ে চলা– খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ।

এই প্রথম ভদ্রঘরের মেয়ের থিয়েটারে আসা। ঐ-সময় থিয়েটারে নারীরা আসত বারাঙ্গনা পল্লী থেকে। থিয়েটারের অভিনেত্রীদের সমাজ খুবই হেয় চোখে দেখতো– রক্ষিতাদের সমাজে দাম থাকলেও অভিনেত্রীরা ছিল অস্পৃশ্য। গ্রেট বেঙ্গল অপেরায় প্রায়শই সন্ত্রাসী আক্রমণ আসতো;অশ্লীল,অশ্রাব্য গালাগাল বর্ষিত হতো দলের সদস্যদের উপর। তার উপর ছিল মালিক বীরকৃষ্ণ দাঁর খবরদারি। রুচি-বিবর্জিত মুৎসুদ্দি বেনিয়া বীরকৃষ্ণ তার আর ক'টা ব্যবসার মতো থিয়েটারেও বিনিয়োগ করেছে;শিল্প-সংস্কৃতি তথা থিয়েটারকে ভালবেসে থিয়েটারে বিনিয়োগ করেনি। সে লাভ ছাড়া কিছু বোঝে না। যদিও বেঙ্গল অপেরা গত তিনমাসে আটত্রিশ হাজার টাকা বীরকৃষ্ণর হাতে তুলে দিয়েছে, তথাপি এই সামান্য লাভকে লাভ মনে করে না বীরকৃষ্ণ। তাই সে থিয়েটার ছেড়ে দিতে চায়। বিনিময়ে অন্য কিছু চায়।

ময়না ইতোমধ্যে থিয়েটারের সুবাদে বেলগাছিয়ায় বাগানে সঙ দেখেছে,ঝামাপুকুরের বাবুদের জুড়িগাড়িতে বেড়িয়েছে,চৌধুরীবাবুদের বজরায় চন্দননগর ঘুরে আমোদ করেছে,সোনার হারছড়া উপহার পেয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেয়ে ময়না তার পুরনো দারিদ্র্যে আর ফিরে যেতে চায়না। বীরকৃষ্ণ দলিল নিয়ে এসেছে বেণীবাবুর কাছে। দলিল মোতাবেক শ্যামবাজারে গরবিলি জমি,বেঙ্গল অপেরার নিজের থিয়েটার তৈরির জন্য আট হাজার টাকা। থিয়েটারি ঝামেলায় বীরকৃষ্ণ থাকবেনা; স্বত্তাধিকারী হবেন বেণীবাবু। এতকিছুর বিনিময়ে বা প্রতিদানে বীরকৃষ্ণ ময়নাকে রাখতে চায়। ময়নাকে ধোপাপুকুর লেনের বাড়ি, গয়না, পাটরানী করে রাখবে, থিয়েটার করতে দেবে। বীরকৃষ্ণর শর্তে রাজী না হলে বীরকৃষ্ণ দল তুলে দেবে। ময়নাকে না জিজ্ঞেস করে, তাঁর কোনো মত না নিয়ে, তাকে বীরকৃষ্ণর রক্ষিতা হবার জন্যে বেণীমাধব মত দিয়ে দেন। বসুন্ধরা এর প্রতিবাদ করলে বেণী উত্তরে জানায়–'ও ছিল রাস্তার ভিখিরি। যা পাচ্ছে, বর্তে যাবে।' উত্তরে ময়না বলে:

> ভিখিরি যখন ছিলাম, তখন তরকারি বেচে পেট চালাতাম। এখন এমন ভদ্রমহিলা বানিয়েছো,বাবু, যে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর পথ নেই! কেন তুলে এনেছিলে রাস্তা থেকে? জবাব দাও। কেন রাস্তা থেকে তুলে এনে আমায় এ অপমান করলে?...যখন রাস্তায় আলু বেচতাম, তখন কারোর সাহস হয়নি আমাকে জিগ্যেস পর্যন্ত না করে আমাকে দোকানের পসরাকরে দেবে। কারোর সাহস হয়নি – পুতুলের মতন আমায় হাটে নিয়ে গিয়ে এমন বেচাকেনা করবে।[৫৬]

বেণীবাবু সতীত্বকে একটা কুসংস্কার বলে মনে করেন, তাই তিনি সতীত্ব টতীত্ব মানেন না। থিয়েটারের জন্য তিনি সব করতে পারেন,করে এসেছেন এবং করে যাবেন– এতে ময়নার পছন্দ অপছন্দ, ইচ্ছা অনিচ্ছা,মতামতের কোনো মূল্য নেই। তার কাছে থিয়েটারই সব। প্রিয়নাথ,থিয়েটার ও রক্ষিতা এই ত্রিবিধ দ্বন্দ্বের দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে বিপন্ন বোধ করে ময়না।

ময়না বীরকৃষ্ণকে ঘৃণা করে, ভালবাসে প্রিয়নাথকে। একদিকে প্রিয়নাথের ভালবাসা, থিয়েটার ছেড়ে তার সঙ্গে চলে যাওয়া – অন্যদিকে থিয়েটারের আলো ঝলমল রঙিন জগৎ, বেঙ্গল অপেরার এতগুলো মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্ন। ময়না এখন এমন ভদ্রমহিলা বনে গেছেতার পক্ষে আর পুরনো পেশায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। দারিদ্র্যকে দারুণ ঘৃণা করে ময়না। একদিকে থিয়েটারের রঙিন জগত,দলের সবাই,স্বচ্ছলতার হাতছানি অন্যদিকে বীরকৃষ্ণর রক্ষিতা – এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত ময়না বীরকৃষ্ণর রক্ষিতা হয়ে অন্তত থিয়েটার করতে পারবে ভেবে রক্ষিতা হওয়ার পথই বেছে নেয়। বীরকৃষ্ণর রক্ষিতা হলেও ময়না সেখানে চোখ বুঁজে পড়ে থাকবে, তার মন পড়ে থাকবে মঞ্চের আলো ঝলমল জগতে।

বেঙ্গল অপেরা প্রিয়নাথের লেখা 'তিতুমীর' নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেণীমাধব আগে না বুঝলেও এখন বোঝে প্রিয়নাথ লেখে ভালেই। স্টেজে ড্রেস রিহার্সাল চলছে। এ-নাটকে ময়নাও অভিনয় করছে। বীরকৃষ্ণর হাতে এখন মালিকানা না থাকলেও সে জানায় এ-নাটক হতে পারছে না কারণ এ-নাটকে সাহেবদের গাল দেয়া হয়েছে। সে আরও জানায়, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 'গজদানন্দ' নাটকসহ কয়েকটি নাটক

১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উপেন দাস, অমৃতলাল,ভুবনমোহন নিয়োগী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেও ময়না মনে করে কাপ্তেনবাবু ছাড়বে না,সাহেবদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে এ নাটক,ঢেউ দেখেই নাও ডোবাবার পাত্র বেণীমাধব নয়। কিন্তু ময়নার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারে না বেণী, কারণ, সবাই জেলে গেলে তো আর দল টিকে না। তাই দলের স্বার্থে বেণী তিতুমীরের পরিবর্তে *সধবার একাদশী* নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়। *সধবার একাদশী* মঞ্চস্থ করে বেঙ্গল অপেরা;মঞ্চের সামনের দুটি বক্সের একটিতে ময়না-বীরকৃষ্ণ ও এদের সঙ্গীরা, অন্যটিতে ল্যাম্বার্টসহ অন্যান্য ইংরেজ সাহেবরা এবং অসংখ্য দর্শক। বেনী *সধবার একাদশীর* নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে বক্সে বসা বীরকৃষ্ণর দিকে ইঙ্গিত করে নিজের মত করে কিছুটা বদলে নিয়ে উচ্চারণ করে দীনবন্ধুর সংলাপ। এর মধ্য দিয়ে বীরকৃষ্ণ তথা বাবু শ্রেণির প্রতি বেণীমাধব তার এতদিনের লালিত ঘৃণা ও ক্রোধ উগরে দেয়। বেণী কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়লেও অটলবেশী জলদ ও অন্যরা সংলাপ বলতে থাকে। এরই মধ্যে বেণী নিমচাঁদের সংলাপ না বলে অন্য সংলাপ বলতে শুরু করে। সামনে বসা ল্যামবার্টকে দেখে বেণীর দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও ঘৃণা তিতুমীরের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। বেণী তার মাথায় বাঁধেন গলার রুমাল, চাদরটা কোমরে– নিমচাঁদ রূপান্তরিত হয়ে যায় তিতুমীরে। দর্শকরা প্রথমে বুঝতে না পেরে হৈ চৈ করলেও পরে চুপ হয়ে দেখতে থাকে 'তিতুমীর' নাটক। এবার বেণী সংলাপ বলতে শুরু করে–

> সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেনে? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষেতি করিনি। আমরা তো ছেলাম ভায়ে-ভায়ে গলাগলি কর্য্যে, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির বাহু বেঁধে,বাংলাদেশের শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে। হাজার হাজার কোশ দূরে এদেশে এসে কেনে ঐ বুট জোড়ায় মাড়গে দিলে মোদের স্বাধীনতা?[৫৭]

বসুন্ধরা বেণীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে :

> কেনে এয়েছে জানো না, তিতুমীর? এরা হার্মাদ,জলদস্যু। এয়েছে লুট করতে। নারীর সতীত্ব নাশ কর্য্যে, সোনার ভারতেরে ছারখার কর্য্যে চলে যাবে সপ্তডিঙা ভাস্যে।[৫৮]

দৃশ্যসজ্জা পাল্টে যায় মুহূর্তে। অন্যান্য অভিনেতারাও যুক্ত হয়ে যায় 'তিতুমীর'-এর অভিনয়ে,কামিনীর গানের সাথে ময়না বকস্ থেকেই গান ধরে। ইংরেজ সাহেব ও এ দেশীয় দু-একজন মোসাহেব ছাড়া পুরো প্রেক্ষাগৃহের দর্শক একাত্ম হয়ে যায় নাটকের সঙ্গে। সকলে জয়ধ্বনি করে ওঠে। ল্যামবার্ট সাহেব 'স্টপ দিস' বলতে থাকেন দর্শকাসন থেকেই। ল্যামবার্ট নাটক বন্ধের নির্দেশ দিলেও বেণী থামেন না; নাটক চালিয়ে যেতে থাকেন। অভিনেতারা ল্যামবার্টের রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করে সমবেত গানে কাঁপিয়ে দেন প্রেক্ষাগৃহ। এখানেই *টিনের তলোয়ার*-এর যবনিকা।

নাট্যকার*টিনের তলোয়ার* নাটকে থিয়েটারের মধ্যে থিয়েটার, মঞ্চের মধ্যে মঞ্চ নির্মাণ করে থিয়েটারের যে-পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে তা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। উৎপল দত্ত এমনভাবে এ-নাটকের দৃশ্যসজ্জা করেছেন যাতে চিৎপুরের বেঙ্গল অপেরার ঘরটি একই সাথে প্রাত্যহিক ও শাশ্বতের বৈচিত্র্য ধ্বনিত হয়েছে। নাট্যকার এই ঘরটির মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর সেই সময়ের থিয়েটারের চিত্র তুলে

ধরেছেন–যেখানে থিয়েটারের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন,অভাব-অভিযোগ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, আনন্দ-বেদনা,হাসি-কান্না মিলেমিশে একাকার।

উৎপল দত্ত রিভলভিং মঞ্চের ব্যবহার করেছেন এ-নাটকে। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রসদনে ১২ই আগস্ট ১৯৭১। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় জুন ১৯৭৩-এ;পরে নাটক-সমগ্র পঞ্চম খন্ডে। উৎপলের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর অন্যতম *টিনের তলোয়ার*। রাজনীতির প্রচার ছাড়াও যে উৎপল দত্ত অসাধারণ নাটক লিখতে পারেন *টিনের তলোয়ার* তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রথম প্রদর্শনী থেকেই দর্শক অভিভূত, উচ্ছ্বসিত। *টিনের তলোয়ার* পিএলটিকে নাট্যজগতে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছে। ছ'মাস এক নাগাড়ে *টিনের তলোয়ারের* নাটকের মহড়া চলেছে। উৎপল দত্ত পড়া শেখানোর মতো করে প্রতিটি সংলাপ ধরে ধরে শিখিয়েছেন অভিনয়কর্মীদের। উৎপল দত্ত বরাবরই রাজনৈতিক নাটক লিখেছেন ও প্রযোজনা করেছেন।*টিনের তলোয়ার*-এর মতো ভিন্নধর্মীবক্তব্যের প্রযোজনা চমকে দেয় সবাইকে। এ-প্রসঙ্গে শোভা সেন লিখেছেন–

> চিরদিন লোকে জানে উৎপল দত্ত রাজনীতির প্রচার ছাড়া নাটক লিখতে বা প্রযোজনা করতে পারে না। এই নাটক দেখে তারা চমকে গেল;তাদের ধারণা বদলে গেল।[৫৯]

মহাবিদ্রোহ নাটকের পটভূমি ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধ। এই নাটকের শুরু হয়েছে গাজীউদ্দিন গ্রামে (১৮৪০ সালে)। শুরুতেই দেখা যায় বুধন জোলহার পরিবার(বুধন ছাড়াও পরিবারে আছে তার ছেলে বিষণ, ছেলেবউ কস্তুরী এবং নাতি কালু) তীব্র অভাবের ভেতর দিনযাপন করছে; চাল-গম জোগাড়করতে না পেরে তারা আমের আঁটির রুটি বানিয়ে খাচ্ছে। বুধন জোলহার সপরিবারে ডাক পড়েছে কোম্পানির এজলাসে–বাজারে কম দামে কাপড় বেচার অপরাধে। তাঁতি কাপড় বুনে বাজারে বিক্রী করে, এটা ভারতের হাজার বছরের এতিহ্য। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তাতে আপত্তি। বুধন জোলহারা – শুল্ক দিয়েও শস্তায় কাপড় বেচতে চায়, কারণ এটা তাদের সাত পুরুষের পেশা। ইংরেজরা তাঁতিদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ায় সেখানে আর পৃথিবীখ্যাত ঢাকাই মসলিন তৈরি হয়না।

কোম্পানির এজেন্ট ফ্রেজারের কাছে ডাক পড়ে বুধনদের। ফ্রেজার জানতে চায়, বুধনরা দু'টাকায় বাজারে কাপড় বেচে কি না। বুধন স্বীকার করে, তারা দু'টাকায় কাপড় বেচে। ফ্রেজার জানায়, এতে তাদের ক্ষতি হয়। ক্ষতি স্বীকার করার জন্য তারা ছ'হাজার মাইল দূরে আসেনি। বুধন প্রস্তাব দেয়, ব্রিটিশদের কাপড়ের দাম কমিয়ে দিতে; কিন্তু ফ্রেজার দাম কমাতে রাজি নয়। ফ্রেজারদের অনেক দূর থেকে মাল আনতে খরচ হয় অনেক, তাই তাদের পক্ষে দাম কমানো সম্ভব নয়। এ-দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বুধনের অজানা নয় বলে ফ্রেজার বুধনকে দাম বাড়াতে চাপ দিলেও বুধন দাম বাড়াতে রাজি হয়না। বরং সকল তাঁতির পক্ষ থেকে :

> যত তাঁতী অনাহারে মরেছে, এটা তাদের সকলের পক্ষে একটা ...কি...বলব... ধরুন, তাদের সকলের রক্তে ঐ-সুতোর রং– ধরুন ওটা শেষ একটা বিক্ষোভ।[৬০]

বুধন জোলহা ও তার ছেলে বিষণ জোলহাকে ফ্রেজার হডসনের সামনে হাজির করে, কাপড়ের দাম বাড়াতে অস্বীকার করায় হডসন গুলি চালাতে চাইলে বুধন পিস্তলশুদ্ধ হডসনের হাত চেপে ধরে বিষণকে নদী সাঁতরে পালিয়ে যেতে বলে।বিষণ পালিয়ে যায়। হডসন, ফ্রেজার বুধনের আঙ্গুল কেটে নেয়; কস্তুরি কালুরসামনে ঘটে এই দৃশ্য। তাই, কস্তুরি কালুকে নাম বদলে, পরিচয় মুছে, দূরে দেশান্তরে এদের নাগালের বাইরে চলে যেতে বলে। কালু চলে যায় অজানায়– তার নতুন নাম লছমন সিং। সে-কখনো আফগানিস্তান, কখনো সিন্ধু, কখনো ঝাঁসি, কখনো লখনৌ, মীরাট থেকে যুদ্ধ করেছে, মাকে চিঠি লিখেছে।

বিষণ জোলা রূপান্তরিত হয় হিরা সিং-এ। মীরাট অস্ত্রাগারে দেখা হয় বিষণ ও কালু পরস্পরের। কিন্তু বিষণ তখন রিসালদার হিরা সিং আর কালু লছমন সিং। কেউ কাউকে চেনে না, চেনার কথাও নয়।মীরাট অস্ত্রাগারে ভারতীয় সেপাইরা শতবর্ষের বৈষম্য, নির্যাতন আর দাঁতে টোটা কামড়ানোর বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। ফিফ্থ ইনফেনট্রির মৌলভী সুবেদার বখ্ত খাঁ বেরিলি থেকে মীরাট এসেছেন, দুটি চাপাতি দিয়ে যান হিরা সিংকে আর বলে যান– পুবে-পশ্চিমে-উত্তর-দক্ষিণে দুই চাপাতি থেকে দশ চাপাতি বানিয়ে পাঠাতে।

বিদ্রোহ শুরু হবে ২১শে মে গোয়ালিয়র, পাটনা, কানপুর,লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসিতে;আর মীরাট যাবে দিল্লি-বাদশার ঘুম ভাঙাতে।গরু আর শুয়োরের চর্বির কথা শুনে গোবিন্দ-নবাবরা হঠাৎই বিদ্রোহ শুরুর ১০ দিন বাকি থাকতেই বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। হীরা সিং সময়ের আগে বিদ্রোহ শুরুর আক্ষেপ করেও চ্যাপেল স্ট্রীটে ইংরেজদের বাংলো ওড়াতে যায়, সঙ্গে লছমন সিং। গুলি, ড্রামের শব্দে সাহেবরা সচকিত হয়;নানান জায়গায় যোগাযোগের চেষ্টা করে। টুমস্, উইলসন দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়।

দিল্লির লালকেল্লায় শাহেনশা বাহাদুরশার দরবারে গায়িকা সাকিনা মালকোষ তান বাজায়;দেশের কোনো খবরই বাহাদুরশার কাছে পৌঁছায় না;তাঁকে সবসময় ঘিরে থাকে ফিরিঙ্গি গুপ্তচর। বাহাদুরশার দরবারে বানিয়া তুলারাম, আসানুল্লা, মির্জা, পণ্ডিত, খয়ের সুলতান প্রমুখের উপস্থিতিতে ফ্রেজার বড়লাটের অনুরোধ নিয়ে হাজির হয়েছেন– কুতুবমিনারের কাছে গড়ে দেয়া নয়া ইমারতে তাঁর সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাদশাহ রাজি হন না। এমন সময়ে বন্দুক উঁচিয়ে দরবারে প্রবেশ করেন বখ্ত খাঁ, হিরা সিং, মহব্বৎ খাঁ, পরন্তপ চৌধুরী, প্রসাদ মিশির। এঁরা ফ্রেজারকে হত্যা করে। তুলারাম ভীত। বাহাদুরশা উপস্থিত সকলকে এই মর্মে শপথ করান– স্বাধীনতা ও ধর্মের শত্রু ইংলিশিয়োঁকে হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত না করে কেউ তলোয়ার কোষবদ্ধ করবে না। বাহাদুরশা নিজেও চাপাটি ও নিমক মুখে ঠেকিয়ে ‘বেঈমানী করব না’বলে শপথ নেন।

দিল্লির গার্স্টিন গলিতে (হিরা সিংদের) সিপাহীরা অনাহারে জংলি শাক,ঘাস খেয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বানিয়ারা ঔষধ, খাবার, কাপড়,নুন,সোরা,গন্ধক, চিনি,কাগজ সব লুকিয়েছে। তাই লছমন হিরার কাছে জানতে চায় :

> রিসালদার-সাহেব। খাবার কই? আমাদের থাকার জায়গা কোথায়?ওষুধ কোথায়?আমীর আর বানিয়ারা সেসব লুকিয়ে ফেলে চন্ডু টানছে, আর আমরা খুন ঝরাচ্ছি।[৬১]
> (উত্তরে হিরা সিং জানায়) :হ্যাঁ তাই ঝরাবে। এ যুদ্ধটা আমাদের,ওদের নয়।[৬২]

এখানেই লছমন সিং ওরফে কালুর সাথে তার মা কস্তুরি বাঈয়ের দেখা হলেও কেউ কাউকে চেনে না।লালকেল্লার অভ্যন্তরে হিরা সিং,বখ্‌ত, পাঞ্জা, বাহাদুরশা,জিনাতমহল সকলেই সিপাহীদের দুরবস্থায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কিন্তু এঁরা তুলারাম বানিয়াদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছেনা। বানিয়ারা তা করার কথাও নয়। আসানুল্লা মির্জাকে হিরা সিংএর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে। হিরা সিংরা এক ভাঙা গির্জায় অপারেশন চালায়;একটু আগেই ইংরেজরা এখান থেকে পালিয়েছে। এরপর অপারেশন চালায় পেট্রলিং-এ।

হিরার বীরত্ব সম্রাট বাহাদুরশাহ,সম্রাজ্ঞী জিনাতমহল ও বাদশাজাদা খয়র সুলতানের কাছে অবিদিত নয়। বাদশাজাদা খয়র সুলতানের কাছে হিরা সিং 'দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা'। কিন্তু হিরার বীরত্ব মির্জা মোগলের কাছে অসহনীয়। তাই, এ সুযোগ কাজে লাগায় আসানুল্লা ও তুলারাম বানিয়ারা; তাদের পরামর্শমতো হিরা সিংকে লালকেল্লায় ডেকে আনে মির্জা। লাডলো দুর্গের অপারেশনে হাতের আঙুল জখমের অজুহাত দেখিয়ে হিরাকে দিয়ে রজব আলিকে চিঠি লিখিয়ে নেয়; সরল তাঁতির ছেলে হিরা সিং কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক ইংরেজের গুপ্তচর' হিসেবে আখ্যা দেয় মির্জা মোগল। মির্জা মোগলরা ষড়যন্ত্র করে বীর হিরা সিংকে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী বানিয়ে সামরিক আদালতে বিচারের আয়োজন করে; সামরিক আদালতে হিরা সিং-এর স্বহস্তে লেখা পত্রের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাঁকে মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত করে। হিরা সিং-এর অস্ত্র, কোট, জামা, টুপি ইত্যাদি খুলে নিয়ে তাঁকে শৃঙ্খলিত করে–যদিও হিরা বারংবার তাঁর দেশপ্রেম এবং তাঁর জীবনের উনত্রিশটা যুদ্ধ ও উনিশটা ক্ষতচিহ্নকে সাক্ষী রেখে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে পেরে ওঠেনি। সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে জল চেয়ে জলও পায় নি। ফাঁসিতে ঝুলবার একটু আগে কস্তুরীবাঈ আসে ঘটনাস্থলে – হিরা সিং ওরফে বিষণ জোলা-কস্তুরীবাঈ পরস্পরকে চিনলেও হিরা সিং কিছুতেই স্বীকার করেননি তিনিই বিষণজোলা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হিরা সিং আত্মপরিচয়ে স্বীকৃত হননি; তিনি চাননি তাঁর ছেলে লছমন সিং ওরফে কালু বিশ্বাসঘাতক পিতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাক। হিরা সিংয়ের ফাঁসি হয়ে যাবার পর লছমন সিংদের অনুভব –

> এখানে এতজন ছিলে, প্রত্যেকের হাতে বন্দুক – কেউ বন্দুক তুললে না। আমীরদের ভয়ে। সে ভয় বহু শতাব্দীর ভয়। দুটো লড়াই চলছে – আমাদের সঙ্গে গোরার আর আমাদের সঙ্গে আমীরদের। সেটা না বুঝলে কিছুই বুঝলে না। তোমাদের সামনেও শত্রু পিছনেও শত্রু। হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে মরছ আর পেছন থেকে চশমখোর আমীর আর বানিয়ার দল ছুরি চালাচ্ছে।[৬৩]

আবার যুদ্ধ শুরু হয় দিল্লি দখলকে কেন্দ্র করে। এক একজন করে ধরাশায়ী হয় আর আমীররা উল্লাসে ফেটে পড়ে। যুদ্ধে ইংরেজ এবং তাদের এদেশীয় দোসররা জয়লাভ করে। তারা দিল্লি দখল করে। হডসন,উইলসন,টুমস্, গোরা সেনা, আসানুল্লা ও তুলারামরা বাহাদুরশাকে বন্দি করতে এসে দেখেন তিনি শান্ত পরিবেশে সাকিনার গান শুনছেন। বাহাদুরশাকে কারাগারে নিয়ে যাবার আগে হডসন জানায়–সাতাশ হাজার দিল্লিবাসীর মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত আছে; তার মধ্যে ছাব্বিশজন বাহাদুরশার আত্মীয়। সম্রাট বাহাদুরশার পুত্র খয়ের সুলতানকে প্রাণে মারা হবে না, এই মর্মে ব্রিটিশরা কথা দিলেও লেখক পাঞ্জাকুশ, মির্জা মোগলের পর বাদশাজাদা খয়ের সুলতানকেও গুলি করে হত্যা করে। অবশেষে বাহাদুরশাকে কারাগারে নিয়ে যাবার মধ্য দিয়ে হিন্দুস্তানের শেষ সম্রাট বিদায় নেন ইতিহাসের পাতা থেকে।

হিন্দু ও মুসলিম সিপাহীরা গরু এবং শুয়োরের চর্বি লাগানো কার্তুজ ব্যবহারের প্রতিবাদ জানায়– কারণ এতে উভয়েরই ধর্ম ক্ষুণ্ন হয়। এই সিপাহীদের সাথে সামন্ত প্রভু ও মোগল বাদশারাও যোগ দেন।আবার সিপাহীদের শত্রু ইংরেজ শাসকদের সাথে দেশীয় সামন্ত প্রভুরা গোপনে আঁতাত করে, যে-কারণে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও হীরা সিংরা শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। সামন্ত, দেশীয় বেনিয়া ও ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রে প্রাণ দিতে হয় দেশপ্রেমিক বীর হীরা সিং ওরফে বিষণজোলাকে। নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে এইসব দ্বন্দ্ব নাটকে তুলে ধরেছেন।

পিএলটি-র নাট্যোৎসবে *টোটা* প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লির আইফ্যাক্স মঞ্চে। ১৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লির লালকেল্লায়ও নাটকটি অভিনীত হয়। *টোটা* এপিক থিয়েটার, ১৯৭৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তবে *মহাবিদ্রোহ* প্রকাশের খবর জানা যায়নি। উৎপল নাট্যসমগ্র ৫ম খণ্ডেই প্রথম প্রকাশিত হয় এ-নাটক। রবীন্দ্রসদনে ১৯৮৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর *মহাবিদ্রোহ* প্রথম অভিনীত হয়।*মহাবিদ্রোহটোটা*-র পরিমার্জিত ও নামান্তরিত রূপায়ণ। নাটকের শুরুতেই পিএলটি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের যোদ্ধাদের অভিবাদন জানিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আখ্যান *মহাবিদ্রোহ*।

১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত, শতবর্ষ ধরে, ভারতের কৃষক-শ্রমিক-জনতা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে ছোট ছোট আন্দোলন সংঘটিত করেছিল– সেই ছোটছোট আন্দোলনের সমষ্টিই ১৮৫৭ সালের(স্বাধীনতাযুদ্ধ)মহাবিদ্রোহ। মহাবিদ্রোহে একক কোনো নায়ক নেই। কৃষক, তাঁতি সিপাহী, দেশীয় রাজন্যবর্গসহ নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের শতবর্ষের সঞ্চিত ক্রোধাগ্নি-মহাবিদ্রোহ। তাই এই বিদ্রোহ কোনো আঞ্চলিক বিদ্রোহ নয় এবং আকস্মিকভাবেও এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তথা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিল তিল করে গড়ে ওঠা ক্ষোভ একসময় মহাবিদ্রোহে রূপ নেয়। বৈষম্যের শিকার দেশীয় সিপাহীরা নিপীড়িত হতে হতে বিদ্রোহের পতাকা হাতে তুলে নেয়, অস্ত্র ধারণ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে।

পিএলটি *মহাবিদ্রোহ* নিয়ে পূর্বজার্মানি সফর করে। পূর্বজার্মানির বার্লিন, রস্টক, স্ট্রাসবুন্ড,কার্ল মার্কস্ স্টাট,ভাইমার, প্লাউয়েন ও লাইপজিগ শহরে পিএলটি *মহাবিদ্রোহ* অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে।উৎপল দত্তের বিশেষ প্রিয় নাটক *মহাবিদ্রোহ*।

সত্তরের দশকের কলকাতা শহরের চালচিত্র *দুঃস্বপ্নের নগরী*। দেশে জরুরি অবস্থা, শাসক শ্রেণির সাথে মিলেছে পত্র-পত্রিকা, পুলিশ, প্রশাসন ও তাদের ভাড়াটে খুনি। এরা সবাই একাট্টা হয়ে খুন, হত্যা, সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে, সংস্কৃতিকে আক্রান্ত করে দেশে এমন এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যাতে মনে হয় – কলকাতা যেন *দুঃস্বপ্নের নগরী*। অথচ কলকাতা নাট্যকারের প্রিয়ার নাম। নাট্যকার নাটকের সূচনাসংগীতে বলছেন :

> আমার প্রিয়াকে আর কত দেবে গাল
> কলঙ্কিনী বলে ডাকবে কত কাল?
> ছিন্নবসনা সে ধূলিধূসরা,
> দেহকে নাকি করেছে পসরা,...
> চোখের সামনে মরতে দেখেছে সন্তান শত শত,
> তাই যুদ্ধের সাজে সেজেছে প্রিয়া লড়ছে অবিরাম
> কলকাতা অমার প্রিয়ার নাম। [৬৪]

তিনটি দৃশ্যে বিন্যস্ত *দুঃস্বপ্নের নগরী*। পুঁজিপতি লক্ষণ পালিত, পুলিশ অফিসার মৃগাঙ্ক রায়, যুবনেতা চিন্ময় গোস্বামী,বঙ্গবাণী'র সম্পাদক গোবিন্দ চাটুয্যে,বেকার যুবক মনিভূষণ মিত্র, সাগর প্রমুখ চরিত্রের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্তসহ উৎপল দত্ত এদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। কালোবাজারি মুনাফাখোর (আসল খুনি) লক্ষণ পালিত টাকা দিয়ে পুলিশ অফিসারকে কিনেছেন, কিনেছেন যুবনেতা চিন্ময় গোস্বামীকে আর বঙ্গবাণীর সম্পাদককে তো পুষছেনই। পুলিশ অফিসার যুবনেতা আর সম্পাদক যখন কালোবাজারির দোসর হয় তখন দেশে কেমন গণতন্ত্র থাকে, কেমন থাকে দেশের মানুষ তা সহজেই অনুমেয়। এরা গুণ্ডা মাস্তান পোষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়। লক্ষণ পালিতের ভাড়াটে খুনি মনিভূষণ মিত্রকে দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের নির্দেশ-মতো কাজ করতে বলে। মনি এসব করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে :

> আমাদের পেয়েছিলেন, বেকারির জ্বালায় জর্জরিত কিছু হতভাগ্য।...কাজ নেই, কাজ কেউ দিতে পারেনি।... তারপর এসে বললেন, সি-পি-এমকে মেরে পাড়াছাড়া করতে হবে– তাহলে চাকরি দেবেন। পুলিশ পাহারায় দিনের পর দিন আক্রমণ চালিয়েছি।...কিন্তু চাকরি পাইনি। তখন বললেন, নির্বাচনটা পার করতে হবে, গদিতে বসেই সক্কলকে চাকরি দেবেন। আমার ছেলেরা তাই মেনে নিয়ে গুণ্ডামী আর জোচ্চুরিতে নামল। বিপক্ষের ইলেকশান-এজেন্টকে গুম করেছি, ব্যালট-বাক্স পাল্টে দিয়েছি,ভোটকেন্দ্রে যেন সাধারণ মানুষ না আসতে পারে তাই বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়েছি, বোমা

> মেরে ভোটকেন্দ্র তছনছ করেছি,হাজারে হাজারে জাল ভোটপত্রে ছাপ মেরে বাক্সে ফেলেছি। কিন্তু চাকরি পাইনি – ক্ষুধার জ্বালায় তবু জ্বলছি![৬৫]

ক্ষুধা,বেকারির জন্য বাধ্য হয়ে এতদিন এতকিছু করলেও মনি আর এসব করতে চায় না এসব ছেড়ে দিয়ে অন্য পাড়ায় চলে যেতে চায়; অন্যভাবে বাঁচতে চায়–স্বপনকে খুন করতে চায় না। কিন্তু মনি না চাইলেও লক্ষ্মণ, মৃগাঙ্ক,চিন্ময়রা তাকে তো ছাড়বে না। পাড়া বদলে, স্বপনদের হাত এড়াতে সক্ষম হলেও পুলিশের হাত তো এড়াতে পারবে না, তার বিরুদ্ধে চারটে মার্ডার কেস রয়েছে। অন্তহীন এই বৃত্ত থেকে মনিরা বেরুবার সুযোগই পায় না, তাইতো মনির প্রশ্ন– 'তার মানে একই অন্ধ একই অন্ধ চক্রে ঘুরে ঘুরে মাথা খুঁড়ে মরব সারা জীবন?'

এবারের কাজটা করে দিলেই মনির ছুটি। ছুটির প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে এবার মনি রাজি হয়; ভাবে, শেষ 'এসাইনমেন্টটা' শেষ করে পূর্ণিমাকে (লক্ষ্মণ পালিতের পিএস) বিয়ে করে অন্যভাবে বাঁচবে। মনি পূর্ণিমাকে জানায়–স্বপনকে মারবে বলে টাকা নিলেও আসলে সে স্বপনকে মারবে না। মনি কী করে এপথে এলো পূর্ণিমা জানতে চাইলে মনি জানায়–ক্ষুধার জালায় ব্যাঙ্ক লুট করে ধরা পড়ে।

> তারপর একদিন বন্দুক হাতে দিয়ে বলে কমিউনিস্ট মার, তবে ডাকাতির দায় থেকে রেহাই দেব।... মারলাম একটি ছেলেকে। তখন বলে, আরেকটি ছেলেকে মারতে হবে, নইলে প্রথম ছেলেটিকে খুনের দায়ে আমায় ফাঁসি দেবে এইভাবে চলল। তৃতীয়কে না মারলে দ্বিতীয়কে খুনের চার্জ– চতুর্থকে না মারলে, তৃতীয়কে খুনের চার্জ! মাথার ভেতরে মগজটা বোধ হয় গলে গেছে। – শয়তানরা ! মেরে, ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়ে আমাকে একটা রাজনৈতিক অস্ত্র বানিয়েছে।[৬৬]

পূর্ণিমাকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালায় – এদের গোপন খবরাদি জানার জন্য। পূর্ণিমাকে বিকেলের মধ্যে ছেড়ে না দিলে সব ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দেয় মনি। সাপ্তাহিক দর্পণের রিপোর্টার অশোক মুখুয্যের কাছে প্রমাণাদিসহ লক্ষ্মণ পালিতদের হত্যা,সন্ত্রাসের যাবতীয় ইতিহাস ফাঁস করে দেবে। অশোক মুখুয্যের রাত দশটায় আসার কথা থাকলেও সাড়ে দশটা বেজে যায়, তবুও সে আসে না – অশোকের পরিবর্তে আসে পুলিশ; চারদিক ঘিরে ফেলে। মনির আর স্বাভাবিক জীবনে ফেরা হয় না। মনির সাগরেদ সাগরই তাকে ধরিয়ে দেয়। মনি রিলিজড্। তার ফাইল পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মনিকে মৃগাঙ্ক বাড়ি যেতে বলে। মৃগাঙ্কের মিথ্যা আশ্বাসে দৌড়ে পালানোর সময় মৃগাঙ্কই পিছন থেকে গুলি করে, মনি ডাস্টবিনে পড়ে যায়। সবশেষে, স্বপন-মুস্তফারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মজদুরদের সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

উৎপল দত্ত এ-নাটকে প্রতিটি চরিত্র তাদের ইতিবৃত্তসহ হাজির করেছেন। *দুঃস্বপ্নের নগরী*'র রচনাশৈলী ভিন্নতর। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কবিতা ও ছড়ার কোলাজ এ-নাটক। সমকালীন কলকাতার বিস্ফোরণ-উন্মুখ পরিস্থিতি উৎপল দত্তের রচনার বৈদগ্ধ্যে সংগ্রামের পদাবলিতে পরিণত হয়েছে। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৪। প্রথম অভিনয় কলামন্দিরে ১৬ মে ১৯৭৪ সালে। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় এপিক থিয়েটার ৭৯-৮০ সংখ্যায়;পরে নাটক-সমগ্র ষষ্ঠ খণ্ডে ১৪০৫ সনে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত লেনিনের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার ইতিবৃত্ত *লেনিন কোথায়*। লেনিনকে ধরবার জন্যে একের পর এক মরণপণ অভিযান, আর প্রতিবারই স্তালিনসহ অন্যান্য সহযোদ্ধার বুদ্ধিমত্তায় সব অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়ে লেনিনদের বিজয় – *লেনিন কোথায়* নাটকের বিষয়বস্তু।

লেনিন কোথায় নাটকটি রচনায় উৎপল দত্ত যাত্রার আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। নাটকের শুরুতেসূত্রধার লেনিনের আত্মগোপনকে ইতিহাসের বৃহত্তম 'থ্রিলার', রুদ্ধশ্বাস 'ডিটেকটিভ' উপন্যাস হিসেবে অভিহিত করে 'মেলোড্রামা'র স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। নাটকটিনয়টি দৃশ্যে বিন্যস্ত।

রুশ বিপ্লবে বলশেভিকরা নেতৃত্ব দিলেও ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে মেনশেভিকরা; যার নেতৃত্বে ছিলেন কেরেনেস্কি, স্কোবে প্রমুখ। লেনিনকে জার্মান গুপ্তচর হিসেবে প্রচার করে তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপকৌশল প্রয়োগ করেছে ক্ষমতাসীন মেনশেভিকরা। শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবে অংশগ্রহণ, লেনিনের আত্মগোপন, লেনিনকে বার বার ধরার পাঁয়তারা এবং শেষপর্যন্ত বেঁচে যাওয়া এ-নাটকের নাট্যিক আবহ। ডানপন্থী মেনশেভিকরা বামপন্থী বলশেভিকদের সাথে,শ্রমিকশ্রেণির সাথে, দেশের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিপ্লবী পার্টিতে বামপন্থী নেতাদের বিচ্যুতি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সবকিছুর পরেও বিপ্লবী পার্টি ও নেতার দায়িত্ব হচ্ছে সমস্ত বৈরিতা, বিরোধিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিচ্যুতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো। লেনিন ও স্তালিন এই দায়িত্বই যথাযথভাবে পালন করে ইতিহাসের মহানায়ক হয়েছেন। প্রতিপক্ষ মেনশেভিকদের মরণপণ অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়ে শ্রমিকরাজ কায়েমের লড়াই চালিয়ে গেছেন নিরন্তর। একের পর এক অভিযানে লেনিন ও তাঁর সহযোগীদের কাবু করতে পারেনি। বরং প্রতিটি অভিযানের আগেই লেনিনরা দ্রুততা ও বিচক্ষণতার সাথে সরে পড়তে সক্ষম হয়েছেন। কালোবাজারি করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি, শ্বেতসন্ত্রাস, বিদেশি ফৌজ, দেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, লেনিনের বিরুদ্ধে কুৎসা, জার্মান গুপ্তচর হিসেবে অপপ্রচার শক্তহাতে মোকাবিলা করেছেন লেনিন-স্তালিনরা।

লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পরাভূত হয়। মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে বলশেভিকরা জয়ী হয়। লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার জনগণের লাগাতার সংগ্রামই তাঁদের বিজয়ের চাবিকাঠি। প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাভূত করে শ্রমিক-কৃষক বিপ্লব সম্পন্ন হলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না, বরং শ্রমিক-কৃষকদের রাষ্ট্র – সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনা শুরু হয় তখন থেকে। তাইতো নাটকের শেষে লেনিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়:

> কমরেডস্, যে শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের কথা আমরা বলেছিলাম তা সম্পন্ন হয়েছে... এবার আমরা রুশিয়ায় সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের কাজ আরম্ভ করবো। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।[৬৭]

গোটা বিশ্বের লড়াকু মানুষ চিরকালের বিপ্লবী নায়ক লেনিনের নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে আনা বিজয় দেখে অনুপ্রাণিত হবে – নাট্যকারের এই অভিপ্রায় অনপনেয় দৃঢ়তায় উচ্চারিত হয়েছে এ নাটকে।নাট্যকার উৎপল দত্তের ইতিহাসবীক্ষার সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে *লেনিন কোথায়* নাটকটি। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের মত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে সফল ও বিরল রচনা। এ-নাটকের ঘটনা যেমন ঐতিহাসিক, চরিত্রগুলোও তেমনি ঐতিহাসিক চেনামুখ। লেনিন, স্তালিন, জিনোভিয়েব, ট্রটস্কি, কেরেনেস্কি, ক্রুপস্কায়া,কোবে প্রমুখ ঐতিহাসিক কিংবদন্তি। চরিত্রসমূহের পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াশীলতা আশ্চর্য দক্ষতার সাথে উৎপল দত্ত উপস্থাপন করেছেন। এ-নাটকের সংলাপ সরস। নাটকটি, নাটকেরই বিবেকের কথায় 'ইতিহাসের বৃহত্তম থ্রিলার'। *লেনিন কোথায়* নাটকে উৎপল দত্ত বাঙলা লোকনাট্য-আঙ্গিক যাত্রাপালার সম্ভাবনাকে আধুনিক থিয়েটারে যাচাই করেছেন এবং সাফল্য নির্মাণ করেছেন। নাট্যকার এ-নাটকের খসড়ায় এর নাম দিয়েছিলেন 'লেনিন ভেঙেছে বাঁধ';পরিমার্জন করে দেন *লেনিন কোথায়*। পিএলটি নাটকটি মিনার্ভায় প্রথম মঞ্চস্থ করে ১৯৭৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। এপিক থিয়েটার পত্রিকার মে-জুন ১৯৭৯ সংখ্যায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়;পরে নাটক-সমগ্র ষষ্ঠ খণ্ডে।

১৯৪৬ সালে ভারতের উত্তর বাংলার মেচগীর রাজ্যের উত্তাল ঘটনা প্রবাহ *এবার রাজার পালার* পটভূমি। নাটকের প্রস্তাবনা থেকে জানা যায়–ননী অধিকারীর দলের 'নীলকুঠি' পালা ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে। তাই কলকাতার কাছাকাছি এরা এ-পালা গায় না। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর বাংলার স্বাধীন দেশীয় রাজ্য মেচগীর স্টেটের এক অজ গ্রামে এক কুমার বাহাদুরের (ত্রিদিব সিংহ) ডাকে তারা গাইতে এসেছে।

বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কু মেচগীর রাজার আটত্রিশজন জারজ ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। সে লিখতে পড়তে পারে না। ননী অধিকারীর যাত্রার দলে প্রমট্ শুনে শুনে বঙ্কু রাজার ভূমিকায় অভিনয় করে। পীঠস্থান গ্রামে ননী অধিকারীর দল কংসবধ পালা গাইতে এলে এখানেই মেচগীর রাজার মুত্যুর পর বঙ্কুকে রাজা ঘোষণা করে দেওয়ান হরকিশোর রায়, মন্ত্রী দোলগোবিন্দ মুখুয্যে এবং ব্রিগেডিয়ার বর্মণ। রাজার পালার অভিনেতা বঙ্কু সত্যিকারের রাজা বনে যায়।বঙ্কু রাজা হয়ে তার পারিষদ নিযুক্ত করে ননী অধিকারী, চন্দ্রশেখর ডোম ও ঝগরু নাপিতকে। আর বঙ্কুর বেশ্যা বান্ধবী যমুনা তো যথারীতি মহারানী। রাজা বঙ্কু ও তার পারিষদরা রাজকার্যেও যাত্রার সংলাপ আওড়ায়,বাস্তব আর পালাকে তারা গুলিয়ে ফেলে। জীবন-অভিনয়-কল্পনাকে তারা একাকার করে ফেলে।রাজা বঙ্কু দিনে দিনে তার পারিষদ থেকে পৃথক হয়ে যায়।যাত্রার নকল কংসরাজা ক্রমশ আসল কংস রাজায় পরিণত হয়। দেওয়ান হরকিশোররা আশা করেছিল– শাসনকার্যের যে কিছুই জানে না, সেই অজ্ঞ, মূর্খ বঙ্কুকে নামমাত্র রাজা বানিয়ে তারাই রাজ্য চালাবে। কিন্তু বাস্তবে হরকিশোরদের আশাভঙ্গ হয়। কিশোরীলাল চামারিয়া দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে ইসলামপুর মহল ইজারা নিয়ে মাটি খুঁড়ে লোহার খনি বের করতে কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের বাধার জন্য এতদিন পেরে ওঠেনি। বঙ্কু ইজারা দিতে রাজি হয়, এর জন্য বাধা এলেই বঙ্কু আইন জারি করে সব বন্ধ করে দেয়।

বঙ্কু কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহকে বন্দি করেছে। ননী অধিকারীর লেখা বক্তৃতা দেয় বঙ্কু। সংবাদপত্র সেন্সর করে। বঙ্কু ক্রমশ ক্ষমতালোভী ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। হিটলারের আদলে গোঁফ ছেঁটে সে প্রকৃতই ভারতের হিটলার বনে যায়। সে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করে এভাবে – গণতন্ত্র মানে সে যা বলবে সবাই মিলে তা করা, সেটাই প্রকৃত গণতন্ত্র।প্রজা পরিষদ তার বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় ১০৩জন সদস্যকে গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে বঙ্কুর অভিব্যক্তি এরকম– কষে লাথি মারার মাধ্যমেই গণতন্ত্র রক্ষা পায়। বঙ্কুর কাছে সংবিধান তো যখন তখন কেটে-কুটে ঠিক করে নেয়ার জিনিস। আদালতের সব ক্ষমতাও বঙ্কু বাতিল করে দিয়েছে। বঙ্কুর কাছের মানুষরাও ক্রমশ বঙ্কুর কাছ থেকে দূরে চলে যায়। বঙ্কু শত্রু-মিত্র শনাক্ত করতে পারে না। সে কাউকেই বিশ্বাস করে না– তাইতো ঝগরুর কণ্ঠে শোনা যায় :

> এখানকার বাতাসে বোধ হয় কেমন অবিশ্বাস আর ভয় মিশে আছে।সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে বুকের ওপর পাষাণ চাপে। লোকে অকারণে ভয় পায়। তুমি দেশটাকে এমন এক জেলখানা করে তুলেছ যে এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে মনের কথা কইতে পারছে না।[৬৮]

ননী অধিকারী শ্রীনিবাস ময়রার কাছে চিঠি পাঠায় ভীষ্মলোচনের উদ্দেশ্যে যমুনাকে দিয়ে। যমুনা ধরা পড়েও ননীর নামোচ্চারণ না করে টেংরার কথা বলে। তাই অনিবার্যভাবেই ট্যাংরার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। শুধু ট্যাংরা নয়, ঝগরু, ভীষ্মলোচন কেউই রেহাই পায় না বঙ্কুর কাছ থেকে। যে কমিউনিস্ট ভীষ্মলোচনকে একদা আশ্রয় দিয়েছিল বঙ্কু সেই ভীষ্মকে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেয় বঙ্কু নিজেই। ভীষ্মকে না পেয়ে তার স্ত্রী আন্নাকালীকে নির্মম যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে ট্যাংরা ও বর্মণ। গোপিকাপুর রেডিও-স্টেশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চন্দ্রশেখর ডোম প্রাচীন বাঙালি কবি দাশরথি রায়ের গান গায় :

> যেমন পাপ ঘুচিলে পৃথিবী পবিত্র বলি শাস্ত্রমত।
> দুর্জন ঘুচিলে গ্রাম পবিত্র, দস্যু ঘুচিলে পথ ॥
> রাহু ঘুচিলে চাঁদ পবিত্র, আলো করে ভুবন।
> জংগল ঘুচিলে স্থান পবিত্র, বেণী ঘুচিলে কেশ।
> অত্যাচারীর রাজ ঘুচিলে পবিত্র স্বদেশ ॥[৬৯]

কিন্তু বঙ্কুর পক্ষে তো এ-ধরনের সংগীত সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই বঙ্কু আদেশ করে মাইক্রোফোনের সুইচ বন্ধ করে দিতে। চন্দ্রশেখরের গান থামে না। বঙ্কুর নির্দেশে চন্দ্রশেখরকে হত্যা করা হয়। বঙ্কুভীষ্মদের কৃষকবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছে। কারণ বঙ্কুর সব পরিকল্পনার খবরই ননীর বদৌলতে ভীষ্মরা আগে ভাগে পেয়ে যায়। বঙ্কুও জেনে গেছে আসল গুপ্তচরের নামননী অধিকারী। বিশ্বাসঘাতক ননী অধিকারীকে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেয় বঙ্কু কিন্তু বঙ্কু জানে না ইতোমধ্যে ননী হিটলারের সাজে বঙ্কু বনে গেছে। বঙ্কু ব্রিটিশ সৈন্য আহবান করে তাদের রসুলপুর দিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে ননী নির্দেশ দিয়েছে হেতমপুর দিয়ে ঢুকতে। একবার আসল বঙ্কু, একবার নকল বঙ্কু। একবার রসুলপুর, একবার হেতমপুর। এরকম দ্বৈত নির্দেশ পালন করতে গিয়ে রীতিমতো গলদঘর্ম হয়ে যায় হরগোবিন্দ ও বর্মণরা। ইতোমধ্যে ভীষ্মদের লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বঙ্কুরূপী ননী তার কার্যসিদ্ধির পর সবাইকে তিনদিনের ছুটি দিয়ে দেয়। আয়নার সামনে ননী বঙ্কুর ছায়া সেজে দাঁড়ায়। বঙ্কু যা যা করে ননীও তা তা করে। আয়না থেকে বেরিয়ে ননী বঙ্কুর সাথে করমর্দন করলে বঙ্কু বলে :

> বঙ্কু ॥ আপনি তো বেশ, বাংলা বলেন।
> ননী ॥ হ্যাঁ, তবে একটা ব্যাপারে তুমি আমাকে হারিয়েছ– তাই তোমাকে সাধুবাদ দিচ্ছি।
> বঙ্কু ॥ কি সেটা গুরুদেব ?
> ননী ॥ আমি জার্মানীতে স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করে সেটাকে স্বৈরাচারই বলেছিলাম, ডিকটেটরশিপ বলেছিলাম। তুমি সেটাই তোমার দেশে চালু করে বলছ গণতন্ত্র। এটা খুব জোর একহাত নিয়েছ ভায়া। সবাই ডাণ্ডা খাবে ঘাড়ে-মাথায়, অথচ তাদের সমস্বরে চেঁচাতে হবে গণতন্ত্রে বাস করছি, এটা আমার মাথাতেও আসে নি।...
> ননী ॥ তবে ব্যাপারটা কি জানো কামেরাড বঙ্কু ? তোমার জীবন সুতোয় ঝুলছে।
> বঙ্কু ॥ আমার প্যান্টও তাই।
> ননী ॥ হুঁ, ঐ প্যান্ট খুলে নিয়ে মারবে!
> বঙ্কু ॥ কে ? কে মারবে ?
> ননী ॥ যদি লোকে না মারে, তাহলে যারা আমাদের পোষে তারাই মারবে। আমরা ভাবি আমরাই আসল ভাগ্যবিধাতা। আসলে আমরাও পুতুল। আমার সুতো ছিল ক্রুপ,টিসেন, ফার্বেন প্রভৃতি মহাধনীদের হাতে। তোমার সুতোও বাঁধা রয়েছে বানিয়া জমিদারদের হাতে। আচ্ছা চলি হের বঙ্কু, তোমার প্রয়াসটাকে কিন্তু প্রশংসা করতেই হয়। তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ।[৭০]

বঙ্কুকে চামারিয়া বর্মণদের আর প্রয়োজন নেই, তাই তারা রাজা বদল করে; বঙ্কুকে হত্যা করে ত্রিদিব সিংহকে রাজা বানায় আর হত্যার দায় চাপায় ভীষ্মদাসের কম্যুনিস্ট পার্টির উপর।

> এইভাবে মেচগীররাজ্যে চামারিয়া এন্ড কোম্পানি লিমিটেড লৌহখনি খুঁড়বার অনুমতি পেল।[৭১]

এবার রাজার পালা সম্পর্কে উৎপল দত্ত তাঁর *টুওয়ার্ডস্ এ রেভ্যুলেশনারী থিয়েটার* গ্রন্থে যে-মন্তব্য করেছেন তাতেই এ-নাটক সম্পর্কে একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠেছে: 'A band of strolling players suddenlyhears that the fellow among them who plays the king is a real king, and when he takes his rightful throne he appoints his fellow actors to various posts and they proceed to play a new drama.They abolish the constitution,the law and all civil liberties,and in the manner of theatre-allegory of Goeth's Wilhelmmeister,they proceed to summarise in their strictly theatrical problems the tragedy of a nation without democracy.They have lost the ability to distinguish between illusion and reality and hasten cheerfully to their doom,much as the rulers of India are securrying to theirs.'[৭২]

শ্রেণিবিভক্তসমাজে একের পর এক রাজা বদল হতে থাকবে, রাজা বদলের পালা চলতেই থাকবে; যতক্ষণ না সব শ্রেণিদ্বন্দ্বের অবসান হয়। পুতুল রাজারা পুঁজিপতিদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে আর রাজ্য চালাবে পুঁজিপতিরা – নাট্যকার এই বিষয়টি সুনিপুণভাবে*এবার রাজার পালায়* উপস্থাপন করেছেন। ১৯৪৬ সালের শেষদিকে– ভারতে ব্রিটিশ শাসনেরও শেষপর্ব, দেশীয় রাজ্যের দুরবস্থা, বংশ পরিচয়ের বদৌলতে রাজা হওয়া,

রাজা জমিদারদের সাথে পুঁজিপতি বানিয়াদের সম্পর্ক, কমিউনিস্ট আন্দোলন, জার্মানের ফ্যাসিস্ট হিটলারের আদলে ভারতের গণতন্ত্রায়ণ, এসব বিষয়অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে নাট্যকার এ-নাটকে তুলে ধরেছেন।নাটকটির কাহিনী,সংলাপ, ঘটনার চমৎকারিত্ব ও পারম্পর্য, কাহিনীর বিন্যাস,নাট্যমুহূর্ত, নাট্যসংঘাত, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাস্য-পরিহাস সৃষ্টিতে নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। হাস্য-পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভেতরেও যে নিরেট রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরা যায় *এবার রাজার পালা* তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

> সে যুগের শ্রেণিসংগ্রামগুলি ধর্মীয় বকুনির আবরণে আত্মপ্রকাশ করতো; শ্রেণিগুলির স্বার্থ, চাহিদা এবং দাবিদাওয়া লুকিয়ে আছে ধর্মের যবনিকার পেছনে। কিন্তু তাতে মূল বিষয়টির কোন হেরফের হয় না। ওসব যুগের প্রভাব মাত্র।[ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস : ধর্ম-সম্মন্ধে, দ্বিতীয় সংস্করণ, মস্কো, পৃ: ৯৯][৭৩]

এঙ্গেলস্-এর এই উক্তি ব্যবহারের পর উৎস নির্দেশ, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি ও ঘটনার পরিচয় দিয়ে *তিতুমীর* নাটকে প্রবেশ। বারটি দৃশ্যে বিন্যস্ত *তিতুমীর*। নাটকের শুরুতে, প্রথম দৃশ্যে, বাগুন্ডিতে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জেনারেল ক্রফোর্ড পাইরনের গৃহে সমবেত হয়েছে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট পিটার আলেকজান্ডার, ক্যাপপ্টেন রিচার্ড ব্র্যান্ডন, চুতনার জমিদার মনোহর রায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়। পাইরন তার সংগৃহীত গোয়েন্দা রিপোর্ট সম্পর্কে এদের অবহিত করার জন্য ডেকেছে। তিনবছর আগে পাইরন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের মুখটি দেখেছে – যে-মুখ ঘর্মাক্ত, প্রতিজ্ঞায় হিংস্র। পাইরন অভ্যাগতদের তিতুমীরের সংগঠিত হওয়ার উদ্বেগজনক খবর দিলে সকলেই তা হেসে উড়িয়ে দেয়। মুসলমানদের দাড়ির ওপর আড়াই টাকা,গোঁফের ওপর পাঁচ সিকে,কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা, পাকা মসজিদের জন্য সহস্র টাকা খাজনা; শিবু, বিশু ও গোপাল প্রভৃতি ডাকনামের বদলে কেউ নিজের মুসলমানি নামটা বাইরে বললে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা; গো হত্যা করলে ডান হাত কেটে ফেলা; তিতুকে কেউ বাড়িতে স্থান দিলে তাকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হবে – এরকম নানা হুকুম জারি করে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন মর্মে পাইরনসহ সকলকে অবহিত করে। পাইরন তিতু সম্পর্কে কৃষ্ণদেব রায়ের অজ্ঞতা তুলে ধরে বলে :

> রাজাসাহেব, তিতুমীর যখন মুসলিম চাষীকে দাড়ি রাখতে বলে বা তার আরবি নামটা সজোরে আমাদের মুখে ছুঁড়ে মারতে বলে, তখন সে আসলে সেই চাষীকে পৃথিবীর বুকে দু'পা দৃঢ়ভাবে রেখে মাথাটা উদ্ধতভাবে সোজা করতে শেখাচ্ছে।[৭৪]

সাজন গাজীর গান, তার অভিনয়ের ভেতর দিয়ে তিতুমীরের ব্যাপারে এদের টনক নড়ে, 'ওয়াকিবহাল' হয় সকলে। পাইরন জানায় :

> ১৮২৭ সালের এপ্রিলে সৈয়দ ব্রেলভি, জৈনপুরের কেরামত আলি, পাটনার এতায়েত আলি,বাংলার আব্দুল বারি খাঁ, মুহম্মদ হুসেন,শরীয়তুল্লা, খোদাদাদা সিদ্দিকি এবং সর্বোপরি তিতুমীর কলকাতার বিবিবাগানে সামসুন্নিসা খানুমের গৃহে গোপনে মিলিত হন।[৭৫]

মুচিরাম ভাণ্ডারী, চৌকিদার হারু সর্দার এবং দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী সাধারণ মানুষকে হয়রানি করে। শুল্ক আদায়ের নামে অবৈধ কড়ি আদায়, জোয়ান লোকদের সুন্দরবনে নিমকমহালে লবনের কাজে পাঠানো, চাঁপাকে সাহেবের ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা,জঞ্জালী কামারনীকে ইট মরার প্রস্তুতির চুড়ান্ত পর্যায়ে ঘটনাস্থলে ফকিররূপী তিতুমীরের আগমন। তিতুমীরের উপস্থিতি জনতার মধ্যে যেন বিদ্যুৎখেলে যায়। তিতুকে হঠাৎকাছেপেয়েসকলেই উল্লসিত। হাকিম মোল্লা তার মুরিদ হতে চাইলে তিতু জানায় :

> আমার কোনো মুরীদ নেই,শিষ্য নেই। আমার আছে শুধু একদল শহীদ ভাইবোন, মুত্যু যাদের নিশ্চিত।মৃত্যুর শীতল ওষ্ঠে যদি চুম্বন করার সাহস রাখ, তবে আগে ওঠে দাঁড়াও। কাদায় পড়ে থাকা মানুষ আমি সহ্য করতে পারি না।[৭৬]

তিতুমীররা তৈরি হতে থাকে। পাইরন নানাভাবে তিতুর গতিবিধির খোঁজখবর রাখছে। পাইরনের গৃহে ব্রানডনের জন্য দারোগা রামরাম চাঁপাকে উপহার দেয়। কৃষ্ণ রায় পাইরনের গৃহে আসার সময় তাকে দেয়া তিতুর পত্রটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে; যাতে তিতু লিখেছে :

> আপনি আমাকে ওয়াহাবি বলিয়া মুসলমানদিগের নিকট হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি কেন এইরূপ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারা মুশকিল। ওয়াহাবি ধর্ম নামে দুনিয়ায় কোন ধর্ম নাই।[৭৭]

হাকিম মোল্লার বেঈমানির বদৌলতে পাইরন তিতুদের গতিবিধি জেনে যায়। তার মাধ্যমেই পাইরন জেনেছে তিতুদের সরফরাজ ক্যাম্পের খবরাখবর। পাইরন জমিদার কৃষ্ণ রায় ও দেবনাথ এবং দারোগা রামরামকে কলকাতা যাবার জন্য নির্দেশ দেয় – কারণ কাল দুপুরে লাটুবাবুর বাড়িতে পরামর্শ সভা বসবে।

পাইরনদের সরফরাজপুরের আক্রমণে তিতুরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ২২জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। এরপর তিতুমীরের লোকজন পুঁড়া আক্রমণ করে ছাই করে দেয়। কৃষ্ণরায় কোনমতে পালিয়ে বাঁচে।হাকিম মোল্লা পাইরন, ব্রান্ডনদের নারকেলবাড়িয়ায় তিতুমীরদের বাঁশের কেল্লা গড়ার খবর দেয়। সে এও খবর দেয় যে, চুতনার জমিদার মনোহর রায় তিতুর সঙ্গে দেখা করেছে। পাইরন হাকিম মোল্লাকে পিস্তল দেয় তিতুমীরকে হত্যা করতে। পাইরন জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে মনোহর রায়কে দত্তক এবং জারজ চিহ্নিত করে তাকে বন্দি করার আদেশ দেয়।

কিছুদিনের মধ্যে বারাসত আক্রমণ করে জমিদার আর ফিরিঙ্গি নীলকর যাকে হাতে পাবে তাকেই শেষ করার কথা বলে সকলকে হিংস্র হয়ে ওঠার আহবান জানায় তিতুমীর, নইলেতারা হেরে যাবে। পাইরনের দেয়া পিস্তল দিয়ে হাকিম মোল্লা তিতুকে হত্যা করতে চায়। সাজনের কাছ থেকে গুপ্তচরের তাবিজের হদিশ পেয়ে গুপ্তচরকে শনাক্ত করে তিতু। আলিঙ্গনাবদ্ধ করে হাকিম মোল্লাকে আমূল ছোরা বিঁধিয়ে হত্যা করে তিতু। তিতুদের লাউঘাটি আক্রমণে ব্র্যান্ডন, রাম,মুচিরা সকলেই পালিয়ে গেলেও দেবনাথ রায় একাই থেকে যায় এবং তিতুদের হাতে ধরা পড়ে।

তিতুদের পরের অপারেশন বাদুরিয়ায়। এখানে দারোগা রামরামকে পাহারায় রেখে ব্র্যান্ডন আলেকজান্ডার কোনমতে পালাতে সক্ষম হলেও রামরাম তিতু-জঙ্গালীদের হাতে প্রাণ হারায়। ইতোমধ্যে ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় জমিদার দোসররা লাউঘাটি, পুঁড়া, নূরনগর, হুগলি, পীরপুর ও গোবরডাঙার যুদ্ধে তিতুদের সাথে হেরেছে। সাজন গাজী ফিরিঙ্গিদের যুদ্ধের একটা নকশা নিয়ে আসে– যা ইচ্ছে করে ফেলে রেখেছিল পাইরন তার ঘরে, কারণ একমাস আগেই পাইরন নিশ্চিত হয়েছে যে সাজন তিতুর গুপ্তচর।

সাজন গাজী ও তিতুরা ভেবেছে ঐ-নকশা অসাবধানতায় পড়ে গেছে– সেই নকশা দেখে ব্র্যান্ডনদের অবস্থান জেনে তিতুরা যখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে – সেই ফাঁকে কর্ণেল স্টুয়ার্ট কামান দিয়ে ঘিরে ফেলবে বাঁশের কেল্লা। তিতুরা গোকনায় আক্রমণ করে জমিদার কৃষ্ণরায় ও ক্যাপ্টন ব্র্যান্ডনকে ধরতে সক্ষম হয়। তিতুদের লোভ দেখিয়ে গোকনায় নিয়ে যায় – ফিরে এসে দেখে গোকনা ঘিরে ফেলেছে দুশমনরা।

১৯শে এপ্রিল ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের মাচার 'পরে সারিবদ্ধ মুজাহিদগণ অস্ত্রহাতে ব্রিটিশ আক্রমণের প্রতীক্ষা করছিল–এখানেই খবর পাওয়া যায় হিন্দুস্তানের মুক্তিযুদ্ধের নেতা সৈয়দ ব্রেলভি চারদিন আগে বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। ব্র্যান্ডনকে হত্যা করে তার লাশ রাস্তায় ফেলে দেয়া হলেও মতিউদ্দীন তার প্রাক্তন প্রভু কৃষ্ণরায়কে ছেড়ে দেয়। কারণ মতিরা এখনও যোদ্ধা তৈরি হয়নি। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও তাই তিতুমীরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আশাবাদ :

> তবে হবে,যোদ্ধা তৈরি হবে।হাসিনাকে দেখে,গোলাম মাসুমকে দেখে, এই বৃদ্ধদের দেখে, এই দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে নিয়ে মীর মরছে যে বাংলার শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে, হিন্দু-মুসলমান উদয়াস্ত মেহনত করছে, তারা ভীষণ নির্দয় দুর্ধর্ষ আপসহীন যোদ্ধা হয়ে উঠবেই একদিন।[৭৮]

তিতুমীরের কণ্ঠে আশাবাদ ধ্বনিত হতে হতেই প্রবল কামানের নির্ঘোষের সাথে ধুম ও আগুনে ছেয়ে যায় বাঁশের কেল্লা;আর এখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

১৮৩০-এ বাংলার গ্রামেগঞ্জে ঝলসে ওঠেছিল হিন্দু-মুসলিম চাষীদের তরবারি মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১) নেতৃত্বে। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত সমকালীন ভারতবর্ষে তাই তিতুমীরকে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার *তিতুমীর* নাটকে। তিতুমীর হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কৃষক সম্প্রদায়ের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন, তাই তিতুমীরকে হিন্দু-বিদ্বেষী, সুন্নি-বিরোধী ও মুসলিম-বিরোধী বলে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে আধুনিক গবেষকদের সত্য উদ্‌ঘাটনে। তিতুমীর-স্রোত সে-যুগে ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়েছিল শ্রেণিশত্রু ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্কটের পুনরায় মুখোমুখী হতে হচ্ছে দেশের জনগণকে আজও, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। তাই আবার *তিতুমীর*।

স্তালিন শতবর্ষে উৎপলের শ্রদ্ধার নিদর্শন *স্তালিন-১৯৩৪*। দশটি দৃশ্যে বিন্যাস্ত এ-নাটক পিএলটি প্রযোজনা করে ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৯ সালে একাডেমি মঞ্চে। প্রথম প্রকাশ এপিক থিয়েটার পত্রিকায় (১-৬,১৯৮৩ সংখ্যায়);পরে নাটক সমগ্র ষষ্ঠ খণ্ডে। এ নাটকের পটভূমি ১৯৩৪ সালের রাশিয়া।

নাটকের শুরুতে বিবিসির খবরে হিটলার ও চার্চিলের ভাষ্যে সংলাপগুলো দেখলেই বোঝা যায় স্তালিনের বিরুদ্ধে কী জঘন্যতম অপপ্রচার চালানো হয়েছিল। স্তালিনের স্ত্রী নাদেজদা ক্রুপস্কায়াকে ধরে যে জোইয়া স্তালিনের দপ্তরে চাকরি পেয়েছে সেও স্তালিন হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এমনি করে পার্টির অভ্যন্তরেও স্তালিন হত্যার আয়োজন চলে;রাশিয়ার গুপ্ত পুলিশের প্রধান পর্যন্ত স্তালিন হত্যা ও বড় বড় ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত। যখনই কেউ ধরা পড়েছে তখনই জেরার নাম করে তাকে য়াগোদা সরিয়ে নিয়েছে। স্তালিন অনুসারী প্রকৃত দেশপ্রেমিককে মিথ্যা অভিযোগে হত্যা করা হয়েছে। সাক্ষীদেরও হত্যা করা হয়। অবশেষে কিরভ হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে ধরা পড়ে য়াগোদা। জোইয়ার বিবৃতি থেকে আরও অনেকের নাম বেরিয়ে আসে – জেনোভিয়েভ ক্রেমলিন রক্ষীদলের অধিনায়ক পেটেরসন প্রমুখ। তাছাড়া বুখারিনতো ছিলেনই।দলের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা এইসব য়াগোদাদের ধরার পর স্তালিন বলেন :

> শ্রেণীশত্রুর ঘৃণা আমাদের স্বর্ণপদক।...এখন থেকে শ্রমিকরাষ্ট্র এমন হিংস্র ও রক্তাক্ত প্রত্যাঘাত হানবে, সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচরদের এমনভাবে মাটিতে ফেলে বুটের তলায় পিষবে যে পশ্চিমের নেতারা সকাল-সন্ধ্যা নপুংসকের মতন য়োসেফ স্তালিনের মুণ্ডুপাত ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না। শ্বেত সন্ত্রাসের জবাবে লাল সন্ত্রাস,আর কোন পথ নেই।[৭৯]

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হলেও শ্রেণিশত্রুরা নিষ্ক্রিয় ও নির্মূল হয়নি বরং স্তালিনের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রেণিশত্রুরা ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পুঁজিবাদী বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন অতি দুরূহ কাজ। পুঁজিবাদ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সমাজতন্ত্র ঠেকাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। এজন্য ঘৃণ্য এমনকি মানবতাবিরোধী কাজ করতেও কসুর করে না তারা; আর তাদের অপপ্রচারের তো জুড়ি নেই।

তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের কার্যক্রমে বাধা আসতে থাকে নানা দিক থেকে। পরাজিত শত্রু তো বটেই, পার্টির ভেতরেও লুকিয়ে থাকে বর্ণচোরা শত্রু। ক্ষমতালিপ্সু দোদুল্যমানরা নানা বাধা সৃষ্টি করে। স্তালিন-বিরোধীরা দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, সেনা বিদ্রোহ ঘটায়, বিদেশের সাথে চক্রান্ত করে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। পার্টির ভেতরে স্তালিন-বিরোধী চক্র নানাভাবে স্তালিনকে, তাঁর কর্মপ্রয়াসকে, ব্যর্থ করতে চেয়েছে এমনকি তার স্ত্রীকে পর্যন্ত সুকৌশলে তার বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে। এতকিছুর পরও কয়েকবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে সুকৌশলে ফিরে এসেছেন স্তালিন। এ-সব মোকাবেলা করতে সঙ্গত কারণেই স্তালিনকে কঠোর হতে হয়েছে। তা না হলে লেনিনের উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া স্তালিনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনিবার্যভাবেই শ্বেতসন্ত্রাসের জবাবে লালসন্ত্রাস। স্তালিনের নেতৃত্বে লালফৌজ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক তাবৎ অপপ্রয়াসকে পরাজিত করার নিপুণ চিত্র *স্তালিন* ১৯৩৪নাটক।

মাইকেল মধুসদন দত্তের জীবন চিত্র *দাঁড়াও পথিকবর*নাটক। এই নাটকের প্রধান চরিত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাই মাইকেল মধুসূদনের যে-সব উক্তিসহ যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা নাটক অনুসরণ করেই করা হয়েছে। বেলগাছিয়ার রাজপথে খেউরের দলের গানের মধ্য দিয়ে নাটকের শুরু। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের *শর্মিষ্ঠা* নাটক দেখে সুদর্শন দত্তের মতো বাবু (যিনি সোনাগাছী গমন করেন) ও রামবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের মতো কুলীন কুলনিধির (যার পত্নী সংখ্যা ১২৯) ধর্ম বিপন্ন – এ-সমাজ আর টিকবে না বলে আতঙ্কিত তারা। পুরো *শর্মিষ্ঠা* নাটকটি ব্রাহ্মণদের হেয় করার জন্য রচনা করা হয়েছে বলে তারা মনে করেন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় *বুড় সালিকের ঘাড়ে রো* নাটকের মহড়ায় মাইকেল উপস্থিত হন। কেশব গাঙ্গুলি *শর্মিষ্ঠা* ছাড়াও *একেই বলে সভ্যতা* ও *ভগ্ন শিব মন্দির*-এর (*বুড় সালিকের ঘাড়ে রো*-এর পুরনো নাম) মতন উচ্ছল চলতি ভাষার প্রহসন তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত জানালে মাইকেল জানান; তিনি কৃষ্ণলীলা-লহরী কীর্তনের ভক্ত, বদন অধিকারীর যাত্রার একনিষ্ঠ অনুরাগী, যাত্রাঅলা গোবিন্দ অধিকারীর গুণমুগ্ধ। তিনি এই প্রহসনের সঙ্গীত রচনার ভার হাফ আখড়াই গায়ক গুরুদয়াল রায়কে দেয়ার জন্য রাজা ঈশ্বর সিংকে অনুরোধ করেন। মহড়া চলার সময়েই বাবুদের মধ্যে উত্তেজিত আলোচনা চলে – মাইকেলের নাটক বেলগাছিয়ায় অভিনয় করা চলবে না। এ-পালায় সম্ভ্রান্ত জমিদারদের – সমাজের পুরোধা ব্যক্তিদের দেখানো হয়েছে বেশ্যাসক্ত মাতাল হিসেবে। ঈশ্বর নিজে জমিদার হয়ে এ-পালার প্রতিটি বর্ণ সত্য বললেও সত্য সবসময় কাম্য নয় বলে জানান। যতীন্দ্র নাটকটার দু-এক স্থানে সামান্য পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলে মাইকেল তাঁর নাটকের একটি বাক্য, একটি শব্দ বা একটি অক্ষর ও পরিবর্তন করতে রাজি হননি। যতীন্দ্র বাবু স্থানে স্থানে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে, যা ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্য বিরোধী বলে মন্তব্য করলে মাইকেল জানান :

> ঐতিহ্য? অর্থাৎ, পুরাকালের সংস্কৃত নাটকের কিছু কীটদষ্ট বিধিনিয়মের কথা বলছেন? I don`t know why I should bother myself about Sanskrit rules.I shall not be bound by the dicta of Mr. Vishwanath of the Sahitya Darpan.কবে বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণ লিখেছেন, আর সবাইকে বেদবাক্যজ্ঞানে তা মেনে চলতে হবে, সে-দাসত্ব আমার দ্বারা হবে না। You chose the wrong person।[৮০]

ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের মাধ্যমে মাইকেল হিন্দুধর্মের অবমাননা করেছেন,তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিপ্রক্ষিতে মাইকেল জানান–'আমার নাটকে হিন্দুধর্মের অবমাননা হয়নি, হতে পারে না ! এক ভণ্ড হিন্দুকে দেখানো হয়েছে।'[৮৯]এরপরও রাজা ঈশ্বর সিংহ জানায় ইদানিং সংবাদপত্রগুলোর লক্ষ্য বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেলের নাটক করে একঘরে সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় তারা তাঁর নাটক করতে সাহস পাচ্ছেন না। এ প্রসঙ্গে মাইকেলের সংলাপ খুবই তাৎপর্যবহ :

> এটা বুঝলাম সমাজের শীর্ষে অধিষ্ঠিত কিছু barren rascals-এর আদেশে আপনারা জাতিচ্যুত হতে পারেন, সেটাই আনাদের ভয়, কিন্তু আদর্শচ্যুত হতে আপনাদের তেমন আপত্তি নেই। আমি সুলতানা রিজিয়া সম্পর্কে নাটক লিখতে চাইলাম – আপনারা বললেন, মুসলমানদের নিয়ে নাটক করা চলবে না। একেই কী বলে সভ্যতা লিখে আনলাম,

বললেন কলকাতার বাবুরা রেগে যাবেন। এখন বলছেন ভগ্ন শিবমন্দির নাটকে বিধর্মী মাইকেলের অধিকার নেই ভণ্ড হিন্দু জমিদারের কথা বলার।...চ্যালেঞ্জ রইলো এ সমাজের যাঁরা পরমপূজ্য তাঁরা যে ঠগ, জোচ্চোর, প্রতারক, এ আমি নাটকে বলেই যাব।...আমি লিখেই চলব। এবং আপনারা সকলে মিলে যদি আমার ডানা কেটে দেন, তবে বাংলা ছেড়ে দিয়ে আমি হিব্রু বা চীনা ভাষায় লিখব –কিন্তু লেখা বন্ধ হবে না।[৮১]

বাংলায় অমিত্রাক্ষর হয় না –যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এই চ্যালেঞ্জ মাইকেল গ্রহণ করে লিখলেন তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। বাংলা ভাষাকে মিত্রাক্ষরের বেড়ি থেকে মুক্ত করলেন। মধুসূদনের প্রেরণাদাত্রী কাব্যলক্ষ্মী স্ত্রী হেনরিয়েটা,অভিনেতা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, গায়ক গুরুদয়াল রায়,বন্ধু গৌরদাস বসাক মাইকেলের অমিত্রাক্ষার শুনে অভিভূত। এঁদের আড্ডার মাঝখানেই বিদ্যাসাগর মাইকেলকে বিধবাবিবাহ নাটক দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করতে আসেন। দেশপ্রেমিক মাইকেল সনেট লিখে শোনালেন সকলকে:

''আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণবলে
নির্মল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?
আমরা দুর্বল ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে!"[৮২]

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সরযুর দলের যাত্রা-পালার অভিনয় মাইকেল গোপনে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। দেখেন তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ কেমন চলছে। ঐ-আসরেই তিনি নতুন কাব্য– একটা হুকুম না মানার কাব্য– বিদ্রোহের, অসঙ্গতির, অন্যায়-যুদ্ধের গান লেখার কথা সকলকে জানিয়ে আসেন।এরপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করতে থাকেন বাংলা সাহিত্যের অমর মহাকাব্য *মেঘনাদ বধ*।

মাইকেল মধুসূদন স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে সাগরদাঁড়িতে পৈত্রিকভিটায় যান। মধুসূদনের জেঠতুতো ভাই হরিমোহন হেনরিয়েটাকে ভাঙা চেয়ারে আঙ্গিনায় বসতে দেয়। মধুর ছোট মা প্রসন্নময়ী হেনরিয়েটাকে পেলে চাঁদ হাতে পাবেন,কোলে করে রাখবেন বলে গ্রামে নিয়ে এসেছেন – সেই ছোট মা তাঁর বৌমার প্রণামই গ্রহণ করেননি। এঁদের খেতে দেয়া হয় উঠানে কলাপাতায়; সেটাই মায়ের প্রসাদ মনে করে খেয়ে নেন তাঁরা। নিজের বাড়ি থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসেন কলকাতায়। নিজের বৈঠকখানায় বসে একটি কবিতা লেখা শেষ করে মৃদুস্বরে পাঠ করেন:

'আশার ছলনে ভলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে?
জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন–

তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!'[৮৩]

আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই বিদ্যাসাগর, পাদ্রি লং ও কেশব গঙ্গোপাধ্যায় আসেন মাইকেলের কাছে দীনবন্ধুর নিষিদ্ধ নাটক *নীলদর্পণ*-এর ইংরেজি অনুবাদের জন্য, এতে অনুবাদকের নাম থাকবে না এবং তাঁকে একরাতের মধ্যেই করে দিতে হবে, কারণ'য়ুরোপকে জানাতে হবে, এখান থেকে যত বাক্স নীল য়ুরোপে যাচ্ছে তার প্রত্যেকটি রক্তচিহ্নিত।'লন্ডনের প্রকাশক সিম্‌প্‌কিন-মার্শাল নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ ছাপাবেন।

কন্যা শর্মিষ্ঠা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ডাক্তার ডাকার মত টাকা মধুসূদনের হাতে নেই। অথচ স্ত্রীর জন্য প্যারিস থেকে গাউন, পারফিউম আনিয়েছেন। আর নিজের যাবতীয় পোশাক-আশাক, টুপি, ছড়ি, দস্তানা সব প্যারিস থেকেই আনান। মাইকেল মধুসূদন বরাবরই বড্ড বেহিসেবি। বিদ্যসাগরের কাছে চিঠি পাঠান,বিদ্যাসাগর ডাক্তার নিয়ে আসেন। মাইকেল ভোরের আলো না ফুটা পর্যন্ত সারারাত ধরে লিখে অনুবাদটা শেষ করলেন। টাকা পাবে না এমনকি নামও থাকবে না, তাহলে সারারাত জেগে কেন লিখলো হেনরিয়েটার এ প্রশ্নের জবাবে মাইকেল জানায় :

আমি একটি বিপ্লবে খানিক সাহায্য করলাম [৮৪]

এবং এই বিপ্লবীর একটিই প্রার্থনা–

এই বর হে বরদে মাগি শেষ বায়ে
জ্যোতির্ময় করো বঙ্গ– ভারতরতনে।[৮৫]

নীলদর্পণ প্রকাশের জন্য পাদ্রী লংকে গ্রেপ্তার করে বিচারপতি ওয়েলস্ ও জেকসন জেরা করে,ভয় দেখিয়ে আসল অনুবাদকের নাম বের করতে ব্যর্থ হয়; বিচারপতিদ্বয় অনুমানে অনেকটা নিশ্চিত হলেও জেমস্ লং-এর স্বীকারোক্তি ও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ছাড়া মাইকেলকে ধরতে পারছেন না। তাই এঁরা জেমস্ লংকে নানারকম ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করলেও জেমস্ লং আসল অনুবাদকের নাম প্রকাশ না করে নিজের নাম বলে। বিদ্যাসাগর আদালতে আসেন চৌদ্দ হাজার লোকের সই সম্বলিত দরখাস্ত পৌঁছাতে –যাতে পাদ্রী জেমস্ লং-এর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়েছে।'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এ তথ্য জেনে বিচারপতিদ্বয় একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই *নীলদর্পণ*-এর অনুবাদক।

ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে হেনরিয়েটা ও সন্তানদের নিয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে দিনাতিপাত করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ঘরে বিক্রি করার মত তেমন কিছু আর নেই। তাই হেনরিয়েটা তাঁর পোশাক বিক্রি করতে যান; আর মাইকেলও যানতাঁর টুপি-ছড়ি-দস্তানা বাঁধা দিতে। ঘরে এক টুকরো রুটিও নেই, এমন কি ব্রান্ডিও নেই। না খেতে পেলে মাইকেল কী করে কবিতা লিখবে হেনরিয়েটার এ-প্রশ্নের জবাবে মাইকেলের উত্তর :

কে কবি? কবে কে মোরে? ঘটকালি করি
শব্দে শব্দে বিয়া দেয় সেইজন

Dhaka University Institutional Repository

সে কি কবি?[৮৬]

মাইকেল ফ্রান্সে যাবার আগে দিগম্বর মিত্র এবং মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সাথে বিষয়সম্পত্তির যে-ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন তারা সে-ব্যবস্থামত টাকা-পয়সা না পাঠিয়ে প্রতারণা করায় তাঁকে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছে।এই দুঃসময়ে তাঁদের ভরসা বিদ্যাসাগর।ক্ষুধায় যখন দুর্বল, হাত যখন কাঁপছে,তখনও মাইকেল লিখছেন 'ভারতভূমি' নামের দেশপ্রেমমূলক সনেট :

ভারত যদি সাপিনীর মতন বিষময়ী হত,
তবে কি সে ব্রিটিশ শাসকের অধীন, হত।[৮৭]

তাঁদের দরজার বাইরে অজানা কেউ খাবার রেখে চলে যায়। দরজা খুলে খাবার দেখে আনন্দে দুজনে যখন দিশেহারা তখন ফ্রান্সের জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের অফিসার কানপুরের নানা ধুন্ধুপন্থ সন্দেহে মাইকেলকে তাঁর সঙ্গে কঁসিয়ের্জেরি কারাগারে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি।
*দাঁড়াও পথিকবর*মাইকেলের নাটকীয় জীবনগাথার এক শ্বাসরুদ্ধকর নাট্যরূপায়ণ। উৎপলের অসাধারণ নির্মাণগুলোর অন্যতম।

উৎপলের *আজকের শাজাহান*নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছে রবীন্দ্রসদনে ১৯৮৩ সালের ১৬ই নভেম্বর। প্রথম প্রকাশিত হয়েছে নন্দন পত্রিকায়(বাংলা ১৩৯০ সনে কার্লমার্কস সংখ্যায়), পরে নাটকসমগ্র ৭ম খণ্ডে।উৎপল দত্তের ভিন্নধর্মী নাটক *আজকের শাজাহান*। একসময়ের জাঁদরেল অভিনেতা কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তীর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি এবং এই পরিণতি তৈরিতে চলচ্চিত্রজগতের নগ্ন মিথ্যাচার ও নির্মম শোষণ এ-নাটকের পটভূমি।

কুঞ্জবিহারী এককালের দাপুটে অভিনেতা। আজ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। অতি দীন-হীন জীবন-যাপন। নেশার ঘোরে অতীতে বিচরণ। জীবনে যত 'পার্ট' করেছেন তার সব 'কস্টিউম' সংগ্রহ করে রেখেছেন। একা একা অভিনয় করেন,নিজের প্রায়ান্ধকার ঘরে। কুঞ্জর দারিদ্র্যের সুযোগে ননীগোপাল ফিল্মে অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। ননীর পীড়াপীড়িতে সত্তর হাজার টাকার লোভনীয় প্রস্তাবে,কুঞ্জবাবু একসময় রাজি হয়ে যান।

'রঙমাখা মুখ' নামে একটি ছবি করবেন প্রযোজক ক্ষীরোদচন্দ্র, চিত্রনাট্যকার অসিত এবং চিত্র পরিচালক সুব্রত। একজন সার্কাসের ক্লাউন জীবনের ঘটনাপ্রবাহে শেষপর্যন্ত পাহাড়ে পুলিশ-কর্তৃক ঘেরাও হলে পুলিশ তাকে গুলি করে মারে। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে তার মৃতদেহ। অসিত কুঞ্জকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অভিহিত করে অনেক মিথ্যা বিনয় দেখিয়ে – 'কাকাবাবু কুঞ্জ এ-ছবিতে অভিনয় না করলে ছবিই হবে না' – বলে তাকে রাজি করান। এরা প্রতিশ্রুতি দেয়, ঐ-পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ার দৃশ্যে শট দেবে বোম্বে থেকে আসা ফাইটার। কুঞ্জবাবু সঙ্কুচিত;এদের মত শিক্ষিত, ভদ্রলোকদের সাথে কাজ করতে যেয়ে কি ভুলচুক

হয়ে যায়। ভদ্রসমাজে মিশতে পারেননি জাত বাউণ্ডুলে, 'ভাগাবন্ড' কুঞ্জবাবু চালচলনে এদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেন কিনা তাই নিয়ে সন্দিহান। নেতার হাটে একটানা দেড়মাস শুটিং করতে চলে যান তিনি। সুব্রত এতো বিনয় দেখিয়ে কুঞ্জবাবুকে এনে ক্লাউনের চরিত্রের ক্লান্তি চেহারায় ফুটাবার জন্যে মিছামিছি ৭৫ বছরের বৃদ্ধকে দুপুরের তপ্ত রোদে দৌড় করান। আর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ার দৃশ্যের শটটা ছবির বাস্তবতার স্বার্থে এবং তাঁর অভিনয়ের সম্মানের স্বার্থে কুঞ্জবাবুকেই দিতে বলে। অবশ্য তিনি শট দিতে অস্বীকার করলে সুব্রত কিছুই মনে করবে না। কুঞ্জবাবু শট দিতে অস্বীকার করেন কারণ শট দেয়ার মত নার্ভ তাঁর নেই।

সুব্রত এখন নতুন পথ খোঁজে – কুঞ্জবাবুকে জোর করবে না অথচ তার মুখ দিয়েই বলিয়ে নেবে। কলকাতা থেকে ফোন করে সাংবাদিক আনায় – যিনি শ্লেষে বিদ্ধ করবে কুঞ্জবাবুকে – যে শ্লেষ সইতে না পেরে কুঞ্জবাবু বলতে বাধ্য হবেন ঐ শট তিনি নিজেই দেবেন। ননী, ক্ষীরোদ, কুমকুম সকলের নিষেধ সত্ত্বেও কুঞ্জবাবু পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার শট দেন। খুব ভাল শট দেয়ার পরও সুব্রতর কাছে তা অত্যন্ত বাজে বোধ হয়। এই দৃশ্যের রোলটা ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় এবং সুকান্ত মজুমদারকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে হুকুম দেয়া হয় – রোলটা নষ্ট করে ফেলতে। এমনকি পাহাড়ের গায়ে যে রডোডেনড্রেনের গাছ আছে যেখানে একটু হাত আটকানো যায় তা-ও কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। প্রযোজক ক্ষীরোদচন্দ্র পর্যন্ত সুব্রতর এই নৃশংসতাকে মানুষ খুনের সাথে তুলনা করেন। সুব্রত তার ছবির স্বার্থে সেরকম কাজ করতে পারেন বলে জানান।

অতঃপর কুঞ্জবাবুকে দিয়ে আরেকটা শট দেয়ায় সুব্রত। এই শটের পরে কলকাতায় গিয়ে তাঁর হার্ট এ্যাটাক হয়;তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেন। তিনি নাটক ভুলে যান তার স্মৃতিশক্তি চুরমার করে দিয়েছে সুব্রত।কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী পক্ষাঘাতগ্রস্ত, যে সাজাহানের অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে ওঠেছিলেন সেই ঘটনাই তার নিজের জীবনে ঘটে যায় – এই মর্মন্তুদ যন্ত্রণা তাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে বাকি জীবন।

একজন প্রাক্তন অভিনেতার জীবন কাহিনী *আজকের সাজাহান*। মানুষের বিচ্ছিন্নতার গল্প-গাথা এ-নাটক। এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুঞ্জবিহারীর বক্তব্যেই এর সমর্থন মেলে :

> আমাদের এই পুরো ছবিটায় একবারও পেলাম না কঠোর বাস্তব জীবনের স্পর্শ,শ্রমের আমেজ,পেলাম না মানুষ। শুধু প্যাচ, শুধু প্যাচ। গ্রেট আর্ট ইজ সিম্পল। শেকস্পিয়ারের মতন। শেকসপিয়ারও এঁকেছিলেন বিচ্ছিন্ন মানুষের ছবি–হ্যামলেট, টিমন অফ এথেনস। কিন্তু তার নাটকে পাশাপাশি আসে আস্ত রাষ্ট্রের উত্থান-পতন। বিদ্রোহ আর যুদ্ধ, আস্ত একটা সমাজ। তোমরা নিজেরা যেমন কাপুরুষ, মাদকদ্রব্য সেবন করে বাস্তবকে ভুলে থাক, সেই কাপুরুষতাকে নিয়ে চাপিয়েছ এই ছবিটার উপর। ঐ ক্লাউন কারুর প্রতিনিধি নয়, সে এক ব্যর্থ ব্যক্তি মাত্র। তাই তার মৃত্যুতে কারুর কিছু এসে যায় না। সমাজের সামান্যতম ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তোমরা সমাজের স্রোতে ভাসমান আবর্জনা মাত্র।[৮৮]

উৎপল দত্ত শ্রী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ-নাটক সম্পর্কে বলেছেন :

> আমি গভীর আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ করলাম যে কেউই 'আজকের সাজাহান'-এর বক্তব্যটা অনুধাবন করতে পারেন নি। বোধহয় লেখায় কোনও গন্ডগোল আছে। নাটকটা মানুষের বিচ্ছিন্নতার একটা গল্প। যন্ত্রসভ্যতার চাপে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সেইটেই বলা হয়েছে। Incidentallyযাকে ধরা হয়েছে সে একজন অভিনেতা। Machineতাকে গুলিয়ে দিচ্ছে।...আর সে একটা ঘরের মধ্যে আটকে পড়েছে। অতীত নিয়ে বাস করছে। বেরিয়ে জীবনের মুখোমুখী হবার সাহস সে হারিয়ে ফেলছে।[৮৯]

*আজকের সাজাহান*উৎপল দত্তের ব্যতিক্রমধর্মী নাটক। এ-ধরনের বিষয় নিয়ে (চলচ্চিত্র-জগৎ)লিখেছেন–*ছায়ানট*; থিয়েটার নিয়ে লিখেছেন *টিনের তলোয়ার*।

মহাত্মা নর্মান বেথুনের জীবন-কাহিনী *মহাচীনের পথে* নাটক। ডাক্তার বেথুন একজন সার্জন,তিনি চীনা নন, ক্যানাডা তার দেশ; আসলে গোটা পৃথিবীটাই তার স্বদেশ। চীনারা বেথুন উচ্চারণ করতে পারে না। তারা বলে নর্মান বীটন। বাই-জু-এন। চীনের জনগণ মাও-ৎ সে-তুং-এর নামের পাশে বাই-জু-এন-এর নাম লিখে রেখেছে। নাটকের শুরুতে ভারতের ডাক্তার দ্বারকানাথ কোটনিসের জবানিতে জানা যায় কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন ইয়েনানে (উত্তর চীনে) গিয়েছিলেন জাপানি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধে আহত লালফৌজের সৈনিকদের শুশ্রূষা করতে। কোটনিসরা ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন বেথুনের চিঠিপত্র, ডায়েরি,বেথুনের হাতে আঁকা ছবি– যা থেকে ডা. নর্মান বেথুন সম্পর্কে জানা যায়।

নর্মান বেথুন প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক ছিলেন, ১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে একবছর কাটিয়েছেন। কানাডা শহর ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করার পথে টরেন্টো শহরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে কানাডার শ্রমিকরা মেডিক্যাল মিশন পাঠান চীনে। সেই মেডিক্যাল টিমের প্রতিনিধি কমরেড বেথ ইয়েনানে এলেন– ইয়েনানে এসে কমরেড মাও-ৎসে-তুং-এর সাথে দেখা করেন। মাও-ৎসে-তুং বেথুনকে পাঠালেন জাপানি অধিকৃত অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে– মুক্তঅঞ্চল চিন-চা-চি। এখানে ডাক্তার বেথুনের পদ চিন-চা-চি সামরিক জেলার মেডিক্যাল উপদেষ্টা।

বেথুন ডাক্তার হিসেবে খুব দক্ষ এবং সফল। একের পর এক অপারেশন করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি তাঁর প্রিয় পিয়েরকে অত্যন্ত সফল অপারেশন করেও বাঁচাতে পারেননি কারণ পিয়েরের শ্রমিক পিতা ব্রিকস্টন শিপিং কোম্পানি থেকে দুবছর আগে ছাঁটাই হয়। দারিদ্র্যের কারণেই পিয়েরের ডানদিকের ফসফুস পঁচে যায়। সফল অপারেশনের পরও বড় দুর্বল থাকার কারণে পিয়ের আর বেঁচে ওঠেনি। বেথুন বলেন :

> অপারেশন করে লাভটা কি? টি-বি রোগটা একটা ফলাফল মাত্র; তার কারণ হচ্ছে মানুষের দেহের ওপর সমাজ ব্যবস্থার আক্রমণ; পারিপার্শ্বিকের আক্রমণ। সমাজব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে যে টি-বি রোগের চিকিৎসা করে সে হাতুড়ে ডাক্তার, উপসর্গ নিয়ে পড়ে আছে, মূলে যাচ্ছে না।[৯০]

পুঁজিপতিরা সমাজের সকল কিছুরই হর্তা-কর্তা। বেথুনের কণ্ঠে তাই অক্ষেপ ধ্বনিত হয়।

বেথুনের অনুভবে জার্মান-ইতালির ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরার সময় এসে গেছে কিন্তু ডাঃ আর্চি বলেন–'তুমি সার্জারির জিনিয়াস,বেথ, তুমি এসব রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে–'উত্তরে বেথুন জানায় :

> সার্জারি! সার্জারি! কোথায় ছুরিটা চালাব বলতে পার? সার্জারি যত এগুচ্ছে, টি-বি রোগ তত বাড়ছে, এ অসঙ্গতিটা চোখে পড়ে না তোমার? একদিকে ঔষধবিজ্ঞানের অগ্রগতি, অন্যদিকে এশিয়া আর আফ্রিকায় শিশুরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরে যাচ্ছে। এর পরিহাসটা দেখতে পাচ্ছ না? হাসপাতালের মধ্যে আমরা যা কিছু গড়ে তুলি তাকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে হাসপাতালের বাইরে। এ-প্রশ্নের সমাধান তাই হাসপাতালের মধ্যে হবে না,হবে বাইরে। টি-বি-র চেয়ে ঢের ব্যাধি সেটা। ঐখানে ছুরি চালাবার সার্জারিটা শিখছে স্পেন আর চীন। সে সার্জারি আয়ত্ত করে ফেলেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, স্তালিনের হাতে ঝলসাচ্ছে সেই বৃহত্তর সার্জারির ছুরি।[৯১]

বেথুন সমাজের আসল ব্যাধিতে সার্জারি করতে উদ্যত। শ্রমিক-কৃষক,তাদের সন্তানদের সার্জারি করে বেথুন ভাল করবেন কী করে? ডাক্তারতো আর শ্রমিক ছাঁটাই না হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। একমাত্র শ্রমিক-রাষ্ট্র কায়েম হলেই শ্রমিক তার কাজের নিশ্চয়তা পেতে পারে। বেথুন পুঁজিবাদী সমাজের আসল ব্যাধি, মূল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আর ছিলেন বলেই মার্কসবাদে আস্থা স্থাপন করে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

বেথুন মানুষকে তথা রোগীদের ভয়ানক ভালবাসতেন। 'আমার ছেলে', 'আমার মেয়ে', বলে রোগীদের সম্বোধন করতেন। বেথুন-ফ্রানসেসদম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। বেথুন তার স্ত্রীকে অসম্ভব ভালবাসতেন। কিন্তু সেই প্রচণ্ড ভালবাসার মানুষটা যখন দেখে বেথুনের জীবনে রোগী ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই, তখন সে চলে যায়। যাবার সময় বেথুন ফ্রানসেসকে বলে – 'লিসেন ফ্রানসেস,আই লাভ ইউ, আই শ্যাল অলওয়েজ লাভ ইউ,রিমেমবার দ্যাট।'[৯২]

চীনের যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবিরাম অপারেশন চালিয়ে গেছেন বেথুন। একটানা উনসত্তর ঘণ্টায় অস্ত্রোপচার করেছেন একশ পনেরটি। বেথুনের বাঁ হাতে ইনফেকশান হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে বিশ্বখ্যাত সার্জন কোন অস্ত্রাপচার ছাড়াই চীনের যুদ্ধক্ষেত্রে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগমুহূর্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন বেথুন স্মৃতির জগত থেকে ফ্রানসেসকে জানান–'আমি আছি আমার সবচেয়ে কাছের মানুষদের মধ্যে। যারাই লড়াই করে তারাই আমার কাছের মানুষ।'[৯৩]

বণিকের মানদণ্ড নাটকের পটভূমি ভারতে হেস্টিংস ও তার সহযোগী ব্রিটিশ আমলা বেনিয়াদের লুণ্ঠন ও গোপন ব্যবসা-বাণিজ্য।ছয়টি দৃশ্যে বিন্যস্ত *বণিকের মানদণ্ড*।মন্বন্তর ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। হেস্টিংস গ্রেহাম সাহেবকে কালেক্টর নিযুক্ত করেছেন ঠিকমত খাজনা আদায় করতে। প্রতি মাসের খাজনা দু'লাখ, হেস্টিংস-এর সেলামি প্রতি মাসে বিশ হাজার, তিনমাস ধরে বাকি পড়েছে। রাজস্ব দ্বিগুন করেও কোন লাভ হয়নি। রাজস্ব যারা দেবে তারাই বেঁচে নেই; অর্ধেক মরে গেছে ক্ষুধায় বাকিঅর্ধেক হাল-বলদ বেচে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। বাংলায় এই বিভীষিকা এনেছে ইংরেজরা।

বর্ধমানের রানী তার প্রজা বৃষ বাগদিকে গ্রেহামের কুঠিতে বিচারের জন্য ধরে আনায় এর কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছে। কান্ত মুদি মনসা মন্দির থেকে রানীর ছেলে তেজচন্দ্রকে কদমা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে আসে কুঠিতে। এবার এরা নতুন চাল চালে – তেজচন্দ্রকে ফেরত দেবে যদি রানী বর্ধমানের সিলমোহরটা এদের হাতে সমর্পণ করেন। রানী বুঝে গেছেন এদের হাত থেকে ছেলেকে সহজে পাওয়া যাবে না।

দশবছর ধরে নন্দকুমারকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা এনে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে তদন্ত করার ছুতায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ – গত যুদ্ধের সময় তিনি গোপনে মীরকাসিম এবং আউধের উজির সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান করেছেন।অথচ নন্দকুমারের হাতে মজুত আছে হেস্টিংস-এর পাপাচারের যাবতীয় প্রমাণ। হেস্টিংস-এর ঘুষ,দুর্নীতি বেআইনি কার্যকলাপ জানা এবং এসবের প্রমাণ নন্দকুমারের হাতে থাকার কারণেই তার বিপদ সব চেয়ে বেশি। যারা সব জানে তাদের হেস্টিংস সাহেব এ-দুনিয়া থেকে ছুটি দিয়ে তবে ছাড়ে।

খবর এসছে ভদ্রপুরে নন্দকুমারের পৈতৃক ভিটায় কৃষ্ণমন্দির ভেঙে কালেক্টর হুইলার চালের গুদাম তৈরি করতে চায়। স্ত্রী ক্ষেমঙ্করীর অভিযোগ– স্ত্রী-পুত্রের কথা না ভেবেই বারবার নানা ঝামেলায় জড়িয়ে তাদের জীবন বিপন্ন করেছেন নন্দকুমার। এতকিছুর পরও মহারাজা নন্দকুমার বধির, কিছুই করতে পারছেন না। এরই মধ্যে বর্ধমানের রানী বাঙালির কুলপতি নন্দকুমারের কাছে হাজির হয়েছেন প্রতিকারের আশায়। নন্দকুমারকে তিনি আদ্যোপান্ত তার ছেলে অপহরণের কথা, তার সিলমোহর প্রদানের কথা,হেস্টিংস সাহেবকে ঘুষ দেয়ার কথা এবং হেস্টিংস-এর বেমালুম অস্বীকার সবই জানিয়েছেন।

সব শুনে মহারাজ, রানী সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত কি-না এবং কাউন্সিলে হেস্টিংসকে অভিযুক্ত করলে রানী পিছিয়ে যাবে কি না এবং তার শিশুপুত্র তেজচন্দ্রকে নির্যাতন এমনকি হত্যার আশঙ্কা থাকার পরওরানী ওদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কি-না জানতে চাইলে রানী জানায় :

> মহারাজ, প্রত্যেকেরই থাকে কোনো-না কোনো বন্ধন, কোনো-না-কোনো পিছুটান। কারুরও পত্নী-পুত্র-পরিবার, কারুর বা প্রেমিকা, কারুর বা সঞ্চিত টাকা, যা হারাবার ভয়ে সে মূক হয়ে দেখে সবলের অত্যাচার। কিছু না কিছু থাকেই। সেটাই হয়ে ওঠে কাপুরুষতার অজুহাত। শক্তি প্রমত্তদের স্বেচ্ছাচারের সামনে সবাই যদি নানা অজুহাতে নিশ্চেষ্ট,মূক ও বধির হয়ে থাকে, তবে তো ধর্ম আর টেঁকে না মহারাজ। আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আমার ছেলেকে ওরা হত্যা করলেও আমি নীরব থাকব না, আমার সাধ্যমতো চিৎকার করে হিন্দু-মুসলমানকে জানাব বর্গিরা আবার এসেছে, এবার শ্বেতচর্মে আবৃত হয়ে।[৯৪]

নন্দকুমার রানীকে এও জানায় ওয়ারেন হেস্টিংস শত্রুকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেয়। রানী তথাপি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। মহারানী বলেন :

> মরতে তো একদিন হবেই মহারাজ, তবে বিদেশী বণিকের পদতলে শুয়েই মরতে হবে এমন কোন ললাটের লিখন বিধি লেখেননি।...কাউকে কাউকে আত্মদান করতেই হবে, মহারাজ,নইলে যে ক্লীবে, বৃহন্নলায় ভরে যাবে দেশ। স্বেচ্ছায় বলি হতে হবে, একটা জাতির হয়ে।[৯৫]

নন্দকুমারের কাছে রানী যেন দেবী, মানব বেশে তার মনের আঁধার দূর করতে এসেছে। নন্দকুমার জানেন হেস্টিংস কাউকে ছাড়বে না এমনকি নন্দকুমার এও জানেন সব প্রমাণ করে দিলেও ওরা চেপে দেবে সব। কারণ ওদের গভর্নর একজন তস্কর ইংরেজ কখনো তা স্বীকার করবে না। তারপরও নন্দকুমার তার সিদ্ধান্তে অনড় এজন্যে যে'একটা জাতির হয়ে বলি হতে হয় কখনো কখনো।'[৯৬]

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আলীপুরেরগৃহেওয়ারেন ও মেরিয়ানের সংলাপ থেকে জানা যায় হেস্টিংস ব্যারন ইমহফের স্ত্রী মেরিয়ানকে জয় করেছে স্ত্রীর পরিচয়ে অভিজাত হবার বাসনায়। হেস্টিংস মেরিয়ানকে তার অতীতের কথা–তারবেড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বলতে গিয়ে বলে – সে উর্স্টারশায়ারের ছোটলোক শ্রেণি থেকে ওঠেএসেছে, বড় হয়েছে লন্ডনের রাজপথে, গুন্ডা-চোর-বদমাইশদের সঙ্গে এক টুকরো রুটির জন্য বন্যসংগ্রাম করে। হেস্টিংসদের শ্রেণির লর্ড হবার, জাতে উঠার বড় সাধ; এ-সাধপূরণ পিতৃ পরিচয়ে হবার নয়, তাই স্ত্রীর পরিচয়ে অভিজাত হবার চেষ্টা। কিন্তু হেস্টিংস বড় হিসেবি, তার অন্তরটা দোকানদারের এবং দোকানদাররাই তার আদর্শ। মেরিয়ানের পেছনে এত খরচ করে তাই আফসোস করছে। মেরিয়ানকে (লোকের) দেয়া গয়নাগুলোও মেরিয়ানের নয়; ওগুলো তোষাখানায় তালা লাগিয়ে রাখে হেস্টিংস, বড় কোন পার্টি বা বলডান্সে গেলে মেরি সেগুলো ধার নিতে পারে।

ইলাইজা ইম্পে, মিস্টার রিচার্ড বারওয়েল ও মিস্টার টমাস গ্রেহাম প্রমুখ হেস্টিংসের সাথে আলাপচারিতায় দেখা যায় – এরা সবাই ব্যবসার সাথে জড়িত – গভর্নর নিজে চাল নিয়ে ফটকাবাজি করে; তামাক, আফিং আর নুনের ব্যবসা করে, হীরে মুক্তো বেচাকেনা করে।জেনারেল জন ক্লেভারিং, ফিলিপ ফ্রানসিস, বারওয়েল এবং হেস্টিংসসহ কাউন্সিল অধিবেশন বসে। অন্যান্য বিষয় আলোচনার পর কাউন্সিলে নন্দকুমারের চিঠি খোলা হয় – যে চিঠিতে নন্দকুমার হেস্টিংকে ঘুষখোর বলেছেন। নন্দকুমারকে কাউন্সিলের সামনে ডাকতে চাইলে হেস্টিংস বাধা দেয় এবং সে কক্ষ ত্যাগ করে কিন্তু দ্বারদেশে থেকে সবই শোনে। ফ্রানসিস নন্দকুমারকে ডেকে এনে গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তা প্রমাণে সক্ষম কি-না জানতে চাইলে নন্দকুমার জানান – যাবতীয় প্রমাণাদি তার কাছে আছে এবং কাউন্সিলকে একে একে তা তিনি অবহিত করেন।

প্রথমত, রেজাখাঁর কাছ থেকে এগার লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে হেস্টিংস তাকে মুক্ত করে দেয়। প্রমাণ হিসেবে রেজা খাঁকে স্বহস্তে লেখা হেস্টিংস-এর পত্র কাউন্সিলেদাখিল করেন নন্দকুমার।রাজশাহীতে রানী ভবানীর জমিদারি থেকে ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায় করতে করতে সেখানে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করে ১১৭৩ সালে। রানী ভবানীর কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকা ঘুষ আদায় করে ওই বছরেরই ১২ আশ্বিন। এরপর রানী ভবানীর জমিদারি থেকে বাহারবন্দ পরগণা কেড়ে নিয়ে নিজের মুৎসুদ্দি কান্তবাবুর ছেলের নামে (বেনামে)নিজেই জমিদার হয়ে

বসে।তৃতীয়ত, নন্দকুমারের মাধ্যমে মনি বেগমের কাছ থেকে মোট তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশ পাঁচ টাকা ঘুষ নেয় হেস্টিংস। চতুর্থত, হেস্টিংসের প্রতিনিধি গ্রেহাম ও ব্রজকিশোর বর্ধমানে রানীর ছেলেকে অপহরণ করে রানীর সিলমোহর হস্তগত করে এবংরানীর শিশুপুত্রকে নির্যাতন করে। এসবের প্রতিকার করবে কথা দিয়ে বর্ধমানের রানীর কাছ থেকে নয় লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে কিছুই করেনি।

কাউন্সিল সব শুনে প্রথমেই তেজচন্দ্রকে উদ্ধারের উদ্যোগ নেয়। হেস্টিংসের নির্দেশে (মিথ্যা) ফৌজদারি মামলা দায়ের করে মোহনপ্রসাদ। নন্দকুমার গভর্নর হেস্টিংসকে যেই ঘুষখোর বলল অমনি সে ফৌজদারি মামলার আসামি হয়ে গেল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পের সঙ্গে হেস্টিংস পরামর্শ করে নন্দকুমারের বিচারের আইন ঠিক করে – নন্দকুমারের বিচার হবে রাজা দ্বিতীয় জর্জের সেই আইনে, যে-আইন এখনো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়নি। বিচারপতি ইম্পে হেস্টিংসের আফিমের ব্যবসা থেকে শতকরা পাঁচ টাকা ভাগ চেয়ে নিয়েছে, সেইসাথে মাসতুতো ভাই ডারহামের জন্য নিমকমহালের দেওয়ানি। অতঃপর ঘুষখোর বিচারপতি নন্দকুমারের গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সানন্দে স্বাক্ষর করে, যদিও বিচারপতি ক্লেভারিং ও ফ্রানসিস নন্দকুমারকে আসামি না করার জন্য হেস্টিংসকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে। মহারাজ নন্দকুমার কাউন্সিলের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছে যে, মোহনপ্রসাদ গভর্নরের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে রোজ ষড়যন্ত্র করছে। হেস্টিংস জানায় কাউন্সিলের কোনও কথা ঘুণাক্ষরেও বাইরে উচ্চারণ করা যায় না, সবটাই 'টপ সিক্রেট'।

নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিয়ে আসা হয়েছে। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে চার্জ–পার্সি ভাষায় একটি পাট্টা জালিয়াতিপূর্বক তৈরি করে সে এবং সে-পাট্টায় জনৈক বুলাকিদাস যেন নিজ শিলমোহর অঙ্কিত করেছে এই মিথ্যা প্রচার করে। এই পাট্টা তৈরির উদ্দেশ্য ছিল বুলাকিদাসের নিকট থেকে আটচল্লিশ হাজার একুশ সিক্কা রুপেয়া এবং প্রতি টাকায় চারি আনা সুদ ঠকিয়ে নেয়া। নন্দকুমার শুধু পাট্টা জালই করেনি জাল জেনেও তা প্রচার করেছে ঐ টাকা ঠকিয়ে নেয়ার জন্যে। কী হাস্যকর অভিযোগ, বাংলার দেওয়ান মাত্র আটচল্লিশ হাজার টাকার জন্য জাল পাট্টা তৈরি করেছেন। হেস্টিংসের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে প্রধান বিচারপতি ইম্পে যে জুরিবোর্ড গঠন করে তাতে কোন ভারতীয় নেই; আসামিপক্ষের উকিল টমাস ফ্যারারের আপত্তি সত্ত্বেও দোভাষি নিয়োগ করা হয়েছে সরকারি চাকুরে খালসা মহাফেজখানার সুপারিনটেন্ডেন্ট মিস্টার এলিয়েটকে যিনি মহারাজা নন্দকুমারের পুরাতন শত্রু।

জালিয়াতির মামলায় পাট্টাটা জাল কিনা তা নির্ণয় করার প্রাথমিক উপায় সই ও সিল মিলছে কিনা সেটা নিরূপণ করা – সেজন্য ফ্যারার বুলাকিদাসের গদি থেকে আনা কিছু দলিল পেশ করেন,সাক্ষী হাজির করতে চায়, কিন্তু বিচারপতি ইম্পে কোনকিছুই গ্রাহ্য করে না। মিথ্যা সাক্ষী এমনকি পাঁচবছর আগে মৃত ব্যাক্তিও এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছে। বিচারকদের জেরায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এটা নন্দকুমারকে ফাঁসানোর জন্য সাজানো মিথ্যা মামলা।

ওয়ারেন হেস্টিংস ও বারওয়েল কারাভ্যন্তরে নন্দকুমারের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা করে সমঝোতা করার উদ্দেশ্যে। আদালতে দোষ স্বীকার করে নিলে শুধু কারাদণ্ড নইলে ফাঁসি; আর মীরকাসিম কোথায় বলে দিলে জালিয়াতির মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। কলকাতায় দশবছর ধরে বন্দি থেকে নন্দকুমারের পক্ষে তো বলা সম্ভব নয় এতবড় ভারতবর্ষে কোথায় মীরকাসিম ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেস্টিংসের সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে নন্দকুমার তার সঙ্গে বেঈমানি করেছে হেস্টিংসের এমন অভিযোগের উত্তরে নন্দকুমার জানায় – বেঈমান হল ইংরেজ, সেই বণিক অন্যকে বেঈমান বলতে পারে না, সে অধিকার রাখে না। এরপর ইংরেজদের বেঈমানি, যুদ্ধের অজুহাতে কত লক্ষ টাকা আদায় করেছেন যার সাক্ষী নন্দকুমার স্বয়ং সেই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। উত্তর শুনে হেস্টিংস বলেন–

> বুঝেছেন তো নন্দকুমার রায় কেন আপনাকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়? আপনি একটা সর্বনাশা যুগের সাক্ষী। একটা প্রবল ভাঙাগড়ার সময়ে আপনি ছিলেন বাংলার দেওয়ান। তৎকালীন সব লেনদেনের আপনি হচ্ছেন প্রত্যক্ষদর্শী। বড় বেশি জানেন আপনি। আপনার মতন লোকেদের আমরা ধরাধামে রাখি না।[৯৭]

এরপর আর কারুরই বুঝতে বাকি থাকে না যে, কেন নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে আর নন্দকুমারের জন্য কী পরিণতি অপেক্ষা করছে। ঐসব পাট্টা জালিয়াতি কোন বিষয় নয়– আসল কথা নন্দকুমারের হাতে আছে ইংরেজদের ঘুষ, দুর্নীতিসহ নানা অপকর্মের প্রমাণ। তাই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে ধরাধাম থেকে বিদায় করার জন্যেই এত আয়োজন। ফ্যারারের বক্তব্য থেকে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায় পাঠকের সামনে; এক্স-পোস্ট আইনে আসামির বিচার হচ্ছে যেটা সম্পূর্ণ বে-আইনি। তা-ছাড়া এ-বিচার স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী – কারণ, জালিয়াতি ভারতবর্ষে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ নয়। তাছাড়া নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতি প্রমাণিত হয়নি। তারপরও ঘুষখোর বিচারপতি ইম্পে হেস্টিংসের কাছ থেকে আফিমের ব্যবসার শতকরা পাঁট টাকা ভাগ পেয়ে হেস্টিংসের ইচ্ছেমত রায় প্রদান করে–ইম্পে নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে রাজা দ্বিতীয় জর্জের ২৫ নম্বর আইন অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং ৫ আগস্ট গলায় ফাঁসি পরিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘোষণা দেয়।

বিচারপতিকে আদালত ত্যাগ করার আগে আসামি পক্ষের আপিল করার অনুমতি দেওয়ার রেওয়াজ থাকলেও এবং মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে দণ্ডের তারিখ ঘোষণা বেআইনি হলেও ইম্পে তাই করে। ইম্পেনন্দকুমারকে আপিলের অনুমতি দেয়নি এবং ইংল্যান্ডের রাজার কাছে দরখাস্ত করার সুযোগ না রেখে ৫ তারিখেই ফাঁসি হবে বলে কোর্ট এডজার্নড করে। ফ্যারার এ-রায়কে 'জুডিশিয়াল মার্ডার' হিসেবে অভিহিত করে। ৫ তারিখেই নন্দকুমারের ফাঁসি কার্যকর হয়।

নন্দকুমারের মামলার যেসব গুরুতর বিচ্যুতি ঘটেছে, যেভাবে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে, যেভাবে জালিয়াতির অভিযোগ ভেস্তে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে জোর করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হছে সে বিষয়ে নন্দকুমার ফ্রানসিসকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে গেছেন। মিস্টার ডারহাম ঐ চিঠি জেল থেকে পাচার করে। এ-চিঠি থেকে

প্রমাণ হয়– গভর্নর প্রত্যক্ষভাবে মামলায় হস্তক্ষেপ করেছে, বিচারপতির সঙ্গে পদে-পদে ষড়যন্ত্র করেছে, সাক্ষীদের তালিম দিয়েছে, এমনকি গঙ্গাবিষ্ণুকে কিডন্যাপ করতে দিয়েছে ; যাতে সে সাক্ষ্য দিতে না পারে। ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের স্বার্থে কাউন্সিল তদন্ত শুরু করলে পুরো ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে বলে ফ্রানসিসের ধারণা। এবারেও হেস্টিংস উল্টো চাল চালে– তার জেল থেকে গোপনে কোনও চিঠি বাইরে পাঠানো অসম্ভব, অতএব ঐ চিঠি নন্দকুমারের লেখা নয়। হেস্টিংস উল্টো ফ্রানসিসকে নন্দকুমারের চিঠি জাল করার জন্য জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে ফাঁসিতে ঝোলাবার হুমকি দেয়। হেস্টিংসই রাষ্ট্র, সব, সে যা চাইবে তাই হতে হবে। তাই নন্দকুমারের চিঠিটা আনুষ্ঠানিকভাবে আদালত-প্রাঙ্গনে জল্লাদ কর্তৃক পোড়াবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।নাটকের শেষাংশে দেখা যায় – হেস্টিংস একা বসে লিখছে; তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সহসা ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ তার সামনে নেমে আসলে হেস্টিংস নিজেকে সর্বশক্তিমান, তিনিই রাষ্ট্র, তিনিই স্থির করেন কে মরবে, কে থাকবে বলে জানায়। হেস্টিংস আর্তনাদ করলে মেরিয়ান আসে, বলে – 'ও কিছু নয়, তার ইউজুয়াল ড্রীমস'। মেরিয়ান তাকে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়তে বললে হেস্টিংস জানায়, তাকে সারারাত কাজ করতে হবে। আঠারলক্ষ টাকার আফিমের চালান যাবে কাল সকালে সাংহাই– যা থেকে সালিভান আর হেস্টিংসের মুনাফা থাকবে আট লক্ষ টাকা, অতএব তার ঘুমোবার সময় নেই। কাজ করতে থাকে হেস্টিংস। এখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

ঘুষখোর হেস্টিংস ও বণিক হেস্টিংস কী করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছে নিজের জন্য এবং তার স্বদেশের জন্য – তারই ইতিবৃত্ত এই নাটক। জাতে উঠার জন্য এবং টাকা উপার্জনের জন্য কোনোকিছুই করতে বাধেনি যার – সেই হেস্টিংসকে যখন ভারতীয় লেখকদের কেউ কেউ মহান করে উপস্থাপন করছিলেন তখন সঙ্গত কারণেই উৎপল দত্ত দায়বোধ করেন হেস্টিংসদের আসল চেহারা উন্মোচন করতে।

সতীদাহ প্রথা ও রাজা রামমোহন রায় *অগ্নিশয্যা*নাটকের পটভূমি। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে ১৯৮৮ সালের ২৭শে নভেম্বর রবীন্দ্রসদনে; আজকাল পত্রিকায় ১৪০০ সালের শারদীয় সংখ্যায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়;পরে উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র সপ্তম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। নাট্যকার রামমোহনের কালের সতীদাহের একটি পরিসংখ্যান,সতীদাহেরপটভূমি এবং বিভিন্ন মনীষীর উক্তি – অতঃপর নাটকের সূচনা।

বর্ধমান জেলার ডিহিকেশপুরের জমিদার রাজা জগৎনারায়ণ রায় তিন কিশোরী বালিকা বধূ রেখে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। জগৎনারাণের তিন স্ত্রীর মধ্যে স্নেহময়ী জ্যেষ্ঠ,অন্য দু'জন সরলা ও সূর্যময়ী; এরা বিশেষত স্নেহময়ী স্বামীর সাথে সহমরণে অস্বীকৃতি জানায়। অবশ্য এদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বিয়ের সময়ই এদের অভিভাবকরা কথা দিতে বাধ্য হয় যে, তাদের মেয়েরা সহমরণে যাবে। স্নেহময়ীর পিতা নিজ কন্যাকে সহমরণে যাবার জন্য সতীমাহাত্ম্য এবং তার নিজের কথা দেয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে স্নেহময়ী বলে:

তোমাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এরা বউ কিনে আনে আশেপাশের গাঁ থেকে। তারপর তাদের দলে দলে পুড়িয়ে মেরে এরা সতীমন্দির নামে দোকান দেয়। সেখানে সতীমাহাত্ম্য বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে। চারশ বছর ধরে এরা এই ব্যবসা করছে।[৯৮]

স্নেহময়ীর সহমরণে অস্বীকৃতির কথা শুনে জগৎনারায়ণ রায়ের ভ্রাতা অলক নারায়ণের মাথায় হাত – তার বৌদি যদি ডিহিকেশপুরের রানী হয়ে তার সম্পত্তিতে ভাগ বসায়। একদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগারের পথ রুদ্ধ হওয়া ও অন্যদিকে এ বাড়ির চারশ বছরের প্রথার বিরোধিতা করায় স্নেহময়ীর উপর নেমে আসে অর্থলোলুপ অলকের খড়্গহস্ত। স্নেহময়ী বাধ্য হয়ে ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তক, যিনি, রবীন্দ্রনাথের জীবনেরও আদর্শ, সেই রাজা রামমোহন রায়ের শরণাপন্ন হন। স্নেহময়ীকে আশ্রয় দিতে যেয়ে রামমোহন রায় রাধাকান্ত দেব ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। রামমোহণ রায় শাস্ত্রাদি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' লিখেছেন। তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন – হিন্দুশাস্ত্রে সতীদাহের গুরুত্ব নেই, বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলা হয়েছে তাই সহমরণ নারীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যুক্তি-তর্কে তাঁর সাথে কেউই পেরে উঠেননি। (ইয়ংবেঙ্গলের দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী অবশ্য রামমোহনের সাথে ছিলেন)। বাধ্য হয়ে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আর্মহার্স্টকে ঘটনা জানান। কিন্তু রামমোহন রায়ের জানা ছিল না বড়লাটের মিলিটারি সেক্রেটারি কর্ণেল ফার্গুসনের সাথে রাধাকান্ত দেবের গোপন ব্যবসার কথা,ভাবতে পারেন নি তার আগেই ফার্গুসনকে টাকা দিয়ে হাত করে ফেলেছে অলক,রাধাকান্তরা। লর্ড আর্মহার্স্টের সামনে রানী স্নেহময়ী সহমরণে অস্বীকৃতি জানানোর পরও ফার্গুসন তাকে ডিহিকেশপুরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়।বাড়ি ফিরে গিয়ে এরা শুরু করে স্নেহময়ীর উপর নির্যাতন। শশ্মানকালীর মন্দিরে বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করে তার কাছে জানতে চায় কাল ভোরে সে সতী হবে কি-না ? উত্তরে স্নেহময়ী জানায় –

না! ভয়ে আমার বুকটা হিম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জ্যান্ত আগুনে প্রবেশ করতে আমি পারব না। অস্থি থেকে পোড়া মাংস খসে খসে পড়বে, আর আগুনে আমাকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে রাখবে একদল বলবান লোক – না, আমি পারবো না।

অলক ॥ সতী তোমাকে হতেই হবে! সতী আমাদের চাই! সতী-মন্দির চাই!

কৃষ্ণ ॥ বর্ধমানের মহারাজার আদেশ, রাজা রাধাকান্ত দেবের আদেশ। হিন্দু সমাজপতিরা সবাই জড়িয়ে পড়েছেন এই সতীদাহে। এখন পিছিয়ে গেলে কেলেঙ্কারি হবে, এঁদের সবার মুখে কালিমালেপন করা হবে।

স্নেহ ॥ আমি অতি সামান্যা রমণী, সমাজপতিদের সম্মানের ভার বইবার শক্তি আমার নেই। আমায় ছেড়ে দিন আপনারা, পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দিন।

অলক ॥ তোমায় বাঁচতে দিতে পারি না। তুমি বেঁচে থাকা মানে কখনও না কখনও তুমি ডিহিকেশপুরের জমিদারির অংশচেয়ে বসবে। আমার অর্ধেক রাজত্ব কেড়ে নেবে তুমি।[৯৯]

স্নেহময়ী দলিল সই করে সব লিখে দিতে চাইলেও অলক বলে – শত্রুর শেষ রাখতে নেই।সতী, সতীমন্দির এদের চাই-ই চাই। স্নেহময়ী সতী না হলে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের সহজ উপায় বানচাল হয়ে যাবে এবারে তাই সরলা ও সূর্যকে জিম্মি করেছে; স্নেহময়ী রাজী না হলে নিষ্পাপ এই দুই কিশোরীকে আগুনে পুড়িয়ে

মারবে মানুষরূপী হায়েনারা। সরলা ও সূর্য – যারা বেঁচে থাকার সুখই ভোগ করেনি তাদের বাঁচাতেই শেষপর্যন্ত স্নেহময়ী অগ্নিপ্রবেশ করতে রাজি হয়।

এদিকে রাজা রামমোহনের সঙ্গে না পেরে তার ছেলে রাধাপ্রসাদ রায়কে জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে গোরা পুলিশ। স্নেহময়ীর অগ্নিপ্রবেশের খবর শুনে রাজা রামমোহন রায় ছুটে আসেন ডিহিকেশপুরে। ডিহিকেশপুরের শ্মশানে হাজির হয় রাধাকান্ত দেব,ফার্গুসনরাও। ফার্গুসন স্নেহময়ীকে তথাকথিত সাজানো জেরা করে তার মুখ দিয়েই বলিয়ে নেয় যে, সে স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে। রামমোহন স্নেহময়ীকে বারংবার অনুরোধ করে, তার উপর জুলুম নির্যাতনের কথা প্রকাশ করতে। কিন্তু স্নেহময়ী রাজি না হওয়ায় রাধাকান্তদেবের কাছে হাতজোড় করে স্নেহময়ীর প্রাণভিক্ষা চায় রামমোহন।রামমোহন রায়কে তার জন্য অপমানিত হতে নিষেধ করে স্নেহময়ী :

> নারী-নির্যাতনের বহু উপায় জানে ওরা। যতদিন এরা থাকবে সমাজের মাথায় ততদিন সতীদাহ হবেই। আপনি সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন করে কিছুই করতে পারবেন না। এ-সমাজটাকে উল্টে দেয়ার আন্দোলন করুন দেওয়ানজি। ... বেঁচে থাকলে সারা জীবনই ওরা নির্যাতন চালাবে।...এই দেশে এ-ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। যতদিন ওরা নারীদের ভাগ্যবিধান করতে থাকবেন ততদিন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মেয়েদের আত্মহত্যা করেই পালাতে হবে।[১০০]

অতঃপর জ্বলে ওঠে চিতা, স্নেহময়ী চিতারোহণ করে মৃত্যুবরণ করে। স্নেহময়ীর বিরুদ্ধে অলকের লড়াই আসলে যতটা না ধর্মের তারচেয়ে অনেক বেশি অর্থের, যে অর্থলোলুপতার জন্য নৃশংসভাবে পৈশাচিক কায়দায় তিল তিল করে স্নেহময়ীর ছোট্টশিশুকন্যাকে হত্যা করেছে অলক। অলকের অর্থলোলুপতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাধাকান্তদের তথাকথিত হিন্দুয়ানি। ফলশ্রুতিতে স্নেহময়ীদের মতো প্রতিবাদী নারীদেরও বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছে।

ইতঃমধ্যে ভারতের বড়লাটের পরিবর্তন হয়; নতুন বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। বেন্টিঙ্ক সতীদাহ বন্ধ করার আইন করার আগে রাজা রামমোহনের মতামত জানতে চাইলে রামমোহন এই প্রস্তাবিত আইনের বিপক্ষে অবস্থান নেন; কারণ :'আইন করে, জোর-জবরদস্তি করে সতীদাহ বন্ধ করা যাবে না। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে পড়বে দেশের সর্বকোণে। একমাত্র সেইভাবেই সতীদাহ নির্মূল করা যাবে এ দেশ থেকে।...সতীদাহ বন্ধ করতে হবে নিজেদের চেষ্টায়, ব্রিটিশের সাহায্যে নয়।'[১০১]সতীদাহ সম্পর্কিত রামমোহণের এহেন মনোভাবের খবর শুনে তার প্রতিপক্ষরা অপপ্রচার করতে থাকে আর তাঁর অনুসারী, শুভার্থীরাও তাঁকে ভুল বোঝে। কিন্তু :

> রামমোহন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে সমাজে নারীরা প্রতিনিয়ত অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা সহ্য করে থাকেন সেখানে বিদেশী প্রভুদের দাক্ষিণ্যে সতীদাহপ্রথা আইনের সাহায্যে নিষিদ্ধ করে নিপীড়নের অবসান ঘটনো যাবে না। ফরাসী মানবতাবাদের সমর্থক রামমোহন জানতেন এজন্য প্রয়োজন সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের। এই বোধ থেকে

> রামমোহন সঙ্গত কারণেই উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আইন প্রণয়নের সপক্ষে মত দেননি।ক্রুর সনাতনপন্থীদের গোঁড়ামি ও শঠতাই প্রতিষ্ঠিত হল,অসহায় রামমোহন বিরাগভাজন হলেন তাঁর স্বদেশবাসীর কাছেই। কিন্তু এই সাময়িক হার স্বীকারের অন্তরালে প্রস্তুতি চলছিল ভবিষ্যতের মহত্তর বিজয়ের,ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে।[১০২]

রামমোহন রায় বাংলা ব্যাকরণ লিখতে শুরু করেন;তিনি মনে করেন :'বাংলায় শিক্ষা দিলে তবে শিক্ষা সর্বজনীন হবে– তবে আমাদের ঘরের মেয়েরা শিক্ষিত হতে পারবে। তারপর আর তারা মুখ বুঁজে অত্যাচার সইবে না। তারা সোচ্চার হবে। তখন আর কেউ তাদের জোর করে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারতে পারবে না।'[১০৩]দিল্লির বাদশাহর প্রতিনিধি হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের ইংল্যান্ড যাবার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি।

ভারতে আইনত সতীদাহ বন্ধ হয়েছে অনেক আগে,লর্ড বেন্টিঙ্কের সময়ে। কিন্তু আজও ভারতের নারীরা নানা সহিংসতার শিকার । ভারতের অনেক অঞ্চলে নারীদের জীবন কুসংস্কারে পূর্ণ।এ যুগেও রূপ কানোয়ারদের সতী হতে দেখা যায়, তাই এ যুগেও এ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৮৮ সালে উৎপল দত্ত ফরাসি পতাকার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নামকরণ করে নাটক রচনা করেন *নীল সাদা লাল*। পিএলটি এবং আলিয়াঁস ফ্রাসেজের যৌথ উদ্যোগে নাটকটি ১৩ এপ্রিল ১৯৮৯ সালে রবীন্দ্র সদনে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৯৬ সালের শারদীয় সংখ্যায় আজকাল পত্রিকায় ; পরে নাটক সমগ্র ৫ম খণ্ডে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

*নীল সাদা লাল*নাটকের পটভূমি ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব।এ-নাটকের ঘটনাপ্রবাহ তিন স্থানে সংঘটিত হয়েছে : শ্রীরঙ্গপত্তম, ভার্সেই এবং পারিতে।এতে একই সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত ও ঘটনাপ্রবাহ এবং টিপু সুলতানের লড়াই উপস্থাপন করা হয়েছে। আটটি দৃশ্যে বিন্যাস্ত নাটকটি। প্রথম দৃশ্য শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের অভ্যন্তরে টিপু সুলতানের দরবার। সুলতানের উপদেষ্টা মসিয়্য গুর্জো টিপু সুলতানকে জানায় তার দেশের (ফরাসির) প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ও বর্তমান অবস্থা। বর্তমান প্রজাতন্ত্র আগের চেয়ে ভাল চালাচ্ছে বলে জানায় গুর্জো। গুর্জো আরও জানায়:

> সরকারের নানা দপ্তরের কাজকর্মকে এতকাল ইচ্ছে করে জটিল আর রহস্যময় করে রাখা হয়েছে। আসলে সেগুলি দুঃসাধ্য কিছু নয়; ফরাসী প্রজাতন্ত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আগের রাজতন্ত্রী সরকারের চেয়ে অনেক ভাল কাজ করছে।[১০৪]

সপ্তম দৃশ্য পারিতে; সেখানে দেখা যায় দাঁতো, রোবসপিয়ের এবং মহাকবি গ্যায়টেকে। গ্যায়টে পারিতে বিপ্লবে সহমর্মিতা জানাতে এসে বলছেন :

> জার্মানীর জনগণ অপেক্ষা করে বসে আছে কবে ফ্রান্সের নীল-সাদা-লাল পতাকা মুক্তির বাণী বহন করে আনবে সাকসনিতে,ভাইমারে,প্রুশিয়ায়। এসেছি আপনাদের পতাকাকে অভিবাদন জানাতে।...আপনাদের বিপ্লবটা দুনিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক বিপ্লব। সুদূর হাইতি পর্যন্ত সে বিপ্লব ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে গেছে, এদিকে পোলান্ডের ওয়ারশ পর্যন্ত।[১০৫]

এবং :

> রোবস্ ॥বিপ্লবের জয় হয়েছে! রাজা জমিদারদের পশুশক্তি বিধ্বস্ত।
> দাঁতো ॥ নবীন বিপ্লবের প্রথম যুদ্ধজয়।
> গ্যায়টে ॥ আজ আমরা নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করলাম।[১০৬]

অষ্টম দৃশ্য টিপু সুলতানের প্রাসাদে নাট্যাভিনয় চলছে; যেই মুহূর্তে গুর্জো বলেন–'ইংরেজ বাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গ আক্রমণ করেছে। এবার তোমরা সবাই সৈনিক। লড়তে হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, যেমন এক্ষুণি নাটকের মধ্যে লড়ছিলে'[১০৭]সেই মুহূর্তে প্রস্থানোদ্যত গুর্জো গুলিবিদ্ধ হন। টিপু সুলতান গুর্জোর পাশে বসে বলেন :

> বন্ধু তোমার নাটকের শেষ অভিনয় না করেই বিদায় নিচ্ছ?নাটকের শেষটা অভিনীত হচ্ছে এইখানে– মহীশুরে – শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের প্রাচীরমূলে।... গুর্জো বাহাদুর, কর্নেল ওয়েলেসলি শেষ যুদ্ধটা জিতছেন। ইংরেজ সেনা ইতিমধ্যেই দুর্গের ভেতরে ঢুকে এসেছে। আমরা পারলাম না, হেরে গেছি। এবার না মরা পর্যন্ত হাতাহাতি লড়াই।...কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারকে পরাজিত হতে হবেই। ফ্রান্সের বিপ্লবেই তাদের অন্তিম ঘোষিত হয়ে গেছে।[১০৮]

গুর্জোর মৃত্যু এবং তার দেহ লাল-সাদা-নীল পতাকায় ঢেকে দেয়ার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি।

১৭৮৯ সালে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবকে পৃথিবীর প্রথম বিপ্লব বলে মনে করেন উৎপল দত্ত। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার যে নতুন অধ্যায়, নতুন যুগের সূচনা হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে তা ফরাসি দেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে লাতিন আমেরিকা,আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসি বিপ্লব দুই শতাধিক বছর ধরে সারা পৃথিবীর মানুষকে প্রভাবিত করে আসছে। এ নাটকে বুরকথা – মহীশূরের লোকনৃত্যের ব্যবহার খুবই সফল এবং অসাধারণ হয়েছে; মঞ্চসজ্জায়ও অসাধারণ নৈপুণ্য লক্ষিত।

গান্ধীর প্রিয় গান 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে'– এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে উৎপল দত্ত নাটকের নামকরণ করেছেন *একলা চলো রে*।১৯৪৭-এর দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গান্ধীহত্যা *একলা চলো রে* নাটকের পটভূমি। মৃণাল ঘোষ ও বিষ্ণুপ্রিয়া দত্তের পরিচালনায় পিএলটি নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করে ১৯৮৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর রবীন্দ্রসদনে;প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয়া 'আজকাল'-এ,পরে নাটক সমগ্র সপ্তম খণ্ডে। 'দেশবিভাগ ও গান্ধী হত্যার অনুদ্ঘাটিত ইতিহাস' এবং 'বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনা ও সংলাপ ঐতিহাসিক' মর্মে (এইসব সংলাপের উৎস নির্দেশ করে) নাটকের পরিচিতি পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে।একলা

চলো রে নাটকটি ১৩টি দৃশ্যে বিন্যস্ত। তিনটি স্থানে নাটকের ঘটনাপ্রবাহ সংঘটিত হয়েছে– নন্দীগ্রাম,দিল্লি ও বোম্বে।

অনাথবন্ধু সত্যাগ্রহী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা;স্ত্রী যোগমায়া,দুই পুত্র সন্তোষ ও প্রিয়তোষ,এক কন্যা বৃন্দা। সন্তোষ প্রিয়তোষ দু'ভাই দেশমাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ের অংশ হিসেবে ভারত থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালের ফাল্গুন মাসে নন্দীগ্রাম স্টেশনে গুলি করে ম্যাজিস্ট্রেট ডানকানকে। সন্তোষ,প্রিয়তোষকে দু'বছর লুকিয়ে রাখে কৃষক গোলাম নবী ও তার স্ত্রী ফতেমা। জমিদার অঘোর রায় পুলিশকে পথ দেখিয়ে গোলাম নবীর বাড়ি থেকে সন্তোষ প্রিয়তোষকে ধরিয়ে দেয়। এদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে গোলাম নবীর জমি কেড়ে নেয়; ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। গোলাম নবীর দু'বছর জেল হয়, প্রিয়তোষের দীপান্তর আর সন্তোষের ফাঁসি। ১৬ বছর জেল খেটে প্রিয়তোষ বাড়ি ফেরে। গোলাম নবী, ফতেমা বিবি তাদের পুত্রতুল্য প্রিয়তোষের আগমন সংবাদে এসে হাজির। হাজির হয়েছে অঘোর রায়ও।

দিল্লিতে ভাইসরয় প্রাসাদের দরবার কক্ষে মাউন্ট ব্যাটেনের গৃহে দেশবিভাগের পরিকল্পনা মাথায় রেখে নেহেরু, জিন্না,প্যাটেলকে ডেকেছেন ব্যাটেন– (এদেরকে পরিকল্পনা গিলানোর জন্য)। মাউন্টব্যাটেন দূর থেকে এদের যত কড়া লোক ভাবতেন, কিছুদিন ওঁদের সঙ্গে মিশে বুঝেছেন এরা তা নয়;অন্তসারশূন্য, কাপুরুষ ও দুর্বলচিত্ত। মাউন্টব্যাটেন বলেন :

> ব্রিটিশ গভর্মেন্ট চাইছে লীগ এবং কংগ্রেসের হাতেই থাকুক শাসনভার। কারণ আপনারা আমাদের বন্ধু। চীনের লালফৌজের অনুরূপ কিছু যেন এদেশে উদিত না হয় তার জন্য আপনাদেরই বসতে হবে সরকারে। বসে শক্তহাতে দমন করতে হবে গণবিদ্রোহ। This is your last chance।হয় ছিন্নভিন্ন ভারতের রাজা হয়ে বসুন, আর নইলে গণবিপ্লবের সামনে নিশ্চিহ্ন হন।[১০৯]

নেহেরু ক্লান্ত বৃদ্ধ তাকে ম্যানেজ করেছে ব্যাটেনের স্ত্রী এডুইনা– দেশবিভাগে নেহেরুর ইতস্ততাকে লেডি ব্যাটেন তার সান্নিধ্য দিয়ে জয় করে ফেলেন, জিন্নাহ ভারতবিভাগ প্রস্তাবে রাজি তবে পুরো পাঞ্জাব আর বাংলাসহ। প্যাটেল ক্ষমতার জন্য বৃটিশের যে-কোন প্রস্তাবে রাজি। একজনকেই ভয় – গান্ধী। নেহেরু,ব্যাটেন (ডিকি)-এর প্ল্যানে সই করলেও আশায় ছিলেন গান্ধী -তার প্রিয় বাপুজী, এই প্ল্যানে মত দেবেন না। একমাত্র গান্ধীই সকলের বদমায়েশি আর গোপন ষড়যন্ত্র ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে দেশব্যাপী আবার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম শুরু করে দিতে পারেন। নেহেরু আশায় আছেন তিনি তাই করবেন। তাদের হটিয়ে দিয়ে সোজা দরিদ্র ভারতবাসীকে সংগ্রামের ডাক দেবেন।

যিনি সকলের নমস্য,যাঁকে সকলের ভয়–সেই গান্ধী এলে মাউন্টব্যাটেন দেশবিভাগ সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাইলে তিনি এক টুকরো কাগজে লিখেন :

> আজ সোমবার, আমার মৌনী দিবস, এই দিনে আমি কথা বলি না।[১১০]

মৌনতা সম্মতির লক্ষণ; অতএব উল্লাসে সবাই একে অপরের সাথে করমর্দন করেন।একদিকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহেরুশপথ নিচ্ছেন,দিল্লির রাজভবনে চলছে উল্লসিত পার্টি; অন্যদিকে তখন পথে পথে হিন্দু মুসলিমকে মারছে, মুসলিম হিন্দুকে মারছে, শবদেহ স্তুপীকৃত; হিন্দু-মুসলিমের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে দেশ। এই কি স্বাধীনতা? এমন স্বাধীনতা তো চায়নি প্রিয়তোষরা। তাইতো প্রিয়তোষ বলছে – 'এ স্বাধীনতা মিথ্যা, ইয়া আজাদী ঝুটা হ্যায়।'[১১১]নন্দীগ্রামে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ঠেকাতে অনাথ,প্রিয়তোষরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।এরকম পরিস্থিতিতেসন্তানের জন্য অপেক্ষারত মাকে প্রিয়তোষ বলে–'মাগো ধ্বসে যাচ্ছে সব। একশ বছরের স্বাধীনতার যুদ্ধ বিফলে গেল।'[১১২]

অত্যাচারী অঘোর রায় সারা জেলা ঘুরে দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করছে। অনাথবন্ধুতার উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলে এবং এদের রক্তমাখা হাত চেপে ধরার কথা বললে অঘোর রায় জানায় – অনাথবন্ধুকে পদচ্যুত করা হয়েছে এবং তার স্থানে অঘোর রায়কে জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক করা হয়েছে। কংগ্রেস-এর ফান্ডে টাকা দিয়ে অঘোর রায়রা কংগ্রেসের আদর্শ কর্মী বনে গেছে। সর্বত্যাগী ঋষীদের স্থান আজকের কংগ্রেসে নেই। গান্ধী যেমন আজকের কংগ্রেসের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, তেমনি তাঁর শিষ্য অনাথবন্ধুও অঘোর রায়দের কাছে অপ্রয়োজনীয়। তেভাগা আন্দোলনের নেতা গোলাম নবীকে ধরতে জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক অনাথবন্ধু চক্রবর্তীর বাড়িতে এসেছে অঘোর রায় গুণ্ডা নিয়ে। অঘোর রায়ের হুকুমে গুণ্ডারা গোলাম নবী ও তার স্ত্রী ফতেমাকে খতম করে,মুসলমান পাড়ায় আগুন দিয়ে বেনেডাঙা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তাইযোগমায়ার উচ্চারণ :

> স্বাধীনতার অভিষেক!স্বাধীনতা এসেছে দেশে। এই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিলে তোমরা?হ্যাঁগো এই স্বাধীনতার জন্য তোমার বড় ছেলে গলায় ফাঁসির দড়ি পরেছিল? তোমার ছোট ছেলে দ্বীপান্তরে গিয়েছিল? তুমি এই করলে? তোমার ছেলেদের প্রাণ যাঁরা বাঁচিয়েছিল তাদের রক্তে তোমার ঘরের অঙ্গন নিকোলে?[১১৩]

গান্ধী অনশন শুরুর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর উদ্দেশ্যে আভাকে 'ডিকটেশন' দেন :

> "মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্নেহাস্পদেষু। পুত্রবরেষু,আমার ক্রমশ মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছি। আমি এখন দিল্লিতেই আছি এবং দেখছি কিভাবে মুসলিমদের রাজপথে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, এমনকি তাদের পবিত্র মসজিদগুলিতে বসে যাচ্ছে হিন্দু এবং শিখ উদ্বাস্তুরা, অথচ তোমার সরকার হয় অপদার্থ, নয় নিজেই এই অত্যাচারের সহযোগী। সর্বশেষে পকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যে টাকা ভাগাভাগি হবার কথা ছিল, তার মধ্যে পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা তোমরা দিতে অস্বীকার করেছ। আমি জানতে চাই কিভাবে তোমরা এই অধর্ম করতে পারলে। সুতরাং আমি স্থির করেছি – দিল্লিতে মুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দাবীতে এবং পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য টাকা ফেরৎ দেয়ার দাবীতে আমি আজ ১৩ই জানুয়ারি,১৯৪৮, সকাল দশটা থেকে অনশন শুরু করছি। এ-খবর তোমাকে কাল দিয়েছি, আজ লিখিতভাবে জানালাম।

Dhaka University Institutional Repository

আশীর্বাদক
মোঃ কঃ গান্ধী"[১১৪]

গান্ধী করাচীর জাহাঙ্গীর প্যাটেলের চিঠির মাধ্যমে জানতে পারেন – জিন্না তাঁকে(গান্ধীকে) সারা ভারতের মুসলিমদের একমাত্র সহায় ও সম্বল মনে করেন এবং তিনি করাচি গেলে তাঁর সাথে কৃতজ্ঞচিত্তে আলোচনায় বসতে রাজি আছেন।গান্ধী পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে পদযাত্রা করে জিন্নার কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। জিন্না ও গান্ধী সব আবার গোড়া থেকে গড়ার আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। গান্ধীর অনশনের খবর পেয়ে লর্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেন গান্ধীকে নিরস্ত করতে এলে গান্ধী পাঞ্জাবের গণহত্যা এবং ব্রিটিশ সৈন্য ও অফিসারদের নিষ্ক্রিয়তার চিত্র তুলে ধরেন। দেশভিাগের ব্যাপারে নীরব থেকে যে ভুল করেছেন – চেষ্টা করে দেখবেন ভুল শোধরানো যায় কিনা, ভারত-পাকিস্তানের মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করা যায় কিনা।প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেলও গান্ধীর অনশনের খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে তর্ক জুড়ে দেন। সর্দার প্যাটেল দিল্লির দাঙ্গা, মুসলিম হত্যা, মুসলিমদের পৈশাচিক নির্যাতন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মুসলিমদের আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তিনি এসবের জন্য ভারতীয় লোকসভা ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে জবাবদিহি করতে নারাজ বলে জানান।

ভারতকে দুভাগ করেই ব্রিটিশরা সন্তুষ্ট হয়নি তারা পাকিস্তান ও ভারতকে যুদ্ধে নামিয়ে দুই দেশের সর্বনাশ করতে কাশ্মীরে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। তাই গান্ধী কাশ্মীরের আত্মঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করতে,পাক-ভারত মৈত্রীর জন্য জিন্নার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতে চান। জিন্নার সাথে সাক্ষাৎ-এর কথা শুনে রোষে ফেটে পড়ে প্যাটেল;গান্ধীকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন এমনকি গান্ধী সরকারের ও আইনত কংগ্রেসের কেউ নন বলে জানান। প্যাটেল গান্ধীকে অনশন ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং গান্ধী না খেয়ে মরলেও কংগ্রেস পার্টির কিছু আসে যায় না বলে জানান। কংগ্রেস-এর ভয়ঙ্কর রূপ দেখে গান্ধী তাই সংবাদপত্রে বিবৃতি পাঠান :

> কংগ্রেস পার্টি যে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ামাত্র এরকম হিংস্র, স্বৈরাচারী,বিশ্বাসঘাতক এবং চোর হয়ে উঠবে, তা আমি ভাবতে পারিনি কখনো। জীবনে গান্ধীর যতগুলি পরাজয় ঘটেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাকর হচ্ছে কংগ্রেস নামক সংগঠনটা। চোরের আড্ডা বা মাস্তানদের ভাঁটিখানা হয়ে উঠলো স্বাধীনতা-সংগ্রামের একমাত্র সংগঠনটি, তাই আপনারা যাতে কংগ্রেসের গৌরবময় অতীতটাকেও উচ্ছেদ করতে না পারেন, কংগ্রেস-এর সুনাম যেটুকু এখনো আছে তাতে আর কাদা ছিটোতে না পারেন, তাই আমি আজ এই বিবৃতিটি সব সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দিয়েছি, কাল বেরুবে...ক্ষমতালোলুপ নেতাদের প্রভাবে কংগ্রেস পার্টি ক্রমশ জনবিরোধী এক পশুশক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। সেইজন্য আমি মনে করি এই মুহূর্তে কংগ্রেস সংগঠনের বিলোপসাধন কর্তব্য– সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি হইতে গ্রাম পর্যন্ত সব সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়া ঈশ্বর-বিহিত কর্তব্য।[১১৫]

প্যাটেলদের অত্যাচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীর যুদ্ধ ঘোষণার চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার কাজ শুরু করতে অবিলম্বে বোম্বাই যাচ্ছেন প্যাটেল। জহরলাল নেহেরু দোদুল্যমান, কোনদিকে যাবেন – তিনি তার প্রিয় বাপুজীকে কষ্ট দিতে চান না; ভারতরাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হতে না হতে কংগ্রেস পার্টি তুলে দেয়ার পক্ষেও মত দিতে

পারছেন না আবার প্যাটেলের মত বাপুজীর বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে আহতও করতে চান না। নেহেরু সর্দার প্যাটেলের কদর্য হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একমত নন; আবার গান্ধীর কংগ্রেস-পার্টি তুলে দেয়ার মত নৈরাজ্যবাদী প্রস্তাবের সঙ্গেও একমত হতে পারছেন না।

গান্ধীর পাশে প্যাটেল, নেহেরুরা কেউই নেই তাই তিনি একাই সকলের মোকাবেলা করতে চান। আভার কণ্ঠে শুনতে থাকেন রবীন্দ্রনাথের 'একলা চলো রে' গান। পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের মিছিল থেকে মদনলাল পাহোয়া গান্ধীর সামনে এসে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ,বাবার দুহাত কেটে নেয়াসহ দেশের বুকে সর্বনাশ ডেকে আনার জন্য এঁদের দায়ী করলে গান্ধী মদনকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।মদনলালকে দিল্লির পুলিশ সদরদপ্তরে নিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর জসবন্ত ও বালকৃষ্ণণ জেরা করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যে পুনা শহরের উল্লেখ পায়। আরও কিছু তথ্য পাবার আগেই ওপরওয়ালা ডি.জে. সাঞ্জেভি এসে মদনলালকে ছেড়ে দেয়। ব্যস্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেল বোম্বাই ছুটে যান পুলিশ কমিশনার নাগরওয়ালাকে নিরস্ত করতে। নাগরওয়ালা নাথুরাম গডসে, নারায়ণ আপ্টে ও বীর সাভারকার-এর পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহের মতো কাজ করে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন বলেগোয়েন্দাদের প্যাটেল ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে নাগরওয়ালার প্রশ্ন রয়ে যায়– গান্ধীজীকে সরাসরি হত্যার কথা বলা রাজনৈতিক অধিকার? মুসলিমদের গণহত্যার কথা বলা নাগরিক অধিকার?অস্ত্র সংগ্রহ করা ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার ... ইত্যাদি।প্যাটেল নাগরওয়ালার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে 'ইট ইজ অ্যান অর্ডার বলে' নাগরওয়ালার ফাইল দেখে, অতীত ইতিহাস ঘেঁটে, তাকে ব্ল্যাকমেইল করে গান্ধী-হত্যা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িতদের পথ পরিষ্কার করেন। ডা: জগদীশ চন্দ্র মদনলালের কাছ থেকে গান্ধী-হত্যা ষড়যন্ত্রের কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লে তাকেও কৌশলে নিরস্ত করেন।এইভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গান্ধী-হত্যাকারীদের সাথে যোগসাজশ করে এদের রক্ষা করেছেন,পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।
দিল্লির মারিনা হোটেলে মদনলাল, নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্টে গান্ধীর প্রার্থনা-সভায় তাকে শেষ করে দেয়ার আদেশ- মোতাবেক প্রস্তুতি নেয়। তারা বিড়লা ভবনে গান্ধী খুনের রিহার্সালও করতে যায়। পুলিশের সাথে এদের মিতালি,পুলিশের তাঁবুর সামনে খুনিদের 'অ্যাপয়েনমেন্ট', রিহার্সাল দিয়ে খুন, সবই ইতিহাসে প্রথম বলে মনে করে মদনলাল পাহোয়া।

গান্ধীর প্রার্থনাসভায় কোন নিরাপত্তা না থাকায় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু খুবই উদ্বিগ্ন।পুলিশ প্রধানমন্ত্রীর হুকুম তামিল না করে উল্টো তাকে ঐতিহ্য-মাফিক কাজ করা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে নির্দেশ জানানোর কথা বলে। এরকম পরিস্থিতিতে বাপুজীকে প্রার্থনা সভায় যেতে বারণ করেন নেহেরু। কিন্তু গান্ধী কোনো নিষেধ না মেনে প্রার্থনা সভায় আসেন। ভাষণ শুরু করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বোমা বিস্ফোরিত হয়। পরিকল্পনামাফিক কথা ছিল মদন গান-কটন ফাটালেই গোডসে ভ্রাতৃদ্বয় পিস্তল ও গ্রেনেড দিয়ে গান্ধীকে খুন করবে। মদন পূর্বপরিকল্পনা-মত গান-কটন ফাটালেও বাকিরা তাদের নির্ধারিত কাজ করেনি; ফলে এবারের মত গান্ধী বেঁচে গেলেন। জশবন্ত, বালকৃষ্ণণ ধরে আনে সেই মদনলাল পাহোয়াকে। পুলিশের সদরদপ্তরে নিয়ে জেরা করে কৌশলে মদনলালের কাছ থেকে জেনেছেন, দিল্লির কোন শক্তিশালী লোক বোম্বাই এসেছে, সাভারকার এবং গোডসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। সাভারকার গিয়েছিল ছদ্মবেশে– শিখের পোশাকে। সুতরাং গান্ধী হত্যার কাজটা

অতি সহজ। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটা চাইছেন। জেরার জবাবে মদনলাল আরও জানায়, গান্ধী না মরা পর্যন্ত একটার পর একটা চেষ্টা হতেই থাকবে। গান্ধী করাচী রওনা হওয়ার আগে তাকে শেষ করতেই হবে এমন একটা কড়া হুকুম পেয়েছে ওরা। গান্ধী করাচী রওনা হতে চান ১ ফেব্রুয়ারি। হাতে সময় আছে ছ'দিন। এই ছ'দিনের মধ্যে পুরো দলটাকে ধরতে না পারলে গান্ধীকে বাঁচানো যাবে না। মদনলাল পুনায় ২২ নম্বর লরেনস্ রেঞ্জ-এ বিষ্ণু কারকার-এর বাড়িতে নাথুরাম, গোপাল, আপ্টে,বাগড়ে সবাইকে পাওয়া যাবে বলে জানায়।

এই ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র পুনা এবং বোম্বাই জেনে যশবন্ত ও বালকৃষ্ণণ বোম্বাই রওনা হবার জন্য সাঙ্গেভির অনুমতি চায়, সাঙ্গেভি বাধা দিলে তারা পদত্যাগ করে পত্রিকায় বিবৃতি দেবে বলে জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে এদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কোন হুমকিতেও এদের টলাতে না পেরে বোম্বে যাওয়ার অনুমতি দেন। আর সাঙ্গেভিকে নির্দেশ দেন নাগরওয়ালাকে ফোন করে সব ব্যবস্থা করতে। নির্দেশ-মোতাবেক সাঙ্গেভি নির্দেশ দেন নাগরওয়ালাকে। জসবন্ত,বালকৃষ্ণণ বোম্বে পৌঁছালে নাগরওয়ালা তার ওপরওয়ালার নির্দেশে মিথ্যা অভিযোগের অজুহাতে এঁদের গ্রেপ্তার করে পাঁচ দিনের ডিটেইন্ড-এ হাজতে পুরে।

এদিকে ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৮ দিল্লির রাজভবনে উৎসব হচ্ছে – নেহেরুর কাছে উৎসবটা বড় বেমানান। গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তার নিরাপত্তার বিষয়ে নেহেরু খুবই উদ্বিগ্ন। তা ছাড়া বালকৃষ্ণণ ও জসবন্ত বোম্বাই থেকে এখনও না ফেরায় প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে চিন্তিত। তার উদ্বেগ ও চিন্তার কথা লেডি ব্যাটেনকে জানিয়েছেন। প্যাটেল ঐ দুই দেশপ্রেমিক অফিসারকে স্মাগলার সাজান। প্যাটেল নেহেরু সেই পুরনো তর্কে লিপ্ত। নেহেরু গান্ধীর নিরাপত্তার জন্য ফৌজ, সেনাবাহিনী ডাকতে মাউন্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেন। প্যাটেল জানায় শুধু গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্র হয়নি, নেহেরু হত্যারও গভীর এবং ব্যাপক ষড়যন্ত্র হয়েছে। এই অজুহাতে মাউন্টব্যাটেন প্রধানমন্ত্রীকে জনসভায় যেতে নিষেধ করেন।অবশেষে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারিদিল্লির বিড়লা-ভবনে প্রার্থনাসভায় নাথুরাম গডসে গুলি করে গান্ধীকে হত্যা করে।

নন্দীগ্রামে ঝোপঝাড়ে ঢাকা প্রান্তরে ফেরার প্রিয়তোষের সঙ্গে দেখা করতে যায় যোগমায়া, অনাথ, নারদ, হানিফ ও বলরাম। বৃন্দা পথ দেখিয়ে প্রায় চলৎ-শক্তিরহিত প্রিয়তোষকে নিয়ে আসে। কথোপকথনের মাঝেই সেই কুখ্যাত অঘোর রায় পুলিশ নিয়ে হাজির। পুলিশ প্রিয়তোষ, বৃন্দা এমনকি যোগমায়াকেও 'অ্যাসল্ট' করে– যা ব্রিটিশ পুলিশও করতে সাহস পায়নি। পুলিশ বৃন্দা ও প্রিয়তোষকে টেনে নিয়ে যায়–আর অঘোর রায় অনাথবাবুকে শাসিয়ে যায় পরেরবার চুলের মুঠি ধরে জেলে নিয়ে যাবে। অনাথবাবুও অপেক্ষায় থাকবেন বলে জানান। এসব দেখেশুনে যোগমায়া বলেন :

> এমন স্বাধীনতা আনলে তোমরা, যে প্রত্যেক ন্যায়বান মানুষের একমাত্র স্থান কারাগারে। এ রাষ্ট্রের জন্ম পাপে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর রক্ত ঝরিয়ে, গান্ধীজীর পবিত্র রক্ত ঝরিয়ে বেঈমানরা দিল্লির গদি দখল করে বসেছে। মাউন্টব্যাটেনের হুকুমে দেশকে দু'টুকরো করেছে যে শয়তানরা তাদের শাসন মানব না কিছুতেই, এই শপথ নিয়ে শুরু হোক সংগ্রাম, ভারতের শহরে ও গ্রামে।[১১৬]

যোগমায়ার এই দৃপ্ত শপথ বাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের কিছু আগের-পরের ঘটনা-প্রবাহ *একলা চলো রে* নাটকের পরিপ্রেক্ষিত। মাউন্টব্যাটেনের আপোষরফা, নেহেরু-প্যাটেল-জিন্নার চক্রান্ত, গান্ধী ও কংগ্রেস-এর দ্বন্দ্ব,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নাটকে নিয়ে এসেছেন নাট্যকার ইতিহাসের পরম্পরা রক্ষা করে। সাম্প্রদায়িকতা,দেশবিভাগ বিরোধী লড়াইয়ে কাউকে সঙ্গে না পেয়েএকাই অনশন এবং পদযাত্রার সিদ্ধান্ত নেন গান্ধী কিন্তু পেরে ওঠেননি, উল্টো ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তাঁকেই প্রাণ হারাতে হয়। দেশবিভাগের মৌনসম্মতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে যে ভুল করেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে সে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করে গেছেন। গান্ধীর জীবনের পড়ন্তবেলা উৎপল দত্ত অত্যন্ত 'পজিটিভভাবে' চিত্রায়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন এ নাটকে – তাঁর মতে; 'গান্ধীর মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনও মানুষ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তো আসেননি এখনও। নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'[১১৭]এইসব ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের সার্থক নাট্যিক রূপায়ন *একলা চলো রে।*

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র লিভোনিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের বিপর্যয় তথা পতনের ইতিবৃত্ত *লালদুর্গ*। নাটকটি উৎপল দত্ত লিখেছিলেন ১৯৯০ সালে, প্রথম মঞ্চস্থও হয়েছে ১৯৯০ সালের ২৫শে নভেম্বর রবীন্দ্রসদন মঞ্চে;প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয়া 'আজকাল'-এ, পরে নাটক সমগ্র সপ্তম খণ্ডে। নাটকের পরিচিতিতে ফিদেল কাস্ত্রোর উক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিউজ্উহক,১২ই নভেম্বর,১৯৯০সালে এরিখ হোনেকার উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলা হয়েছে:"গরবাচভ আমার সঙ্গে বেঈমানি করেছেন। সাম্যবাদ আবার ওঠে দাঁড়াবে... সাম্যবাদী আন্দোলনের একটা পরাজয় ঘটেছে কিন্তু পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবেই।"[১১৮]

নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার ফিদেল কাস্ত্রোর একটি সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। নয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত লালদুর্গ। নাটকের বিষয় সম্পর্কে সূত্রধারের মাধ্যমে শুরুতেই দর্শক পাঠককে অবগত করেছেন নাট্যকার:

> পেরেস্ত্রৈকা!গ্লাসনস্ত! মস্কো থেকে আওয়াজ উঠছে আর প্রতিধ্বনি জাগছে ওয়াশিংটন লন্ডন প্যারিস বন থেকে। পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্র চাই– এখুনি,এই মুহূর্তে। এবং গণতন্ত্র মানে কী তাও পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে– গণতন্ত্র মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমনটি আছে।...গণতন্ত্র মানে রেগন যুদ্ধখাতে যা ব্যয় করবেন,বুশ এসে তার চেয়েও বেশি ব্যয় করবেন। পূর্ব ইউরোপে এই ধরনের গণতন্ত্র কেন নেই,হঠাৎ এই বিলাপ শুরু হল সারা বিশ্বে। এই যে দেশ দেখছেন –আমার স্বদেশ– পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত লিভোনিয়া– পিপলস্ রিপাব্লিক অফ লিভোনিয়া ...১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে মার্শাল জুকভের লাল ফৌজ এ-দেশ থেকে নাৎসিদের বিতাড়িত করলে এখানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এদশেও বড় বড় জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঐ গণতন্ত্রের দাবীতে। কী করে লিভোনিয়াতে অবশেষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, ওয়াশিংটন লন্ডন মস্কোর মুখে গ্লাসনস্তের হাসি ফুটল তা-ই আজকের নাটকের বিষয়।[১১৯]

গ্রোমেকের মন্ত্রী সভার সদস্য কিরিল সলতিচ মার্টেনবুর্গের সমাবেশে লিভোনিয়ার উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ লেগেছে এমন মিথ্যা ভাষণ দেয় – যা সমাজতন্ত্রের গোর শত্রুরাও বলে না। সলতিচের ভাষণ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লিসর, শ্রমমন্ত্রী রোজা মাসলোভা,পুলিশ প্রধান রাভিনোভিচ, অর্থমন্ত্রী মারিনা প্রমুখ রাষ্ট্রপতি গ্রোমেকের সাথে কথোপকথনের মাঝেই খবর আসে জাতীয় আইনসভার সিঁড়ির ওপরে সলতিচ খুন হয়েছে। সলতিচের খুনকে কেন্দ্র করে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করে। সলতিচের দেহরক্ষী মারেক পুলিশের কাছে বিবৃতি দিয়েছে; সে স্বচক্ষে বেঙ্কোকে দেখেছে সলতিচকে গুলি করতে। ইভান বেঙ্কোর মতো পরীক্ষিত কমরেডকেও মারেকের মিথ্যা অভিযোগের অজুহাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রোমেক-বেঙ্কো-বিরোধীরা, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিরোধীরা, ভাড়াটে খুনি দিয়ে সলতিচকে খুন করিয়ে তার দায় চাপায় গ্রোমেক সরকারের উপর। গ্রোমেক-বিরোধীরা গণরোষও সংগঠিত করেছে সাম্যবাদ-বিরোধী ভাড়াটে লোক দিয়ে। গ্রোমেক-বিরোধী এই ষড়যন্ত্রে গ্রোমেকের মন্ত্রী, পুলিশ-প্রধান,সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত, মার্কিন মেজর উইলকিনসরা জড়িত, এমনকি ডাক্তার বুখারেভকেও এরা 'ম্যানেজ' করে ফেলে। উইলকিনস্ গণরোষ সংগঠিত করতে ও গ্রোমেক সরকারকে অস্থিতিশীল এবং উৎখাত করতেই সলতিচকে খুন করে খুনের দায় চাপায় গ্রোমেক সরকার ও বেঙ্কোর উপর। শ্রমমন্ত্রী রোজা মাসলোভা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লিসর সলতিচের খুনের তদন্ত করতে গিয়ে আসল খুনিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আসল খুনিকে সাহায্য করে গ্রোমেকের যোজনামন্ত্রী মাজিকিন ও পুলিশপ্রধান রাভিনোভিচ। তারা খুনি উইলকিনসকে কুলেবুর্গ শহর থেকে সরিয়ে আনে। উইলকিনস নাম পাল্টিয়ে হয় আর্থার। উইলকিনস জানায় তাদের লিভোনিয়াসহ সর্বত্র ঢুকে পড়ার কথা।মাজিকিন ও রাভিনোভিচের সাথে কথোপকথনে উইলকিনসের কাছ থেকে আরও বিস্ময়কর চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় :

> ইতিহাস আমাদের দিকে। মার্কসবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পুঁজিবাদের জয়জয়কার আজ সারা বিশ্বে। আমাদের যেখানে যা প্রয়োজন তাই করব আমরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথিবীটা চলবে। সোভিয়েতের বিপুল লজ্জাকর পরাজয় হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মার্কস আর লেনিনের ছিন্ন, বিবর্ণ পতাকা এখনো উড়ছে বটে ক্রেমলিনের চূড়ায়, তবে এমনই নির্লজ্জ রুশ কমিউনিস্টরা যে ওদের পতাকার ছেঁড়া অংশগুলি সারা পৃথিবীকে দেখাচ্ছে আর বলছে; এই দেখ লেনিনের পেছনে ছুটে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। আত্মসমর্পণ করছে আমাদের সামনে, কারণ আমাদের শক্তি অপরিমেয়। তাই আমরা যদি ইচ্ছা করি গ্রোমেককে শেষ করে দিয়ে রাজা তৃতীয় পাউলকে লিভোনিয়ায় বসাবো,যদি ইচ্ছা করি লিথোনিয়াকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আলাদা করে দেব, যদি ইচ্ছা করি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ঐক্য কালই শেষ করে দেব – তবে ঠিক তাই হবে।[১২০]

সলতিচ সিআইএ-র সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। সিআইএ-র প্রয়োজনে তারাই আবার তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। দেশে দেশে সরকার-বিরোধী তথা সমাজতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। মাজিকিনরা পার্টির মধ্যে বহু পার্টি থাকার পক্ষে। সেটা ছিল পার্টির মধ্যেকার মতবিরোধ। সিআইএ সে সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। তদন্তে বেঙ্কো নির্দোষ প্রমাণিত হলেও প্রতিবিপ্লবের দোহাই দিয়ে মার্কিনরা তাকে মুক্ত করতে নারাজ। রাষ্ট্রপতি বেঙ্কোকে মুক্তির আদেশ দিলেও বেঙ্কোকে মুক্ত করা হয়নি। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হল, সোভিয়েত

দূতাবাসের সামরিক এট্যাসে সাফ্রোনভ মার্কিন দূতাবাসের অনুরোধপত্র গ্রোমেকের কাছে পৌঁছে দেয় – যে-পত্রে মার্কিন নাগরিক মেজর উইলকিনস-এর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টির কথা বলা হয়েছে। সলতিচের খুনের সংগঠক এবং এ-অভিযোগে তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলে সাফ্রোনভ খুনির পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কাল্পনিক বলে অভিহিত করে। এমনকি উইলকিনসকে মুক্ত করতে না পেরে মার্কিন হুমকির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। উইলকিনসকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র চ্যালেঞ্জ করলে লিভোনিয়ায় অবস্থিত সোভিয়েত ফৌজ সাহায্য করবে না বলেও জানায় সাফ্রোনভ। জনতার হাতে স্টিক, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল বিলি করেছে গ্রোমেক বিরোধীরা। সোভিয়েত ইউনিয়ন চায় না পৃথিবীতে কোন শ্রমিক-রাষ্ট্র থাকুক। সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীটা ভাগাভাগি করে নিলে পৃথিবীতে পুরোপুরি স্বাধীন কোন দেশ থাকবে না। হয় মার্কিন প্রভাবে, নয় সোভিয়েত প্রভাবে থাকতে হবে। তবুও রাষ্ট্রপতি গ্রোমেক মনে করেন–দুই বৃহৎ শক্তি পৃথিবী ভাগাভাগি করলেই সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গেল এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। দরিদ্র দেশগুলি আছে পৃথিবীতে – এশিয়ায়, আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায়; তারা সবাই স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে সুখে জাবর কাটবে এমন চিন্তা করাও অপরাধ। নতুন দ্বন্দ্ব শুরু হবে এবং দুই বৃহৎ শক্তি একদিন স্তম্ভিত হয়ে দেখবে, ওদের নিজের নিজের দেশেই শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করছে বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বার্থে।

মিথ্যা রিপোর্ট প্রদানকারী ডাক্তার বুখারেভেরও অবশেষে বোধোদয় হয়– সিআইএ-র টাকা খেয়েও আসল সত্য প্রকাশ করে দেয়;যদিও তখন ডাক্তারের রিপোর্ট প্রকাশ করার কোনো উপায় ছিল না। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ডাক্তারের বিবৃতি থেকে স্পষ্টতই প্রমাণ হয়,বেঙ্কো খুনের সাথে মোটেই জড়িত নয়। ডাক্তারও বিপ্লবীদের সাথে রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করতে চায়– কারণ শ্রমিক রাষ্ট্র বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কী করবে সার্জন?

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে লিভোনিয়ার সেনাবাহিনী অস্ত্র না পেয়ে খালি হাতেই ব্যারিকেড রক্ষার কাজে লেগে যায়। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে রাষ্ট্রপতি অস্ত্র দেয়ার জন্য প্রথমে নির্দেশ দেন জেনারেল জোলতানেককে পরে মার্শাল পেতকফকে। কেউই রাষ্ট্রপতির নির্দেশ পালন করেননি, উল্টো রাষ্ট্রপতিকে ফৌজের আইন অনুযায়ী সামরিক বিক্ষোভে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে হলে, আটচল্লিশ ঘণ্টার নোটিশ দেয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন (যদিও রাষ্ট্রপতি তিনদিন আগে নোটিশ দিয়েছেন)। এমনি পরিস্থিতিতে শ্রমমন্ত্রী রোজা মাসলোভা গ্রোমেক ও মারিনাকে পেছনের দরজা দিয়ে উত্তরে ক্রাসনোইয়া এলাকায় কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে চলে যেতে বলেন কারণ গ্রোমেক বেঁচে থাকলে লিভোনিয়ার কমিউস্টিরা সঙ্ঘবদ্ধ হবে লড়াই করার প্রেরণা পাবে। সোভিয়েত দূতাবাসের সাফ্রোনভও রাষ্ট্রপতি ও অর্থমন্ত্রীকে সোভিয়েত দূতাবাসে নিতে এলে উভয় প্রস্তাবই গ্রোমেক-মারিনা দম্পতি প্রত্যাখ্যান করে বলেন :

> মস্কো থেকে বার্লিন পর্যন্ত চলছে সংশোধনবাদের ঢেউ, সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসর্মপণের প্রতিযোগিতা।...আমি প্রমাণ করবো, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ছিলাম স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক লিভোনিয়ার রাষ্ট্রপতি। শ্রমিকদের লিভোনিয়া যদি আজ ধ্বংস হয় তবে শ্রমিকদের রাষ্ট্রপতি আর বেঁচে থাকতে পারে না।[১২১]

গ্রোমেক তার নিরাপত্তার কথা না ভেবে সোভিয়েত সেনাবহিনীকে লিভোনিয়ার নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়ার কথা বলেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি ওয়ারশ চুক্তির ৫ম ধারার কথা মনে করিয়ে দেন সাফ্রোনভকে – যে-ধারায় লেখা অছে–সমাজতান্ত্রিক দেশকে সমাজতান্ত্রিক সেনা সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।

সাফ্রোনভ-এর প্রতিক্রিয়ায় জানা যায়, এর ফলে বিরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া হবে লিভোনিয়ার এইরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও এটাকে সাফ্রোনভ লিভোনিয়ার অভ্যন্তরীণ গোলযোগ হিসেবে অভিহিত করছেন এবং এই গোলযোগে বিদেশি হস্তক্ষেপ ঠেকাবার কোনো উপায় থাকবে না, যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন হস্তক্ষেপ করে। গ্রোমেক মার্কিন হস্তক্ষেপের কথা, ওয়ারশ চুক্তির ৫ম ধারার উল্লেখ করলে সাফ্রানভ ঐ-চুক্তি মরে গেছে ওটাকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে বলেন।

জেলের তালা ভেঙে সব বিপজ্জনক কয়েদিদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কভনোগ্রাদ শহরকে ওরা ছারখার করে দিয়েছে। মাতাল গুণ্ডা, যাদের একহাতে অস্ত্র অন্যহাতে বোতল, তাদের সঙ্গে নিয়ে হোয়াইট গার্ড,উইলকিনস,রাভিনোভিচ, মাজিকিন,স্তেপান মারেক আসে গ্রোমেকের কক্ষে। গ্রোমেক-মারিনার অস্ত্র কেড়ে নেয়। উইলকিনস গ্রোমেককে বলে– 'ইতিহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন আপনি। তাই আপনার পরাজয় ছিল অনিবার্য। বাক্-স্বাধীনতা চাইছে মানুষ, যেমনটা আছে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে। কি করে রুখবেন?'[১২২]

এর উত্তরে গ্রোমেক যা বলেন– তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তসারশূন্যতাকেই উন্মোচন করে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে মানুষকে বাক স্বাধীনতা দেওয়া হয় সমাজে পরিবর্তন ঘটানোর জন্য নয়, পরিবর্তন যেন না ঘটে সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য।রাভিনোভিচ জানায়, গ্রোমেক মারিনার বিচার হবে সামরিক আদালতে গোপনে। এদের বিচারে বিচারপতি থাকবেন মার্শাল পেতকফ, জেনারেল জোলতানেক এবং জেনারেল মারিউস। যারা বিদ্রোহের পরোক্ষ নেতা, যে-মার্শাল আর জেনারেলরা অস্ত্রগার বন্ধ রেখে লিভোনিয়ার সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে তারাই বিচার করতে বসেছে। মারেক-গ্রোমেকদের জমানা শেষ এবং তারাই পার্টির নবযুগ বলে জানিয়ে গ্রোমেককে 'লাল দুর্গের ওপর ঘুরে বেড়ানো এক বৃদ্ধ ডন কুইকসোট বলে অভিহিত করে। গ্রোমেক এই পরিপ্রেক্ষিতে যে-উত্তর দেন–তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ:

> কারণ ব্যতীত কার্য নেই, বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নেই, সব ঘটনা অন্য ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। হ্যাঁ, দায়িত্ব অখণ্ড, মস্কো থেকে কভনোগ্রাদ, দায়িত্ব সর্বত্র। সে-দায়িত্ব নেয়ার মতন বুকের পাটা কমিউনিস্টদের আছে। আমি নিচ্ছি দায়িত্ব। শ্রমিকশ্রেণী একটা স্বপ্ন দেখেছিল, বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন। সে-স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে ভুল হয়েছে অনেক, কিন্তু সে ভুলের মধ্যে কোনো কুটিলতা ছিল না, ছিল না অসাধুতা। সবার জন্য রুটি, সবার জন্য বাসস্থান,এই কঠিন কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণি স্বাভাবিক সারল্যে বুঝতে পারেনি সাম্রাজ্যবাদীরা ছেড়ে কথা কইবে না।[১২৩]

সামরিক আদালতে গোপনবিচারে অমানুষিক নির্যাতন ভোগের পরও ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গ্রোমেক বলেন :

> কোন ভুল করিনি। দরিদ্র মানুষের জন্য এদেশে গড়েছিলাম খানিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। সেটা পৃথিবীর ধনীদের সহ্য হয়নি। তাই ওরা ভাবছে লালদুর্গ বুঝি চূর্ণ হয়ে গেল। ওরা যেন মনে রাখে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অভিযানের পথে এটা একটা কমা মাত্র, দাঁড়ি নয়,পূর্ণচ্ছেদ নয়।[১২৪]

লালদুর্গ নাটক সম্পর্কে শোভা সেন লিখেছেন 'দুনিয়াব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতার দিনে এই নাটকের প্রয়োজন ছিল। বহু দর্শক এসে অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের বলেছেন, অনেক কিছুই আমাদের কাছেও ধোঁয়াটে ও জটিল বলে মনে হতো। এই নাটক দেখে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।'[১২৫]

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনে উৎপল দত্ত অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় বা পরাজয়কে উৎপল দেখেছেন সাময়িক বিপর্যয় বা পরাজয় হিসেবে। উৎপল বিশ্বাস করেন সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ আবার ওঠে দাঁড়াবে; সাম্যবাদী আন্দোলন তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাময়িক পরাজয় ঘটলেও পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবেই।

জনতার আফিম নাটকের পটভূমি উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ তথা ধর্মীয় মৌলবাদ। পিএলটি নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করে ১৯৯১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রবীন্দ্রসদনে। নাটকটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'আজকাল' শারদীয় সংখ্যায় ১৩৯৯ সনে;পরে নাটক-সমগ্র সপ্তম খণ্ডে। ৫টি দৃশ্যে বিন্যস্ত নাটকটি। মথুরায় আচার্য সোমদেবের আখড়ায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের উপযুক্ত সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অস্ত্রশিক্ষা দেয়া হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকদের। পালোয়ান ধ্বজাধারী সিং হিন্দু সেনাদের হাজিরা নিতে গিয়ে দেখে শ্রমিক-কৃষকদের কেউ কেউ ক্ষেতে লাঙল দিতে গেছে। এখানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত আছে সাধ্বী কলাবতী–সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াতে যার জুড়ি নেই।

সোমদেব আচার্য স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন – কৃষ্ণ-জন্মভূমি খুঁজে বার করতে। দুজন মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ-জন্মভূমির সন্ধানে চলে এসেছে মথুরায়; এদের একজন হল – বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বদ্রিদত্ত শর্মা, অপরজন ড. মানবেন্দ্র মল্লিক – দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক। দুই মহাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমির সন্ধানে অনেকদূর এগিয়েছে। এই অনুসন্ধানের ফলাফল দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ভারত সরকারের দূরদর্শন বিভাগ মথুরায় এসেছে। আচার্য সোমদেব পণ্ডিতদ্বয়কে কাজে লাগায়।

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান খুঁজতে গিয়ে এরা প্রথমে যান দ্বারকাধীশের মন্দির। তারপর একে একে হনুমানটিলা, ডাম্পিয়ার পার্ক, কানাইলাল কোঠি প্রভৃতি জায়গায় খুঁজতে গেলে প্রত্যেক জায়গার হিন্দুরা প্রবল আপত্তি করে এদের বিতাড়িত করে। এবারে বদ্রিদত্তের মনে পড়ল আসল জায়গায়ই খোঁজা হয়নি। আসল জায়গা হচ্ছে – মথুরার জামা মসজিদ। জামা মসজিদের তলায় কৃষ্ণমন্দির রয়েছে এই অনুমানের ভিত্তিতে মসজিদের চারপাশ ও ভেতরে অনুসন্ধান করে যে-মন্দিরের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয় সেটা বিষ্ণুমন্দির। কোনো একসময় মন্দিরটি ভাঙা হয়েছে। মুসলমান ছাড়া কে এই মন্দির ভাঙতে পারে? মুসলমানই এই মন্দির ভেঙেছে

বলে মনে করে মি. বদ্রি কিন্তু মানবেন্দ্র মনে করে সমুদ্রগুপ্তও ভাঙতে পারে। এরপর মি. বদ্রি বলে–তুর্কী সেনাপতি মুহম্মদী বখতিয়ার দ্বাদশ শতাব্দীতে মথুরা আক্রমণ করে এই কৃষ্ণমন্দির ধ্বংস করে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মি. বদ্রির সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক মানবেন্দ্র একমত হতে পারে না। কোনো প্রমাণ ছাড়া ঢালাওভাবে মন্দিরভাঙার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয় মি. মানবেন্দ্রের কাছে। তিনি মনে করেন –ঐতিহাসিক প্রমাণ ছাড়া এসব বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু মি.বদ্রি মনে করে–প্রমাণের দরকার নেই। হিন্দুর মন বলছে – ভাঙামন্দির মানেই মুসলমানরা ভেঙেছে। আর কেউ ভাঙতে পারে না। এটা ভক্তি-বিশ্বাসের ব্যাপার।

ভাং সেবনকারী সাম্প্রদায়িক সোমদেব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মীয় আবেগে অন্ধ ও উন্মত্ত বদ্রিদত্ত, উগ্র সাম্প্রদায়িক কলাবতী, ধ্বজাধারী সিং এরা সকলেই এক। এদের কাছে যুক্তি প্রমাণের চেয়ে সংস্কার ও আবেগই বড়। সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন এই শ্রেণিকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক দল। তাইতো সোমদেব ভাবছেন –নির্বাচন এসে গেছে, তাদের প্রার্থী ভাজপাকে ভোট পেতে হলে মথুরায় হিন্দুত্বের একটা ঝড় তুলতে হবে। সোমদেবদের প্রার্থী ভাজপা জিততে না পারলে সোমদেবের আশ্রমের চিহ্নমাত্র থাকবে না। অন্যকোন পার্টি যদি মথুরায় জিতে তাহলে এই আশ্রমকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে ।

আসলে অনুসন্ধান কিছু নয়; একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসল কথা এদের ব্যবহার করে সোমদেব। আবার সোমদেবদের ব্যবহার করে অন্যরা। দু'কোটি সত্তর লক্ষ টাকা খরচ করেও বদ্রি,মানবেন্দ্ররা কোন ঐতিহাসিক ফলাফলে পৌঁছাতে পারছে না; কারণ, ইতিহাসের ফলাফল সময়সাপেক্ষ, প্রমাণসাপেক্ষ। এইজন্যেই সোমদেব বলে, :'মানছি এসবে সময় লাগে, কিন্তু নির্বাচন চুকে যাওয়ার পর ফল বেরুলে তো কোন লাভ হচ্ছে না। যাঁরা এই ইতিহাস গবেষণায় টাকা ঢেলেছেন তাঁরা জানতে চাইছেন এতদিন কি তাঁরা ভস্মে ঘি ঢেলেছেন?'[১২৬]মানবেন্দ্র প্রমাণ ছাড়া সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না, কিন্তু বদ্রি প্রমাণ ছাড়াই সোমদেবকে প্রচার শুরু করে দিতে বলে আবার খুঁড়তে শুরু করার ঘোষণা দেয়। অমনি সামদেবও বক্তৃতামঞ্চে ঘোষণা করে :

> ঐ মসজিদ গড়া হয়েছে মথুরার প্রাচীন কৃষ্ণমন্দির ভেঙে। এটাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। যেখানে যত হিন্দু আছিস, অস্ত্র হাতে ছুটে আয়। ঐ জামা মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। কৃষ্ণের জন্মস্থান মুক্ত করতে হবে। নইলে তোরা হিন্দু নস।[১২৭]

মুসলিম নৌশের আলীও বক্তৃতামঞ্চে এদের সাথে আছে। অন্তপাড়া বস্তির বাসিন্দারা তার জমিতে বাস করে তাকে ভাড়া দেয় না;তাই সে অন্তপাড়া বস্তি জ্বালিয়ে ছাই করার আহবান জানায়। কলাবতী তার উস্কানিমূলক বক্তৃতায় বলে :

> শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি উদ্ধারের পবিত্র যুদ্ধ শুরু হল। সে যুদ্ধের ভাষা রক্ত আর আগুন। জামা মসজিদ ভাঙতে হবে, অন্তপাড়া জ্বালাতে হবে।[১২৮]

ধ্বজাধারী সিং-এর নেতৃত্বে বলভদ্দর, খটমল, পর্দুমান, হোতিলালরা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রসহ অন্তপাড়ায় আগুন দেয়। এদের ধর্মের দোহাই দিয়ে উন্মত্ত করে দেয়া হয়েছে। কলাবতী শুধু আগুন দিয়েই ক্ষান্ত নয়; আগুনের ভয়ে বেরিয়ে এলে সবকটাকে শেষ করার নির্দেশ দেয়। কলাবতী নিজে তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে চারদিক প্রকম্পিত করে তুলেছে।

বলভদ্দর গুলি চালাতে চালাতে হিংস্র হয়ে ওঠেছে। তার রক্ত পিপাসা জেগেছে। কাউকে না কাউকে সে চায়। বলভদ্দরকে উন্মত্ত করে দেয়া হয়েছে,হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছে (হিন্দু নয়)ম্লেচ্ছ হত্যা করতে, তার এখন খুনের নেশা চেপেছে।বলভদ্দর শেষপর্যন্ত সোমদেব ও কলাবতীর ওপর চড়াও হলে খবরের কাগজের রিপোর্টাররূপী পুলিশ ইন্সপেক্টার হরদরিলাল বলভদ্দরকে গ্রেপ্তার করে। কলাবতীকে কুকুরের দেয়া কামড় বলভদ্দরের নামে লিখে নিয়ে পুলিশের অন্য অফিসার জিজ্ঞেস করলে এইরকমই বলতে শিখিয়ে দেন হরদরিলাল,একইসাথে ধর্মভাবে আচ্ছন্ন হয়ে সত্যি কথাটা বলে না ফেলার অনুরোধ করে। এর উত্তরে কলাবতী যা বলে তা খুবই গুরুত্ববহ–

> ধর্ম আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলাই ধার্মিকের লক্ষণ।[১২৯]

অন্তপাড়া আক্রান্ত হওয়ার পর মুসলিম যুবতী রোকসানা পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় আশ্রমে। চিরঞ্জীবলাল টেবিলের তলায় লুকিয়ে রেখে তার প্রাণ বাঁচায়। রোকসানার পিতা মৌলভী মওদুদ তার কন্যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে মর্মে পুলিশের কাছে অভিযোগ করলে পুলিশ অফিসার মিউনিসিপ্যলিটির কর্মচারী সেজে বলভদ্দরকে সঙ্গে নিয়ে সোমদেবের আশ্রম থেকে রোকসানাকে উদ্ধার করে। পুলিশ অফিসার দু'লাখ টাকায় রফা করে অন্যদের থানায় নিয়ে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়,শুধু থানায় নিয়ে যায় বলভদ্দর লোহারকে।

এদিকে দুই পণ্ডিত খননকার্য সেরে বেরিয়ে এসেছে। টিভি ক্যামেরার সামনে মানবেন্দ্র ঘোষণা করে, এবারে তারা আবিষ্কার করেছে একটি বৌদ্ধ বিহার, এই বিহার ধ্বংস করে কুমারগুপ্ত। তার এই সিদ্ধান্ত ও প্রমাণের সাথেএকমত নয় বদ্রি । সে সব প্রমাণ স্পষ্ট দেখেও মানে না কারণ, 'হিন্দুর বিশ্বাস সব ইতিহাসের উর্ধ্বে', তার হৃদয় বলছে, 'ভাঙা মন্দির মানেই মুসলমান ভেঙেছে। মুণ্ডুহীন মূর্তি মানেই মুসলমান মুণ্ডু উড়িয়েছে। আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। মানবেন্দ্রের কোনো যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ নাকরে সোমদেব ঘোষণা করে, মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান এবং এই জামা মসজিদ ভেঙে ফেলা হোক।

সোমদেব ধর্মব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠার জন্য এবার ভিন্ন প্ল্যান করেছে। সাধ্বী কলাবতী অন্তপাড়া পরিদর্শনে গেলে সেখানে তার লোক দিয়ে কলাবতীকে হত্যা করিয়ে এর দায় চাপানো হবে অন্তপাড়ার মুসলিমদের ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিস্তৃত হবে সারা আর্যবর্তে; সোমদেব বক্তৃতা মুখস্থ করে রেখেছে,তার বক্তৃতার বিষয়–শহীদ কলাবতী। কিন্তু কলাবতী নিহত না হয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিরঞ্জীব (মেশানো) পানীয় পান করে সোমদেব শুতে চলে যায়। বলভদ্দর সোমদেবের বেশ ধারণ করে। আসল

সোমদেব অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলে সোমদেববেশী বলভদ্দর লাখ পাঁচেক লোকের সমাবেশে যে-ভাষণ দেয়, সেটাই দেশের সাধারণ মানুষের অনুভব; ভারতবর্ষের মানুষের সুমহান ঐতিহ্য। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ হানাহানি চায় না; চায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ শান্তিতে নিজের নিজের ধর্মকর্ম করতে চায়। বলভদ্দরের ভাষণই নাটকের আসল সত্য; এর মধ্যেই নিহিত নাট্যকারের বক্তব্য :

> আমার পুত্রকন্যাগণ! না, আমি চাই না হিন্দুরাষ্ট্র। সবাই শুনে নিন–আমি চাই না এমন দেশ, যেখানে কোনও একটা ধর্ম সব ধর্মকে মাটিতে ফেলে দলবে। আমি চাই এমন দেশ যেখানে ধর্ম নয়, মানুষ হবে রাষ্ট্রব্যবস্থার মাপকাঠি, চাই এমন দেশ যেখানে ব্রাহ্মণ আর হরিজন, হিন্দু আর মুসলিম,শিখ,জৈন,বৌদ্ধ,ক্রিস্টান সবাই সুখে নিজের নিজের ধর্ম কর্ম করতে পারবে। আমি বলি ধর্ম যদি কাউকে বলে ঐ লোকটিকে হত্যা কর, তবে সেটা আর ধর্ম থাকে না, সেটা হয় আফিম, যা খেয়ে আমরা মাতাল হয়ে সত্যিই খুনোখুনি শুরু করে দিই। দেখুন – এরা কৃষ্ণ-জন্মভূমি খুঁজছিল জামা মসজিদের তলায়। পেয়েছে বৌদ্ধ মন্দির যেটা ভেঙেছে হিন্দু সম্রাট। তখন নতুন আফিম খুঁজে বার করেছে– সাধ্বী কলাবতীর ওপর আক্রমণ। বন্ধুগণ কোনো মুসলিম তার গায়ে হাত দেয়নি, দিয়েছে সাধু-মোহান্তরা। যাতে দাঙাটা ছড়িয়ে দেয়া যায়।
>
> ধর্ম যদি এসে বলে এখানে রাম জন্মেছিলেন, এখানে কৃষ্ণ – আর সেইজন্য মসজিদ ভাঙতে হবে, আমি বলি সেটা হচ্ছে জনতার আফিম। দেশে খাদ্য নেই, চাকরি নেই, সেই যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দেবার জন্য এইসব আফিম বিলি করে বড়লোকেরা। না, রামের জন্মভূমি বা কৃষ্ণ-জন্মভূমি মসজিদের ভেতরে হতেও কোনো বাধা নেই, রাম বা কৃষ্ণ মসজিদের আল্লাইতো। তাহলে সে মসজিদকে ভেঙে ফেলার কথা ওঠে কেন? আমাদের মন্দিরে যেমন কৃষ্ণের পাশে অলক্ষে রয়েছেন আল্লা, তেমনি মসজিদে আল্লার পাশে অলক্ষে কৃষ্ণ। এ দুয়ে প্রভেদ যারা করে, তারা ধর্মের নামে জনগণকে বিলোচ্ছে বিপজ্জনক আফিম। সে বিষের প্রয়োজন নেই এদেশে। বড়লোকেরা এদেশের মানুষের শান্তি ধ্বংস করতে ধর্মের আফিম বিলোচ্ছে। সে আফিম প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমি মথুরার সব মানুষকে ডাক দিচ্ছি।[১৩০]এখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

ভারতবর্ষের বিপন্ন স্বাধীনতা ও তা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা *মীর কাসিম* নাটকের পটভূমি। ভারতের স্বাধীনতা যখন বিপন্ন তখন একজন মীরকাসিম অস্ত্র ধরেছিলেন ইংরেজ শাসক ও দেশি রাজা-মহারাজা, বেনিয়া, জমিদারদের বিরুদ্ধে। বিদেশি শাসক ও দেশি শোষকদের অন্যায়-অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মীর কাসিমের তরবারি ঝলসে ওঠেছিল। এ-লড়াইয়ে মীর কাসিম জিততেন, যদি না তাঁর আশেপাশের মীরজাফররা বিশ্বাসঘাতকতা করতো। ব্যক্তিগত জীবনে যদিও মীরকাসিম-মীরজাফরের সম্পর্ক নিকটআত্মীয়ের শ্বশুর-জামাতার; তথাপি আদর্শের প্রশ্নে দুজন ছিলেন দুমেরুর।

মীর কাসিমের বর্ণাঢ্য জীবন এবং তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ এই নাটকের উপজীব্য। অসংখ্য বিজয়ের পর, অবশেষে একদিন ফিরিঙ্গি ফৌজের হাতে অপদস্ত হয়ে, ছিন্নবেশে, কপর্দকশূন্য অবস্থায় নজফের গ্রাম রহোতসাগর-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন মীর কাসিম। ঐ-রকম নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায়ও কাসিমআলী বিশ্বাস করেন তিনি আবার ফিরে আসবেন। একদিন না একদিন ফিরবেনই। মীর কাসিমের নিরন্তর লড়াকু ও

আশাবাদী মানসিকতা উৎপলকে আকৃষ্ট করেছে। উৎপলের আগেও মীর কাসিমকে নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৯০৬ সালে *মীর কাসিম* এবং মন্মথ রায় ১৯৩৮ সালে *মীর কাসিম* নাটক রচনা করেছেন।

মীর কাসিম উৎপল দত্তের প্রথম নাটক বলে উৎপল গবেষক ও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্টজনেরা জানিয়েছেন। নাটকটি ১৯৫৩ সালের পূর্বে রচিত বলে তাঁরা অনুমান করেন। *মীর কাসিম* নাটকটিকে উদ্ধার করা হয়েছে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির স্তুপ থেকে; এর রচনাকালের সঠিক হদিস পাওয়া যায়নি। নাটকটি সম্ভবত মঞ্চস্থ হয়নি। কোনোরকম পরিমার্জন ছাড়াই প্রথমে নাটকটি নন্দন পত্রিকায় (১৪০২ শারদ,সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়; পরে উৎপল দত্ত রচনা সমগ্র ৭ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপাখ্যান *কৃপাণ*। নাটকের শুরুতে সূত্রধারের মাধ্যমে জানা যায় রাসবিহারীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ২৩ নম্বর ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর কাহিনী। এই কাহিনীর শুরু ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে চীনের উপকূলে ক্যান্টন বন্দরে, ইম্পিরিয়েল ক্রাউন নামক যুদ্ধজাহাজের ডেকে। ২৩ নম্বর বাহিনী চীন থেকে লাহোরে যায়। লাহোরে মিয়ামির সেনাবাসে কর্তার সিং গদর পার্টির পত্রিকা 'গদর দি গঞ্জ' সিপাহীদের মধ্যে বিলি করেন। পড়া-শেষে পত্রিকাগুলো একটা কামানের ঢাকনা খুলে গর্তে পুরে দিয়ে আবার ঢাকনা এঁটে দেয়া হয়। কর্নেল হোয়াইট একটি কামানের ঢাকনা পরিচ্ছন্ন (বাকি সব কামানের ঢাকনা ধুলি-ধূসরিত)দেখে ঢাকনা সরিয়ে 'গদর দি গঞ্জ' পত্রিকার গুচ্ছ পান। জিজ্ঞাসাবাদে কেউ স্বীকার না করায় ফৌজি কানুনের ধারানুযায়ী শনিবারের ছুটি বাতিল আর নায়েক হরগোবিন্দ সিংকে ত্রিশ ঘা চাবুক মারার আদেশ দেন। রাসবিহারী ওরফে চুচেন্দ্রনাথ দত্তের আস্তানায় কৃপাল, কর্তার, বাসাবা সাক্ষাৎ করে শচীন, পিংলে এবং রাসবিহারীর সাথে। তিনি বলেন :

> ভারতীয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহ না করলে ভারত স্বাধীন হবে না। অনেক হয়েছে ইংরেজ জেলাশাসককে গুলি করে মারা বা বড়লাটের হাতির উপর বোমা মেরে পালানো বা কলকাতায় চার্লস টেগার্টকে গুলি করার চেষ্টা। ওভাবে পৃথিবীর কোন দেশ স্বাধীনতা কেড়ে আনতে পারেনি। গণঅভ্যুত্থান চাই, যার সঙ্গে যুক্ত হবে বিদ্রোহী সশস্ত্র সৈনিকরা, যারা আসলে আমাদের কৃষকের ঘরের ছেলে।[১৩১]

রৌনক সিংহ উপস্থিত সকলকে অপারেশন পরিকল্পনার ম্যাপ দেখান। আক্রমণ করা মাত্র ২৩ নম্বর পুরো রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগদান করবে; একই সঙ্গে আক্রমণ করবে ফিরোজপুর সেনাবাস, এবং এরাও বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসবে। কৃপাল সিং এখানকার কাজকর্মের কথা বলতে গিয়ে 'গদর দি গঞ্জ' পত্রিকা হোয়াইটের হাতে পড়ার কথা জানালে রাসবিহারী বলেন :

> ইংরেজের সাথে লড়াই করার করার যোগ্যতা অর্জন করুন আগে।[১৩২]

এতে কৃপাল ক্ষিপ্ত হয়ে বলে – আমরা ইংরেজের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে মরতে পারি।[১৩৩]

এ-প্রসঙ্গে রাসবিহারীর জবাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ –

> সেটাই তো মুস্কিল। মরাটা তো দরকার নয়, দরকার হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং ইংরেজকে মারা। সেটা করার মত ধৈর্য, বুদ্ধি, পিছুহটার ক্ষমতা, পালিয়ে বেড়াবার নৈপুণ্য – এসব আমাদের ধাতে নেই। বাংলা থেকে পাঠান মুলুক সর্বত্র বুক পেতে দিয়ে মরার উদগ্র বাসনা, ফাঁসির মঞ্চ থেকে দুবার বন্দে মাতরম্ হাঁক পাড়ার শিশুসুলভ লোভে।...আমি চাই এমন যোদ্ধা যে বলবে হাসিমুখে ইংরেজ মারব এবং তারপর বেঁচে থাকবো আরো ইংরেজ মারার জন্য।...সত্যিকারের বিপ্লবী ধরাই পড়ে না।[১৩৪]

কৃপালকে রাসবিহারী কর্নেল হোয়াইটের ব্যাগের চাবি দিয়ে দায়িত্ব দেন তার ব্যাগের কাগজপত্র চুরি করে আনতে। ঐ-কাগজগুলোতে মিলিটারি ডেসপ্যাচ, ভারতের কোন রেজিমেন্ট কবে কখন কোথায় যাতায়াত করছে তার পাকা খবর আছে। হোয়াইটের ব্যাগের কাগজপত্র চুরি করতে গিয়ে কৃপাল সিং ধরা পড়ে যায়। হোয়াইট চালাকি করে কয়েকজনের কিছু স্বীকারোক্তি (মুখে মুখে বানানো) শোনাতেই কৃপাল সব বলে দেয় এবং হোয়াইটদের পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজি হয়। হোয়াইট কিছু কাগজপত্র ও প্লেন দেয় রাসবিহারীকে দেয়ার জন্য যাতে সে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে।

কৃপালের চমকে-উঠা আচরণ,তার দেয়া নির্ভাজ কাগজপত্র দেখে সন্দেহ হলেও 'প্ল্যান' পেয়ে রাসবিহারী বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেয়। ২১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের দিন ধার্য হয়। কৃপাল হোয়াইটদের দিন তারিখ জানিয়ে দিলে অভ্যুত্থান ৪৮ ঘণ্টা এগিয়ে দেয়া হয়। ডিন্ডিবাজারে রাসবিহারীর আস্তানা চিনিয়ে নিয়ে যায় কৃপাল –কিন্তু হোয়াইটরা পৌঁছার আগেই তারা সরে পড়তে সক্ষম হয়। রাসবিহারীর খোঁজ বের করতে মিলিটারি ইনটেলিজেনসে রিপোর্টের মাধ্যমে মোটাসোটা মহিলার সন্ধান পান, ঐ মহিলাই জমিলা। জমিলার বাজার করাকে কেন্দ্র করে এরা শাহীগলির সন্ধান পায়। হোয়াইটরা রাসবিহারীকে ধরার জন্য শাহী গলিতে অপারেশন চালায়। এবারের অপারেশনও ব্যর্থ হয়। রাসবিহারী সরে পড়তে সক্ষম হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে লাহোরে লড়াই শুরু হয়। গোরারা সৈনিকদের মেশিনগান,মর্টার,হাইটজার,কামান দিয়ে চারদিকে ঘিরে এলোপাতাড়ি গুলি করে এবং জলে ডুবিয়ে হত্যা করে। ২৩ নম্বর রেজিমেন্টের ভারতীয় সৈনিকরা কোনো আপোষের প্রস্তাবে, কোনো প্রলোভনে সাড়া না দিয়ে গদর পার্টির গান গাইতে গাইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

২৩ নম্বর রেজিমেন্টের নাম পর্যন্ত মুছে দেয় ব্রিটিশ সরকার তাদের নথিপত্র থেকে। ২৩ নম্বর রেজিমেন্টের যেসব সিপাহী গহবরে আটকা পড়েনি তাদের শিকল পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দাগশাই, সেখানে কোর্টমার্শালে ১৮ জনকে গুলি করে মারা হয় এবং ১৪ জনের হয় কুড়ি বৎসর করে কারাবাস (বলবন্ত সিং ঐ ১৪ জনের একজন)। রাসবিহারী পলাতক; কর্তার সিং, সারাভার, পিংলের ফাঁসি হয়; সবসুদ্ধ ৪৬ জন গদর পার্টি-কর্মীর ফাঁসি হয়, ৪৬ জনের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ১২৫ জনের নানা মেয়াদের কারাবাস।

বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং ব্রিটেনে গিয়ে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক বনে যায়। গিলওয়ালি গ্রামের মানুষের পেট চলে কৃপালের টাকায়, বিনাখরচে সব ছেলেমেয়েরা তার স্কুলে পড়ে, বিনাখরচে সকলের চিকিৎসা হচ্ছে কৃপাল

সিং জেনারেল হসপিটালে। ২৫ বছর পর বাড়ির পথে রওনা হলেও কৃপাল সিং-এর আর বাড়ি ফেরা হয় না। বলবন্ত সিং (সেই সিপাহীদের একজন, যিনি বেঁচেছিলেন)কৃপালের পেটে বুকে কৃপাণ বসিয়ে দেয়।

এই নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে;ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন উদ্ধৃতি;ব্রিটিশ শাসকের আসল চেহারা উন্মোচিত করতে কার্ল মার্কসের উক্তি ব্যবহার করা হয়েছে :

> বুর্জোয়াসভ্যতার গভীর শঠতা এবং বর্বরতা আমাদের চোখের সামনে উন্মীলিত হয় যখনই য়ুরোপীয় বুর্জোয়ারা তাদের স্বদেশে আচরিত তথাকথিত ভদ্রতা ত্যাগ করে তাদের উপনিবেশে স্বমূর্তি ধারণ করে।[১৩৫]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ২৩ নম্বর ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহের কাহিনী অনেকটা অনালোকিত ও অনালোচিতই থেকে গেছে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টির বাইরে রয়ে যাওয়া ২৩ সম্বর ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর দেশপ্রেম,বিপ্লববাদ এবং কারো কারো বিশ্বাসঘাতকতা নাট্যকার সকলের দৃষ্টিগোচর করতে চেয়েছেন। শেষপর্যন্ত যদিও ২৩ নম্বর অশ্বারোহী বাহিনীর অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে তথাপি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ২৩ নম্বর বাহিনীর অবদান খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। সেনাবাহিনী ও কৃষকদের কাছে এই বাহিনী তাদের বিদ্রোহের বার্তা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

আলোচ্য অধ্যায়ে উৎপল দত্তের ৩১টি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকের আলোচনা করা হয়েছে; এগুলোর মধ্যে ২২টির পরিপ্রেক্ষিত স্বদেশের; ৯টির পরিপ্রেক্ষিত বিদেশের; কিন্তু সব নাটকের মৌল-প্রবণতা বিপ্লব-বিদ্রোহ, মানুষের সংগ্রামের কথকতা। উৎপল তাঁর নাটককে দেশকালের সীমায় বাঁধেননি। দেশীয় প্রেক্ষাপটে রচিত উৎপলের নাটকে ওঠে এসেছে: চলচ্চিত্রজগতের নেপথ্য কাহিনী, কয়লাখনির নিষ্পেষিত শ্রমিক জীবন, তিরিশের দশকের সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ, ভারতের নৌবিদ্রোহ, বামপন্থীদের বিচ্যুতির ইতিবৃত্ত, নকশাল আন্দোলন,সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল ও বিজ্ঞানী কল্‌হনের বিজ্ঞানচর্চা, বাংলা থিয়েটারের সংগ্রামের ইতিকথা তথা বাংলা রঙ্গালয়ের শতবর্ষের ইতিহাস, ১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতাযুদ্ধ, আক্রান্ত কলকাতা, ব্রিটিশ শাসক ও দেশীয় নীলকর মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিতুমীরের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার লড়াই, মাইকেল মধুসূদনের বর্ণাঢ্য জীবন,একজন প্রাক্তন অভিনেতার মর্মন্তুদ জীবন-বেদনা, ব্রিটিশ বেনিয়া আমলাদের চৌর্যবৃত্তি, রামমোহন ও সতীদাহ, ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ ও গান্ধীহত্যার অনুদ্ঘাটিত রহস্য,ধর্মীয় মৌলবাদ তথা সাম্প্রদায়িকতা, মীর কাসিমের স্বাধীনতার লড়াই, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ২৩ নম্বর ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহের অনালোকিত ও অনালোচিত কাহিনী ইত্যাদি।

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে উৎপলের নাটকে দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে ওঠে এসেছে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ, আমেরিকার স্কটস্‌বেরো মামলা তথা কৃষ্ণাঙ্গ পীড়ন, ইন্দোনেশিয়ার রক্তাক্ত অধ্যায়,কিউবার বিপ্লব, লেনিনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়,বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,স্তালিনের জীবনের বিশেষ অধ্যায়,চীনের বিপ্লব ও ডাক্তার বেথুনের জীবন, ফরাসি বিপ্লব, পূর্ব ইউরোপে ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন:

> ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনী বেছে নিয়ে নাটক করার, যাত্রা লেখার চেষ্টা বহুদিন থেকে করছি, নৌ বিদ্রোহের কাহিনী, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, ১৯৩০-৩৪ সালের বাংলার বিপ্লবীদের বীরত্ব, জালিয়াওয়ালাবাগের পটভূমিকা, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, আফগান মুক্তিযুদ্ধ, পারি কমিউন, অক্টোবর বিপ্লব, চীন বিপ্লব... যেখানে যত বিপ্লবী সবাই আমাদের নিকটাত্মীয় ... আজকের কমিউনিস্ট যোদ্ধা এক বিরাট ঐতিহ্যের বাহক ...সংগ্রামের এই অবিচ্ছিন্ন ধারাকে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই বিশ্বাসে উপরোক্ত সব বিপ্লবের কাহিনীকেই নাটকে এবং যাত্রার পালায় আনার প্রয়াস পেয়েছি।[136]

উৎপল দত্ত নাটকে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর নাটকের নামকরণে যুদ্ধবিদ্যার নানা অনুষঙ্গ এসেছে। উৎপল দত্তসাধারণ মানুষকে নয়া ট্র্যাজেডির নায়ক করে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, এ-ক্ষেত্রে পুরাকাল থেকে চলে আসা রীতিকে বহাল রেখেই নতুনকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী তিনি। সাধারণ মানুষকে অসাধারণভাবে উপস্থাপনের জন্যই তাঁর এত আয়োজন। নাট্যকার উৎপল দত্ত যেহেতু শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাস করেন তাই ব্যক্তিকে তিনি সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করেদেখেননি, ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নেই,ব্যক্তি সমষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তাই ব্যক্তির কার্যকলাপ শ্রেণিসংগ্রামের অংশ বলে তিনি মনে করেন। এ-পরিপ্রেক্ষিতে উৎপল দত্ত লিখেছেন :

> পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে রীতিতে নাটক সৃষ্টি হয়ে এসেছে তাকে বজায় রেখেই নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষ আসবে নয়া ট্রাজেডির নায়ক হয়ে। আগেরকার নাটকে যেটা ছিল ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ এখন সেটা হয়ে দাঁড়াবে শ্রেণিসংগ্রাম। আজকের ঘটনা আরো ব্যাপক, আরো মারাত্মক, পুলিশের গুলি, মালিকের গুন্ডার ছুরি, পেটোয়া ইউনিয়নের গুপ্তহত্যা, কারখানায় দুর্ঘটনা ... । এ সবই হবে নাটকের বিষয়বস্তু। আগের নাটকে যেটা ছিল ব্যক্তিবিশেষের খুন হওয়া,এখন সেটা হয়ে দাঁড়াবে শ্রেণিসংগ্রামের ব্যাপক খুন।...সমাজ একটা যুদ্ধক্ষেত্র, নয়া যোদ্ধৃবৃন্দকে তুলে ধরুন; আপসে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠবে।[137]

উৎপল দত্ত বিশ্বাস করেন পৃথিবীর কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন বা বিয়োজিত ঘটনা নয়। সবকিছুই পরস্পর-সাপেক্ষ। প্রত্যেক ঘটনার নির্দিষ্ট কার্যকারণ রয়েছে এবং সে-কার্যকারণ সমাজের ভেতরেই গ্রথিত।সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শ্রেণিদ্বন্দ্ব সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান বা ধারণা না থাকলে ঘটনা বিচ্ছিন্ন,বিয়োজিত ও মূল্যহীন মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাই মার্কসিস্ট নাট্যকারের যা অবশ্য কর্তব্য : ঘটনার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তথা শ্রেণিদ্বন্দ্বের আসল চিত্র খুঁজে বের করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা; উৎপল দত্ত তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। নাট্যকার উৎপল দত্ত যে-ধরনের নাটকই রচনা করুন না কেন বিষয়-আঙ্গিক সর্বত্রই তিনি তাঁর বিশ্বাস,অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। এভাবে তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুমহান ঐতিহ্য,বিদেশের গণআন্দোলন,দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা, ব্যক্তি মানুষের সংগ্রাশীলতা সবকিছুর মধ্যেই গণমানুষের গণসংগ্রামের প্রতি দায়বদ্ধ

থেকেছেন। এভাবেই রাজনৈতিক থিয়েটারকে রেভ্যুলিউশনারিথিয়েটারে উন্নীত করতে চেয়েছেন। উৎপল দত্ত বলেছেন :

> নাটক আমাদের কাছে একান্তভাবে একটি সামাজিক ক্রিয়া। সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে যদি তাকে ধরতে হয়, তবে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন লক্ষ করার চোখ তৈরি করতে হয়।[138]

উৎপল দত্ত অন্য অনেক নাটকের ভিড়ে কয়েকটা রাজনৈতিক নাটক লিখেননি। প্রথম থেকে শেষাবধি আগাগোড়া রাজনৈতিক নাটকই তিনি লিখেছেন। মৃদু প্রগতির ফিসফিস নয়, টালমাটাল বিপ্লবের কর্কশ হুঙ্কার-সমৃদ্ধ নাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন তাঁর অর্ধশতাব্দীব্যাপী নাট্যচর্চায়। দেশ-বিদেশের যে-সময়ের যে-ঘটনাই উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যবিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন প্রতিটি ঘটনার মর্মমূলে প্রবেশ করে কার্যকারণ সূত্রে তুলে ধরেছেন এর প্রেক্ষাপট। প্রতিটি ঘটনাই তাঁর নাটকে আর্থসামাজিক অবয়ব নিয়েই হাজির হয়েছে। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও শ্রেণিবিশ্লেষণ তাঁর নাটকের অন্যতম দিক। উৎপল তাঁর নাটকে সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের শ্রেণি-অবস্থান স্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন। এজন্য তাঁরনাটকে শোষক-শোষিতের আন্তর-সম্পর্ক, শোষণের নানা কৌশল স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সবসময়ই তাঁর নাটকে ক্রিয়াশীল থেকেছে – যা তাঁর সমকালে বা পূর্বকালের নাট্যকারদের নাটকে তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি।

নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত এই প্রতীতিতেআস্থাবান ছিলেন যে;

> নাটক একটা কনসেপ্ট, একটা ধারণা,একটা আইডিয়া– চলমান ও পরিবর্তনশীল জগৎ সম্পর্কে একটা চিন্তা। সেহেতু সমাজের দ্বন্দ্বগুলি প্রতিফলিত হয় সেই আইডিয়ায়।[139]

উৎপল দত্তের নাটকের আলোচনা-পর্যালোচনান্তে তাঁর প্রতীতি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

তথ্য নির্দেশঃ

১.উৎপল দত্ত,*আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*,কলকাতা,২০০৫, নাট্যচিন্তা,পৃ.২৬
২.উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*,প্রথম খণ্ড,অঙ্গার,কলকাতা,১৯৯৪,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিঃ,পৃ.৯০
৩.শোভা সেন,*স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*,১৯৯৬, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, পৃ.৪৫
৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৬
৫.উৎপল দত্ত,পূর্বোক্ত,পৃ.২৮-২৯
৬.উৎপল দত্ত,*গদ্য সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড),কলকাতা,১৯৯৮, দে'জ পাবলিশিং,পৃ.১৫৭
৭.পূর্বোক্ত, *নাটক সমগ্র*,ফেরারী ফৌজ,পৃ.১৪৮
৮.পূর্বোক্ত,পৃ.১৬৪
৯.পূর্বোক্ত,পৃ.২০৮
১০.উৎপল দত্ত,রাজনৈতিক থিয়েটার ও সাধারণ দর্শক,*পশ্চিমবঙ্গ*,কলকাতা,১৪০৮,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ.১৫-১৬
১১.উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত, ফেরারী ফৌজ,পৃ.১৫০
১২.উৎপল দত্ত, *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪
১৩. উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*,দ্বিতীয় খণ্ড, কল্লোল, পৃ.২৩৮
১৪.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৩।
১৫.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৫।
১৬.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৬-৬৭।
১৭.পূর্বোক্ত,পৃ.২৮৭।
১৮.পূর্বোক্ত,পৃ.২৮৭।
১৯.পূর্বোক্ত,পৃ.২৮৮।
২০.পূর্বোক্ত,পৃ.২৯৬।
২১.পূর্বোক্ত,পৃ.৩০০।
২২.পূর্বোক্ত,পৃ.৩০২।
২৩.পূর্বোক্ত,পৃ.৩০৩।
২৪.উৎপল দত্ত, *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
২৫.দর্শন চৌধুরী,পূর্বোক্ত,পৃ.৮৬
২৬.উৎপল দত্ত, *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
২৭.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৬
২৮. উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*,তৃতীয় খণ্ড,অজেয় ভিয়েতনাম, ১৯৯৫পৃ.১৬৭
২৯.পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৮
৩০.পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৬
৩১. উৎপল দত্ত, একটি তলোয়ারের কাহিনী,*নাট্যচিন্তা*,উৎপল দত্ত সংখ্যা,সেপ্টেম্বর-অক্টোবর,১৯৯৩(২য় পর্ব),পৃ.১৩
৩২. উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র*,তৃতীয় খণ্ড,তীর,পৃ.২৯১-৯৪
৩৩.পূর্বোক্ত,পৃ.৩১৪
৩৫.উৎপল দত্ত,*আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*,পূর্বোক্ত, পৃ.৪০
৩৬. উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড,মানুষের অধিকারে,পৃ.১৩৪
৩৭.পূর্বোক্ত,পৃ.১৩৪-৩৫
৩৮.পূর্বোক্ত,পৃ.১৩৫
৩৯.পূর্বোক্ত,পৃ.১৩৬-৩৭
৪০.পূর্বোক্ত,পৃ.৭১
৪১.পূর্বোক্ত,*নাটক সমগ্র*,চতুর্থ খণ্ড, রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া,পৃ.২২১

৪২.পূর্বোক্ত, লেনিনের ডাক,পৃ.৯৫
৪৩.পূর্বোক্ত,*নাটক সমগ্র*,পঞ্চম খণ্ড,সূর্যশিকার, পৃ১৭৩-৭৪
৪৪.পূর্বোক্ত,পৃ.১৭৪
৪৫.পূর্বোক্ত,পৃ.১৭৪
৪৬.পূর্বোক্ত,পৃ.১৭৫-৭৬
৪৭.পূর্বোক্ত,পৃ.১৭৮
৪৮.পূর্বোক্ত,পৃ.১৯১
৪৯.পূর্বোক্ত,পৃ.২০১
৫০.পূর্বোক্ত,পৃ.২১১-১২
৫১.পূর্বোক্ত,পৃ.২১৩।
৫২.পূর্বোক্ত, ঠিকানা,পৃ.৭১-৭২
৫৩.পূর্বোক্ত, টিনের তলোয়ার,পৃ.৭৩
৫৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৯০
৫৫.পূর্বোক্ত,পৃ.১০৩
৫৬.পূর্বোক্ত,পৃ.১২৬-২৭
৫৭.পূর্বোক্ত,পৃ.১৪০
৫৮.পূর্বোক্ত,পৃ.১৪০
৫৯. শোভা সেন,পূর্বোক্ত ,পৃ.১০৭
৬০.উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র*,পঞ্চম খণ্ড,মহাবিদ্রোহ,পৃ.২৯০
৬১.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৩১
৬২.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৩১
৬৩.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৫২
৬৪.পূর্বোক্ত,ষষ্ঠ খণ্ড,দুঃস্বপ্নের নগরী,পৃ.৭৯
৬৫.পূর্বোক্ত,পৃ.১০১-১০২
৬৬.পূর্বোক্ত,পৃ.১১৫
৬৭. পূর্বোক্ত, লেনিন কোথায়,পৃ.২২৬
৬৮. পূর্বোক্ত, এবার রাজার পালা,পৃ.২৮১
৬৯.পূর্বোক্ত,পৃ.২৮৬
৭০.পূর্বোক্ত,পৃ.২৯৩
৭১.পূর্বোক্ত,পৃ.২৯৪
৭২.Utpal Dutt, *Towards A Revolutionary Theatre,* Calcutta, 1995, M.C. Sarkar & Sons LTD,p.95
৭৩.উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*,ষষ্ঠ খণ্ড,তিতুমীর,পৃ.২৯৯
৭৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৩১১
৭৫. পূর্বোক্ত,পৃ.৩১৬
৭৬. পূর্বোক্ত,পৃ.৩২৫
৭৭. পূর্বোক্ত,পৃ.৩২৮
৭৮. পূর্বোক্ত,পৃ.৩৬২
৭৯. পূর্বোক্ত, স্তালিন ১৯৩৪,পৃ.৪২৬
৮০. পূর্বোক্ত, দাঁড়াও পথিকবর,পৃ.৪৮৬-৮৭
৮১.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৮৮
৮২. পূর্বোক্ত,পৃ.৪৯৮
৮৩. পূর্বোক্ত,পৃ.৫১৩

৮৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৫১৯
৮৫.পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩১
৮৬.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৩০
৮৭.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৩২
৮৮. পূর্বোক্ত, সপ্তম খণ্ড,আজকের শাজাহান,পৃ.২১৭
৮৯. দর্শন চৌধুরী, পূর্বোক্ত,পৃ.২৮০
৯০.উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র*,সপ্তম খণ্ড,মহাচীনের পথে,পৃ.১১৫
৯১.পূর্বোক্ত,পৃ.১২০
৯২.পূর্বোক্ত,পৃ.১২২
৯৩.পূর্বোক্ত,পৃ.১৭০
৯৪.পূর্বোক্ত, বণিকের মানদন্ড,পৃ.৫৭৭
৯৫.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৭৮
৯৬.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৭৯
৯৭.পূর্বোক্ত,পৃ.৬১৫
৯৮.পূর্বোক্ত, অগ্নিশয্যা,পৃ.২৩৩
৯৯.পূর্বোক্ত,পৃ.২৫৩
১০০.পূর্বোক্ত,পৃ.২৬৬
১০১.পূর্বোক্ত,পৃ.২৭৪
১০২.পূর্বোক্ত,পৃ.২২৬
১০৩.পূর্বোক্ত,পৃ.২৭৬
১০৪.পূর্বোক্ত, নীল সাদা লাল,পৃ.৩৪১
১০৫.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৭৫
১০৬পূর্বোক্ত,পৃ.৩৭৫
১০৭.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৭৬
১০৮.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৭৬
১০৯.পূর্বোক্ত, একলা চলো রে,পৃ.৩৯২
১১০.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৯৫
১১১.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৯৬
১১২.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৯৮
১১৩.পূর্বোক্ত,পৃ.৪০০
১১৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৪০১
১১৫.পূর্বোক্ত,পৃ.৪০৭
১১৬.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৩৬
১১৭.উৎপল দত্ত, যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সব ভুল(সুরজিৎ ঘোষের নেয়া একটি সাক্ষাৎকার), *দেশ*, কলকাতা,৩০.০৩.১৯৯১
১১৮.উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র*, সপ্তম খণ্ড,লালদূর্গ,পৃ.৪৩৮
১১৯.পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪১
১২০.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৭০
১২১.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৮৭
১২২.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৯১
১২৩.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৯৩
১২৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৯৪ ।
১২৫.শোভা সেন,পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৩

১২৬.উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*, সপ্তম খণ্ড,জনতার আফিম,পৃ.৫২৫
১২৭.পূর্বোক্ত,পৃ.৫২৭
১২৮.পূর্বোক্ত,পৃ.৫২৭
১২৯.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৩১
১৩০.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৫৪
১৩১.পূর্বোক্ত, কৃপাণ,পৃ.৬০৯
১৩২.পূর্বোক্ত,পৃ.৬১০
১৩৩.পূর্বোক্ত,পৃ.৬১০
১৩৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৬১১
১৩৫.পূর্বোক্ত,পৃ.৬৫০
১৩৬.পূর্বোক্ত, *পশ্চিমবঙ্গ*,পৃ.১৫০
১৩৭.পূর্বোক্ত,*গদ্য সংগ্রহ*,পৃ.৩৪
১৩৮.পূর্বোক্ত,পৃ.২১৩
১৩৯.পূর্বোক্ত, পৃ.২৯২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
যাত্রাপালা-পথনাটক-একাঙ্কনাটক-রূপান্তরিত নাটক

ক. যাত্রাপালা:

বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য যাত্রা। বাঙালির গণসংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যমও যাত্রা। মৃত্তিকা-সংলগ্ন মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে যাত্রার মাধ্যমেই পৌঁছাতে হবে। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠী বিশেষত গ্রামীণ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। উৎপল দত্ত মনে করতেন; বৃহত্তম জনতার আপন সহজলভ্য ও চেনা মাধ্যমেই তাঁদের কাছে যেতে হবে। তিনি বলেছেন : 'প্রতি জাতি নিজ নিজ প্রিয় ফর্ম সৃষ্টি করেছে বহু শতাব্দী ধরে। সেই ফর্মেই সে দেখতে চাইবে বৈপ্লবিক নাটক। জাপানীদের কাছে বিপ্লবের বার্তা হয়তো কাবুকি মারফত সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছে দেয়া যাবে, বাংলার মানুষের কাছে যাত্রায়।'[১]

উৎপলের আজন্ম আকাঙ্ক্ষা মৃত্তিকার কাছাকাছি সুমহান জনতার কাছে পৌঁছানো। শোভা সেনের কণ্ঠে এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় :

> উৎপলের বহুদিনের ইচ্ছাছিল, যাত্রায় কীভাবে ওর নাটক নেবে, ও নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখবে। যাত্রা আমাদের গণসংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম। জনগণের কাছে পৌঁছাতে গেলে আমাদের যাত্রার মাধ্যমেই যেতে হবে।[২]

তবে, যাত্রার সঙ্গে উৎপল দত্তের যোগাযোগ আকস্মিক নয়। বহু আগে থেকেই তিনি যাত্রা দেখেছেন এবং এ-বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন – দেশজ নাট্যকলার প্রতি তাঁর আজন্ম আগ্রহ এবং মনোযোগ তো ছিলই। এলটিজি যখন ঋণসহ নানা সঙ্কটের মুখোমুখি – উৎপলের কাছে তখন আমন্ত্রণ আসে পালা রচনার। দুঃসময়ের এই আমন্ত্রণ উৎপলের জীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে; নতুন কিছু নির্মাণের পথ পেলেন তিনি। গ্রাম বাংলার অগণিত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার যে-বাসনা তিনি পোষণ করছিলেন এ-প্রস্তাব তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সহায়ক হল। উৎপল দত্ত তাঁর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ এবং নিজেকে তৈরি করার জন্য ঐ সময়ে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর *বাঙালী* পালার অভিনয় দেখেছেন। পাশাপাশি, ব্রজেনকুমারের পালা খুব মনোযোগের সাথে পড়েছেন এবং প্রবীণ যাত্রা অভিনেতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। 'ঘুরে ফিরে' শীর্ষক এক আলোচনায় 'যাত্রার কাছে কী শেখা যাবে' – আধুনিক থিয়েটারকর্মীর এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছেন :

> শিখবেন নাট্যরচনার কৌশল,লক্ষ নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষাদানের কলা, উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সাজাবার পদ্ধতি। শিখবেন মধ্যবিত্ত দর্শককে ছেড়ে অন্যান্য শ্রেণির কাছে যাওয়া। শিখবেন দুর্বোধ্য সব বিচ্ছিন্নতাবাদী, কিমিতিবাদী নাটককে জলাঞ্জলি দেওয়া।... কোমর বেঁধে যাত্রার কাছ থেকে শিখতে শুরু করুন – সহজবোধ্য ভাষায়, সহজগ্রাহ্য গল্পের কাঠামোয় কি করে মহত্তম চিন্তা যোজনা করা যায়।...শিখুন বাংলার সত্যিকারের মানুষের জাতীয় নাট্যবৈশিষ্ট্য কী, কী

> সে শুনতে ও দেখতে চায়। সেই প্যাটার্নটাকেকে প্রথমেই অবজ্ঞাভরে বাদ না দিয়ে, সেই প্যাটার্নে যদি আরোপ করতে পারেন দর্শন ও মহৎ চিন্তা তবে বুঝি বাহাদুর।[৩]

বাংলা রাজনৈতিক নাটক কার সামনে অভিনীত হবে উৎপল দত্তকে এ-প্রশ্ন করা হলে তিনি এর উত্তরে এক সংলাপিকায় যা লিখেছেন তার মধ্যেও নিহিত আছে উৎপলের যাত্রাভাবনা :

> রাজনৈতিক নাটক তৈরি করে তারপর একাডেমী নামক ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে কয়েক কুড়ি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভদ্রলোকের সামনে অভিনয় করতে থাকলে, সেটা আর রাজনৈতিক নাটক থাকে না। সেটা কাঁঠালের আমসত্ব হয়। যেখানে এ-নাটক প্রধানত অভিনয় হবে, সেখানে থাকবে দশ থেকে বিশ হাজার শ্রমক্লান্ত মানুষ,থাকবে অত্যন্ত নির্জীব মাইক এবং থাকবে আশেপাশের হাটুরে কোলাহল।[৪]

'বিবেক নাট্য সমাজ' পথচলা শুরু করে এলটিজি এবং পিএলটির সন্ধিক্ষণে। এলটিজি থেকে বেরিয়ে সংকট-উত্তরণের ভিন্নতর এবং বৃহত্তর পথের নিশানাতেই 'বিবেক নাট্য সমাজ'-এর জন্ম।প্রসেনিয়াম থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ব্যাপক জনতার কাছে পৌঁছবার দৃঢ় আশাবাদ এবং প্রত্যয় এই দলের এবং উৎপলের ছিল। উৎপল দত্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যাত্রার উপাদানকে থিয়েটারে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় তাঁর এক সাক্ষাৎকারে :

> বিবেক নামকরণ থেকেই তা পরিষ্কার এবং আমাদের প্রথম যে দুটো নাটক, দুটোই যাত্রার। যাত্রাকে স্টেজে তোলা। তার প্রসেনিয়াম নেই। তার পর্দা নেই। তার wings নেই। কিচ্ছু নেই। দর্শক তিনদিকে বসত। চারদিক handle করতে গেলে যে-ধরনের অভিনেতা লাগে তা আমাদের নেই। ক্রমে ক্রমে হবে ভেবেছিলাম। অবশ্য বিবেক নাট্যনমাজ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, বাণিজ্যিক দিক থেকেও কোনও সার্থকতা লাভ করা সম্ভব হয়নি, তবু পিপলস্ লিটল থিয়েটার তার প্রাণশক্তি সংগ্রহের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে সমৃদ্ধ করেছে এই বিবেক নাট্য সমাজের অভিজ্ঞতা।[৫]

একদিকে মিনার্ভার ঋণের বোঝা অন্যদিকে গণমানুষের কাছাকাছি পৌঁছার আকুলতা থেকে যেমন উৎপলের যাত্রা জগতে আগমন তেমনি যাত্রা ও থিয়েটারের সমন্বয়ে একটি নতুন ধারা বিশেষত রাজনৈতিক থিয়েটার নির্মাণের অভীপ্সায় নির্মিত হয়েছে 'বিবেক নাট্যসমাজ'।যদিও 'বিবেক' বেশিদূর এগোয়নি তথাপি এলটিজি ও পিএলটি-র মধ্যবর্তী সময়ের যোগসূত্র হিসেবে বিবেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উৎপল দত্ত রচিত প্রথম যাত্রাপালা *রাইফেল*। এর পর ধারাবাহিকভাবে লিখেন :*জালিয়ানওয়ালাবাগ*, *শোনরেমালিক*, *দিল্লিচলো*, *নীলরক্ত*, *ভুলি নাই প্রিয়া*, *সমুদ্রশাসন*, *জয়বাংলা*, *সন্ন্যাসীরতরবারী*, *ঝড়*, *মাও-ৎসে-তুং*, *বৈশাখী মেঘ*, *সীমান্ত*, *তুরুপের তাস*, *মুক্তিদীক্ষা*, *অরণ্যের ঘুম ভাঙছে*, *সাদাপোশাক*, *কুঠার*, *স্বাধীনতার ফাঁকি*, *বিবিঘর এবং দামামা ঐ বাজে।*

'নিউ আর্য অপেরা' (দল) ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ সালে *রাইফেল* প্রথম মঞ্চস্থ করে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। এই প্রযোজনা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে। বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা ও প্রযোজনার অভিনবত্বে *রাইফেল* তখন যাত্রাজগতের চেহারাই পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিল। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক *রাইফেল* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৬ সনে। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ডে রাইফেল পালাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। '১৯৬৮ সালে যাত্রাজগতে নূতন যুগের সূচনা করেছে এই যাত্রা নাটক' এই পংক্তিটি লেখা ছিল *রাইফেল*-এর শিরোনামা-পৃষ্ঠায়। উৎপল দত্ত পালাটি উৎসর্গ করেছেন –'যাত্রাজগতের একাধিপতি *রাইফেল*-এর রহমৎ শ্রী পঞ্চুসেন মহাশয়ের করকমলে' ।

উৎপল দত্তের কাছে নাটক বা পালা নিছক অবসর বিনোদনের আশ্রয় নয়, তা অস্ত্র। *রাইফেল* নামকরণই সে-সাক্ষ্য বহন করে। *রাইফেল*-এর পটভূমি তিরিশের দশকের বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম। সূত্রধারের গানের মাধ্যমে পালার শুরু। গান শেষ করে সূত্রধার ঘরের ছেলের গল্প বলতে গিয়ে অবিনাশ বসুর নেতৃত্বে কল্যাণ ঘোষের সংগ্রামশীলতা আর বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনীর সূত্রে উপস্থাপন করে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মহান সংগ্রামের কথা। ঘরের ছেলে কল্যাণ ঘোষরা ১৯৩৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে 'অবিনাশ বসুর নেতৃত্বে যে-যুবদল তৈরি হয়েছিল বোমার আঘাতে, পিস্তলের গুলিতে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে, তারা মানেনি গান্ধীবাদকে, মানেনি অসহযোগ আর সত্যাগ্রহের নপুংসক নীতিকে।'[৬] কারণ চারিদিকে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছিল, 'দেশ স্বাধীন হয়েছে বিনা রক্তপাতে, অহিংস সংগ্রামের দৌলতে! দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে খদ্দের পরার ফলে, আমরা একমনে চরকা কেটেছি বলে!'[৭]

যে-বিপ্লবীরা নিজের জীবনই শুধু নয়, বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানসহ সকল স্বজনের জীবন বিপন্ন করে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তাঁরা কি করে বিশ্বাস করবেন অহিংস সংগ্রামের ফলে দেশ স্বাধীন? তাদের মনে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সাথে এই প্রশ্ন জেগেছে :

> তবে কি ক্ষুদিরামের নাম মুছে ফেলা হবে ইতিহাস থেকে? বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন, তবে কি সূর্যসেনের রক্ত রক্ত নয়?...অগ্নিযুগ বলে কিছু নেই ইতিহাসে![৮]

বহরমপুর থানায় আলোচনা হচ্ছিল মোস্ট ওয়ান্টেড অবিনাশ বসুকে নিয়ে - যিনি একের পর এক অপারেশন করে ব্যাংক লুট, রেল ম্যানেজার হার্ডিং ও ম্যাজিস্ট্রেট আলেটকে খুন, জিয়াগঞ্জে আর্মস ইন্সপেক্টর মিডলটনকে হত্যা করেছেন। মেজর ইনগ্রাম ইংরেজ পুলিশ অফিসার। তার দোসর ভারতীয় বাঙালি পুলিশ ইন্সপেক্টর মানিক সেন, জমিদার যুগল চৌধুরী। থানায় ভবানী-মানিক-যুগলদের কথোপকথনের মাঝেই অবিনাশের দল বেদে সেজে, কৌশলে থানা থেকে অস্ত্র নিয়ে যায় বিনা রক্তপাতে। যাবার সময় অবিনাশ বলে যায় :

> ইনগ্রামকে বলবেন-অস্ত্র নিয়ে গেলাম। বলবেন, ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি–স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্রী ফৌজ-এই অস্ত্রের জন্য ওঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।[৯]

অভিযান শেষ করে অস্ত্রগুলো কল্যাণের বোন মানসীর জিম্মায় রেখে, জীবন দিয়ে আগলে রাখার কথা বলে যে যার গন্তব্যে চলে যায়। কল্যাণ ভারতের মুক্তিকামী প্রজাতন্ত্রী ফৌজের সদস্য হিসেবে বোনকে শপথ করায়।অবিনাশ,কল্যাণ, মানসী,বীরেন,মহীতোষের সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয় কৃষক রহমৎ ও তার কন্যা নসিবন। অব্যাহত গতিতে প্রজাতন্ত্রী ফৌজ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক এদের অভিযানে ইংরেজ পুলিশ উদ্‌ভ্রান্ত। অবিনাশ বসুর দলকে ধরতে না পেরে মানিক, যুগলরা ভিন্ন পথে এগোয় – এরা কৌশলে প্রজাতন্ত্রী ফৌজের সদস্য বীরেনকে হাত করে ফেলে। বীরেন দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে দলের গোপন খবর, অভিযান,অস্ত্রশস্ত্র,দলের সদস্যদের নামধাম সবই ফাঁস করে দেয়, আর বিশ্বাসঘাতক বানায় সৎ লড়াকু কৃষক রহমতকে।

বীরেনের কাছ থেকে খোঁজ পেয়ে পুলিশ প্রথমে সরোজবর্ধনের পোড়োবাড়ি, পরে রহমৎ শেখের বাড়ি অভিযান চালালে মহীতোষ নিহত ও কল্যাণ আহত হয়। আহত কল্যাণকে পুলিশ পৈশাচিক কায়দায় নির্মম নির্যাতন এবং আর তার বোন মানসীকে ধর্ষণ করে; নসিবনকে রাস্তায় উলঙ্গ করে নির্যাতন করে। বিশ্বাসঘাতক বীরেন তার অগ্রজ-প্রতিম আর তার মায়ের 'বড় ছেলে' অবিনাশকে বাড়িতে ডেকে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

নাটকের শেষাংশে এসে সূত্রধার জানায় বহরমপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অবিনাশ বসুর ফাঁসি আর কল্যাণের দীপান্তর হয়। বীরেন ইংল্যান্ড চলে যায় পড়তে। মানসী ঘোষের মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দেয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। আলাদা এক বিচারে রহমৎ শেখের চার বছর,সুবোধ গাইন ও নিতাই কর্মকারের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আর সেই রাইফেলগুলো খুঁজেই পায়নি কেউ। জীবন দিয়ে এই অস্ত্র আগলে রেখেছে রহমৎ শেখ, সুবোধ গাইন ও নিতাইরা। কল্যাণ ফিরে এলে নসিবন তাকে অস্ত্রগুলো ফেরত দেয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, বহরমপুরে স্বাধীনতা উৎসব। এ-উৎসবে পঙ্গু কল্যাণ বড়ই অনাহুত। প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী –সেদিনের মুক্তিফৌজের বিশ্বাঘাতক বীরেন! পুলিশের ডিআইজি সেদিনের নৃসংশ পুলিশ মানিক! ইংরেজের দালাল অত্যাচারী, লুণ্ঠনকারী যুগল চৌধুরী জেলা কংগ্রেসের সভাপতি! বর্বরতা আর অত্যাচারের জীবন্ত প্রতিনিধি মেজর ইনগ্রাম ইংরেজ সওদাগর আপিস চার্লটন ব্রালি কোম্পানির হয়ে স্বাধীনতা দিবসে স্বাগত জানাতে এসেছে। এ-রকম স্বাধীনতা দেখে তাইতো কৃষক রহমতের অনুভব– স্বাধীনতা যুদ্ধটা বুঝলে না – শেষ হয়নি এখনো, নইলে স্বাধীন পুলিশ এসে যুগল চৌধুরীর হয়ে কৃষক উচ্ছেদ করে ? আর সুবোধের উচ্চারণ:

> যারা লড়াই করলো, জেলে গেলো, তারা সেই অনাহারেই থেকে গেল,রহমৎ কাকা। আর যারা ছিল বৃটিশের গোলাম, আমাদের ধরিয়ে দিল বৃটিশের হাতে, তারা মাথার উপর এসে বসেছে, এখনো বুক চিরে রক্ত খাচ্ছে।[১০]

রহমতের কণ্ঠে আবার স্বাধীনতা যুদ্ধ – ভারতের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আহবানের মধ্য দিয়ে পালার পরিসমাপ্তি।

রাইফেল পালায় পালাকার উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন– দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সশস্ত্র লড়াই, আবার এদের ভেতরকার বিশ্বাসঘাতক; বৃটিশের পদলেহনকারী,পৈশাচিক নির্যাতনকারী পুলিশ, এ-দেশীয় দালালদের। এই দালাল,নিপীড়করাই আবার স্বাধীনতার পর মন্ত্রীসহ বড় বড় পদে অভিষিক্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বহরমপুরে স্বাধীনতা উৎসবে মুক্তিফৌজের বিশ্বাঘাতক কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বীরেন পতাকা উত্তোলন করার উপক্রম করলে পঙ্গু কল্যাণ বাধা দিয়ে বলে–

> তাকিয়ে দেখুন,সব একই রইল,তবু নাকি স্বাধীনতা!মানিক সেন– যার হাতে বহু দেশপ্রেমিকের রক্ত লেগে আছে!যুগল চৌধুরী নাকি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা!বীরেন গাঙ্গুলি নাকি পিস্তল চালিয়ে স্বাধীনতা এনেছে! এ-এমন স্বাধীনতা যে, নারীধর্ষণকারী চার্লস ইনগ্রাম হাসছে। এ-এমন স্বাধীনতা যে, বেঈমান বীরেন গাঙ্গুলির গলায় ফুলের মালা।[১১]

এই পালায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় স্বাধীনতার লড়াইয়ে যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, পঙ্গু হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে, জেল খেটেছে তাঁরা কেউ স্বাধীন দেশের কোন স্বাদ বা সুফল ভোগ করতে পারেনি। ভোগ করেছে তারা, যারা স্বাধীনতা-বিরোধী ছিল, যারা বেঈমানী করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।*রাইফেল* পালায় একদিকে তিরিশের দশকের বিপ্লবীদের মরণপণ-লড়াই অন্যদিকে স্বাধীনতা-বিরোধী সুবিধাবাদী চক্রের ভূমিকা দর্শক-পাঠকের সামনে উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন পালাকার।

শোনরে মালিক পালাটির রচনাকাল ১৯৬৯ সাল। টালিগঞ্জ অগ্রগামী ক্লাবের উদ্যোগে তাদের খেলার মাঠে ১৯৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 'বিবেক যাত্রাসমাজ'-এর প্রথম অভিনয় *শোনরে মালিক*। *শোনরে মালিক* পালা শোষক তথা মালিকের শোষণের ইতিবৃত্ত। এই পালায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য, শ্রম দেয়ার জন্য এবং অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন জানানো হয়। শোষকের এই আহবানে শ্রমিকশ্রেণি প্রবল আবেগে আন্দোলিত হয়। শ্রমিক প্রশান্ত মালিকের ফাঁকি বুঝলেও বুঝেনি তার মা, ভাই ও কমরেডরা। তাই প্রশান্ত ধীকৃত হয়, জেলে যায়। সুশান্ত যায় দেশের ডাকে যুদ্ধে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সুশান্ত মুখোমুখী হয় এক পাক সৈনিকের। তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় শোষকের আসল চেহারা; পাকিস্তানী সৈনিকদের বলা হয় ভারত কাশ্মীর দখল করছে, আর ভারতের শ্রমিকদের বলা হয়, পাকিস্তান কাশ্মীর দখল করেছে। আসল সত্যটা কী, কাশ্মীর কী চায় সেইদিকে কেউ কর্ণপাত করে না। জজ ও সুশান্ত শ্রমিক হয়েও উর্দি পরে যুদ্ধ করতে এসেছে;কারণ দুদেশের শ্রমিককেই বোঝানো হয়েছে দেশ বিপন্ন, সীমান্ত বিপন্ন।সুশান্ত ও জজের সংলাপ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় দেশকাল ভিন্ন হলেও শ্রমিক-শোষণে শোষকের অভিন্নতা। শোষকরা তাদের প্রয়োজন-মাফিক যেখানে যা বললে কাজ হয় তাই বলে শ্রমিকদের আবেগকে জাগিয়ে তুলে, তাদের ব্যবহার করে।

যে সৌগত মুখার্জী, অমিয় সেন, গুরুদাসরা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে সুশান্তকে (তথাকথিত দেশপ্রেমিক) যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছে, সময়মত সেই অমিয়বাবু সুশান্তর মা লাবণ্যপ্রভার সামান্য সম্পত্তিটুকুও দখল করতে যখন আশ্রয় নেয় নানা ছলচাতুরির, লাবণ্যপ্রভার উপলব্ধি তখন দর্শক পাঠককে সচকিত করে তোলে। লাবণ্যপ্রভা দিনে দিনে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন অমিয়বাবুদের চরিত্র; তিনি এ-ও বুঝেছেন,ছেলে প্রশান্ত সত্য কথাই বলেছিল। তার কাছে সবকিছু দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় অমিয়বাবুকে তিনি বলেন :

> অমিয়বাবু, ভুলে যাবেন না,দেশপ্রেমটা আপনাদের ব্যবসা, কিন্তু আমাদের রক্ত দিয়ে কেনা।[১২]

সুশান্তদের প্রথমে ব্যবহার করা হয় সীমান্তে যুদ্ধ বাধিয়ে, এই ফাঁকে কালোবাজারি করে শোষকরা হাতিয়ে নিয়েছে অনেক টাকাপয়সা। পরে সুশান্তদের ব্যবহার করে জোতদারদের স্বার্থে। যে সুশান্তদের উপর গ্রামের লোকের ছিল অপরিসীম আশা আর ভালবাসা, আস্থা; সেই সুশান্তকে ঘাতকের বেশে দেখে গ্রামের লোকদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। অবশেষে সুশান্ত বুঝতে সক্ষম হয় কীভাবে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে, ঠকানো হয়েছে।

তাই, সৌগত সৈন্যদের ফায়ার করার আদেশ দিলেও সৈন্যরা বন্দুক নামিয়ে নেয়। কারণ, যাদেরকে গুলি করতে বলা হয়েছে এরা তাদের ভাইবোন; গুলি চালাবে কি করে?সুশান্তর চোখে ও অনুভবে শোষকের আসল চেহারা, তাদের ফাঁকি উন্মোচিত হয়ে যায় বলেই সুশান্তরা রাইফেল ঘুরিয়ে ধরে। শোষকদের চিরকালীন পরিচয় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পালার পরিসমাপ্তি।

সব মালিকই আসলে এক। জোতদার, কারখানার মালিক, দেশি-বিদেশি সব মালিকই শোষণের স্বার্থে শ্রমিককে ব্যবহার করে, কখনো লেলিয়ে দেয় যুদ্ধে; কখনো চীন-সীমান্ত সংঘর্ষে, কখনো পাকিস্তান-সীমান্ত সংঘর্ষে। যুদ্ধ বাধলে মালিক-শোষক শ্রেণির খুবই লাভ। সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের মধ্যে মিথ্যা আবেগ তৈরি করে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়া যায়। শোষকশ্রেণি ঐ-সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের সীমান্ত সংঘর্ষে ব্যবহার শেষে নিজের দেশে নিজের শ্রেণির বিরুদ্ধেও ব্যবহার করে। শোষকের এ-কৌশল সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষ শোষিত হতে হতে, বঞ্চিত হতে হতে এক সময় শোষকের ফাঁকি ঠিকই বুঝতে পারে; তখন তারা অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরে – এ-বক্তব্যই এ-পালার বিষয়কেন্দ্র।

জালিয়ানওয়ালাবাগ পালাটি উৎপল দত্ত রচনা করেন ১৯৬৯ সালে। রচনার অব্যবহিত পরেই ঐ-বছরই 'সত্যাম্বর অপেরা' কর্তৃক পালাটি মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাস। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পশুশক্তি মহাযুদ্ধে জয়ী হয়ে দ্বিগুন শোষণ চাপিয়ে দিয়েছে ভারতের জনগণের ওপরে, রাউলাট আইন পাশ করে সর্বপ্রকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে পদদলিত করেছে।পাঁচ বছর পর যুদ্ধ জয় করে রেজিমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করে বাড়ি ফেরে মহেন্দরের বড় ছেলে গুরুজিৎ সিংহ ও তার বন্ধু মকবুল মোহাম্মদ। যুদ্ধ গুরুজিতের

চোখ-হাত কেড়ে নিয়েছে, আর মকবুলের নিয়েছে মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান – তারা ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে। গুরুজিতের মা-বাবা মাসের পর মাস তেতুলের বিচি সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে থেকেছে, তবুও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর তাদের শ্রদ্ধা,আনুগত্য কমেনি। দীর্ঘ পাঁচবছর প্রিয়তম পুত্রের জন্য প্রতিটি মুহূর্তে অপেক্ষা করার পর পুত্র ফিরলেও পিতা-পুত্রের মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় – পিতার কাছে রেজিমেন্টের ইজ্জত বড়, পুত্রের কাছে দেশের ইজ্জত। যে-দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন - সে-দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই, রেজিমেন্টের ইজ্জতের চেয়ে বড় বলে মনে করে গুরুজিৎ,তাই বন্ধু মকবুলের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গুরুজিৎ, মকবুল, কিচলু, কানাইয়া, সত্যপাল প্রমুখ লড়াইয়ের কৌশল নিয়ে আলোচনা করে কৌশল ঠিক করে। রেশমাকে টমসনের গৃহে গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব দেয়া হয়, শিশু গুরুবচনকে দায়িত্ব দেয়া হয় গুলির বস্তা পাচারের। রেশমা, গুরুবচন দু'জনেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে প্রতিপক্ষের হাতে ধরা পড়ে যায়। আন্দোলন যখন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন সুবিধাবাদী, আপোষকামী কংগ্রেস নেতা কানাইয়াকে গিরিধারীর মাধ্যমে ব্রিটিশরা হাত করে ফেলে। কানাইয়ার কাছ থেকে এই আন্দোলনের কৌশল এবং নেতাদের নাম জেনে যায় ওডায়ার ও টমসন। প্রথমে কিচলু ও সত্যপালকে আর্ভিং সাহেবের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে গ্রেপ্তার করে। এদের দু'জনকে বন্দি করলেও গুরুজিৎ ও মকবুল আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায়। গিরিধারীলাল, কানাইয়ালাল চতিভিন্দ ফাটকের সামনে করম সিংহ-এর বাড়িতে রাত দুটোয় মিটিংয়ের নাম করে ডেকে এনে গুরুজিৎ ও মকবুলকে ধরিয়ে দেয়।

সশস্ত্র বিপ্লবে আস্থাশীল মকবুলদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকা দেশদ্রোহী কানাইলাল ও গিরিধারীলালের মতো বিশ্বাসঘাতক আর ব্রিটিশের ছলচাতুরী, মিথ্যাচারের জন্য এ-আন্দোলন শেষপর্যন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। মিথ্যাচার ও ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে ধর্মসভার নাম করে (যে-সভায় কানাইলালের ভাষণ দেয়ার কথা)সাধারণ মানুষকে ডেকে এনে জালিয়ানওয়ালাবাগ দুর্গের সব দ্বার বন্ধ করে জেনারেল ওডায়ার ২৫হাজার নিরীহ নিরস্ত্র নর-নারী ও শিশুর উপর বিনা কারণে গুলি চালিয়ে ১৫০০ মানুষকে লাশে পরিণত করে এবং আহত করে অসংখ্য মানুষকে। রেশমা মৃত্যুর সময় উধম সিংহকে জালিয়াওয়ালাবাগের প্রতিশোধের দায়িত্ব দিয়ে যায়। উধম সিংহ ঘটনার ২১ বছর পর লন্ডনে ওডায়ারকে হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেয়।

রেজিমেন্টের ইজ্জতের চেয়ে দেশের ইজ্জতকে বড় করে দেখেছিল বলে অর্জুনসিং তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার চোখের সামনে প্রিয়তম শিশুপুত্র গুরুবচন সিং যন্ত্রণায় ছটফট করে মৃত্যুবরণ তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে –'যার দেশ নেই তার কোন ইজ্জত নেই। স্বাধীনতাই একমাত্র ইজ্জত।'[১৩] এই পালায় জালিয়ানওয়ালাবাগের নেপথ্য কাহিনী উদ্ঘাটনের সূত্রে উৎপল পাঠককে নিয়ে গেছেন ইতিহাসের ভেতরের ইতিহাসে। মকবুল ও গুরুদিৎদের সংগ্রাম সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছেও অহিংস কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকদের জন্য শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। মৃত্যুর আগে এদের শেষ সংলাপেও ধ্বনিত হয় আগামী দিনের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অঙ্গীকার এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে হেরে যাবার কারণ :

Dhaka University Institutional Repository

মকবুল॥ ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত চালাতে পারলাম না ভারতীয় বেঈমানদের জন্য, এই আমার অনুতাপ। তবে আমাদের পরে যারা আসছে, তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে ভারত সম্রাটকে লন্ডন পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এ-বিশ্বাস আমার আছে। সে-কাজ দিয়ে যাচ্ছি আমার দেশবাসীকে।

গুরুজিৎ ॥ এইটুকুই বলতে চাই, যুদ্ধে হারাতে পারেনি, বেঈমানরা ধরিয়ে দিয়েছে। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেই আপনাদের মতন বিবেকহীন পশুদের পরাস্ত করা যায় – আপসে নয়, প্রেম বিলিয়ে নয়, দরদস্তুর করে নয়– একমাত্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনতে হয় স্বাধীনতা – এই আমাদের অভিজ্ঞতা।[১৪]

ব্রিটিশের বীভৎস অত্যাচারের স্বরূপ উন্মোচনের পালা *জালিয়ানওয়ালাবাগ*-এ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস নীতি ও সশস্ত্র বিপ্লবের মূল দ্বন্দ্বগুলোজালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হয়েছে। একই সঙ্গে এ-পালা ইতিহাসের অনালোকিত কিছু সত্যকে তুলে ধরেছে।১৯১০সালের আগে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামেমাত্র বাগ ছিল, সেখানে তেমন কিছু ছিল না, এখন জালিয়ানওয়ালাবাগের উদ্যানে তৈরি হয়েছে শহীদ স্তম্ভ। এ-পালায় জালিয়ানওয়ালাবাগের নেপথ্যকাহিনী, পঞ্চাশ ও পঁচিশ হাজারের বিচিত্র সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত এবং সশস্ত্র রাজনীতি ও অহিংস কুটনীতির রহস্য-উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন নাট্যকার : 'ভারতের রাজনীতিতে দুই ধারা পরস্পরের সঙ্গে যুঝেছে চিরদিন– সশস্ত্র রাজনীতি ও অহিংস কুটনীতি। জালিয়ানওয়ালাবাগ সে-দ্বন্দ্বের প্রকাশ।'[১৫]

নীল বিদ্রোহের পটভূমিকায় উৎপল দত্ত রচনা করেন *নীলরক্ত* পালা। 'ভারতী অপেরা' ১৯৭০ সালে পালাটি প্রথম মঞ্চস্থ করে। নিরস্ত্র গ্রামীণ সহজ,সরল সাধারণ মানুষ কিভাবে দিনের পর দিন নীলকরদের অত্যাচার সহ্য করে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তারই ইতিবৃত্ত *নীলরক্ত*।

নীলকরদের নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত ইসুব বিশ্বাস আসানগর গ্রামে আসে আশ্রয় নিতে। ইসুব বিশ্বাসের উপর জুলুমের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন নীলচাষীদের ঋণ-রহস্য। এ -গ্রামের চাষীদেরও ইংরেজরা নীলচাষ এবং সাদা কাগজে টিপসই দিতে বাধ্য করে। নীলের আঁটি জমা দিয়ে টাকা আনতে যায় প্রজারা। প্রজাদের প্রথমেই ঠকায় ওজনে,তারপর বীজ, সার, নিড়ানি,গাছকাটা ইত্যাদি বাবদ কেটে নেয় টাকা– এতকিছু কেটে নেয়ার পর প্রজার ভাগ্যে আর কিছুই থাকে না। এ-হচ্ছে সেই সাদা কাগজে টিপসইয়ের ফল– ইচ্ছেমতো অঙ্ক বসিয়ে দিয়েছে লারমুর, হাইড প্রমুখ নীলকররা; এভাবে প্রজাদের সর্বস্বান্ত করতে থাকে। এ-দিকে ইসুব বিশ্বাসকে ধরতে না পেরে তারা জিম্মি হিসেবে আটকে নির্যাতন করে বিন্দুর ছেলে বিশুকে, পরে বিন্দুর কোলে ছেলের লাশ তুলে দেয়।

এসব অত্যাচার নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে সকলেই সিদ্ধান্ত নেয় কেষ্টনগরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবার। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কোনো সুবিচার তো এরা পায়ইনি; উল্টো প্রজাদের ১৮৩০ সালের আইন অনুযায়ী হুলিয়া দেয়া হয়। অসহায় কৃষকরা নিরাশ,নিরুপায় হয়ে গ্রামে ফিরে এসে সুবোধ বালকের মতন নীল চাষ

করতে শুরু করে। দিনের বেলা মন দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে নীল চাষ করে আর রাতের বেলা শড়কি খেলে বনের মধ্যে; একমাস-দুমাস – যদ্দিন না তৈরি হচ্ছে হাত আর চোখ;ক্রোধ, ঘৃণা জাগছে মনে। তাদের উপলব্ধি :

> নীলকুঠি দেশের দেহে বিষফোঁড়া ! দেহের মধ্যে বিষ ঢুকেছে –ইংরেজ ঢুকেছে। সেই ইংরেজের আদালত-পুলিশ-সরকার সব কিছুকে শক্ত হাতে নির্মূল করতে হবে। এ-দেশ থেকে ইংরেজ মহাজনকে তাড়িয়ে সমুদ্দুর পার করে দিয়ে আসতে হবে। সে-কাজ এসে পড়েছে আমাদের ওপর ! কত বড় দায়িত্ব বুঝলি ? এ দেশকে স্বাধীন করতে হবে। হাতজোড় করে মিনতি করে কোনো লাভ নেই সুবিচার প্রার্থনা করে কোনো লাভ নেই, নিষ্পত্তি হবে লড়াইয়ের ময়দানে বন্দুকের বিরুদ্ধে শড়কি হাতে নিয়ে![১৬]

এ-ভাবে আসানগর গ্রামের সকলে তৈরি হতে থাকে। তৈরি হয়ে, নীলকুঠি জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়ে থানা, বদরিঘাট আর শাহাগঞ্জের নীলকুঠি আক্রমণের জন্য তারা অগ্রসর হয়।এদিকে মেঘাই সর্দারের ছেলে মানিক সর্দার শিবদাসপুরে জঙ্গল কেটে ফসল ফলিয়ে সাঁওতালদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। শিবদাসপুরকে বাঁচাতে মানিক লারমুর, হাইডদের গোপন তথ্য দেয় এবং চিঠি দিয়ে পালিত পিতা মেঘাই সর্দারকে এনে ধরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে। মেঘাই সর্দার লাঠিয়াল সেজে নিজহাতে বিশ্বাসঘাতক ছেলে মানিককে হত্যা করে স্বেচ্ছায় ইংরেজদের হাতে ধরা দেয়। এখানেই পালার পরিসমাপ্তি।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে নীল বিদ্রোহ নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র *নীলদর্পণ* নাটক লিখে সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি করেন। *নীলদর্পণ* নাটক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে,নবীনমাধব এবং তোরাপ প্রতিবাদও করেছে কিন্তু এই নাটকের চরিত্রসমূহ সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। দীনবন্ধুর *নীলদর্পণ*-এ পরপর ছটি মৃত্যু সংগঠিত হয়। উৎপলের *নীলরক্ত*-এর চাষীরা মৃত্যুর মধ্যে সমাধান খুঁজে নেয় না। তারা তৈরি হয়েছে ভিন্নভাবে–সংগোপনে,রাতের বেলায় এবং দিনে দিনে তৈরি হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। শোষিত কৃষক প্রজারা শোষিত হতে হতে অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। নীলকরদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছে সংগঠিত হয়ে এবং দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে নীলচাষীদের কণ্ঠে। এখানেই উৎপল-এর *নীলরক্ত* পালার স্বাতন্ত্র্য।

সন্ন্যাসীর তরবারী পালার রচনাকাল ১৯৭২ সাল। বিশ্বরূপায় ঐ-বছরেই এপ্রিলে পালাটি মঞ্চস্থ করে ‘লোকনাট্য দল’। উনিশ শতকের ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ *সন্ন্যাসীর তরবারী* পালার বিষয়বস্তু। দেশে তখন চরম দুর্ভিক্ষ চলছে। ক্যাপ্টেন র‍্যানেল দেশের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে হেস্টিংসকে রিপোর্টে জানায় –বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ ইতোমধ্যে মরে গেছে। এমনই দুঃসময়ে মুসা ফকির গান গেয়ে ডাক দিয়ে যায়। বুঝিয়ে দেয় কেন মানুষ মরছে, কে মারছে তাদেরকে? মুসা ফকির আবার গান গায়, আর জানায় তাদের ডাক এসেছে – যেতে হবে সীমান্তের অরণ্যে। আর এ-ডাক এসেছে মজনু শাহর পক্ষ থেকে। জগাই মুসার কাছে জানতে চায় সে কি তার মেয়ের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবে। মুসা উত্তরে জানায় –তিনি মরা মানুষ জাগান না । জ্যান্ত মানুষকে জাগিয়ে ফেরেন। তার হাতে জুলফিকার তরবারী।

প্রফুল্ল সময়মতো খাজনা পরিশোধ করা সত্ত্বেও তার স্বামীকে গুম করে তাকে জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করে, এমনকি সংসার সন্তান থেকেও কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে দেয় হেস্টিংস। সব হারিয়ে যখন আর কিছু বাকি নেই, সন্তানও নেই তখন রিক্ত নিঃস্ব প্রফুল্লকে ভবানী পাঠক(কৃপানন্দ) নিয়ে যায় সন্ন্যাসী মজনু শাহর কাছে, প্রফুল্ল হয়ে যায় দেবী চৌধুরানী। এক প্রান্তরে সমবেত হয়েছেন মশাল ও অস্ত্রে সজ্জিত সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল। কৃপানন্দ বলছেন :

> আজ থেকে দশ বৎসর পূর্বে এই তরবারী হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন মজনু শা,মুখে দিয়েছেন স্বাধীনতার মন্ত্র,অঙ্গে গৈরিক ও নীলবসন, বুকে এক ও আশ্চর্য প্রতিজ্ঞা। প্রথমে ভাবতাম ছেলেমেয়ে ক্ষুধায় মরে আমরা পাপ করেছি বলে...। এই আঁধারে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা সকলে আর নীরবে মরেছি ক্ষুধায় আর ভেবেছি ধনী-দরিদ্রের এই ব্যবধান এটা জগদীশ্বরের বিধান। মজনু শা চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে বুকের আঁধার দূর করে দিয়েছেন। এখন জানি আমরা ক্ষুধায় মরি বলেই ওদের এত ধন,আমাদের অন্ন কেড়ে নিয়ে ওদের বিলাস। আরো জেনেছি শুধু জমিদার মহাজন নয়, তার পেছনে দেখা যাচ্ছে ইংরেজের লাল মুখ। প্রথমে সে মুখ ঢেকে রেখেছিল বণিকের বিনয়ে, তারপর দেখি সে বণিক নয়,দস্যু। সে কেড়ে নিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ফের কেড়ে নিতে হবে।[১৭]

মজনু শাহ দৃশ্যের আড়ালে থেকে যান আর দীপ জ্বেলে যান দেশ থেকে দেশান্তরে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ফকির-সন্নাসীরা লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। অনেক যুদ্ধ জয় শেষে মহাস্থানগড়ের যুদ্ধে কৃপানন্দরা পরাজিত হয়। ইংরেজরা মজুতদারদের গোলা ভেঙে ধান বিলাতে শুরু করে। চাষীরই ধান চাষীকে বিলায় তারা বাধ্য হয়ে; বিদ্রোহীদের আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে। হঠাৎ সুদিনের মুখ দেখে মানুষ বিদ্রোহীদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এবারে কুঠি লুটের অভিজ্ঞতায় দেবী বুঝতে পেরেছে মানুষ আর তাদের দিকে নেই।তবুও দেবীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আশাবাদ :

> বিদ্রোহী মরতে পারে,কিন্তু বিদ্রোহ কখনো মরে না। প্রত্যেকে জ্বেলে রাখব স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রদীপ, অখ্যাত কোনো পল্লীর কোনো ভাঙা কুটিরে। তারপর আবার সেই প্রদীপ থেকে জ্বলবে আগুন – একদিন না একদিন ।[১৮]

মোরাও অরণ্যে আগুন দেয়া হয়েছে, বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা অর্ধদগ্ধ অবস্থায় বের হলেই তাদের গুলি করে হত্যা করছে ব্রিটিশ সৈন্যরা। কৃপানন্দ সকলকে অরণ্য ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে সন্ন্যাসীর শপথ থেকে মুক্ত করে দেয়। এদিকে ধূর্ত রেনেল গোপনে অন্নে বিষ মিশিয়ে কারাগারে রামানন্দ গিরিকে হত্যা করে আর জনগণকে জানিয়ে দেয় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে করাগারে গিরি মরে গেছে। ফাঁসিতে ঝোলালে লোকে অনুপ্রাণিত হতো – এক গিরি থেকে তৈরি হতো অসংখ্য গিরি। সকলেই যখন প্রশ্ন করে রামানন্দ গিরি মরে গেছে? তখন দেবী উত্তরে জানায় :

> রামানন্দরা মরে নাকি কখনো? তরবারির মৃত্যু নেই।...মজনু শাহর তরবারি রামানন্দ গিরি। ইস্পাতের মৃত্যু নেই। এ অস্ত্রকে শক্ত মুঠোয় ধরতে পারলেই হয়। সন্ন্যাসীর মৃত্যু নেই।[১৯]

দেবীর কণ্ঠে ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহীদের বিশেষত মজনু শাহর তরবারি (রামানন্দ গিরির) ইস্পাতের অমরত্বের আশাবাদের মধ্য দিয়ে পালার পরিসমাপ্তি। *সন্ন্যাসীর তরবারী* পালা অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সফল পালা। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত এ-পালায় চরিত্র নির্মাণে ও কাহিনী বিন্যাসে সর্বত্রই দ্বান্দ্বিকতার সূত্র প্রয়োগ করে শিল্প-সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছেন।

ছিয়াত্তুরের মন্বন্তরের অনিবার্য পরিণতি ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ। ১১৭৬-এর মহাদুর্ভিক্ষে হিন্দু,মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে মজনুশাহ,ভবানীপাঠকের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসক এবং তাদের এদেশীয় দোসর তাবেদার মহাজন, জোতদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে। কৃপানন্দ, রামানন্দ,চেরাগ আলী, দেবী চৌধুরানীরা সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন; শেষ পর্যন্ত যদিও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর কাছে তাদের পরাস্ত হতে হয়। এ-পালায় উৎপল দত্তের ইতিহাস-বীক্ষা পাঠকক-দর্শককে নিয়ে গেছে আসল ইতিহাসে।

সুপ্রকাশ রায়, হান্টার প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহকে হিন্দু-মুসলমানের যুগপৎ আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন; হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখেন নি। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত *আনন্দমঠ*ও *দেবী চৌধুরানী* উপন্যাসে এ-বিদ্রোহকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে সন্তানধর্মের ক্ষুদ্র আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন; যেন ইংরেজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করাই সন্তানদের প্রধান কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে এই আন্দোলনকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন উৎপল দত্ত সেখানে এই আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের দলিল *দিল্লী চলো* যাত্রাপালা। ভারতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা সুভাষ বসুর জীবনের একটি অধ্যায় *দিল্লী চলো* পালা। এ-পালাটি ১৯৭০ সালে 'লোকনাট্যদল' প্রযোজনা করে। টীম-ওয়ার্ক ও বলিষ্ঠ বক্তব্যে এ-পালা খুবই দর্শকপ্রিয় হয়েছিল। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে *দিল্লী চলো* পালার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার রাজনীতি। পালার শুরুতে কর্নেল কিয়ানির জবানিতে জানা যায় – আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের ভূমিতে প্রবেশ করে ১৯শে মার্চ ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ ফৌজের ব্যূহ ভেদ করে। পালেল বিমান ঘাঁটি উড়িয়ে দেয়া ও পুরুম-চুমপাং গ্রামে নাগা নেতৃবৃন্দের বৈঠকে নেতাজী সুভাষ বসুর উপস্থিতি নিয়ে পালার কাহিনী আবর্তিত হয়েছে।প্রদ্যোতের উত্তরের মধ্য দিয়ে পালার(সমাপ্তি এবং) সার কথা ধ্বনিত হয়েছে:

> জাপানীদের সাহায্য করতে তো আসিনি। আমার সহযোদ্ধাদের বাঁচিয়ে নিয়ে গেছেন নাগা মুক্তিযোদ্ধারা। আর আমরা দুজন এখানে মরছি – ভারতের অগণিত জনগণকে এই বার্তা পোঁছে দিতে - গেরিলা-যুদ্ধ ছাড়া ভারতের মুক্তি নেই! সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে, মুক্তি নেই শোষণ থেকে। বারবার হয়তো পরাজিত হবে

ভারতের গেরিলাবাহিনী আর বারবার সেই ধ্বংসস্তুপ থেকে জন্ম নেবে নতুন গণফৌজ, যার রাইফেলের গর্জনে সূচিত হবে মুক্ত,ckvlYnxb শ্রমিক-কৃষকের ভারতবর্ষ।[২০]

সমুদ্রশাসন পালার রচনাকাল ১৯৭০ সাল। 'লোকনাট্যদল' বিশ্বরূপায় পালাটি প্রথম মঞ্চস্থ করে ঐ-বছরের ৩রা অক্টোবর। এ-পালা সম্পর্কে শোভা সেন জানিয়েছেন : 'নাটকটি আদতে লেখা হয়েছিল সত্যাম্বর অপেরার শৈলেন বাবুর অনুরোধে। কিন্তু নাটক পড়ে ওঁর মনে হয়েছিল এ-নাটক করার মত শক্তি ওঁর দলের নেই। তখন নীলমনি বাবুই ওটা নিলেন।... পরে এ-নাটকই আমরা *সূর্যশিকার* নাম দিয়ে আমাদের থিয়েটারে অভিনয় করে সুখ্যাতি পেয়েছিলাম।'[২১]*সমুদ্রশাসন* পালারমঞ্চভাষ্য *সূর্যশিকার* নাটক।

আফগানিস্তানের সীমান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি *সীমান্ত* পালার উপজীব্য। 'লাকনাট্য দল' ১৯৭৫ সালে পালাটি মঞ্চস্থ করে। 'জনতার স্বাধীনতার সীমান্ত ছাড়িয়ে এক পা এগুলে – কোন স্বেচ্ছাচারীর নিস্তার নেই।'[২২]নাট্যকার এই পালার মাধ্যমে সেই বিষয়টিই দর্শকের সামনে হাজির করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বিশ্বের প্রথম বামপন্থী সরকারের জয়-পরাজয়ের ইতিবৃত্ত *মুক্তিদীক্ষা* পালা। পারি কমিউন উৎপলের প্রিয় বিষয়। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে লেখা *মুক্তিদীক্ষা* পালাটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। 'লোকনাট্য দল' পালাটি মঞ্চস্থ করে ১২ই আগস্ট ১৯৭৭ সালে স্টার থিয়েটারে।

দৈনিক ফিগারো পত্রিকার সম্পাদক পিয়ের রোশেল পালার শুরুতেই জানান বিশ্বের প্রথম বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ রাত আন্দাজ দশটা নাগাদ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। শতকরা ৭৬ ভাগ ভোটে জিতে বামপন্থীরা সরকার গঠন করে। গরীব সর্বহারা শ্রেণি ভোটে জিতে পারি কমিউনের প্রথম অধিবেশনে নাগরিকদের যে মূল অধিকারের সনদ গ্রহণ করেছে তা হল : বাঁচার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা,বিবেকের স্বাধীনতা, সভা সমাবেশের অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা, নিজ ইচ্ছানুযায়ী ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার। বুর্জোয়া সরকারের আমলে এই সমস্ত কোনো অধিকারই জনতার ছিল না, ছিল না শ্রমজীবী মানুষের। সর্বহারা শ্রেণিই অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করেছে; স্বাধীনতার আলোয় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

শাসকশ্রেণি মেহনতী জনতার সঙ্গে যখন কোনোভাবেই পেরে উঠছে না, শ্রমিকশ্রেণি ভালভাবেই দেশ চালাচ্ছে, তখন শোষকরা বেছে নেয় ঘৃণ্য, জঘন্য ও মানবতা-বিধ্বংসী পথ। তারা ক্রিমিনাল সাভিনাককে দিয়ে মজুরদের ঘরেরই ছেলে লাফোঁকে ভয় দেখিয়ে ম্যানেজ করে রুটির কারখানার নকশা সংগ্রহ করে কারখানা পুড়িয়ে দিয়ে

দেশে খাদ্যের হাহাকার সৃষ্টি করে, খাবারে বিষ মিশিয়ে স্কুলের শিশুদের হত্যা করে। লাঁফোকে কেউ সন্দেহ করে না, সে কমিউনার্ডদের মাঝেই মিশে থাকে কিন্তু এই বিবেকহীন মেরুদণ্ডহীন নরপিশাচ একসময় নিজের প্রেমিকাকেও হত্যা করে। লাফোঁ ব্যারিকেডের নকশা শোষকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে কমিউনকে খতম করার পথ বাতলে দেয়। এতকিছু করেও লাফোঁ বাঁচতে পারেনি। ষড়যন্ত্রকারী সাভিনাকের চালাকিতে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্র কমিউনের পরাজয়কে অনিবার্য করে তোলে। কমিউনের হেরে যাবার কারণ শনাক্ত করতে গিয়ে গী বলে –'এবার হেরে গেলাম শুধু ধূর্ততার জবাবে ধূর্ত হতে পারিনি বলে, নির্দয়তার উত্তরে নির্দয় হতে পারিনি বলে।' রাভিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ করে বলে– 'আর কৃষকদের হাত ধরতে পারিনি বলে।'[২৩] তাই ভার্ল্যা মনে করে, এরপরে যারা লড়বে তারা আর সে ভুল করবে না। ক্লোদেৎ শেষপর্যন্ত অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে লড়তে লড়তে বলে যায় :

> কমরেডস্, পারি কমিউন শেখাচ্ছে...দুনিয়ায় কোনো বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্র ধনিকশ্রেণি হিংস্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাকে উচ্ছেদ করতে। নির্বিচার হত্যা, ষড়যন্ত্র, নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার, গুপ্তহত্যা সব হবে তার অস্ত্র। খসে পড়বে তার গণতন্ত্রের চেহারা, সে ছিঁড়ে ফেলবে তার নিজের সংবিধান, ভেঙে দেবে নির্বাচিত আইনসভা, বাতিল করে দেবে আদালতের অধিকার, নিষিদ্ধ করবে সভা-সমাবেশ, কেড়ে নেবে সব নাগরিক স্বাধীনতা, চাপিয়ে দেবে যুদ্ধ। তাই বামপন্থী সরকার শুধু কায়েম করলেই হয় না, তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও নিতে হবে জনগণকে।[২৪]

শেকসপিয়ারের *রোমিও এন্ড জুলিয়েট* অবলম্বনে উৎপল দত্ত রচনা করেন *ভুলি নাই প্রিয়া* পালা। পালার রচনাকাল ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ ; 'শ্রীমা নাট্য কোম্পানি' ঐ-বছরই ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে পালাটি মঞ্চস্থ করে। *ভুলি নাই প্রিয়া* শেকসপিয়ারের *রোমিও এন্ড জুলিয়েট*-এর বঙ্গীকরণ;এর প্রেক্ষাপট সিরাজ-উদ্‌দৌলার মুর্শিদাবাদ। তাই পাত্র-পাত্রী ভারতীয় – হিন্দু বংশীয় রঞ্জন আর মুসলিম বংশীয় রৌশনারা। রঞ্জন আর রৌশনারা দুই অভিজাত পরিবারের বিরোধ পুারুষানুক্রমে চলে আসছে। এদের প্রেম তাই চূড়ান্ত পরিণতিতে গড়ায় না; হিন্দু-মুসলিম বিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। শেষপর্যন্ত রঞ্জন-রৌশনারা কেউ কাউকে পায় না, তাদের জীবনে নেমে আসে বেদনাময় মর্মান্তিক পরিণতি; দুজনের আত্মহনন। শেকস্‌পিয়ার *রোমিও এন্ড জুলিয়েট* নাটকে যেমন তার দেশ-কাল সমসাময়িক সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন তেমনি উৎপল দত্ত *ভুলি নাই প্রিয়াতে*ও তাঁর দেশ-কাল-সমাজ,সমাজের অস্থিরতা, মূল্যবোধ সবই তুলে ধরেছেন। ভারতীয় সমাজের এই মূল্যবোধ, অস্থিরতার জন্যই অকালে ঝরে পড়ে দুটি তাজা প্রাণ রঞ্জন আর রৌশনারা। শেষ পর্যন্ত নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার কাছে সংবাদ পৌঁছালে সিরাজউদ্‌দৌলা এই অঘটনের উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে আসল কারণ শনাক্ত করে উচ্চারণ করেন সেই সাবধান-বাণী :

> ওদের নিহত প্রেমের সমাধি থেকে এক ভয়ঙ্কর সাবধান-বাণী উত্থিত হচ্ছে সমস্ত হিন্দুস্তানের সম্মুখে। হিন্দু-মুসলমান কাফের আর যবন – এই সব অন্ধ গোঁড়ামির বিভেদ যদি না দূর হয়,যদি ধর্মের অজুহাতে ভাই-ভাই পর হয়ে থাকে,সে দেশে জন্মায় এমন নিষ্ফলা প্রেম–রঞ্জন আর রৌশনারার মতো।[২৫]

জয়বাংলা পালার পটভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। 'লোকনাট্য দল' রবীন্দ্রসদনে পালাটি প্রথম মঞ্চস্থ করে ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির 'জয়বাংলা' শ্লোগানে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নয়মাস রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের আলেখ্য *জয়বাংলা* পালা। আটটি দৃশ্যে বিন্যস্ত এ-পালা।

প্রেম,বিশ্বাসঘাতকতা,সুদখোর মহাজন, পাকিস্তানি হায়েনাদের পৈশাচিক আচরণও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের মরণপণ লড়াই এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সকলের যূথবদ্ধ প্রয়াস *জয়বাংলা* পালাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

ডিরোজিওর বর্ণাঢ্য-জীবনী অবলম্বনে উৎপল দত্ত *ঝড়* পালা রচনা করেন ১৯৭৩ সালে। 'লোকনাট্য দল' রনজি স্টেডিয়ামে ১৯শে সেপ্টেম্বর পালাটি প্রথম মঞ্চস্থ করে। এ-পালা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। *ঝড়* পালা প্রযোজনা করে লোকনাট্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর গৃহে বিচিত্র বিষয় নিয়েআড্ডা হতো। এতে উপস্থিত থাকত তাঁর ছাত্ররা – ডিরোজিও এবং ডিরোজিয়ানরা সমাজের আচার,প্রথা,বিশ্বাস, ধর্ম সবকিছুকে যখন প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে; তখন সমাজের লোকজনও ওঠে পড়ে লেগেছে চলমান সমাজের আচার,প্রথা,বিশ্বাস, ধর্ম সবকিছু অক্ষুণ্ন রাখতে। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং ডিরোজিও-এর বোন এমিলিয়া– পরস্পরকে ভালবাসে; এদের বিয়ের দিন-তারিখও স্থির। রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার-এর পরামর্শ এবং সমাজের সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়েই ডিরোজিও বিয়েতে মত বদলান। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন গুরুর এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ;এমিলিয়া হতবাক হয় ভাইয়ের আচরণে।

(হিন্দু কলেজে) নিচে কলেজ কমিটি ডিরোজিওকে পদচ্যুত করার জন্য যখন সভা করছে তখনও উপরে তিনি (ডিরোজিও) ক্লাশ নিচ্ছেন–কারণ তিনি বিশ্বাস করেন; তিনি কলেজ ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর ছাত্ররা পড়াশুনা বন্ধ করে দেবে না। ডিরোজিওর বক্তৃতার মাঝখানেই রাধাকান্তদেব,রামকমল বাবু,হেয়ার সাহেব ও ভবানীবাবু প্রবেশ করে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব এবং সে-প্রস্তাব ঐ মুহূর্তেই কার্যকর করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। রাধাকান্তদেবের বাড়িতে ওলাবিবির উৎসব, সাথে এলাহি খানাপিনাসহ বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে ডিরোজিওকে স্বরস্বতীর মাধ্যমে (যে স্বরস্বতীকে বোনের মর্যাদায় তাঁর গৃহে ঠাঁই দিয়েছিলেন) অপদস্থ করেন রাধাকান্ত দেব। ডিরোজিও ভীষণ অসুস্থ,ওদিকে দারিদ্র্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কিন্তু থামলে চলবে না,ইস্ট ইন্ডিয়ান পত্রিকার জন্য অবিরাম লিখে যেতে হবে মাথা নত না করে। তাঁকে দেখতে এসেছে তাঁর ছাত্ররা এবং অন্যরাও। মৃত্যুর আগেও ডিরোজিও ছাত্রদের বলে যাচ্ছেন 'কাজ ছেড়ো না – লেখা ছেড়ো না– দা ফাইট গোজ অন! লড়াই চলছে'।

ডিরোজিও এক দ্রোহের নাম,ডিরোজিও এক বিপ্লবের নাম, ডিরোজিও এক ঝড়ের নাম। উনিশ শতকের বাংলার সংস্কার-সংস্কৃতির জগতে ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলদের বিপ্লব-বিদ্রোহ *ঝড়* পালার

উপজীব্য। হিন্দু কলেজের তরুণ পণ্ডিত মেধাবী বিপ্লবী শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সেই আলো জ্বেলে যেতে চেয়েছেন, যে আলোয় পথ চলে এই জীর্ণ সমাজটাকে ধরে একটা ভীষণ নাড়া দেয়া যায়। সত্য বলে যা জানবে তারা সেই সত্য প্রকাশে কুণ্ঠিত হবে না। যাই ঘটুক না কেন, সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। ডিরোজিওর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

> আমি ... একটা ঝড়ের মতন এসে জীর্ণ ও পুরাতনকে উড়িয়ে নিতে চাই, ওদের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সমাজটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাই। আমি মার্কিন বিপ্লবী টম পেইন এবং ফরাসী বিপ্লবী রোবসপিয়েরের শক্তি এই মুষ্টিতে একত্র করে এমন একটা ঘুঁষি মারতে চাই যে ওরা যেন ডিরোজিওর নামে চিরদিন ত্রাসকম্পিত হয়।[২৬]

মাও-ৎসে তুং-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-প্রবাহের উপর ভিত্তি করে উৎপল দত্ত রচনা করেন *মাও-ৎসে* তুং পালা ১৯৭৪ সালে; 'তরুণ অপেরা' ঐ-বছরেই সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ পালাটি মঞ্চস্থ করে। তেরটি (দৃশ্যে) চিত্রে বিন্যস্ত *মাও-ৎসে* তুং পালা। পালার সূচনায় ওয়েই কুং-চি আসরে এসে চীনের ইতিহাস সম্পর্কে দর্শকদের অবহিত করে।এরপরের ঘটনাপ্রবাহ ভিন্নরকম। একদিকে হুনান প্রদেশসহ বিভিন্ন প্রদেশে কৃষক-জনতা জেগে ওঠেছে;হুনানে কৃষকদের জমি দখলের নেতৃত্ব দিয়েছেননারী-বিপ্লবী ইয়াং কাই-হুই,মাও-ৎসে-তুং-এর সহধর্মিনী। মাও জমি দখলের লড়াইকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন,প্রথমে গেরিলা বাহিনী তারপর গণফৌজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট থেকেছেন।

শুরু হয় বিশ্ব ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লং মার্চ। জেনারেল চাং সুয়ে-লিয়াং জানান জাপানিদের হাতে সাংহাইয়ের পতন হয়েছে; তিনি জানতেন না যে, চিয়াং গোপন চুক্তি করেছে সাংহাই,পিকিং, ক্যান্টন–সব শহর বিনাযুদ্ধে জাপানিদের হাতে তুলে দেবে। ইয়েনান আক্রমণের দায়িত্ব দেয়া হয় লিয়াংকে,প্রথমে অস্বীকার করলেও শর্তসাপেক্ষে রাজি হয় সে। জেনারেল লিয়ান কৌশলে চিয়াংকে সিয়ান শহরে এনে মাওদের হাতে তুলে দেন। মাও-ৎ-সে-তুঙরা চিয়াংকে রাষ্ট্রপতি সম্বোধন করেন। জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধে তিনি প্রধান থেকে ইয়েনান আর চুংকিং একসঙ্গে লড়াই করবে। চিয়াংকে সুপ্রিম কমান্ডার করে লালফৌজ তার অধীনে থেকে লড়বে। চিয়াং-মাও-এর সাথে এক হয়ে চুক্তিতে সই করে;তার স্ত্রীও কথা দেয় চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। তারপরও ফিরে এসে চিয়াং চুক্তিভঙ্গের চেষ্টা করে কাইফেং সামরিক দপ্তরে যোগাযোগ করে। লালফৌজ ধ্বংস করার জন্য গোপনে আদেশ দিলে তার স্ত্রী তাকে বেঈমানির জন্য ধিক্কার দেয়। ধিক্কার দেয় সকলে। ধিক্কারে ভরে যায় জগৎ। পিকিং, সাংহাই, ক্যান্টন মুক্ত হয়, চীনের বিশাল গ্রামাঞ্চল মুক্ত হয়। অবশেষে চুংকিঙের উপকণ্ঠে চীন বিপ্লবের শেষ অধ্যায়। সরকারি ফৌজ চীনের সর্বত্র বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। চু-টে জানায়, মাও-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ অভিযান সম্পূর্ণ করা হয়েছে, বিপ্লব সমাধা করা হয়েছে। মাও-ৎসে-তুঙ মঞ্চে ওঠে বক্তৃতা দেয়ার মধ্য দিয়ে পালার পরিসমাপ্তি :

> কমরেডস্ ! বক্তৃতা আমি দিতে পারি না,কখনও জনসভায় বক্তৃতা দিইনি। আমি কৃষকের ছেলে, শ্রমিকদের ছাত্র,আমি বক্তৃতা দেব কি করে? তবে যা হৃদয় দিয়ে বুঝেছি, বুকে অনুভব করেছি তাই বলছি। ১৯২৭ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করে আমরা জিতেছি। আমাদের রাইফেলের নলে এই ঘোষণা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছি যে– সাম্রাজ্যবাদকে

> এশিয়া ছাড়তে হবে। আমাদের প্রতিটি বুলেটে এই ঘোষণা ছিল যে এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে শোষকদের জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়েছে। আমাদের কামানের গর্জনে এই কথা বিশ্বের মেহনতী মানুষকে জানাচ্ছি–অস্ত্র ছাড়া জয় হয় না,নিয়মতান্ত্রিক প্রতারণায় ভুলে থাকবেন না–একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের মেশিনগানের কণ্ঠে জেগেছে রণধ্বনি–অস্ত্র সংগ্রহ করুন, গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলুন,গণফৌজ গড়ুন–নইলে শোষণের দুর্গে ইতিহাসে কোনদিন চিড় খায় নি, খাবে না।[২৭]

এই পালার সুর সংযোজনায় অভিনবত্ব ছিল;বিশ্বের শোষিতের মুক্তির গান খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। লং মার্চের সুর হয়েছিল কোরাসে,দি রেড সান রাইজেস,দি ইস্ট ইজ রেড গানটির অনুবাদ করেন ও সুরারোপ করেন উৎপল দত্ত;শীর্ষ সঙ্গীতে দুর্গা এবং ভূপালির মিশ্রণ চৈনিক সুরের কাছাকাছি গিয়েছিল। মাও-ৎ-সে-তুঙ এবং তাঁর সহযোদ্ধাদেরসহ চীনের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেভাবে দৃশ্যে দৃশ্যে সাজানো হয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার কুড়িয়েছিল। এই পালায় প্রেমও এসেছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায়। চেয়ারম্যান মাওয়ের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে যুদ্ধদিনেও তাদের পারস্পরিরক বোঝাপড়া,ভালবাসা,সন্তান বাৎসল্য এই পালাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। মাও-ৎ-সে-তুঙ যাচ্ছেন চুন এন-লাই-এর সঙ্গে দেখা করতে,স্ত্রীকে বলছেন 'চলো কাই-হুই'। স্ত্রী জানতে চাচ্ছে 'কোথায়'? উত্তরে মাও বলেছেন,

> আমাকে গ্রামের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে না? রোজই তো দাও।
> {সবলে কাই-হুই-এর বাহু ধরেন}
> তুমি পেছন থেকে হাত না নাড়লে আমি যাব কি করে?[২৮]

বৈশাখী মেঘ পালাটি প্রথম অভিনয় করে 'লোকনাট্য দল' ৪ অক্টোবর,১৯৭৪ সালে স্টার থিয়েটারে। বারোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত *বৈশাখী মেঘ*। তিরিশ-চল্লিশের দশকের সশস্ত্র বিপ্লবীদের কর্মযজ্ঞ এই পালার উপজীব্য। মোহিত মিত্র,শুভ্রা সরকার এরা বিপ্লবী গুপ্ত সংঘঠনের সদস্য। পালার শুরুতে দেখা যায় মোহিত মিত্র আসামীর কাঠগড়ায়। সরকারি উকিল আসামী মোহিতের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ উত্থাপন করে।উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মোহিত মিত্রের কিছু বলার আছে কিনা বিচারপতি জানতে চাইলে নিজেকে দোষী,নির্দোষ কোনোটাই প্লীড না করে একটি বিবৃতি পড়তে চায় মোহিত। প্রথমে পড়তে দিতে না চাইলেও শেষপর্যন্ত মোহিতকে বিবৃতিটি পড়তে দেয়া হয়। বিবৃতি পড়তে গিয়ে মোহিত মিত্র বলে :

> এই তথাকথিত ট্রাইবুনালের সামনে এসে অবধি একটি কথাই শুনছি–দেশদ্রোহী। আমি দেশদ্রোহী,আমার কৃষক-সহযোদ্ধারা দেশদ্রোহী,আমার পার্টি দেশদ্রোহী। এখানে কোনো কথা কইবার পূর্বে...আমাকে জানতে হবে, আমাকে বিচার করার কোনো অধিকার এই সরকারের আছে কি না; আমাকে জানতে হবে, কে দেশদ্রোহী–আপনারা, না অমরা। যদিও এখানে আমি আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করব, সেটা কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত বিলাপের উদ্দেশ্যে নয়, একটা গোটা দেশের রাজনৈতিক জীবনের দর্পণ হিসেবে। আমি ও আমার সহযোদ্ধারা ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের একটি অবহেলিত পরিচ্ছেদ। সেটা জনতাকে জানাতে চাই, আপনাদের নয়– কারণ আপনাদের আমি স্বীকারই করি

> না।...আমার কাহিনীর শুরু ১৯৩১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী,মধ্যরাত্রে – নারায়ণগঞ্জ শহরের স্টিমারঘাটার একটি বৃহৎ গুদামের এক কোণে-[২৯]

মোহিত যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র,টগবগে তরুণ, তখনই বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়; সেই সূত্রেই নারায়ণগঞ্জের একটি স্টিমারের গুদামঘর এবং মোহিতের পরিবারও জড়িয়ে যায়। তারপর নানা ঘটনা-প্রবাহ;এই ঘটনা-প্রবাহের অংশই নারায়ণগঞ্জ মামলা।নারায়ণগঞ্জ মামলার রায়ে আসামি সাবিত্রি মিত্র ও মীনাক্ষী মিত্র প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস, পরিমল ঘোষের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড,মনসুর আহমেদের দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড, শেখ কলিমুদ্দিনের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, মোহিত মিত্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং শুভ্রা সরকারের ফাঁসি। ১৯৩১ সালের ৫ই ডিসেম্বর প্রত্যূষে শুভ্রার ফাঁসি কার্যকর হয়।পালার শেষ দৃশ্যে দেখা যায় সেই বিজয় ঘোষাল পুলিশ-মন্ত্রী হয়েছেন। বিজয় ঘোষালরা বেঈমানি করে বিশ্বাসঘাতকতা করে, মন্ত্রী সেজে দেশপ্রেমিক মোহিতকে দেশদ্রোহী হিসেবে অভিহিত করলে মোহিত প্রতিবাদ জানায় :

> এই লোকটির জীবন বাঁচাতে একদিন আমার পুরো পরিবার নিঃশেষে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিল। আমাদের জীবনের বিনিময়ে ব্রিটিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এরা আজ মন্ত্রী সেজে বসেছে ! এরা আমাদের বলছে দেশদ্রোহী ? লজ্জা নেই ?[৩০]

মোহিত সাক্ষীকে জেরা করার শেষ সুযোগও গ্রহণ করে না, কারণ এই আদালত, সাক্ষী কিছুই এরা মানে না। বিচারক দণ্ড গ্রহণের জন্য তাকে প্রস্তুত হতে বলে এবং তার কিছু বলার থাকলে বলতে বললে মোহিত বলে :

> ভেবেছিলাম বলব না। তবে বলছি– জনতার কাছে, আপনাদের কাছে নয়। আমার সহকর্মী শহীদ শুভ্রা সরকার বলেছিলেন,অত্যাচারী ম্যানিংহামকে–বিপ্লবীদের তালাবদ্ধ করতে পারেন,বিপ্লবকে নয়। বিপ্লবের সেই অবিচ্ছিন্ন গতিটা আপনাদের বুঝতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ– সেই ক্ষুদিরাম,কানাইলাল থেকে বিনয়বসু,ভগৎ সিং,সূর্য সেনের পথ ধরে,বিপ্লব এগিয়ে এল সুভাষচন্দ্রের আই-এন-এ বাহিনীর রাইফেলের মুখে, বোম্বাই-এ নৌবিদ্রোহের কামানের মুখে। সেইবিপ্লবই আজ ফেটে পড়েছিল তেলেঙ্গানায় আর কাকদ্বীপে। শত্রু একই–সাম্রাজ্যবাদ আর শোষকবর্গ,মুক্তিযোদ্ধা একই–সশস্ত্র জনগণ। আর প্রতিবারই শত্রুকে আড়াল করে এসে দাঁড়ায় শান্তি আর অহিংসার বুজরুকি নিয়ে দিশি দালালের দল। সেই সংগ্রামই করতে হবে আবার, সেই একই যুদ্ধ চলছে,স্বাধীনতার যুদ্ধ! গোড়ায় আমরা ভুল করেছি, আলাদা আলাদা লড়েছি। এবার লড়ছে বিশাল শ্রমিক-কৃষক-জনতা। সুতরাং জনতার জয় এবার অপ্রতিরোধ্য। কারণ গণবিপ্লব হয়েছে রাশিয়া ও চীনে; সেই অভিজ্ঞতায় আমাদের পথ আরও স্পষ্ট হয়ে এসেছে। একজন মনীষীর বাণী উদ্ধৃত করে বলি:'পরবর্তীকালে যে বিরাট আলোড়নে আর একটি যুগের সূচনা হইবে,তাহা রাশিয়া হইতে, অথবা চীন হইতে আসিবে; জগতে এখন বণিকের অধিকার চলিতেছে; পরবর্তী যুগে প্রলেটারিয়েটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।[৩১]

বিচারক জানায় কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলায় তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ সপ্রমাণ বিবেচনায়৪ঠা জুন ১৯৫০ সালে কুড়ি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে। মোহিত জানায় ব্রিটিশের ষোল আর এই সরকারের কুড়ি– দুয়ে মিলে ছত্রিশ বছর কারাবাস। এখানেই পালার পরিসমাপ্তি।একদিকে দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বিপ্লবীদের মরণপণ

লড়াই অন্যদিকে এদের এককালের সহযোদ্ধাদের আপোষকামিতা ও ক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনীতির প্রকৃত চিত্র পালাকার এই পালায় উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন।

'কাশ্মীর প্রিন্সেস' নামক বিমান দুর্ঘটনা *তুরুপের তাস* পালার পটভূমি। উৎপল দত্ত পালাটি রচনা করেন ১৯৭৬ সালে,প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে ১২ই সেপ্টেম্বর; 'লোকনাট্য দল' এ-পালার প্রযোজক। *তুরুপের তাস* সম্পর্কে শোভা সেন লিখেছেন:

> উৎপলের এ-বছরের যাত্রাপালা তুরুপের তাসশুরু হল ২৯ আগস্ট। রবীন্দ্রসদনে মর্নিং শো। সুপারহিট, শেখর গাঙ্গুলি অসাধারণ অভিনয় করে। কাশ্মীর প্রিন্সেস বিমান দুর্ঘটনার পেছনে সি-আই এ-র কর্মকাণ্ড সম্মন্ধে দর্শককে অবহিত করাই এ-নাটকের উদ্দেশ্য।[৩২]

ষোলটি দৃশ্যে বিন্যস্ত *তুরুপের তাস।* পালার শুরুতেই নেহেরুর ভাষণের মাধ্যমে জানা যায়,১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর সম্মেলন আরম্ভ হবে। ভারত ও চীন দুই দেশই এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবে। চীনের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই। ভারতের পক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু।

এই বান্দুং সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পালার ঘটনা আবর্তিত। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার কথা রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে বিশেষত চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই-এর। তাঁকে বহন করা বিমানকে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে সিআইএ এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ছিল ভারতীয় কিছু দালাল। ঘটনাচক্রে এসব জেনে যায় বসন্ত সালগাওংকর-এর পুত্রবধূ মিত্রা। মিত্রার স্বামী অশোক সালগাওংকর নৌবাহিনীতে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মারা যায় ধনৌষ জাহাজের ডেকে। ফৌজি কানুনে সেটা নাকি বিশ্বাসঘাতকতা। ভারতের নৌবিদ্রোহীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়ে নিজের জীবন দিয়ে বিশ্বাসঘাতক হয়েছেন, আর ছেলের এই দেশেপ্রেমের অপরাধে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর বর্তমানে পঙ্গু সালগাওংকর পেনশন এবং সৈনিকের বিশেষ ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন এবং ছেলের রাজদ্রোহিতার দায়িত্ব তাকেও বহন করতে হবে বলে জানিয়েছেন মিলিটারি সেক্রেটারি হরিনাথ জয়সোয়াল। এই অবস্থায় জেদ করে আর বাধ্য হয়ে সংসার চালানোর জন্য মিত্রা কলগার্ল হয়ে যায়। কলগার্ল হওয়ার সুবাদেই মিত্রা জড়িয়ে যায় সিআইএর এজেন্ট ঘুষখোর, বেইমান,বদমাইশদের সঙ্গে।

একের পর এক নানা পরিকল্পনা করতে থাকে এই চক্র;মিত্রাকে কাজে লাগায়। কুচক্রীরা ভেবেছিল চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই ঐ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কিন্তু চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ওই বিমানে আসার কথা থাকলেও হঠাৎ কাশ্মীর প্রিন্সেসের সময়সূচী পরিবর্তিত হওয়ায় তাঁরা বিমান ধরতে পারেননি সেকারণে তাঁরা নিরাপদে আছেন। বিমানের এঞ্জিনিয়ার এ.এস.কর্ণিক সাঁতরে নাতুনা দ্বীপে পৌঁছেছেন, তিনি জানিয়েছেন হংকঙে বিমানের মাল রাখার গহ্বরে দুটি টাইম বোমা রাখা হয়,এবং পরপর দুটি

বিস্ফোরণে বিমানটি আকাশে ধ্বংস হয়। বিমানটির ধ্বংসাবশেষ এবং টাইম বোমা দুটোর টুকরো সমুদ্র থেকে তুলে পরীক্ষা করা হবে তাহলে তা কোন দেশের তৈরি তা শনাক্ত করা যাবে। নেহেরুর বিবৃতি শুনে কুচক্রীদের মাথা খারাপ হয়ে যায়।

মিত্রা তার ছেলে পবন ও বাড়ির সবাই গ্লোরিয়াসহ কাশ্মীর প্রিন্সেস দুর্ঘটনার শোকে মুহ্যমান; এতকিছু করেও তারা কাশ্মীর প্রিন্সেসকে রক্ষা করতে পারেনি, কুচক্রীরাই জিতেছে, এরা হেরে গেছে। মিত্রার শাশুড়ি জানায়, হংকং-এর প্লেনেমিত্রার মাধ্যমে (প্রকাশ) গ্লোরিয়াকে যে সুটকেস পাঠায় সেটা গ্লোরিয়ার ছিল না - সেটাতে ছিল টাইম বোমা। প্রকাশ জানায়; মিত্রা এবং তার ছেলেকে বাঁচাবার জন্যই, তাদের মুখ চেয়েই, মিত্রাকে ভালবাসে বলেই তাকে এ-কাজ করতে হয়েছে। প্রকাশ যখন বলে, সে নিজের সুখ,নিজের শান্তি ছাড়া কিছুই জানে না,বুঝে না এবং মিত্রাকে নিয়ে এখান থেকে অন্য কোথাও গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায় তখন মিত্রার সংলাপ খুবই তাৎপর্যবহ :

> আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা দেশকে ভালবাসি। আমরা ভাবতে পারি না যে বিদেশির ঘুষ খেয়ে,নিজের দেশের সর্বনাশ করে, এক কুড়ি মানুষকে হত্যা করে,তারপর ভালোবাসার দোহাই পাড়া যায়। ... প্রকাশ, দেশটা ওদের, তোমাদের নয়। তাই তোমরা যখন দেশকে প্রায় নিলামে চড়িয়ে বিক্রি করে ফেল, তখন লেঃ সালগাওংকরের স্ত্রীর কর্তব্য অতি স্পষ্ট। যে-দেশ তোমাদের নয়– সে-দেশকে তোমরা বেচে দিচ্ছ কোন অধিকারে ? এ-তো আমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখব না। আগে যেমন পুলিশে গিয়েছিলাম,এবারও যাব। খুঁজে দেখব দেশপ্রেমিক মানুষগুলো সব গেল কোথায়।[৩৩]

কুচক্রীরা সব সাক্ষীকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়। সিআই-এর এজেন্ট হরিনাথকে অশোকচক্র প্রদানের জন্য যে-আনন্দসভার আয়োজন করা হয়, মিত্রা সেখানে হাজির হয়ে কুচক্রীদের ছবিসহ যাবতীয় তথ্যাদি ফাঁস করে দিলে মি. ব্যানার্জী অশোকচক্র প্রদান স্থগিত ঘোষণা করেন ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেন এবং কুচক্রীদের এয়ারফোর্সে পুলিশের দপ্তরে নিয়ে যেতে বলেন। শ্বশুর-শ্বাশুড়ি এই যুদ্ধ জেতায় পুত্রবধূকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে মিত্রা বলে :

> এখনও জিতিনি,সবে তো শুরু। ওরা ভয় দেখাবে,কাগজে কুৎসা রটাবে, ঘুষ দেবে। তদন্ত-কমিশনের মাথা শুদ্ধ হয়তো কিনে নেবে। এমন কি হঠাৎ আমাদের অ্যাকসিডেন্ট ঘটতে পারে। কিন্তু তার জন্যে পিছু হঠলে তো চলবে না। আজকে ওদের জানিয়ে দেয়া গেল – এ-দেশের স্বাধীনতা দোকানের পসরা নয় যে, যার খুশি বেচে দেবে। জানানো গেল– দেশটা ওদের নয়,আমাদের। তাই দেশ নিয়ে বাণিজ্য করতে আমরা দেব না।[৩৪]

মিত্রার এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে পালার পরিসমাপ্তি।

এই পালায় একদিকে আছে মিত্রা, গ্লোরিয়া, সালগাওংকর পরিবার, দিভেচা, জসমিন্দর প্রমুখ দেশপ্রেমিক, অন্যদিকে আছে কুচক্রীমহল, যারা দেশকে নিলামে চড়িয়ে বিক্রি করতে চায় দেশপ্রেম বলতে যাদের কিছু

নেই। দেশপ্রেমিক এবং দেশপ্রেম-বিরোধী কুচক্রীদের দ্বান্দ্বিক রূপটি পালাকার অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে উপস্থাপন করেছেন।

*অরণ্যের ঘুম ভাঙছে*পালাটি প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভায় ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে। প্রযোজনা করে 'গণবাণী'। উধম সিং কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক ও-ডায়ারকে হত্যা প্রচেষ্টা ও হত্যা এই পালার পরিপ্রেক্ষিত। উধম সিং লন্ডনে গিয়ে মুহম্মদ সিং আজাদ নাম ধারণ করে। বৃদ্ধা প্যাট্রিশিয়ার দোকানে উধম সিং অন্যান্য ভারতীয় এবং মার্গারেট এ্যালেন প্রমুখের সঙ্গে মিলিত হয়। উধম ও-ডায়ারের ভাইঝি জেন বাকল্যান্ডের মাধ্যমে গ্রোভনার স্কোয়ারে ও-ডায়ারের গৃহে পৌঁছে যায়, উদ্দেশ্য তাকে হত্যা, প্রথমবার ব্যর্থ হয়; আরও কয়েকবার ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হয় এবং জানায় :

> স্যার মাইকেল,ইন্ডিয়া টেকস্ রিভেঞ্জ! হিন্দুস্তান বদলা লে রহা হায়'বলে গুলি করতে থাকে;ও-ডায়ার, ডেন জ্যাটল্যান্ড পড়ে যায়,পুলিশ উধমকে ধরে ফেলে। উধম বলতে থাকে–অরণ্যের ঘুম ভাঙছে!জালিয়ানের প্রতিশোধে ভারতের মাথা উঁচু হল আবার–২১ বছর পরে। এই পিস্তলের গুলিতে জানিয়ে গেলাম স্বাধীন ভারত,বিপ্লবী ভারত,সশস্ত্র ভারতের জয়। সেইসঙ্গে য়ুরোপেও নির্যাতিত কোটি মানুষের অভ্যুত্থান। [৩৫]

উধম সিং-এর প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে পালার পরিসমাপ্তি।

*সাদা পোশাক*পালাটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর,বাসুদেব মঞ্চে,প্রযোজনা করে 'গণবাণী'।

কৌশিক বসু পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার, দুর্দান্ত সাহসী, সৎ, কর্তব্য ও ন্যায়পরায়ণ। এক ছেলে শমিত,স্ত্রী তাপসীকে নিয়ে তার সংসার। তাপসী গাঙ্গুলি পরিবারের বিরাট ধনসম্পত্তিকে অগ্রাহ্য করে একজন দরিদ্র কায়স্থ, নিঃস্ব পুলিশ অফিসারকে বিয়ে করে।

এই পালায় একদিকে আছে কৌশিকের বস সুদিন চক্রবর্তী, ঘুষখোর পুলিশ অফিসার; তার সাথে আছে ঘুষখোর, ধর্ষক সাব ইনস্পেকটার মহাদেব চাটুয্যে,আছে ছিরু মাস্তান থেকে ভোট জালিয়াতি করে মন্ত্রী হওয়া শ্রীকান্ত মুখুয্যে (কোনো অপকর্ম করতে যার জুড়ি নেই)তার শিষ্য শিলাদিত্য,আছে কালোবাজারি,মাদক ব্যবসায়ী, ধনাঢ্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রঘুনাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ – অন্যদিকে আছে সৎ পুলিশ কর্মকর্তা কৌসিক বসু, তার স্ত্রী-সন্তান,পুলিশ ইউনিয়নের নেতা কনস্টেবল গিয়াসুদ্দিন মণ্ডল,জীবানন্দ হালদার,শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের অধ্যক্ষ কৃপাসিন্ধু, অধ্যাপিকা হেনা, ঐ-কলেজের ছাত্র (সিপিএম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত)জয়দেব,বৃন্দা,সাত্যকি

প্রমুখ। একদিকে অপশক্তি অপরদিকে প্রগতিশীল শক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব এই পালার বিষয়। শেষপর্যন্ত কৌশিককে বাধ্য হয়ে ধরা দিতে হয়। শান্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে কৌশিক বলে :

> ক্রমে তনু হতেছে অবশ,কত অস্ত্র বরষিছে অরি,বাজে গায়ে অগ্নিশিখাসম। স্ত্রী-পুত্রকে আফিম খাওয়াবে তোমরা? এটা কি করে হতে দেব, তবে ভেব না তোমরা বা তোমাদের এই অধঃপতিত ওই মালিকগুলো পার পেয়ে যাবে। পুলিশ ইউনিয়ন লড়বে,কমিউনিস্টরা লড়বে,সাধারণ মানুষ এবার লড়বে। নির্যাতিত কনস্টেবলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে– আমরা এবার সংগ্রামী জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যাব– আর ওই মন্ত্রীর দল তাদের জরুরি অবস্থা আর লাঠি-বন্দুক নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে ভারতের ধুলায়।... তোমাদের শেষ ঘনিয়ে এসেছে! সারা ভারত কেঁপে উঠবে পুলিশের ধর্মঘটে,সি-আর-পির বিদ্রোহে!যাদের অস্ত্রে স্বৈরাচার বলীয়ান, যে অস্ত্রে আমাদের দিয়ে দেশের সেরা ছেলেদের হত্যা করিয়েছ, সেই অস্ত্র তোমাদের বুক লক্ষ্য করে গর্জে উঠবে–! সে দিনের আর দেরি নেই![৩৬]এই আশাবাদের মধ্যেই পালার পরিসমাপ্তি।

কুঠার পালাটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১০ইসেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে মহাজাতি সদনে। 'গণবাণী' পালাটি প্রযোজনা করে। পালাটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় 'দৈনিক বসুমতী'তে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৯১ সনের পৌষে;উৎপল দত্ত নির্বাচিত নাট্য-সংগ্রহ ৪র্থ খণ্ডে। ১১টি দৃশ্যে বিন্যস্ত *কুঠার* পালা।*কুঠার* পালার পরিপ্রেক্ষিত বিহারের বীর কুঁয়র সিং-এর (দেশের স্বাধীনতার) লড়াই। ৭৫ বছর বয়সী কুঁয়র সিং জগদীশপুরের রাজপুত জমিদার; জীবনের অনেকটা সময় মেয়েমানুষ, মদসহ নানা নেশায় আসক্ত থাকলেও যখন দেখছেন স্বদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন,তখন সেই বিপন্নতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। কামার,কুমার,চাষী, তাঁতিসহ সাধারণ মানুষদের নিয়ে গড়ে তুলছেন ফৌজ,যাঁরা কুঠার ও নানাবিধ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দেশমাতৃকার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন,অংশ নিয়েছেন তার ভাই অমর সিং ও অন্য স্বজনরা।

কুঁয়র সিং অপ্রতিরোধ্য গতিতে একের পর এক অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছেন। তার তরিকা আলাদা। ক্ষিপ্র গতিতে ঘোড়া চালিয়ে শত শত মাইল দূরে গিয়ে কাজ সেরে আবার ফিরে আসা, পাশাপাশি গুপ্তহত্যা এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধ।তারপরও তিনি যুদ্ধে বহুস্বজনসহ অনেক কাছের মানুষ ও সাধারণ মানুষকে হারিয়েছেন – যারা তার ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধে তিনি আহত হলেও ভাই অমর সিংকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

> যুদ্ধ চলবে। সারা হিন্দুস্তান হেরে গেছে, দক্ষিণ বিহার এখনো স্বাধীন। ওরা সারা ভারত থেকে গোরা সিপাহি নিয়ে আসছে বিহারে। তুমি লড়াই চালিয়ে যাবে।[৩৭]

অমর সিং জানায় আমৃত্যু লড়াই চলবে। কুঁয়র সিং-এর চৈনপুরের অরণ্যে চলে যাবার সিদ্ধান্ত এবং হিন্দুস্তানের সত্যিকারের আজাদী না আসা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার আহ্বানের মধ্য দিয়ে পালার পরিসমাপ্তি:

> চৈনপুরের অরণ্যে যেখানে বাতাসও স্বাধীন। বিদায় মুহূর্তে সে অরণ্য আমাকে দিয়েছিল মুক্ত বাতাসের স্বাধীনতা সঙ্গীত। আজ আবার অচেনা দূরত্ব থেকে সে আমাকে শোনাচ্ছে ভালবাসার গান। ভয় হয় হৃদয় খুঁড়ে সে গান জাগাতে গেলে হয়তো চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে অসংখ্য নামের করুণ ভিড়ে। আমার বিবির হাত ধরে চললাম অরণ্যে, যাতে আমাদের মৃতদেহও ফিরিংগির হাতে না পড়ে। তুমি দেখবে হিন্দুস্থানের সত্যিকারের আজাদী না-আসা পর্যন্ত বিহারের তলোয়ার যেন কোষবদ্ধ না হয়।[৩৮]

উৎপল দত্ত রচিত ২১টি যাত্রাপালার মধ্যে (*স্বাধীনতার ফাঁকি*, *বিবিঘর*, *দামামা ঐ বাজে* – এই তিনটি পালা বাদে)বর্তমান অধ্যায়ে ১৮টি পালা আলোচিত হয়েছে। *স্বাধীনতার ফাঁকি* ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে স্টার থিয়েটারে 'ভারতী অপেরা'কর্তৃক প্রথম মঞ্চস্থ হয়। *বিবিঘর*প্রথম মঞ্চস্থ হয় 'নবরঞ্জন অপেরা'র প্রযোজনায় একাডেমী মঞ্চে ১৯৮২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর। *দামামা ঐ বাজে*গিরীশ মঞ্চে ১৯৮৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর 'আর্য অপেরা'র প্রযোজনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

উৎপল দত্তের যাত্রাপালাগুলোতে বিচিত্র বিষয় স্থান পেয়েছে:*রাইফেল* পালায় তিরিশ-চল্লিশ দশকের বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম ও আত্মাহুতি,*জালিয়ানওয়ালাবাগ*-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড,*শোনরে মালিক*-এ মালিকশ্রেণি তথা শোষকশ্রেণির শোষণের কৌশল,*দিল্লী চলো*-তে নেতাজী সুভাষ বসুর জীবনের বিশেষ অধ্যায়,*নীলরক্ত* পালায় নীল বিদ্রোহ,*ভুলি নাই প্রিয়া*'য় (শেকস্পিয়ারের রোমিও জুলিয়েট অবলম্বনে) রৌশনআরা-রঞ্জন-এর অচরিতার্থপ্রণয়,*সমুদ্রশাসন*-এ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়কাল এবং বিজ্ঞানী কল্‌হনের বিজ্ঞানচর্চা,*জয়বাংলা*'য় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ *সন্ন্যাসীরতরবারী*'তে ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ, *ঝড়*-এ ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিভু ডিরোজিও'র দ্রোহ,*মাও-ৎ-সে*-তুং-এ *মাও-ৎ-সে*-তুং-এর জীবনের সংগ্রামমুখর দিন,*বৈশাখী মেঘ*-*এ* বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও কংগ্রেসীদের বেঈমানি ও আপোষকামিতা, *সীমান্ত* পালায় আফগানিস্তানের টালমাটাল রাজনীতি,*তুরুপের তাস*-এ সিআইএ কর্তৃক বান্দুং সম্মেলনে চীনের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র,*মুক্তিদীক্ষা*'*য়* পারি কমিউন প্রতিষ্ঠা ও পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়ার অনমনীয় দৃঢ় মনোভাব, *অরণ্যের ঘুম ভাঙছে* পালায় উধম সিং কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যার প্রতিশোধ, *সাদা পোশাক*-এ সৎ পুলিশ অফিসার কৌশিক বসুর সততা ও পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন রাজনীতির কদর্য রূপ,*কুঠার* পালায় বিহারের বীর কুঁয়র সিং-এর স্বাধীনতার লড়াই ইত্যাদি।

যাত্রাপালার মাধ্যমে প্রসেনিয়াম থিয়েটার থেকে বেরিয়ে বৃহত্তম সাধারণ দর্শকের কাছে পৌঁছার প্রবল প্রয়াস উৎপল দত্তের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন,যাত্রার উপাদানকে থিয়েটারে নিয়ে আসা প্রয়োজন। বিচিত্র বিষয় নিয়ে ব্যাপক জনতার বিশেষত সাধারণ গণমানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে, এবং একই সাথে সাধারণ গণমানুষের ভাষা ও বোধের কাছাকাছি আধুনিক থিয়েটারকে পৌঁছাতে হলে যাত্রাপালাই, হতে পারে সবচেয়ে বিশ্বস্ত, ঘনিষ্ঠ নাট্য-আঙ্গিক। এবং এ-অভিলাষ থেকেই উৎপল দত্তের যাত্রাপালা রচনা ও পরিচালনা।তাই উৎপল দত্ত বলেছেন:

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের নাট্য-ঐতিহ্য অন্যপ্রকার, যেটা যাত্রা ও পুরনো বাংলা থিয়েটারের চরম নাটকীয় রসে সিঞ্চিত। এখানে দর্শক কাঁদতে চায়,হাসতে চায়,তারপর রোষে কম্পিত হতে চায়,ভয় পেতে চায়,অনুকম্পার স্পর্শ পেতে চায়। এটা শেক্সপীয়রীয় ফর্মের দেশ,ধর্ষিতা ক্ষেত্রমণির বিলাপের দেশ,সীতার ক্রন্দন আর দুর্গার সবাইকে কাঁদিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার দেশ।[৩৯]

উৎপলের জীবনসঙ্গী শোভা সেনের কথায় এমনই প্রতিধ্বনি :

যাত্রাপালা যেহেতু গ্রামে গঞ্জে হয়, তাই অগণিত দর্শকের কাছে তার বক্তব্য পৌঁছে যায়। শুনেছি টিপু সুলতানও তাঁর রাজত্বকালে বিপ্লবের বাণী জনগণকে শুনিয়েছিলেন লোকনাট্যের মাধ্যমে গ্রামেগঞ্জে সর্বত্র।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

খ.পথনাটক :

নাটক কার্যকর প্রচার এবং পথনাটককে তারমধ্যে সবচেয়ে প্রকট, সবচেয়ে আগ্রাসী প্রচার মাধ্যম বলে মনে করতেন উৎপল দত্ত। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে, নাটকের মাধ্যমে তাঁর আদর্শকে প্রচার করে যেতে চেয়েছেন। তিনি নিজেকে পার্টিজান, প্রপাগান্ডিস্ট, এ্যাজিটেটর পরিচয়ে পরিচিত করতেও প্রয়াসী ছিলেন।

প্রোপাগান্ডা একটা সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসের জগতে নাড়া দেয়, অনাস্থা জাগিয়ে তোলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে। আর এ্যাজিটেশন একটা তাৎক্ষণিক ইস্যুর ওপর মানুষকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। পথনাটিকা এ্যাজিটেশনের অংশ। এজন্য গোড়ার দিকে গণনাট্য সংঘে পথনাটিকাকে পোস্টার প্লে, এ্যাজিট পোস্টার প্লে,এ্যাজিট প্লে বলা হতো বলে উৎপল দত্ত 'লিটল থিয়েটার ও আমি' স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন।

পথনাটকের সাথে উৎপলের নিবিড় যোগাযোগ ঘটেছে গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে। সংঘের যে দিকটি উৎপল দত্তকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল – সেটি হল খোলা আকাশের নিচে, বিনা রঙ্গমঞ্চে বিনা আড়ম্বরে রাস্তার পথচারীদের জড়ো করে তাদের সামনে অভিনয়। উৎপল দত্তের মতে, আমাদের মত দরিদ্র অশিক্ষিত দেশে এর ভেতর দিয়ে নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবার সম্ভাবনা। উমানাথ ভট্টাচার্য রচিত *চার্জশীট*-এ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্তের পথনাটকে অভিষেক। এরপর পানুপালের *ভোটের ভেট*-এ অভিনয় করেন ১৯৫২ সালের নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্য। জলপাইগুড়ি থেকে ক্যানিং, হাটে-বাজারে, লরির ওপরে, রোয়াকে হিসেবহীন অসংখ্য অভিনয় করেছেন। *চার্জশীট*-এ অভিনয় করার আগ পর্যন্ত উৎপল দত্ত ছিলেন প্রপাগান্ডিস্ট; *চার্জশীটে* অভিনয়ের উত্তাপ তাঁকে এ্যাজিটেটরে পরিণত করে। গণনাট্য সংঘের অভিজ্ঞতা এবং প্রেরণায় স্নাত ও সমৃদ্ধ হয়ে গণনাট্য সংঘ থেকে ফিরে উৎপল দত্ত পথ নাটক লিখতে শুরু করেন।

উৎপল দত্ত রচিত পথনাটকের সংখ্যা ২৫ : *পাসপোর্ট*, *সৌরিন মাস্টারের সংসার*, *অস্ত্রের খবর*, *দৈনিক সন্দেশ*, *নয়া তুঘলক*, *সমাজতন্ত্র*, *স্পেশাল ট্রেন*, *গেরিলা*, *সমাজতান্ত্রিক চাল*, *জনতার কল্লোল*, *দিন বদলের পালা*, *ময়না তদন্ত*, *বর্গি এলো দেশে*, *অস্ত্র*, *দিন বদলের দ্বিতীয় পালা*, *চক্রান্ত*, *কালো হাত*, *পেট্রোল বোমা*, *মালোপাড়ার মা*, *তিলজলার জল*, *মুমূর্ষু নগরী*, *মুমূর্ষু বাংলা*, *কাঁচের ঘর*, *হমে দেখনা হ্যায় এবং সত্তুরের দশক*।

পথনাটকের ইস্যু কী হবে আর নাট্যকার কীভাবে সেই ইস্যু দর্শকের সামনে উপস্থাপন করবেন কিংবা বলা যেতে পারে নাট্যকারের প্রধান কাজ কী ? এ-বিষয়ে উৎপলের অভিমত :

> যে-ইস্যু নিয়ে পথনাটিকা লিখবো, সে-ইস্যুটা নিয়ে জনগণ কীভাবে দেখেছেন, সেটা ভালভাবে জানা দরকার। ওদের কোন ভুলভাল হচ্ছে কিনা। দর্শকদের মধ্যে কোনও বিভ্রম আছে কিনা, কোনও মোহ আছে কিনা ওই ইস্যুটা সম্পর্কে সেই মোহটা ভাঙা, সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে দর্শককে সাহায্য করাই হচ্ছে আমার(নাট্যকারের) প্রধান কর্তব্য।[১]

পথনাটিকায় বৈদগ্ধ্য দেখাবার ঘোর বিরোধী উৎপল দত্ত;তিনি মনে করেন বৈদগ্ধ্যদেখাবার ঠিক জায়গা পথনাটিকা নয়। পথনাটক মানুষের ক্ষোভ-ঘৃণাকে সংগঠিত করতে পারে। দর্শক যে-ক্ষোভ-বিক্ষোভ সুসংবদ্ধরূপে দেখে নাটকে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী; এ-প্রভাব কাজ করে উত্তরকালে। দর্শক যেখানে আছে সেখান থেকে পথনাটকশুরু করতে হবে বলে উৎপল মনে করেন। পথনাটকের নাট্যকারের রসবোধ তথা কৌতুকবোধ থাকা আবশ্যক। গোমড়ামুখো পথনাটিকা দর্শক দেখতে চায় না। কারণ মঞ্চে দর্শক তার আবেগকে শেয়ার করতে চায়। তাই নাট্যকারের খুব কৌতুকবোধ থাকা দরকার বলে উৎপল মনে করেন।

পথনাটিকায় মহড়ার সময় অনেক সময় পাওয়াই যায় না। তাৎক্ষণিক বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয় বলে কখনো একবেলার মহড়ায়ও অভিনয় করতে হয়। মঞ্চসজ্জা, আলো ইত্যাদি ছাড়াই মঞ্চে একটা তক্তপোষ, সেটাকেই মঞ্চ করে, লরির ওপরে হলে লরিটাকেই মঞ্চ করে অভিনেতা অভিনয় করে যান। এ-রকম অবস্থায়ও দর্শক একাত্ম হয়, গুণবান অভিনয়ে। মূলত, পথনাটকে অভিনয়ই প্রাণ, অভিনয় ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। উৎপল মনে করতেন :

> আসল কথাটা হচ্ছে, দর্শকের রাজনীতি ও অভিনেতার রাজনীতির ঐক্য।...পার্ট মুখস্থ আছে কি নেই, সেটা বড়ো কথাই না, দর্শকরা সাতখুন মাপ করে দেবে যদি কথাগুলি চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়, যদি গল্পটা উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে।[২]

রাজনীতিবিদদের বক্তৃতার চেয়ে পথনাটক বেশি ইফেকটিভ বলে মনে করেন উৎপল। কারণ, বক্তৃতার প্রভাব দর্শক-মনে যতটা না পড়ে তার চেয়ে বেশি পড়ে নাটকের প্রভাব। তাই তিনি বলেন :

> ইনফ্যাক্ট রাজনৈতিক বক্তাদের বক্তৃতার চেয়ে নাটক বেশি কাজ করে। কারণ ওরা একটা গল্পের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক তথ্যে উন্নীত হবে। যদি অবশ্য পথনাটিকা ভালভাবে লেখা হয়।[৩]

উৎপল দত্ত সাধারণত কোন ইস্যুভিত্তিক পথনাটক লিখতেন। এর মধ্যে নির্বাচন ছিল বড় ইস্যু। যে-ইস্যুই হোক; সেটা নিয়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে-বাজারে-গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-লরিতে-রোয়াকে জলপাইগুড়ি থেকে ক্যানিং সর্বত্র অসংখ্য অভিনয় করেছেন। উৎপল দত্ত মনে করেন :

> পথনাটক হচ্ছে সেই মাধ্যম যেখানে লক্ষ মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও অভিনেতার রাজনৈতিক উপলব্ধি এক হয়ে বিস্ফোরিত হয় মঞ্চে।[৪]

উৎপল দত্ত রচিত পথনাটকগুলো অভিনয়ের সময় 'উৎপল দত্ত ও সম্প্রদায়' নাম ব্যবহার করা হতো। উৎপল দত্ত রচিত কয়েকটি পথনাটক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। তাঁর প্রথম পথনাটক *পাসপোর্ট* আর শেষ নাটক*সত্তরের দশক। প্রথম*টি ১৯৫২ সালে রচনা,পরিচালনাও অভিনয় করেন উৎপল দত্ত; শেষটি পিএলটি মঞ্চস্থ করে ১৯৯২ সালে।

*স্পেশাল ট্রেন:*পথনাটকটি রচিত হয় ১৯৬১ সালে। এ-বছরই হিন্দ-মোটরস,উত্তরপাড়ায় উৎপল দত্ত ও সম্প্রদায় নাটকটি অভিনয় করে; এর বিষয় হিন্দ-মোটরস কোম্পানির হরতাল।মালিক তথা শোষক শ্রেণি অবিরাম শোষণ করে চলেছে শ্রমিক শ্রেণিকে; স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শোষণের ধরন বদলায় কিন্তু শোষণের ইতি ঘটে না। *স্পেশাল ট্রেন* পথনাটকে হিন্দ মটরস-এর শ্রমিকরা যখন তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনরত তখন শোষক-শ্রেণি বিড়লাদের তাবেদার পুলিশ অফিসার ও লেবার অফিসারদ্বয় আন্দোলন বানচালের চেষ্টা চালায়। চেষ্টার অংশ হিসেবে লেবার অফিসার, পুলিশ অফিসার তাদের ত্রুটিহীন চেষ্টার বিবরণ দিয়ে রিপোর্ট পেশ করে। বিড়লার এক টেলিফোনে সরকার একেবারে তটস্থ হয়ে স্পেশাল ট্রেন দিয়ে বসেছে। বোঝাই হয়ে আসছে দালাল, আজ রাতেই কারখানা চালু হবে। কোম্পানি যেখানে ট্রেন বোঝাই করে দালাল আমদানি করে কারখানা চালুর ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেখানে পুলিশ কটা দালাল জড়ো করেছে জানতে চাইলে পুলিশ জানায় – অসংখ্য, তা জনা পঁচিশেক তো হবেই।ছয়হাজার শ্রমিকের কাজ পঁচিশজন দালালকে দিয়ে করানো, রাজ্যের কাঠ জড়ো করে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া ছাড়া, আর একটা এয়ার কমপ্রেসার পাম্প চালু করে ফট-ফট গর্জন করে আশেপাশের গাঁয়ের মানুষের কাছে কারখানা পুরোদমে চালু আছে মর্মে প্রমাণ করার হাস্যকর অপচেষ্টায় মেতে ওঠে পুলিশ ও কারখানার মালিক।এদিকে স্পেশাল ট্রেনে দালাল আসবে বলে সমস্ত প্ল্যাটফরম খালি করে রাখা হয়েছে, কেউ টিকিটের জন্য প্ল্যাটফরমে গেলেই তাকে ধরে টর্চার করছে পুলিশ। অধীর আগ্রহে স্পেশাল ট্রেনের অপেক্ষায় লেবার অফিসার, পুলিশ অফিসার। একদিকে সব আয়োজন করছে অন্যদিকে তারা বড় দুশ্চিন্তায়; পাম্প চালিয়ে আর কাঠ পুড়িয়ে ধোঁয়া করে গাঁয়ের লোককে ধোঁকা দেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু প্রোডাকশান করতে পারছে না। প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়িয়ে থাকার অপরাধে এক শ্রমিককে ধরে এনে জেরা করে পুলিশ ও লেবার অফিসার। জেরার এক পর্যায়ে শ্রমিক জানায় :

> অর্থনীতির মূলস্তম্ভ আমরা মজুররা গড়েছি, আমরাই গড়তে থাকবো। অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শত্রু,সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী হল ঐ বিড়লা যে আজ ১৩ বৎসর কারখানার জীবনে এক পয়সা বোনাস দেয়নি। এই ১৯৬১ সালে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা নীট মুনাফা করেছে কোম্পানি; অথচ ছহাজার মজদুরকে এক পয়সা বোনাস দেয়নি। সব মালিকরাই জুলুম শোষণ করে, কিন্তু বিড়লার মতন এমন নগ্ন নির্লজ্জ শোষণ এই আজব দেশ ভারতেও বিরল।[৫]

মজুরদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে মুনাফার পাহাড় গড়ছে মালিকরা। একদিকে শ্রমিকরা দিনকে দিন মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে অন্যদিকে মালিকশ্রেণি ক্রমাগত শোষণ করেই চলেছে।এই অব্যাহত শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে, বেঁচে থাকার ন্যূনতম দাবিতে, ন্যায়সংগত বোনাসের জন্য ধর্মঘটের নোটিশ দিলে কর্তৃপক্ষ জবাবে বিনা নোটিসে লক-অউট করে দেয় কারখানা। অতঃপর পুলিশ অফিসার লেবার অফিসার নানা

চেষ্টার পর স্পেশাল ট্রেনে করে দালাল এনে কারখানা চালুর উদ্যোগ নিলে তাও ভেস্তে যায়। কারণ, স্পেশাল ট্রেন হিন্দমোটরে না থেমে যেরকম গতিতে আসছিল ঠিক সেই গতিতে কোন্নগরের দিকে চলে যায়।

স্পেশাল ট্রেন হিন্দমোটরে না থামার কারণ; উত্তরপাড়া স্টেশনে হাজার হাজার লোক জমা হয়ে দালালদের টেনে নামাচ্ছিল। পুলিশ বেদম লাঠি চালিয়েও পাবলিককে ঠাণ্ডা করতে পারেনি। তাই ট্রেনের ড্রাইভার ভয় পেয়ে হিন্দ মোটরে না থেমেই পালিয়ে যায়।সংঘশক্তির ঐক্যের কাছে অন্যকোন শক্তিই টিকতে পারে না : এই মহাসত্যই এ-পথনাটকে প্রতিভাত হয়েছে। সংগঠিত শ্রমিক ঐক্যের বিজয় সূচিত হওয়ার মধ্য দিয়েই *স্পেশাল ট্রেন* পথনাটকের পরিসমাপ্তি।

সমাজতান্ত্রিক চাল পথনাটকের পটভূমি ১৯৬৫ সালের খাদ্য আন্দোলন। সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার প্রথম প্রকাশনা *সমাজতান্ত্রিক চাল*,এর প্রকাশক ছিলেন জোছন দস্তিদার। *সমাজতান্ত্রিক চাল*-এর প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৬৫ সালে চুঁচুড়া কোর্টের সামনে কৃষক জমায়েতে। এ-পথনাটিকার বেশি অভিনয় হতে পারেনি, মাত্র নয়টি অভিনয় হয়েছিল; কারণ ঐ-বছরের সেপ্টেম্বরে উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হয়ে যান। এ-নাটক উৎপল দত্তের পরিচালনায়ই মঞ্চস্থহতো।
হৃদয়রঞ্জন মাইতি বেকার যুবক, বাবা মরেছে অসহযোগ আন্দোলনে, মা মরেছে অর্ধহারে, অনাহারে,বিনা চিকিৎসায়। বোন বিধবা হয়ে তিনটে বাচ্চা নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসে। এমনিতেই চাকুরি, ব্যবসা কিছুই নেই হৃদয়ের। নিরুপায় হয়ে বহুদিন থেকেই ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত বিক্রি করে। গত নির্বাচনে কংগ্রেস নেতা শ্রী গৌরহরি ভট্টাচার্যের হয়ে কাজ করেছে হৃদয় মাইতি কারণ দেশে সমাজতন্ত্র আসবে। হৃদয় মাইতির গণতান্ত্রিক কাজ ছিল কমিউনিস্ট ঠেঙানো। গৌরহরি জিতে আইনসভায় গেলো, হৃদয় গেলো সেই ব্লাড ব্যাংকে। নিরুপায় হয়ে শরণাপন্ন হল সে গৌরহরিবাবুর। এবারে বলা হল চীন আক্রমণ করছে ভারতকে। চীনকে রুখতে পারলেই সমাজতন্ত্র আসবে। জনসাধারণ রক্তদান, শ্রমদান, স্বর্ণদান করলেই চীনকে রুখা যাবে। হৃদয় মাইতির মায়ের একগাছা হার ছিল; তাই এনে দিল গৌরহরিবাবুর হাতে। এবারেও হৃদয়মাইতির কাজ হল কমিউনিস্ট ঠেঙানো। চীন ভারত যুদ্ধ থামলেও সমাজতন্ত্র এলো না, কারণ বাংলাদেশের মুসলমানগুলো সমাজতন্ত্র ঠেকিয়ে রেখেছে। এবারে তাই হৃদয়ের কাজ হল বাংলাদেশের মুসলিমদের ঠেঙানো। ঠেঙানোর কাজ করতে করতে হৃদয় মাইতি উপলব্ধি করে–সমাজতন্ত্র মানেই হচ্ছে কাউকে না কাউকে খুব একচোট ঠেঙানো।

হৃদয় মাইতি দেখে গৌরহরিবাবুর কাছে নটবর (কালোবাজারি,মুনাফাখোর) এসেছে তার চাল রক্ষা করতে। কারণ, তার চাল লুট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে; নটবরের চাল গৌরহরিবাবুর শোবার ঘরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে যায় নটবর। গৌরহরিবাবু এবার নজর দেয় হৃদয় মাইতির দিকে; জানতে চায়, সেকী চায় – সামান্য চাল চায় হৃদয়। তাকে রেশন কার্ডের কথা বলা হয়। অনেক চেষ্টার পর যে রেশন কার্ড হৃদয় সংগ্রহ করেছে সে-কার্ডে রেশন পেতে ৪০দিন অপেক্ষা করতে হবে। এই চল্লিশ দিন কী খাবে হৃদয় ও তার বোন এবং বোনের বাচ্চারা? হাওয়া খেয়ে চল্লিশ দিন কাটিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেয় নটবর। এমন সময়ে খাদ্য মিছিল আসে গৌরহরিবাবুর বাসার সামনে; তাদের দাবি – সস্তাদরে চাল দিতে হবে, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য চালু করতে হবে,

চোরাকারবারি মজুতদারদের শাস্তি দিতে হবে, আর মজুত চাল উদ্ধার করতে হবে। দাবি-দাওয়া পেশ করতে এসে জনতা দেখে গৌরহরিবাবুর সাথেই বসে আছে কালোবাজারি নটবর। মিছিলের নেতা গণেশের সঙ্গে কথোপকথনের মাঝেই খবর আসে মালতি নামের এক মহিলাকে পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে, কারণ মালতী তার দেড় বছরের ছেলেকে জলে ফেলে দিয়েছে।খাবারের জন্য নিরন্তর হাহাকার, আর্তনাদ, খেতে দিতেনা পারার ব্যর্থতা মালতীকে পাগল করে তুলেছিল তাই মালতী নিজের পেটের সন্তানকে জলে ফেলে দেয় :

> ক্ষুধার জ্বালায় বাচ্চা যখন রাতদিন কাঁদে তখন বাপ-মায়ের কি অবস্থা হয়, সেটা আপনারা চোরেরা জানবেন কি করে?শিশুর খাদ্য চুরি করে নিয়ে নিজেদের পেট ভরিয়েছেন, আপনারা খুনীরা জানবেন কি করে?[৬]

গৌরহরি হৃদয়কে এবার নির্দেশ দেয় কমিউনিস্ট গণেশকে মারতে কিন্তু হৃদয় মারে না। কারণ, মালতী হৃদয়ের বোন আর জলে ফেলে দেয়া দেড়বছরের শিবু তার ভাগ্নে। অতঃপর, হৃদয় মাইতি ফাঁস করে দেয়, নটবর – গৌরহরির গোপন আঁতাত : 'এ দুজনের মধ্যে যোগসাজস হয়েছে। এর গুদামের আটলড়ি চাল এর শোবার ঘরে নিয়ে তোলা হবে আজ রাত্রে।'[৭]

কংগ্রেস এম.এল.এ. গৌরহরিবাবু এবং চালের আড়তদার নটবরদের যোগসাজসের কারণেই মালতীদের সন্তানদের খেতে দিতে না পারার বেদনা সইতে হয়, সন্তানকে হত্যা করতে হয়। গণেশ এই খবর সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে জঞ্জাল দূর করার আহবান জানায় :

> মালতী নামে বাংলাদেশের এক লাঞ্ছিতা অপমানিতা মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আসুন দূর করিএই জঞ্জাল। এই দেশকে মালতীর সন্তানের বাসযোগ্য করে রেখে যাবো এই প্রতিজ্ঞা করি।[৮]

এই দেশকে মালতীর সন্তানের বাসযোগ্য করে রেখে যাবার প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি।

*দিন বদলের পালা*উৎপল দত্ত ও সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয় ইছাপুরে ১৯৬৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর। '*দিন বদলের পালা*স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে।...*দিন বদলের পালা* সারা পশ্চিমবঙ্গকে উত্তাল করে দিয়েছিল।'[৯]প্রসেনিয়াম থিয়েটার (মিনার্ভার মঞ্চে) এবং মাঠে-ময়দানে,পথে-প্রান্তরে একই সাথে এ-নাটকের অভিনয় হয়েছে। এ-নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত লিখেছেন –

> ৬৬-র শেষে '৬৭-র নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে আমরা তৈরি করি 'দিন বদলের পালা', পথ-নাটিকার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। প্রথমে লাগত আড়াই ঘণ্টা, শেষপর্যন্ত নানা প্রসঙ্গ জুড়তে জুড়তে পুরো তিন। একটি খুনের মামলা অবলম্বন করে আমরা নেহেরু লোকসভা উদ্ধৃত করে দেখাতাম ভারতই প্রথম সীমান্ত লঙ্ঘন করে চীনা সীমান্ত রক্ষীদের আক্রমণ শুরু করে সেই '৫৭ সাল থেকে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে কংগ্রেসী রাজত্বের স্বরূপ ধরার চেষ্টা করতাম, শোধনবাদীদের নির্বাচনী ইস্তাহার উদ্ধৃত করে দেখাতাম তারা আসলে কংগ্রেসের বি-টিম, এবং সাম্প্রতিক খাদ্য-আন্দোলনের কারণ প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভার জালিয়াতি ও তার প্রবল অত্যাচারের খতিয়ান হাজির করতাম।[১০]

*বর্গী এলো দেশে*নাটকটি নাট্যকার এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যাতে একইসঙ্গে পথনাটিকা ও প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয় করা যায়। ১৯৭০ দশকের ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতি;বিশেষত কংগ্রেস-প্রশাসন-পুলিশ-এর ভূমিকা এবং অত্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে এই নাটকে। চারটি দৃশ্যে বিন্যস্ত নাটকটি। নাটকের শুরু হয়েছে দীপক রায়-এর আত্মপরিচয়, হারাধন উকিল সম্পর্কিত তথ্য এবং গৌতম মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর দিয়ে। পুলিশ কনস্টেবল মিহির চক্রবর্তীকে খুন করার মিথ্যা অপবাদে গৌতমকে এ্যারেস্ট করে থানায় এনে গুলি করে হত্যা করে, এবং লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর না করে পুলিশ তার স্বজনদের সামনেই পোড়ায়,তারা দাঁড়িয়ে দেখে। গৌতমের মা প্রভাবতী, বাবা জলধর (স্কুল শিক্ষক) ও দাদা অমিতাভ(মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য) শ্মশান থেকে হারাধন উকিলের বাড়ি এসেছেন রাত দশটার পরে। রাত দশটার পরে তিনি(হারাধন উকিল) কোন মক্কেলের সঙ্গেই কথা বলেন না;কিন্তু এদের সঙ্গে কথা বলতে যেয়েই প্রখ্যাত উকিল হারাধন বাগচি জড়িয়ে পড়লেন গৌতম-মুখুয্যের মামলায়। তারপর নানা তথ্য ঘাঁটতে লাগলেন;অনেক ছেলের মৃত্যুর একটিতেও মামলা না হলেও তারই প্রচেষ্টায় অবশেষে গৌতমের মামলার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত বসে। বিচারপতি মিস্টার জাস্টিস ভাদুরি,পুলিশ পক্ষে ব্যারিস্টার ভোলা গুপ্ত, কোর্ট ক্লার্ক দেবনাথ বাবু, পুলিশের ডেপুটি কমিশনার চিরঞ্জীব সেন। উকিল হারাধন তথ্য-প্রমাণসহ সওয়াল করে মামলা এমন পর্যায়ে নিয়ে যান যাতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় মিহির চক্রবর্তীকে পুলিশই খুন করিয়ে তার দায় মেধাবী ছাত্র সিপিএম-এর রাজনীতির সাথে যুক্ত গৌতমের ওপর চাপানোর জন্য তাকে এ্যারেস্ট করে থানায় এনে গুলি করে হত্যা করে। পরদিন সাক্ষী দেয়ার কথা গৌতমের দাদা অমিতাভ মুখুয্যের। মামলার বর্তমান অবস্থায় অমিতাভসহ তার বাবা-মা যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে তখন পুলিশ অফিসার চিরঞ্জীব,জিতেন এবং সি-আর-পির সেপাইরা তাদের বাড়িতে ঢুকে তাদের মেরে রক্তাক্ত করে বাপ-ছেলেকে থানায় নিয়ে যায়;যাতে অমিতাভ পরদিন সাক্ষী দিতে না পারে– তাদের বিরুদ্ধে উদ্ভট,অবাস্তব ও মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে, তারা নাকি বোমা তৈরি করছিলেন। তাদের আরেক সাক্ষী জিতেন তরফদারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় যাতে তিনি সাক্ষী দিতে না পারেন। এতকিছুর পরও উকিল হারাধন বাগচী সাক্ষী জিতেন তরফদারকে আদালতে হাজির করে প্রমাণ করতে সক্ষম হন, চিরঞ্জীব জিতেনকে প্রথমে প্রমোশন ও পুরস্কারের লোভ এবং পরে চাকুরি হারানোর ভয় দেখিয়ে থানায় নিয়ে গৌতমকে হত্যা করায়। অবশ্য হত্যার আগেই চিরঞ্জীব গৌতমকে আধমরা করে ফেলেছিল। জিতেনকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় কেন সে সাক্ষী দিতে এসেছে, উত্তরে সে জানায় :

> সবাইকে জানাতে যে পুলিশের মধ্যে আমরাও আছি। ঐ-খুনীরাই সব নয়। আমরাও আছি। আমরা গরীব বাপ-মার ছেলে। অথচ আমাদের দিয়েই খুন করায়। আমি বলতে এসেছি, কোন কনস্টেবল, কোনো নীচুতলার অফিসারের আর উচিৎ নয়,ঐ নরখাদকদের হুকুম তামিল করা।[১১]

সরকারি উকিল ভোলাবাবুর আবেদনে সাড়া দিয়ে জিতেন তরফদারের পুরো সাক্ষ্য রেকর্ড থেকে বাদ দিয়ে দেন। অমিতাভ জেলে, অন্য সাক্ষী না থাকায় বিচারপতি সোমবার মামলার রায় দেয়ার ঘোষণা দিলে প্রভাবতী বলেন,

> জানি আপনার কিছু করার নেই। জানি সোমবার আপনি কি রায় দেবেন। আপনি বলবেন,যদিও পুলিশের কিছু গাফিলতি হয়েছে,তবু খুব বেশি দোষ হয় নি। আপনার কিছু করার নেই। কিন্তু অন্য অনেকের করার আছে। আমি গৌতমকে হারিয়েছি, বোধ হয় অমিতাভ আর স্বামীকেও হারিয়েছি। তাতে কিছু এসে যায় না। ১৯২৪ সাল থেকে আমাদের পরিবারের ওপর চলছে এই নির্যাতন,গা-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু শোষণের বিরুদ্ধে জনতার যে লড়াই, তার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের যে আজ সুপরিকল্পিতভাবে এক এক করে হত্যা করছে,বর্গিরা যে আবার বাংলাদেশকে ছারখার করে দিচ্ছে, এটা বাংলার জনতা কি মেনে নেবে? তাও কি কখনো হয়? তোমরা কি সবাই বলবে,ও কিছু কমিউনিস্টকে মারছে আমাদের তাতে কি?'[১২]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন বর্গীর নিরন্তর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছিল বঙ্গদেশ, তেমনি ১৯৭০-এর দশকে শাসক গোষ্ঠী-পুলিশ-প্রশাসনের অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছিল পশ্চিমবঙ্গ। এইসব কিছুর নিখুঁতচিত্র এবং এ-দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে *বর্গী এল দেশে* পথনাটিকায়। সেদিন বাংলার ছেলেরা ঘুমিয়েছিল,পাড়া জুড়িয়েছিল তাই বর্গীরা আক্রমণ করতে পেরেছিল কিন্তু আজকের ছেলেরাতো ঘুমিয়ে থাকতে পারে না,ঘুমিয়ে থাকবে না, তারা জেগে ওঠেছে; তারা এ-সবের মোকাবেলা করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে নাটকে।

*মালোপাড়ার মা*পিএলটি একাডেমী মঞ্চে ১৯৮৩ সালের ১৩ অক্টোবর প্রথম মঞ্চস্থ করে। 'মালোপাড়ার মা বাস্তব ঘটনাভিত্তিক নাটক। মালোপাড়ার রতুয়া থানার একটি নৃশংস কংগ্রেসী হত্যাকাণ্ডের দলিল।'[১৩] ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে উৎপল দত্ত এ-নাটক রচনা করেন। মালদহ জেলার রতুয়া থানার মালোপড়া গ্রামে কংগ্রেস-নামধারী মাস্তানদের নৃশংস হামলায় প্রাণ হারায় কয়েকজন। কংগ্রেসীদের এই ঘটনায় সারা দেশে হৈ-চৈ পড়ে যায়। এই বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে উৎপল নাটকটি লিখেছিলেন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য। ১৯৮৩ সালে ১৩ অক্টোবর মঞ্চে অভিনীত হয় এ-নাটক। ১৯৮৪ সালে সাধারণ নির্বাচন এসে যাওয়ায় এ-নাটককে খানিক সংশোধন করে পথনাটকের রূপ দেয়া হয়।

১৯৯২ সালের সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে *সত্তুরের দশক*রচিত হয়। এ-নাটকে উৎপল দত্ত দু'দশক আগের ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষ করে, সত্তুরের দশকের ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিবেশ তুলে ধরেছেন। দু'দশক আগের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে বর্তমান সময়ের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে এ-পথনাটকে।

শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পথনাটকের সমাপ্তি ঘটা উচিৎ বলে উৎপল দত্ত মনে করতেন।'পথনাটিকার শেষে, এটা যদি না হয়, দর্শকরা যদি শ্লোগানে গলা না মেলান – তাহলে বুঝতে হবে কোনও গন্ডগোল হয়েছে শোয়ে। হয়তো অভিনয় ঠিকমতো হয় নি;বা নাটিকা ঠিকমতো লেখা হয়নি,কিংবা পারিপার্শ্বিকতার কোনও গন্ডগোল আছে।'[১৪]

প্রোপাগান্ডিস্ট অ্যাজিটেটর উৎপল দত্ত'র পথনাটিকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেনৃপেন্দ্র সাহার মূল্যায়ণ :

১.অদৃশ্য এক প্রোসেনিয়ামের ফ্রেমে বাঁধানো ক্ষুদ্র নাটিকা।

২.প্রতিটি নাটিকা বা নাটক নাট্যরচনার প্রচলিত কাঠামোর আঙ্গিকে রচিত।

৩.রসের বিচারে সিরিও কমিক।

৪.নাট্যদ্বন্দ্ব মূলত নির্ভর করে ডিবেট বা কোর্টরুম সিকোয়েন্সকে ব্যবহার করে।

৫.প্লট ফ্লেক্সিবল,ইম্প্রোভাইজেশন করতে করতে এগোয়।

৬. ক্লাইম্যাক্সে ওঠেই অবরোহণ।

৭.সমাপ্তিতে কোনও এপিলোগ থাকে না – সোজাসুজি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় শ্লোগানে।[১৫]

গ.একাঙ্ক নাটক

উৎপল দত্ত পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক,যাত্রাপালা এবং পথ নাটকের পাশাপাশি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা তেইশটি :*Betty Belshazzar,ঘুমনেই,দ্বীপ,নীলকণ্ঠ, মেঘ,সঙ্কট মুহূর্তে,ইতিহাসের কাঠগড়ায়,কঙ্গোর কারাগারে, লৌহমানব,এক দেহে লীন,সভ্যনামিক,নয়া ইতিহাস,মায়ের চোখে জল,হিমালয়ে জীবন্ত মানুষ,লোহার ভীম,কাকদ্বীপের এক মা,আজকে আমার ছুটি,অর্জুন অপেরা,৩১শে অক্টোবর,কুশপুত্তলিকা,খুনী কে,কিরাত পর্ব,দিল্লি বিচিত্রা ইত্যাদি।*

Betty Belshazzar নাটকে দুটি দৃশ্য; একটি সেকালের, একটি একালের। সেকালের দৃশ্য; পুরনো বেলসাজার আমলের–যেখানে সম্রাট বেলসাজার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তার ক্ষমতার মাধ্যমেই তিনি সমাজের ধনিক অভিজাত শ্রেণীর সাথে যোগসাজস করে তার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ রাখতে চেয়েছেন। তিনি তার ভোজসভায় আমন্ত্রণও করেন সমাজের সেই ধরনের লোকদের। একালেরদৃশ্য; বেটির ভোজসভায়ও আমন্ত্রণ জানান টেডি. মি. কুশিং এবং কোরির মত লোকদের যারা কেবল বোঝেন ব্যবসা বাণিজ্য,লেনদেন সম্ভোগ ইত্যাদি।দুটো দৃশ্যের মধ্যে মৌলিক কোনো তফাৎ নেই; তফাৎ শুধু এই –একটা চিত্র সেকালের, একটা চিত্র একালের। মি. ব্রাউনকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা ইন্ডিয়ান মেমদের পার্টিতে মজাদার সব কাণ্ডকারখানা ইত্যাদি সবই ব্যঙ্গচিত্র বা স্যাটায়ারের মাধ্যমে নাট্যকার উপস্থাপন করে এরআড়ালে আসল সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

*দ্বীপ*নাটকটি ১৯৫৯ সালে রচিত। শিল্পীমন কর্তৃক অভিনীত হয়েছে ঐ-বছরই এবং জাতীয় সাহিত্য পরিষদের একই সংখ্যায় *ঘুম নেই* এর সঙ্গে প্রকাশিত।

মিলন সরকার এককালে রাজনীতি করতো। এখন পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে সাংবাদিকতা করছে,মালিকের চাহিদা ও হুকুম মতো লিখে যায়। মালিক সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক,সহসম্পাদকও রিপোর্টারকে খবর ম্যানুফ্যাকচার করতে বলে : ''পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত মাছের ঝুড়িতে নরমুণ্ড!''[১] সকালে প্রথম পাতায় প্রথম চার কলম জুড়ে এই খবর বেরুবে। পত্রিকার মালিক এই কাহিনী লেখার দায়িত্ব দিয়েছে মিলন সরকারকে। মিলন সরকার এমন রিপোর্ট লিখতে আদিষ্ট হয়ে মালিকের মুখের উপর কিছুই বলতে পারেনি কারণ তার আত্মা এরই মধ্যে বিকিয়ে গেছে। নরমুণ্ডের ছবি গল্প ছাপানোর পেছনে মালিকের ইচ্ছে দাঙ্গা লাগানো–এবং মালিকের বড় আশা – দাঙ্গা বিকেলেই যেন লাগে। মিলন সরকারের কষ্টবোধ এজন্যে যে, এই কুৎসিত কাজে, এই দাঙ্গা লাগানোর পেছনে তার কালিমাখা হাত খানিক থেকে গেল। মিলন সরকারের আত্মোপলব্ধির মধ্যেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

*নীলকণ্ঠ*একাঙ্কটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের শারদীয় দেশ সংখ্যায়। মহারাজ নামক একটি মেথর বালকের ম্যানহোলের মধ্যে অটকা পড়া,উদ্ধার কার্য এবং শেষপর্যন্ত তার মৃত্যু এইসব নিয়েই নীলকণ্ঠ। ছোট্ট পরিসরের এ-নাটকে নাট্যকার কলকাতার কোনো একটি গলির প্রাত্যহিক দৃশ্য, নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাবেশ,কর্পোরেশন,প্রশাসন,পুলিশ,সাংবাদিকদের বিচিত্র চরিত্র ও তৎপরতা উপস্থাপন করেছেন। বালক মহরাজ বিষাক্ত গ্যাসে আটকা পড়ে বেদনায় নীল হয়ে নীলকণ্ঠ হয়েছে,তথাপি সাংবাদিকরা ছবি তুলে যাচ্ছে – এ-দৃশ্য বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকের নিরন্ন, কংকালসার, প্রায় বস্ত্রহীন মানুষদের নিয়ে ছবি তোলার দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। নাট্যকার ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে-শ্লেষে নিম্নশ্রেণির মানুষের মর্মন্তুদ জীবন-বেদনা তুলে ধরেছেন এ-নাটকে।

মেঘ নাটকটি কথাকলি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে। প্রথম অভিনয় করে নান্দীরঙ্গ, শিশির মঞ্চে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে। উৎপল দত্ত নাটকটি উৎসর্গ করেছেন শ্রী মধু বসুকে;এটি মারাঠি, গুজরাটিসহ ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। *মেঘ* মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা-প্রধান নাটক। এ নাটক উৎপলের অন্য নাটকের চেয়ে বিষয়ে-আঙ্গিকে স্বতন্ত্র। এটি সমগ্র জনতার সমস্যা ও সংগ্রামের নাটক নয়; এ-নাটক একান্তই ব্যাক্তির মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার নাটক।
মেঘ-এর প্রধান চরিত্র সমরেশ স্যানাল, বিখ্যাত লেখক; বর্তমানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন। উপন্যাসের প্লটের কথা ভাবতে ভাবতে বাস্তবের খেই হারিয়ে ফেলেন। স্ত্রী মাধুরী স্যানাল ও ডাক্তারের সহযোগিতায় লেখক এ-অবস্থা অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি।

ইতিহাসের কাঠগড়ায় নন্দন-এ ১৯৬৫ সালে(সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, বর্ষ-৩, সংখ্যা ৬-এ)প্রকাশিত হয়। পরে নাটক সমগ্র ৫ম খণ্ডে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। *ইতিহাসের কাঠগড়ায়* নাটকের পরিপ্রেক্ষিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। দিল্লির এক সরকারি দপ্তরের একটি কক্ষে অত্যন্ত জরুরি ও গোপনীয় তদন্ত বসেছে। আসামির কাঠগড়ায় মেজর সেলিম আহমেদ। কমিশনের আসনে লেফটেনান্ট জেনারেল সাহনি। সামরিক বিভাগের মামলা উত্থাপন করছেন ব্রিগেডিয়ার গুরুবকস্ সিং। উপস্থিত আছেন কয়েকজন সামরিক অফিসার। ব্রিগেডিয়ার সিং সামরিক বিভাগের বক্তব্য তুলে ধরেন। সাহনি মেজর সেলিম আহমেদ-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করছেন কি-না জানতে চাইলে সেলিম আহমেদ নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। সাক্ষীদের ডাকা হয়; প্রথমে কর্ণেল মুখার্জী,পরের সাক্ষী কিষেনলাল আদক লেফটেনান্ট কর্নেল। আর মেজর আহমেদ-এর কাউনসেল ক্যাপ্টেন যশপাল।ক্যাপ্টেন যশপাল কর্ণেল আদককে প্রশ্ন ও জেরা করে বের করে আনে আসল সত্য। তাতে মেজর সেলিম আহমেদ সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং অত্যন্ত চৌকষ ও দেশপ্রেমিক অফিসার হিসেবে প্রতিপন্ন হন।

*কঙ্গোর কারাগারে*নাটক রচনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এটি উৎপল দত্তের জেল জীবনের রচনা। নাট্যকার তখন প্রেসিডেন্সি জেলে। প্রেসিডেন্সি জেলের রাজনৈতিক বন্দিরা নাটকটি প্রথম অভিনয় করে। ১৯৬৫ সালে নাটকটি রচিত এবং ঐ-বছরই প্রসেনিয়াম পত্রিকায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে উৎপল দত্ত নাট্য সমগ্র ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। জন ও উইলিয়াম নামক দুইজন রাজবন্দির আসন্ন মৃত্যু *কংগোর কারাগারে* নাটকের পটভূমি। জন রেগেলো এবং উইলিয়াম চেনজিকে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরার অপরাধে বারাংগা আদালত ১৯৬৪ সালের ১৭ই অক্টোবর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ৭ই নভেম্বর। ১৭ অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর এই বিশ দিন দুই বন্দির (জন ও উইলিয়ামের) একদিকে পৃথিবীর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বেদনা অন্যদিকে বাঁচার আকুলতার দ্বান্দ্বিকতা অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার এ-নাটকে। মৃত্যুর আগে উইলিয়াম মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

উইলিয়াম কিছুতেই মরতে চান না,বাঁচতে চান,এখান থেকে বেরুতে চান, দেয়াল ভেঙে বেরুতে চান। জন তাকে বোঝায় কিন্তু কিছুতেই তার মন মানে না,বাঁচার আকুলতা তাকে ব্যাকুল করে তোলে; মনে পড়ে যায় তার মা-হীন বাচ্চা মেয়েটার কথা। অফিসারের পায়ের শব্দে ওরা সচকিত হয়ে ওঠে। মৃত্যুর মুখোমুখী হতে যে উইলিয়াম ভয় পাচ্ছে সে-কথা ওদের জানতে দেয়া যাবে না বরং ওরা দেখুক লুলুম্বার লোকেরা ইস্পাতে গড়া। তাই জন বলে 'দেখিয়ে দিন, আমাদের স্বপ্ন ওরা বন্দি করতে পারে নি।'[২] অফিসার যখন ৭ই নভেম্বর জন, উইলিয়ামের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘোষণা দেয়, তখন ৭ই নভেম্বর ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উলিয়ামের সামনে হাজির হয়। তিনি ৭ই নভেম্বরের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন :

> সাতই নভেম্বর মানে আপনাদের অনিবার্য ধ্বংসের আরেকটি স্মারক। সাতই নভেম্বর মানে গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে আমরা বেঁচে রইলাম। সাতই নভেম্বর মানে দুনিয়ার সর্বহারার অবশ্যম্ভাবী জয়। সাতই নভেম্বর মানে স্বাধীন আফ্রিকা আর এশিয়া।[৩]

*লৌহ মানব*নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রসেনিয়ম পত্রিকায় ১৯৬৬ সালে (বর্ষ ৩, সংখ্যা ৮-৯-এ) পরে ১৯৯৫ সালে গ্রন্থাকারে নাটকসমগ্র তৃতীয়খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের পরিচিতি পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে–এর রচনাকাল ১৯৬৪। প্রথম অভিনয় ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে। ১৯৭৯ সাল থেকে পিএলটি নাটকটি নিয়মিত অভিনয় করে। এ-নাটকের পরিপ্রেক্ষিত বালাসিয়েভ মামলা – একসময় যারা স্তালিন পূজায় মেতেছিলেন ক্রুশ্চেভের জমানায় এসে তারাই ক্রুশ্চেভের অনুগামী হয়ে মামলা শুরু করেন।
১৯৬৩ সালের শেষভাগে মস্কোর অরবাৎস্কায় প্লাৎসে সামরিক আদালতে বিচার-দৃশ্য দিয়ে নাটকের শুরু। বিচারক কর্ণেল সের্গেইয়েভিচ ক্লাসভ, অভিযুক্ত ত্রোফিম মিখাইলোভিচ বালাসিয়েভ, বাদী সামরিক বিভাগের পক্ষে ক্যাপ্টেন আন্দ্রে গ্রোসমান,এডজুটেন্ট পাভেল মেদেংকো।

ক্রুশ্চেভের জমানায় স্তালিনকে স্বৈরাচার আখ্যা দিয়ে এই দেশপ্রেমিক বীরযোদ্ধাকে স্তালিনের নিকটতম উপদেষ্টা ও সহযোগীদের একজন হয়ে ওঠা এবং স্তালিনের স্বৈরাচারকে দৃঢ় করার প্রধান পান্ডা হিসেবে অভিহিত করে।

বালাসিয়েভের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ : ১৯৪৩ সালের ১৬ই মার্চ মস্কো শহরে ভরবস্‌কোগো আঞ্চলিক কমিটির যে ১৭ জন সদস্য গ্রেপ্তার হন, ঐ-গ্রেপ্তারের হুকুমনামায় স্বাক্ষর করার। এ-ছাড়াও অসংখ্য অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। বালাসিয়েভ-এর বিরুদ্ধে প্রথম সাক্ষ্য দেন বোরিস স্তেপানভ। স্তেপানভকে জেরা করে বালাসিয়েভ প্রমাণ করেন,তার আনীত অভিযোগগুলো সত্য নয়। পরের সাক্ষী ভাসিলি সাভিংকভ। ভাসিলি সাক্ষ্য দিতে এসে বালাসিয়েভের জেরায় বুঝতে সক্ষম হন কেন ঐ ১৭ জনের ব্যাপারে ঐ-রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন বালাসিয়েভ। ঐ ১৭ জনের মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারীরা লুকিয়েছিল কিন্তু কেউই স্বীকার করছিল না এবং কোনোভাবেই আসল অপরাধীদের শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। ভাসিলি সব যখন বুঝে যান তখন বলেন:

> বলতে হবে... সজোরে চেঁচিয়ে বলতে হবে। সাইবেরিয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে... এবং...এবং এঁদের অবিরাম প্রচারের ফলে... আমারও মনে হয়েছিল তুমি ত্রোফিম বুঝি সত্যিই একটা নরপশু। এখন... বুঝতে পারছি,তা নয়... আমরা বদলাইনি কমরেড,বদলেছে এরা। নিজেদের খেয়াল খুশিমতন মার্কসবাদ লেনিনবাদকে বদলে নিচ্ছে,কিন্তু... কিন্তু আমি জানি,তুমিও নিশ্চয়ই জানো ত্রোফিম... লেনিনের-স্তালিনের পার্টির মৃত্যু নেই। এই মহান পার্টি আবার শত শত স্তালিনের জন্ম দেবে। তদ্দিন পর্যন্ত তোমাকে আর আমাকে বাঁচতেই হবে কমরেড।[৪]

বালাসিয়েভ-এর কাছে সবকিছুর চেয়ে পার্টি এবং দেশ বড়,তাই তিনি যাকিছুই করেছেন সবই পার্টি এবং দেশের জন্যই করেছেন। নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে *লৌহমানব* নাটকে বালাসিয়েভ-মামলায় ইতিহাস বিকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকটি উৎপল দত্ত কোর্টরুম ড্রামার আঙ্গিকে রচনা করেছেন।

*এক দেহে লীন*নাটকের পটভূমি ভারতের পাবর্ত্য এলাকা জেন্তিমাই-এর দারিদ্র্যপীড়িত মনক্রাম গ্রামের মানুষের জীবনাচরণ।কর্ণেল বাৎসায়ন মেজর জোসেফকে মনক্রাম গ্রামে পাঠান অধিবাসীদের গণতন্ত্র বোঝাতে,ভারতীয় ঐতিহ্য শেখাতে। মনক্রাম গ্রামকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য ওয়াশিংটনে তৈরি প্ল্যান-বি জোশেফের হাতে ধরিয়ে দেন। প্ল্যান-বি-তে কিছু না পেয়ে সে ভাবছে এখানে কী শিল্প গড়ে তুলে দারিদ্র্য ঘোচানো যায়।

জোসেফ শেখাতে এসে নিজে শিখছে, এদের ভাষা আয়ত্ত করছে, এদের পোশাক পরছে। পাঁচকোনা ইস্কুল বাড়ি প্রায় তৈরি; এ-গ্রামে শিল্প গড়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সারা গ্রামের মানুষকে কাজে লাগায় সে – তিপানি তৈরির কাজে লাগায়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে তিপানি সাপ্লাই দেয় – প্রতি গ্যালন একশ টাকা। কর্ণেল বাৎসায়ন মনক্রামের অবস্থা জানতে জোসেফকে ফোন করে বুঝতে পারে জোসেফের উচ্চারণ, জীবণাচরণ জেন্মিদের মতো হয়ে গেছে। কর্ণেল গাড়ি নিয়ে তখনই মনক্রাম রওনা হয়ে যায় – এসে দেখে, জোসেফ এদের সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে গেছে, সব দেখে খুবই নাখোশ হন তিনি। এদের বর্বর আখ্যায়িত করলে জোসেফ বলে, অন্য জাতির কৃষ্টি, আচার না জেনে এভাবে বলা ঠিক নয়, আর এরা বর্বর নয় ভিন্ন, ভিন্নতা নিয়ে ওরা ভারতীয়।

এদের হাতে পুরো আসামের সেনাবাহিনীর টাকা কীভাবে আসে জানতে চাইলে জোসেফ জানায় – জিনিস বেচে, মদ বেচে। মদের টাকা কী করে জানতে চাইলে বলে, নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ গাও-চান সকলকে ভাগ

করে দেয়। কর্ণেল বলে, তার মানে সাম্যবাদ। কর্ণেল জানতে চায়, জোসেফ কমিউনিস্ট কি-না, উত্তরে জোসেফ জানায়– সে কমিউনিস্ট নয়– জেন্তিম সংস্কৃতি আর ভাষাকে রক্ষাকারী একজন। কর্ণেল জোসেফকে গ্রেফতারের কথা বলে আর শুঁড়িখানাসুদ্ধ মনক্রাম গ্রাম ভেঙে দেয়া ও অধিবাসীদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাম ছেড়ে দক্ষিণে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কর্ণেলের নির্দেশানুযায়ী পুরো গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশে যায়, ধ্বংসস্তুপের ওপর জোসেফ দাঁড়িয়ে। কর্ণেল দৌড়ে প্রবেশ করে জানান, লোকসভা সদস্যরা মনক্রাম গ্রাম দেখতে রওনা হয়েছেন। পার্লামেন্টে মনক্রাম গ্রামের জয়জয়কার। ভারতীয় সেনাবাহিনী ভ্রাতৃত্ব প্রচার করে কী রকম আদর্শ সীমান্তগ্রাম গড়ে তুলেছে তার দৃষ্টান্ত এই মনক্রাম গ্রাম। যদিও তারা এসে দেখবে মনক্রাম শ্মশান।

কাকদ্বীপের এক মা নাটকের পটভূমি কাকদ্বীপেরএক গ্রামীন সহজ,সরল মায়ের সারল্য এবং তার সারল্যের জন্য ছেলে মহেন্দ্রকে হারানো । মহেন্দ্র কমিউনিস্ট। সুন্দরবনের জঙ্গল সাফ করে, বাঘ-সাপ-কুমীরের সংগে লড়াই করে, ধানী জমি হাসিল করে, সেখানে ফসল ফলিয়েছে কৃষকরা। সোনালি ফসলে মাঠ ভরে গেলে জমিদারদের নজর পড়ে। এতদিন যাদের টিকিও দেখা যায়নি, তারা দাবি করে এ-জমি তাদের। কিন্তু এ জমি যখন পড়ে ছিল, যখন জঙ্গল ছিল, তখন জমিদার নবাবরা ফিরেও তাকায়নি। তাই যে-কৃষকরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়েছে সেই কৃষকরা গোলা লুঠ করেছে। কৃষকদের ধান কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে মহেন্দ্ররা সাহায্য করেছে। মহেন্দ্র ফেরার। সহজ,সরল,গ্রামীণ মা বুঝতে পারে না তার এমন ভাল ছেলেটি কেন ফেরার। মহেন্দ্র গোপনে মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছে। মা জানতে চায়, মহেন্দ্র কমিউনিস্ট কি-না ? কমিউনিস্ট মানে কী? উত্তরে জানায় মহেন্দ্র:

> কমিউনিস্ট মানে এমন একজন যে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলা যায়। যে বিশ্বাস করে একজনের শ্রমের ধন আরেকজন চুরি করে খাবে এটা অন্যায়। যে জানে যে নতুন শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য চাই কিষাণ-মজদুর মেহনতী মানুষের নিজেদের সরকার।[৫]

এ-রকম সরকার কী করে তৈরি হবে, তাতে রক্ত বইবে, মানুষ মরবে, তাই বড়লোকদের বুঝিয়ে শ্রেণিহীন সমাজেই রাজি করানো যায় না? মা জানতে চাইলে মহেন্দ্র বলে– 'মজদুরদের সরকার তৈরি হবে না মা, জোর করে তৈরি করতে হবে।' লেখাপড়া না জানা মা ছেলের সব কথা বুঝতে পারে না কিন্তু এটুকু বোঝে নিশ্চয়ই তার ছেলেরা বিরাট কোনো স্বপ্ন দেখছে নইলেতো মা-বাপ সব ছেড়ে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। মা ছেলের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে,খাওয়ার আগে মহেন্দ্র মাকে লালঝাণ্ডা দেয় ও এর ইতিহাস বলে। যেখানেই মানুষ খেটে খায় সেখানেই এই ঝাণ্ডা।খাওয়ার জন্যই মহেন্দ্র মার কাছে এসেছিল কিন্তু খাওয়া আর হল না। জমিদার পুলিশ নিয়ে আসে,মহেন্দ্র লুকিয়ে পড়ে। বোকা সহজ,সরল গ্রামের মা এদের কৌশল না বুঝে বিশ্বাস করে নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দেয়। দিয়েই বুঝতে পারে কী ভুল করেছে। মহেন্দ্রকে পুলিশ নিয়ে যায় – যাওয়ার সময় মহেন্দ্র মাকে ঐ-নিশান প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে বলে যায়। এরপর মহেন্দ্রের মা নিজেই সকলকে ডেকে জানায় :

> তোমরা সবাই শোনো,মহী আমার ছেলে। তাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। মহীকে আমি আজ হারিয়েছি,কিন্তু তার বদলে পেয়েছি তোমাদের সকলকে, যারা মহেন্দ্রের কাজ শেষ করবে।[৬]

উৎপল দত্তের একাঙ্ক নাটকেও বিষয়ের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। মুর্শিদাবাদে পাগলাচণ্ডী ফেরিঘাটে ফেরি মেরামতের জন্য হঠাৎ একরাতে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে ঐ-খানে আটকে থাকা ড্রাইভার ও কয়েকজন মানুষের বিনিদ্র রজনী ঘুম *নেই*একাঙ্ক নাটকের পটভূমি। সাংবাদিক মিলন সরকার পেটের দায়ে বাধ্য সাংবাদিকতা করে,তাই মালিকের হুকুম মতো মিথ্যাচার করতে হয় কিন্তু সে বিশ্বাস করে 'মানুষ দ্বীপ নয়'। মিলন সরকারের এই আত্মোপলব্ধিই *দ্বীপ* নাটকের পটভূমি। মহারাজ নামক একটি মেথর বালকের ম্যানহোলের মধ্যে অটকা পড়া,উদ্ধার কার্য এবং শেষপর্যন্ত তার মৃত্যু এইসব নিয়েই *নীলকণ্ঠ* একাঙ্ক। *মেঘ* মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রধান নাটক। নাটকটি একান্তই ব্যাক্তির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার নাটক। *ইতিহাসের কাঠগড়ায়* নাটকের পরিপ্রেক্ষিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। জন ও উইলিয়াম নামক দুইজন রাজবন্দির আসন্ন মৃত্যু *কংগোর কারাগারে* নাটকের পটভূমি। *লৌহমানব* এই নাটকের বিষয় বালাসিয়েভ মামলা। *এক দেহে লীন* নাটকের পটভূমি ভারতের পাবর্ত্য এলাকা জেন্তিমাই-এর দারিদ্র্যপীড়িত মনক্রাম গ্রামের মানুষের অস্তিত্ব-সংগ্রাম। সমাজের অভিজাত শ্রেণি কাপড়-চোপড়ে বাইরে সভ্য হলেও ভেতরে ভেতরে তাদের জীবন যে কী পঙ্কিলময় তাই-ই উপস্থাপিত হয়েছে *সভ্যনামিক* একাঙ্কিকায়।*লোহার ভীম* একাঙ্ক নাটকের পটভূমি চলচ্চিত্রের ফাইট মাস্টার সুলতান খাঁর জীবন-যন্ত্রণা। কাকদ্বীপের এক সহজ-সরল মায়ের সন্তান হারিয়ে লাল ঝাণ্ডায় জেগে ওঠা*কাকদ্বীপের এক মা* একাঙ্ক নাটকের বিষয়। *আজকে আমার ছুটি* নাটকের পটভূমি পাক-ভারত সীমান্তে যুদ্ধরত সৈনিক জীবন।

একাঙ্ক নাটকগুলোর ভেতর ঘুম *নেই,দ্বীপ, লৌহ মানব, মেঘ* এবং *কঙ্গোর কারাগারে* – এ-কটি নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে। বাকিগুলোর মঞ্চায়ন সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়নি। *মায়ের চোখে জল, ৩১ শে অক্টোবর,খুনী কে, কিরাত পর্ব*–এ-চারটি নাটক এখনও পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ.রূপান্তরিত নাটক

উৎপল দত্তের ব্যাপক,বিস্তৃত অধ্যয়নের বিষয়টি সকলের কাছেই সুবিদিত। শৈশব-কৈশোর থেকেই বিচিত্র বিদ্যায়আগ্রহী ছিলেন তিনি। জেফ্রি কেন্ডালের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজের পড়ার কথা জানিয়েছিলেন এই বলে যে,'পড়তাম আমিও' এবং কেন্ডালের দলের সদস্যদের মানুষ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরিসীম কৌতূহল এবং বিশ্বের নানা ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানার আগ্রহ – 'বিশ্বসাহিত্যের সব পড়ে ফেলার এক অবাস্তব অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাদের যেন পেয়ে বসেছিল' – এ-সবই উৎপল দত্তের জীবনে গভীর ছায়াপাত রেখে গেছে। সেন্ট জেভিয়ার্সের সমৃদ্ধ পাঠাগার তার সহায়ক হয়েছে।বাংলা সাহিত্য এবং বিশ্ব সাহিত্য পাঠে উৎপল গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন; সৌমেন চট্টোপাধ্যায় 'উৎপল দত্ত জীবন কথা'য় উৎপল দত্তের নাট্যবিষয়ক পড়াশুনা সম্পর্কে লিখেছেন,'শুধু নাটক অভিনয় নয়, নাটক বা নাট্য-সম্পর্কিত বইপত্র পড়াশোনাও ছিল প্রচুর। পিটার ব্রুক,স্তালিস্লাভস্কিদের বই ছাড়াও শেকস্পিয়ার তো বটেই, পৃথিবীর যেখানকার যে-নাটক সম্পর্কে বই পাওয়া যেত,সব সংগ্রহ করে পড়া তাঁর কাছে ছিল 'মাস্ট'।'[১]

উৎপল দত্ত দেশি-বিদেশি ক্লাসিক্স অধ্যয়ন করেছেন, বহুবার বিদেশে গিয়েছেন, বিদেশে অসংখ্য নাটকের অভিনয় দেখেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালকের সাথে তিনি নাটক বিষয়ে মত বিনিময় করেছেন। তাই, উৎপল দত্ত মনে করেছেন দেশি নাটকের পাশাপাশি ভাল বিদেশি নাটকের প্রযোজনা করা যেতে পারে, সে-লক্ষ্যে তিনি কিছু বিদেশি নাটকের রূপান্তর করেছেন; তাঁর রূপান্তরিত নাটকগুলো হল:

গলসওয়ার্দি-এর*(দ্য সিলভার বক্স)চাঁদির কৌটো*, ম্যাকসিম গোর্কি-এর*(দ্য মাদার* উপন্যাসের আংশিক নাট্যরূপ) *মে দিবস*, শেকস্পিয়ার-এর *ওথেলো*, কাউফ ম্যান ও হার্ট-এর*(দ্য ম্যান হু কেম টু ডিনার)*ভি.আই.পি,জর্জ বার্ণাড শ-এর*(মিসেস ওয়ারেনস প্রোফেশন)* মধুচক্র,আগাথা ক্রিস্টির গল্প অনুসরণে *রাতের অতিথি*, শেকসপিয়ার-এর *রোমিও জুলিয়েট*, *অ্যা মিডসামার নাইটস ড্রিম*, ফ্রিডরিশ ভোলফ-এর *প্রোফেসর মামলক*, বের্টল্ট ব্রেখ্ট-এর (*মুট্টের কুরাজ উন্ড ইহ্রে কিন্ডের*অবলম্বনে)*হিম্মৎবাই*,আরউইন শ-এর *বেরি দ্য ডেড*অবলম্বনে *মৃত্যুর অতীত*, বের্টল্ট ব্রেখ্ট-এর*(ডী মাসনামে) সমাধান*, *(ডী টাগে ডের কম্যুনে)নয়া জমানা*, গ্রেগরি লারসেন-এর *গণ প্রতিনিধি*, বের্টল্ট ব্রেখ্ট-এর *ডী মুট্টের* আংশিক অনুবাদ *মা*, বোরিসভিয়াঁর নাটক (*ল্যাগুতে দে জেনেরো)* ওব্রের্টোল্ট ব্রেখট্-এর*(শোয়েইক ইম জ্ভাইটেন ভেল্টক্রীগ)*অবলম্বনে *যুদ্ধং দেহি*,ইয়ান পেটার্সেন রচিত*(উনসেরে স্ট্রাসে)*অবলম্বনে *ব্যারিকেড*, শেকস্পিয়ার-এর *ম্যাকবেথ*, দারিও ফো-র*(অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অফ অ্যান অ্যানার্কিস্ট)বাংলা ছাড়ো*, ব্রের্টল্ট ব্রেখ্ট-এর *ডী টাগে ডের কম্যুনে*'র

নির্বাচিত দৃশ্য *কমিউনের দিনগুলি*, স্তেফান হাইম-এর *দ্য লেনজ্ পেপারস্*অবলম্বনে *শৃঙ্খল ছাড়া*, কনস্টানটিন সিমনভ-এর সরোজ দত্তকৃত অনুবাদ অবলম্বনে*(দ্য রাশিয়ান কোয়েশ্চেন)দৈনিক বাজার পত্রিকা*, শেকসপিয়ার-এর*(মেরি ওয়াইভ্স্ অফ উইন্ডসর) ফুলবাবু*, ভাসিলি চিচকফ-এর(*অ্যান আনফিনিশড ডায়লগ)অসমাপ্ত সংলাপ*।

চাঁদির কৌটো নাটকটি জন গলস্ওয়ার্দির *সিলভার বকস্* নাটকের ভাবানুবাদ। উৎপল দত্তের নাট্যকার জীবনের প্রথম দিককার রচনা এই নাটক। *বিচারের বাণী* নামে লিটল থিয়েটার গ্রুপ নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিল **১৯৫৩** সালে,পরে নাম বদলে হয়ে যায় *চাঁদির কৌটো*। নাটকের ভূমিকায় উৎপল দত্ত জানিয়েছেন :

> গলস্ওয়ার্দীর নাটক দেশ-কাল দ্বারা সীমিত নয়, তাই সিলভার বকস্-কে বাংলাদেশের ঘটনা বলে কল্পনা করে নেয়া কঠিন নয় মোটেই।[২]

বিধান সভার সদস্য শ্রী জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়-গিরিনন্দিনী দেবীর আদরের বখে যাওয়া একমাত্র পুত্র জয়ন্ত। জীবন বাবুর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে মেনকা দাসী, মাসে বেতন পায় মাত্র পঁচিশ টাকা,তাই দিয়ে বস্তিতে অত্যন্ত মানবেতর জীবন-যাপন করেও মেনকা সৎ। তার তিনটে সন্তান, স্বামী জনার্দন বেকার, মদ্যপ। একদিন গভীর রাতে মদ্যপ জয়ন্তকে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে সাহায্য করে জনার্দন, তাই জনার্দনের প্রতি সে কৃতজ্ঞ। এ সুযোগ কাজে লাগায় সে। জনার্দন (জয়ন্তর মেয়ে বন্ধুর কাছ থেকে আনা) পার্স আর রুপোর সিগারেটের বাক্সটা পকেটে পুরে নিজের বাড়ি ফেরে। পরদিন ভোরে খোঁজ হয় রুপোর সিগারেট কেসের। সন্দেহ গিয়ে পড়ে মেনকার উপর। সকালেই জয়ন্তর মেয়ে-বন্ধু পলি বাড়ি এসে হাজির পঁয়ত্রিশ টাকা বারো আনা ভর্তি লাল চামড়ার পার্স নিতে। জয়ন্ত মদের ঘোরে তার পার্স নিয়ে আসায় মান-সম্মানের ভয়ে জীবনবাবু টাকাটা দিয়ে দেয় পলিকে।

বাড়ি ফিরে মেনকা স্বামী জনার্দনের ছেঁড়া কোট ঝাড়তে গিয়ে রুপোর সিগ্রেট কেস-এর সন্ধান পায়। মেনকা বিস্ময়ে লজ্জায় স্তম্ভিত, সে রুপোর কেসটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে চাইলে জনার্দন তাকে মারে; হাত থেকে বাক্সটা মেঝেয় পড়ে যায়– এমন সময় দারোগা তুষার মল্লিক ঘরে ঢোকে। তার চোখে পড়ে সেই বাক্স – দু'জনকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। জীবনবাবুদের বৈকালিক নাস্তার টেবিলেইকৌটো হাতে হাজির হয় দারোগা; তাদের জানায়, উদ্ধারের কাহিনী এবং আরো জানায়, জনার্দন বলেছেছোটবাবু রাতে একটু বেশি খেয়ে বাড়িতে এসেছিল এবং নেশার ঘোরে জনার্দন কৌটোটা পকেটস্থ করেছে।

এবারে টনক নড়ে জীবনবাবুর। কোর্টে এসব ফাঁস হলেতো মানসম্মন থাকবে না। তাই মামলা চালাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। দারোগার সামনে জীবনবাবু এমন ভাব দেখান যে, জনার্দনের মত বেকার শ্রমিকদের জন্য তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত। আসলে তিনি উৎকণ্ঠিত নির্বাচনের জন্য; মদ্যপ ছেলের কেলেঙ্কারির জন্য। তিনটে শিশুকে

পিতামাতা ছাড়া করে জনার্দন-মেনকাকে জেলে পাঠিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে জীবনবাবু। কেস কোর্টে উঠলে জেরায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জয়ন্ত দোষী। জনার্দন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর্জি জানায় :

> বাবু বিচার করবে, বিচার করো। ও যা করেছে আমি তার থেকে বেশি কিছুই করিনি। তফাৎ হচ্ছে ওর টাকা আছে, লোকজন আছে ও সব পারে। আমার উকিলও নেই, হুজুর আপনারা সুবিচার করো।[৩]

খুবই সাধারণ ঘটনা নিয়ে এ-নাটক। বড়লোকের বখে যাওয়া আদুরে দুলাল জয়ন্তরা অপরাধ করে পার পেয়ে যায়; পার পেয়ে যাবার কারণ জয়ন্তর শ্রেণি-অবস্থান। এই শ্রেণি-অবস্থান বা শ্রেণি-চরিত্রকেই উৎপল দত্ত উন্মোচন করেছেন এ-নাটকে অসাধারণ নৈপুণ্যে।

*মে দিবস*একটিক্ষুদ্র নাটিকা। *ঘুম নেই* ও *দ্বীপ*-এর সঙ্গে একত্রে নাট্য-সঙ্কলনরূপে ১৩৬৮ সালের ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়। সংকলনটি উৎপল দত্ত উৎসর্গ করেন প্রতিভাবান অভিনেতা রবি ঘোষকে। *মে দিবস* ম্যাক্সিম গোর্কির *দ্য মাদার* অবলম্বনে রচিত।

পুলিশ পাভেলকে ধরে নিয়ে গেলে মা পদদলিত লাল ঝাণ্ডাটাকে শূন্যে তুলে ধরেন আর তিনি অনুভব করেন তার সন্তান পাভেলের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হবে। একজন সাধারণ মা সন্তানকে ভালবাসতে গিয়ে তার কাজ ও দায়িত্বকে নিজের অজান্তেই ভালবেসে ফেলে। তাই, সন্তান যখন কোনো কাজ অসমাপ্ত রেখে যায় মা সঙ্গত কারণেই সেই কাজকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়। এটা মাতৃত্বের দায়বোধ; এর কোনো দেশকাল নেই। পাভেলের মায়ের লালঝাণ্ডা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে সেই সত্যই প্রতিভাত হয়েছে।

ভি.আই.পি. নাটকটি কাউফম্যান ও হার্ট-এর *দ্য ম্যান হু কেম টু ডিনার* অবলম্বনে রচিত। মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯৬২ সালে নাটকটি উৎপল দত্তের পরিচালনায় প্রথম অভিনীত হয়। মিনার্ভায় যখন নাটকটি অভিনীত হয় তখন এর নাম ছিল *ভি.আই.পি.* পরে হয়েছে *পুরুষোত্তম*।

অনাথ গড়গড়ি ছাপোষা মানুষ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বর্ধমানের কাছে সোমপুরে থাকেন। ওখানে ছাতা তৈরির কারখানায় সামান্য চাকরি করেন। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে সাহত্যসম্রাট সুরেন্দ্রনাথ হুদাদ্দারকে আমন্ত্রণ করে আনেন সোমপুরে। অনুষ্ঠান শেষে কলকাতায় ফিরে যাবার সময় কলার খোসায় পা হড়কে পড়ে যান হুদাদ্দার। ডাক্তার দেখে বললেন, কোমরের হাড় সরে গেছে। অন্তত মাসখানেক নড়াচড়া করা যাবে না। অনাথের বাড়ি কাছে হওয়ায় এবং অন্য আয়োজকরা ততক্ষণে সরে পড়ায় নেহায়েত বাধ্য হয়ে তার বাড়িতেই তুলতে হয়। মাসখানেক ধরে তথাকথিত ভি.আই.পি. মি. হুদাদ্দার অনাথবাবুদের পরিবারকে কী-রকম অতিষ্ঠ করে তুলেছেন তা-ই এই নাটকের প্রতিপাদ্য।

> মধুচক্রঅমর নাট্যকার বার্ণার্ড শ' রচিত মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশনস্ অবলম্বনে রচিত। অবশ্য স্থান ও কাল পরিবর্তনের কারণে নূতন বিন্যাস ও ঘটনা-চরিত্র সংযোজিত। তবে, পৃথিবীর আদিমতম পেশার মৃত্যুঞ্জয়ী পুনর্বিচার একান্ত রূপেই বার্নার্ড শ'র।[4]

তুখোড় মেধাবী ছাত্রী কবিতা ইকোনোমিক্স-এ ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট। পরীক্ষা শেষে হোস্টেল থেকে মধুপুরের উপকণ্ঠে একটি সুদৃশ্য বাগানবাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এ-বাগানবাড়ি কবিতার মায়ের – নাম মধুচক্র। ছোটবেলা থেকেই কবিতা পড়াশুনা করে এসেছে হোস্টেলে থেকে। এখানে এসে কবিতা-শ্যামল পরস্পরের একটা হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কবিতার পিতৃ-পরিচয় সন্ধান করতে যেয়েই মা কৃষ্ণার সঙ্গে কথোপকথনে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণার জীবনের অতীত অধ্যায়। কৃষ্ণা কবিতাকে জানায় – ইচ্ছে করে নয়, বাধ্য হয়েই এ-পথে এসেছিলেন তিনি। আসরে গান গেয়ে নাম পাল্টে হয়েছেন নয়নতারা – আধুনিক হয়েছেন, ক্লাবে গিয়ে মদ খেয়েছেন; নিজের দেহের ব্যবসা ছেড়ে ম্যাসাজ ক্লিনিকের ব্যবসা ধরেছেন আর জুটিয়েছেন অগণিত ভক্ত বন্ধু-বান্ধব। সব শুনে, মায়ের মনে এর জন্য কোন গ্লানি বা অনুতাপ আছে কী-না জানতে চাইলে, মা উত্তরে জানান, একটুও না। নাটকের শেষে কবিতা-শ্যামল জানতে পারে ওরা ভাই-বোন। অতঃপর কবিতা চলে যায় তার পথে।
মা কৃষ্ণা পৃথিবীর আদিমতম পেশার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কবিতার মতো মেধাবী মেয়ের জীবনে যে সংকট নেমে এসেছে তার সুনিপুণ চিত্র উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার এ নাটকে।

আগাথা ক্রিস্টির গল্প অনুসরণে উৎপল দত্ত রচনা করেন *রাতের অতিথি* নাটকটি। সমাজের নামি-দামি প্রতিষ্ঠিত মানুষদের ভেতরের চরিত্র উন্মোচন এ-নাটকের পটভূমি। এই নামি-দামি মানুষদের সাতজন – বিকাশ মুখুয্যে-খবরের কাগজের মালিক,তার স্ত্রী সুলোচনা দেবী,অপরাজেয় কথাশিল্পী, ভারত-বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চিত্তব্রত গাঙ্গুলি,শিল্পপতি জগন্ময় লাহিড়ী, মন্ত্রী সদাশিব রায়,নারী প্রগতি সংঘের সভাপতি রেবা জোয়ারদার এবং জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী। এদেরকে কালীকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কাকদ্বীপের সন্নিকটে গাছাখালি গ্রামে ধ্বসে যাওয়া এক প্রাসাদে নৈশভোজে নেমন্তন্ন করে এনেছেন। নিমন্ত্রণপত্রের পুনশ্চে লিখেছেন :

> এক ক্রুদ্ধ লেখক একখানি ক্রুদ্ধ পুস্তক লিখিয়াছেন, হাঁড়ি ফাটিবে; তাঁহাকে নিরস্ত করিতে হইলে আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।[৫]

একে একে সাতজনই উপস্থিত হলে সকলের সামনে প্রত্যেকের কর্মকাণ্ডের তথ্য-পরিচয় উস্থাপন করা হয় – যাতে প্রমাণিত হয়, এদের পেশা মূলত চুরি,লাম্পট্য,জালিয়াতি, দেশদ্রোহিতা, নারীব্যবসা,খুন ইত্যাদি। এদের আসল স্বরূপ বেরিয়ে পড়লে এরা নানান প্রলোভন দেখায় কালীবাবুকে,তাতে ফল না হওয়ায়, এমনকি কেউ কেউ পায়ে ধরে যাতে তাদের পঙ্কিলতায়-ভরা জীবন-কাহিনীভিত্তিক বইটা না ছাপেন। এ-নাটকে সমাজের প্রভাবশালী বিত্তবান ও বিখ্যাত মানুষদের ভেতরের কুৎসিত চেহারা উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার।

উৎপল দত্তের রূপান্তর নাটকের মধ্যে ফ্রিডরিশ ভোলফের *প্রোফেসর মামলক* বিখ্যাত নাটক।নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ৫ই নভেম্বর ১৯৬৪ সালে 'ব্রেখ্‌ট সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে;এবং প্রথম প্রকাশিত হয়গন্ধর্ব পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়, পরে নাটক সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডে।

ইহুদী বিদ্বেষের পটভূমিকায় নাৎসী অমানবিকতার বীভৎস চিত্র উন্মোচনকারী জার্মান নাটক *প্রোফেসর মামলক*। নাটকের নাম-পৃষ্ঠায় : 'যখন লড়াই করা দরকার, তখন লড়াই এড়ানোর চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই' – এ-সুখ্যাত উক্তিটি ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। চারটি অঙ্কে বিন্যস্ত *প্রোফেসর মামলক*। নাটকের ঘটনাপ্রবাহের সূত্রপাত ১৯৩২ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হিন্ডেনবুর্গ নির্বাচনের পূববর্তীকাল এবং শেষ হিটলার তথা নাৎসীদলের উত্থান। জার্মানির বিখ্যাত ডাক্তার প্রোফেসর মামলক। এই ইহুদী ডাক্তার আর্তের সেবায় নিজেকে নিবেদন করেছেন। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন; সেই হাসপাতালে নিরলস নিষ্ঠায় রোগীর সেবা করে যাচ্ছেন। হাসপাতাল আর রোগী ছাড়া তার আলাদা কোন জীবন নেই। তাই তার সহকর্মী ও স্টাফদের সমকালীন রাজনীতির প্রতি আগ্রহ থাকলেও তার কোন আগ্রহ নেই; যে কারণে তিনি বলেন :

> বন্ধুগণ, যত মানসিক যন্ত্রণাই আমরা ভোগ করি না কেন,ভবিষ্যতে এই হাসপাতালে কোন রাজনৈতিক আলোচনা আমি শুনতে চাই না। আমাদের কাছে শুধু ডাক্তার আর রুগী, রুগী আর ডাক্তার – আর কিছু নেই।[৬]

জার্মানির পার্লামেন্ট রাইখস্টাগে আগুন লাগলে সেই দায় চাপানো হয় কমিউনিস্টদের ওপর। কমিউনিস্টদের বিদেশি রাষ্ট্রের গুপ্তচর আখ্যায়িত করে তাদের হত্যা, নির্যাতন ও দেশছাড়া করার পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে নাৎসী বাহিনী। হিটলারের নাৎসী বাহিনী ক্ষমতা দখল করে কেবল কমিউনিস্ট পার্টি নয় অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টিকেও বেআইনি ঘোষণা করে; চলতে থাকে দমন-পীড়ন। প্রোফেসর মামলকের পুত্ররল্‌ফ, কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলে পিতা-পুত্রের মধ্যে আদর্শিক মতপার্থক্য দেখা দেয়। ছেলেকে তার বিশ্বাস ও রাজনীতি থেকে কিছুতেই ফেরাতে পারেন না মামলক। জার্মানির রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্নক বয়কট আন্দোলন করে সরকার ১৯৩৩ সালে চাকুরির পুনর্গঠন আইন নামে নতুন আইন প্রবর্তন করে :

> যে আইনের বলে, সমস্ত সরকারি চাকুরি, সমস্ত হাসপাতালের ডাক্তার ও সমস্ত আদালতের বিচারপতির পদ হইতে ইহুদীদের বিতাড়িত করা হইল।ঐ আইনেরই আর একটি অনুচ্ছেদের বলে সমস্ত ব্যায়ামাগার,সঙ্গীতানুষ্ঠান,নাট্যশালা, টেনিস-ক্লাব, সাধারণ স্নানাগার এবং প্রকাশকের দপ্তরে ইহুদীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।[৭]

যিনি নিজের হাসপাতালে কোন ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিপক্ষে, তিনিও তাঁর হাসপাতাল দেশের এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পান না। প্রোফেসর মামলকের মেয়েকে অপদস্থ করে তার পিঠে বৃহদাকার পাঁচকোনা তারা এঁকে দেয় নাৎসীরা, ছেলে চলে যায় রাজপথে। ডাক্তারের সেবাকর্ম কেউ রুখতে পারবে না বলে হাপাতালে যান,গিয়ে দেখেন তিনি এবং তার অন্যান্য ইহুদী সহকর্মীদের বরখাস্ত করা হয়েছে। মামলকের মতো প্রখ্যাত,জনপ্রিয় ডাক্তারকে বরখাস্ত করার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে;তাই তার নামে মিথ্যা অপবাদ

দিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন বলে রটিয়ে দেয় নাৎসীরা। তবুও ডাক্তার হিসেবে রোগীর সেবাই প্রধান এবং একমাত্র ব্রত মনে করে আবার হাসপাতালে যান তিনি, যদিও সরকারি নিষেধাজ্ঞায় সবকিছু থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। সেখানে নাৎসীরা তাকে লাঞ্ছিত করে তার গলায় সুতো দিয়ে কার্ডবোর্ডে ইহুদী লেখা ঝুলিয়ে দেয়। কার্লসেন এবং সিমন (বিস্রস্ত বেশভূষা) প্রোফেসর মামলককে ধরে বাড়ি নিয়ে আসে। মামলকসহ বাড়ির সবাই যখন বিমর্ষ ও বেদনাহত এবং কার্লসেন ও মামলক পত্নী যখন জার্মানি ছেড়ে যাবার কথা ভাবছেন; তখনও মামলক কিছুতেই জার্মানি ছাড়তে রাজি নন। এ-রকম দুঃসময়ে মামলকের সহকারী হেলপাখ এসে জানায়, (যে মামলকের অধীনে চাকুরি করত। মামলকের কাছ থেকেই কাজ শিখেছে। বর্তমানে অত্র এলাকার হাসপাতালগুলির নতুন অধ্যক্ষ) মামলক এবং অন্যান্য অনার্য কর্মী ও ডাক্তারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আগামীকাল থেকে তাঁর (মামলকের)এবং অন্যান্য অনার্য কর্মীদের হাসপাতালে প্রবেশ নিষেধ। নাৎসী সরকার প্রত্যহই নতুন নতুন আইন তৈরি করে –নতুন আইনে প্রাক্তন সৈনিকদের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তাই ডাক্তার মামলক আবার হাসপাতালে ফিরে আসেন। আইন না হলেও হয়তো তিনি ফিরে আসতেন তার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন? মামলক কাজে লেগে গেছেন এমন সময় হেলপাখ এসে জানায়, এই হাসপাতালের পাঁচজন কর্মীর উপর এই আইন প্রযুক্ত হচ্ছে। সেই পাঁচজনের তালিকা মামলকের হাতে দিয়ে হেলপাখ তাদের বরখাস্ত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। সে-তালিকায় রয়েছে সিমন–যিনি পনের বছর ধরে মামলকের সঙ্গে কাজ করছেন বিশ্বস্ততা,নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে;তাই তিনি তাকে ছাড়বেন না। কিন্তু যেহেতু তার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নেই তাই তিনি পাঁচজনের সঙ্গে নিজের নাম ছ'নম্বরে যুক্ত করে দেন। প্রোফেসর মামলকের এই বক্তব্যকে ভিন্ন দিকে ধাবিত করে তাকে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে ডা: হেলপাখ রিপোর্ট তৈরি করে–'অধ্যাপক মামলক তাহার সরকার-বিরোধী উস্কানিমূলক বক্তৃতার দ্বারা এই হাসপাতালের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করিয়াছেন। তাহার সরকার-বিরোধী মনোভাবের জন্য রোগী ও কর্মীদের মনোবল ভাঙিয়া পড়িতেছে। এই কারণে আমরা প্রোফেসর মামলক-এর অধীনে কাজ করিতে অস্বীকার করিতেছি।'[৮]এইরকম জঘন্য একটি বিবৃতি না পড়েই সকলে ভয়ে সই করছে দেখে মামলক বলেন :

> ভয়ে সবাই কাঁপছ, রুখে দাঁড়াবার মুরোদ নেই। ভাবছ হাঁটু মুড়ে হাতজোড় করলে লড়াইয়ের দায়িত্বটা এড়ান যাবে। ভুল করছ, নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছ। ঐ-কাগজে যদি সই কর, তবে জেনে রাখ নিজেদের মৃত্যুপরোয়ানায় সই করবে। তোমাদের কাপুরুষতা দেখে শত্রু নূতন নূতন অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করবে। যখন লড়াই করা দরকার তখন লড়াই এড়ানোর চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। আমার অনুরোধ একবার অন্তত রুখে দাঁড়াও,ল্যাজ গুটিয়ে পালিও না।[৯]

মামলকের বিরুদ্ধে বিবৃতিতে সকলে সই করলেও ডাক্তার ইঙ্গে সরকার সমর্থক হয়েও তাতে স্বাক্ষর করেননি। এত অপমান হেনস্থার পরও কাজ-পাগল মামলক কাজ করতে চান। তাতে হেলপাখ বাধা দিলে প্রোফেসর কাজ করার জন্য, শুধু কাজের জন্য,আর কিছু নয়, শুধু কাজটুকু করতে দেয়া, রোগীদের একবার দেখার আকুতি প্রকাশ করেন। নিতান্ত অসহায় হয়ে মামলক দুজন সহকারীর একজন হিসেবে তাকে কাজ করতে দেয়ার অনুরোধ জানান এবং তাতেও প্রত্যাখ্যাত হন। সবশেষে মামলক বরখাস্তের কাগজ ছিঁড়ে, নিজেই

নিজের বুকে গুলি করে বসেন। সকলে এগিয়ে আসে। তাঁকে ট্রলিতে শোয়ানো হয়;ইঙ্গে এটাই একমাত্র পথ কি-না জানতে চাইলে মামলক জানান:

> আমার সামনে আর কোন পথ ছিল না...তবে...হয়ত...তোরা অন্যপথ ধরতে পারবি...নূতন পথ...শোন্, অন্য রাস্তা খুঁজে নে...বিপদ গ্রাহ্য করিস নি...আর ওকে আমার অভিনন্দন জানাস,মানে আমার ছেলেকে, রল্ফকে...তোর সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়ই...নূতন পথে,নূতনের পথে।[১০]

জাতিবিদ্বেষ ব্যবহার করে বুদ্ধিজীবী, শ্রমিকশ্রেণি ও কমিউনিস্টদের টুটি চেপে ধরার ভয়াবহ চিত্র এই নাটক। প্রোফেসর মামলকের মত বিখ্যাত, জনপ্রিয় এবং নিবেদিত ডাক্তারের জীবন যে-রকম দুর্বিষহ করে তুলেছিল নাৎসীরা; যার আত্মহত্যা ছাড়া অন্যকোন বিকল্প ছিল না। তাহলে সাধারণ মানুষ এবং কমিউনস্টিদের কি হাল করেছিল নাৎসীরা এই বীভৎসতার চিত্রই নাট্যকার ভোলফ্ এবং উৎপলের রূপান্তরে ওঠে এসেছে। তিরিশ-চল্লিশের দশকে জার্মানে নাৎসীরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অত্যাচার, নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে নাৎসীদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এইসব কিছুই নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাটকে উন্মোচন করেছেন।

বের্টল্ট ব্রেখ্ট-এর*মুট্টের কুরাজ উন্ড ইহ্রে কিন্ডের* উৎপল দত্ত ভারতীয় পটভূমিতে *হিম্মৎবাই* নামে পুনর্নির্মাণ করেন। *হিম্মৎবাই* নাটকের পাঁচটি নির্বাচিত দৃশ্য পিপলস্ লিটল থিয়েটার গ্রুপ অভিনয় করে ১৯৮৮ সালের ৩১শে মার্চ ব্রেখ্টের ৯০তম জন্মদিবসে। গোর্কিসদনে অনুষ্ঠিত এই নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন ফিৎজ বেনেভিটস।

বেরটোল্ট ব্রেখট্ নাটকটি রচনা করেছিলেন প্রুশিয়ান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। ব্রেখ্টের নাটকে মা কুরাজ একজন খুব অল্প পুঁজির ফেরিওয়ালা। থাকার মধ্যে তার তিন ছেলে-মেয়ে আর একটি গাড়ি। গাড়িটি নিয়েই মা ফেরি করে ফেরে। সহজ-সরল এই মা মনে করে যুদ্ধ থাকলেই তার লাভ– তার কাছ থেকে লোকে জিনিস কিনবে, সেও অন্যের কাছ থেকে কম দামে কিনতে পারবে। যুদ্ধের জটিল মারপ্যাচ সে বুঝে না। যে-সব যুদ্ধবাজরা যুদ্ধ বাধায় সে-সব রথী মহারথীদের মধ্যে মা কুরাজ এক সামান্য নারী তার অর্থ-বিত্ত কিছুই নেই। ব্রেখ্ট-এর মা এক লড়াকু মা। আবার সে ব্যবসায়ীও, ব্যবসার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে যায় মা। ব্রেখট্-এর নাটকের যে-বৈশিষ্ট্য তা এই নাটকেও দুর্লক্ষ্য নয়।

উৎপল দত্ত ভারতীয় পটভূমিতে নাটকটিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সাজিয়ে নিয়েছেন। নাটকের পরিচিতিপত্রে বলা হয়েছে'শাহেনশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধে রোহিলাখণ্ডের রাজা আদিত্য সিংহ হিন্দুরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দোয়ার অঞ্চল আক্রমণের জন্য সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দেন।[১১]রাজা আদিত্য সিংহের লোকেরা সৈন্য সংগ্রহ শুরু করে। হিম্মৎবাঈ নাটকে হিম্মৎবাই – মাদার কুরাজের মতোই মা এবং এখানেও তিনি স্বল্পবিত্ত ফেরিওয়ালা। মা

সৈন্যদের মধ্যে নানা জিনিস বিক্রি করে, সেই সাথে মদও। মা হিম্মৎবাইয়ের ধারণা, যুদ্ধ বাঁধলে আর যুদ্ধ চললে তার খুব লাভ, কারণ তার কেনা-বেচা হয়; মুনাফাও হয়। যেমন রিসালদারের কণ্ঠে শোনা যায় : 'অবশ্য যুদ্ধও একটা ব্যবসা, গোড়ায় অসুবিধে হয়, কিন্তু একবার ফেঁদে বসলে, ফেঁপে ফুলে ওঠে। তখন সবাই শান্তির ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে।'[১২] সংগ্রাহক হিম্মতের বড় ছেলে আলিফকে ধরে যুদ্ধে নিয়ে যায়। বড় ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে ছোটভাই মোগলাই পরোটা আর বোবা বোন কার্ত্রী জোয়াল তুলে নেয় কাঁধে,গাড়ি টেনে নিয়ে যায় তাদের মা।যুদ্ধে হিম্মৎবাইয়ের উপলব্ধি:

> তাবড় তাবড়, লোকদের কথা শুনে মনে হয় ওরা লড়ছে ধর্মের জন্য,সত্য-শিব ও সুন্দরের জন্যে। একটু খতিয়ে দেখুন, লোক অত বোকা নয়, সবাই লড়ছে মোটা মুনাফার লোভে। নইলে কি আপনার-আমার মতন ক্ষুদ্র লোকেরা এ-ব্যাপারে ওদের তালে ঠেকা দিয়ে যেতাম?[13]

হিম্মৎবাইয়ের ছোট ছেলে মোগলাই পরোটাকে মোগলরা ধরে নিয়ে যায়। ছেলেকে মোগলদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য ইভৎ-এর সাহায্য চায় হিম্মৎ। ইভৎও রাজি হয় সাহায্য করতে; টাকা দরকার,অগত্যা বাধ্য হয়ে সতের বছর ধরে হিম্মৎবাই যে-গাড়িটা চালিয়েছে তাই ইভৎ-এর কাছে বন্ধক দিয়েছে দুশো দিনারে। মনে আশা জেগে আছে মোগলাই ফিরে এলে তার থলির টাকা থেকে টাকা নিয়ে গাড়িটা ফেরত পাওয়া যাবে। দরদস্তুর করতে করতে সর্বনাশই হয়ে যায়। আরও দুবছর পরেও যুদ্ধ ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠছে,মোগল সাম্রাজ্যের দিকে দিকে যুদ্ধ।

বড় ছেলে নিখোঁজ, ছোট ছেলে মৃত, বোবা মেয়ে কার্ত্রীকে নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকেন লড়াকু মা হিম্মৎ বাই। এদের সাথে কাজে সাহায্য করে পুরোহিত। হিম্মৎবাইয়ের ব্যবসা বেশ রমরমা। রাজপথে চলছে তার গাড়ি। গাড়ি টানছে হিম্মৎ,পুরোহিত, কার্ত্রী। গাড়ি বোঝাই নতুন নতুন মালে। যুদ্ধে যেহেতু হিম্মতের আয় রোজগার ভাল তাই হিম্মৎ যুদ্ধের নিন্দা শুনতে চায় না। যুদ্ধ যদি দুর্বলের যমই হয়ে থাকে, তাহলে শান্তির সময়েওতো দুর্বলের কোনো শান্তি হয় না। পরের বছরই হিম্মতের ব্যবসা বিপন্ন হয়; যুদ্ধে শান্তির সম্ভাবনায় হিম্মৎ অনেক রসদ কিনেছে।

মহাধর্মযুদ্ধ ষোল বৎসর ধরে চলেছে, উত্তর ভারতের অর্ধেক লোক মৃত। যারা যুদ্ধের হাত এড়ায়, তারা মরে মড়কে। একসময়ের শস্যশ্যামল গ্রামগুলো এখন ক্ষুধার রাজত্ব। শহরগুলি অগ্নিদগ্ধ, শূন্য রাজপথে শ্বাপদের পদচারণা। হিম্মৎবাই ঝাঁসী শহরের কাছে উপনীত। শীত এসে পড়েছে। ব্যবসা মন্দা। ভিক্ষা ছাড়া সামনে পথ খোলা নেই। পাচক ঠাকুর লাহোরে তার সরাইখানায় হিম্মতকে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু তার সন্তান কার্ত্রীকে নয়। কিন্তু মা হিম্মৎ সন্তান কার্ত্রীকে ফেলে কোথাও যেতে রাজি হয় না। কার্ত্রী আর হিম্মত সওদা করতে শহরে যায়।

ইতোমধ্যে হিন্দু বীরগণ মুসলমান নগরী সুলতানাবাদ আক্রমণ করতে উদ্যত। কার্ত্রীদের গাড়ি এক কৃষকের কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শহরে সাধারণ মানুষ ঘুমুচ্ছে, হিন্দু ফৌজ সশস্ত্র দুশমন শহর আক্রমণ করতে

মাঠ ভেঙে পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে আসছে। দুশমন সাগরপ্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেছে। এমন সময় কার্ত্রী ছাদে বসে ছোট ঢাক বার করে বাজাতে শুরু করে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সৈনিক-হাবিলদারদের উপরোধ-অনুরোধ ভয় ভীতি হুঙ্কার উপেক্ষা করে বোবা কার্ত্রী ঢাক বাজাতেই থাকে শহরবাসীকে জাগিয়ে দেয়ার জন্য। কার্ত্রী কিছুতেই নেমে আসে না বরং আরো জোরে ঢাক বাজাতে থাকে। সৈনিকরা গুলি করে কার্ত্রীকে। 'কিন্তু ঢাকের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যায় শহরের গর্জমান কামানের শব্দে। দূর থেকে কামানের সঙ্গে পাগলাঘণ্টা শোনা যাচ্ছে, শহরবাসী জেগে ওঠেছে।[১৪]

হিম্মৎবাই ফিরে এসে দেখে কার্ত্রী আর নেই। হিম্মৎ বিশ্বাস করতে পারছে না, ভাবছে ঘুমিয়ে আছে তার কার্ত্রী। আলিফ তো নিখোঁজ, মোগলাই নিহত। অবশেষে কার্ত্রীকেও হারিয়ে একাই জোয়াল কাঁধে নিয়ে হিম্মৎবাই একই সাথে সংশয় ও আশার দোলাচলে–'একা টানতে পারবো তো? হ্যাঁ পারবো। গাড়িতে আছে কি? আবার ভাল করে ব্যবসা ফেঁদে বসতে হবে।'[১৫] হিম্মৎবাই একাই গাড়ি টেনে চলতে থাকে আর সৈনিকরা সমবেত কণ্ঠে গান গায় –'বিপদ নিয়ে জুয়ে খেলা, আরেক নাম যুদ্ধ।[১৬]

হিম্মৎবাই কেবল একজন ব্যবসায়ীই নয়, সে একজন মমতাময়ী মা-ও। বেঁচে থাকার জন্য অস্তিত্বের প্রয়োজনে যাকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয় তার মমতা দেখাবার অবকাশ কোথায়! আর এতো সংগ্রাম-ও তো তার সন্তানদের জন্যই; শুধুই নিজের জন্য নয়। দেশকাল ভিন্ন হলেও লড়াকু মায়ের ভূমিকা প্রায় একইরকম সব-জায়গায়। একদিকে যুদ্ধ তার সন্তান কেড়ে নিয়েছে অন্যদিকে যুদ্ধ বাধলে তার লাভ; কেনা-বেচা ভাল হয়। এই দ্বৈত চরিত্রের অসাধারণ রূপায়ণ করেছেন নাট্যকার। সব সন্তান হারিয়ে হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে ধারণ করে আবারও হিম্মৎবাই একাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়, একা টানতে পারবে কি-না সংশয় জাগছে মনে, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে চলতে যে হবেই; জীবন তো থেমে থাকে না; জীবন চলমান।

আরউইন শ'-এর *বেরি দ্য ডেড* অবলম্বনে *মৃত্যুর অতীত* একাঙ্ক নাটকটি রচিত।নিতাই ঘোষ এক প্রতিবাদী যুবক, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে জীবন দিতে হয়েছে। গর্তে নিতাইয়ের লাশ নামিয়ে ডোম গর্ত বুঁজে দেয়। এমন সময় নিতাই ঘোষ গর্ত থেকে ওঠে দাঁড়ায়, আর গর্তের মধ্যে ঢুকতে চায় না। ইতোমধ্যে অফিসাররা ফিরে এসেছে, সঙ্গে ডাক্তার। সৈনিক অফিসারদের জানাচ্ছে মৃত নিতাই মৃতের মতন আচরণ করছে না, সে কিছুতেই শুতে চাচ্ছে না। নিতাই বলে তার অনেক কথা আছে। অফিসার বিস্মিত, মড়ার আবার কথা থাকে কি করে। ডাক্তার আবার পরীক্ষা করে বলে ৪৮ ঘণ্টা আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।এরপরও যখন নিতাই গর্তে ঢুকতে চায় না, মড়ার মত আচরণ করতে চায়না তখন অফিসার, পুলিশমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর শরণাপন্ন হয়। ঘটনাস্থলে চলে এসেছে পত্রিকার সম্পাদক, রিপোর্টার, এসেছে মন্ত্রী তারপর ব্যবসায়ীবৃন্দ। ব্যবসায়ীরা শবদেহ নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে একটা লাভজনক উপার্জনের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। নিতাইকে নিয়ে ব্যবসায়ীরা একটা 'শো-বিজনেস' করতে চাইলে নিতাই বলে :

> জীবিতাবস্থায় আপনাদের ব্যবসার পণ্য ছিলাম,সবাই তাই থাকে। মরার পরও রেহাই দেবেন না?[১৭]

'আধুনিকতাত্ত্বিকদের ভাষায় এটিকে বলা যেতে পারে Subversive black comedy।পুঁজিবাদী সমাজে মৃতদেহও যে মূলধনে পরিণত হতে পারে, মৃত্যুতেও যে শোষণের ইতি ঘটে না,এই নির্জলা সত্যই উদঘাটিত হয়েছে তীব্র শ্লেষাত্নক নাটকটির নাতিদীর্ঘ পরিসরে।'[১৮]

বার্টল্ট ব্রেখট্ডি *মাসনামে* নাটকটি রচনা করেন ১৯৩০ সালে। উৎপল দত্ত এটি *সমাধান* নামে মূল জর্মন থেকে অনুবাদ করেন।নাটকটি আলোচনার রীতিতে গঠিত। আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি নিয়ে মস্কো থেকে চারজনের একটি দল মার্কসবাদ শিক্ষা তথা মতাদর্শ প্রচারের জন্য চীনের মুকডেন শহরে যায়।চারজন বিপ্লবী নাটকের প্রথমেই জানায় তারা এসেছে মস্কো থেকে, চীনের মুকডেন শহরে, প্রচার করতে এবং কারখানায় কারখানায় চীনের পার্টিকে সাহায্য করতে। তারা গিয়েছিল পার্টির সদর দপ্তরে রিপোর্ট করতে, এবং পথপ্রদর্শক যোগাড় করতে, তখন বাইরের ঘরে ঢুকে এক যুবক ইউরোপীয় কমরেড, তাঁর সাথে আলাপ হয়। যে-কাজে এরা এসেছে তা তাকে অবহিত করে।

যুবক কমরেড নানা প্রশ্ন করে জানতে চায় চীনের জন্য কী এনেছে বিপ্লবীরা। তারা জানায় কিছুই সঙ্গে করে আনেনি, এসেছে শূন্য হাতে। বিপ্লবীরা জানায় – তাদের হাত শূন্য হলেও মুকডেনের উপকণ্ঠে চীনের শ্রমিকদের জন্য তারা এনেছে মার্কসবাদের শিক্ষা, প্রচারবিদের অভিজ্ঞতা। এনেছে সাম্যবাদের গোড়ার কথা। যারা বোঝে না তাদের জন্য এনেছে উপলব্ধি,অত্যাচারিতের জন্য এনেছে শ্রেণিসংগ্রামের বাণী, আর শ্রেণিসচেতনের জন্য বিপ্লবের অভিজ্ঞতা।মুকডেন শহরে এক যুবকের সঙ্গে ঐ দলের পরিচয় হয়। মুকডেনে পার্টি বে-আইনি হওয়ার কারণে শহরে ঢুকবার আগে চার বিপ্লবী তাদের চেহারা মুছে দেয়ার জন্য সত্তা বিলোপ করে মুখোশ পরে চীনা সেজে চললো মুকডেনের দিকে।

চার বিপ্লবী মুকডেন শহরে চীনা কমরেডদের সাহায্য করতে লাগলো,প্রচার চালাতে লাগলো শ্রমিকদের মধ্যে। প্রথমে যুবক কমরেডদের পাঠানো হয় কুলিদের সাহায্য করতে, যুবক কমরেড কুলিদেরকে ও তাদের দাবি সম্পর্কে সচেতন করতে তো পারেইনি উল্টো বিপদ ডেকে এনেছে। বিপ্লবীরা সাতদিন পালিয়ে রক্ষা পায়।
এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা হল, আলোচনার পর সারাংশ :

> বুদ্ধিমান যে ভুল করে না সে নয়,
> বুদ্ধিমান হল যে দ্রুত ভুল সংশোধন করতে পারে।[১৯]

এবার যুবক কমরেডদের পাঠানো হল(সুতোকলে) কারখানায় প্রচারপত্র বিলি করার জন্য।
এরপর যুবক কমরেডদের পাঠানো হল সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ীর কাছে একটি চিঠি দিয়ে এবং বলা হল ব্যবসায়ীকে বুঝিয়ে রাজি করাতে। কারণ শাসকশ্রেণির মধ্যে প্রত্যেক বিরোধের সুযোগ শাসিতের নিতে হবে।

যুবক কমরেড এখানেও সব গুলিয়ে ফেলে। যাকে সে ঘৃণা করে তার সঙ্গে সে একত্রে আহার করলো না । ব্যবসায়ীও তাকে বাড়িতে ঢুকতে দিল না। কুলিদের হাতে অস্ত্রও আর পৌঁছলো না।

এরপর ক'সপ্তাহ ভয়াবহ দমননীতি চললো। এক বুর্জোয়া গুপ্তচরের খপ্পরে পড়ে পৌরভবন দখলের ফাঁদে পা দেয়। পৌরভবন সৈন্যে ঠাঁসা। পক্ষান্তরে শ্রমিক কৃষক ও যুবক কমরেডদের কোনো অস্ত্র নেই। পৌরভবনের দিক থেকে ভেসে আসা কামানের নির্ঘোষ থেকে বুঝতে পারলো সব শেষ হয়ে গেছে। ওকে চিনে ফেলেছে সবাই।পালানোর পথ নেই। নদীতে যুদ্ধ জাহাজ। রেলের বাঁধের ওপর প্রহরারত সাঁজোয়া ট্রেন। বিপ্লবীদের একজনকে চিনতে পারলে সবাই গ্রেপ্তার হবে। যুবক কমরেড ধরা পড়লে পুরো সংগঠন বিপন্ন হবে এটা বিপ্ল-বীদের কাম্য হতে পারে না। তাই অন্য কোন উপায় না পেয়ে, যুবক কমরেডকে গুলি করে মেরে চুনের গর্তে দেহ ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যুবক কমরেড বুঝতে পারে বারবার সে ভুল করেছে,

> চেয়েছিলাম কাজে লাগতে, আর এনেছি শুধু বিপর্যয় ।[২০]

এ-সব ঘটনা বিপ্লবীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে এ-দুনিয়াকে বদলে দিতে গেলে কী কী লাগে – ক্রোধ,একাগ্রতা, জ্ঞান, বিদ্রোহী চিত্ত, দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষিপ্রতা, গভীর চিন্তার স্থৈর্য, নিরুত্তাপ সহ্যশক্তি, অসীম অধ্যবসায়, একক ও সমগ্র– বিশেষ ও সাধারণ – দুই-ই উপলব্ধির ক্ষমতা। কারণ, বাস্তবকে সম্যক বুঝে, তবেই পারা যায় বাস্তবকে আমূল বদলে দেয়া।

বোরিসভিয়াঁর নাটক*ল্যগুতে দে জেনেরো* ও বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট-এর *শোয়েইক ইম জ্‌ভাইটেন ভেল্টক্রীগ* নাটকের প্রভাবেযুদ্ধ *যুদ্ধং দেহি* নাটক রচিত। রাষ্ট্রনেতাদের মুনাফাবৃত্তির কদর্য কৌশল যুদ্ধ *যুদ্ধং দেহি* নাটকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার উৎপল। যুদ্ধ বাধলে নেতাদের খুবই লাভ। রাষ্ট্রনেতারা তাই কখনো দেশপ্রেমের হুজুগ তুলে,কখনো বিপন্ন সীমান্তের হুজুগ তুলে যুদ্ধ বাধায়। যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধ বাধানোর কদর্য কৌশল ও মুনাফাবৃত্তি এ-নাটকের বিষয়বৃত্ত।বেদনা ও হাসির উপর নাট্যকার উৎপল দত্তের যে সমান দখল *যুদ্ধং দেহি* নাটক সে-সাক্ষ্যই বহন করে। নাটকের অন্যতম চরিত্র বেঙা নাট্যকারের বিশেষ সৃষ্টি। ভয়ঙ্কর দুঃসময়েও বেঙা ক্রমাগত গল্প বলে যায়। জীবনের গল্প।

*ব্যারিকেড*নাটকটির রচনাকাল ১৯৭২। প্রথম অভিনয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, কলামন্দিরে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৭ সালের মে মাসে। উৎপল দত্তইয়ান পেটার্সেন রচিত *উনসেরে স্ট্রাসে* অবলম্বনে *ব্যারিকেড* নাটকটি রচনা করেছেন। এ-নাটকে বিশ শতকের ত্রিশের দশকের জার্মান নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান, মধ্যবিত্তের দোটানা, বিপর্যস্ত গণতন্ত্রকামী মানুষ এবং শ্রমজীবী মানুষের মরণপণ লড়াই সবকিছুর সমন্বয় ঘটিয়েছেন নাট্যকার অসাধারণ নৈপুণ্যে। নাটকটির প্রথম অভিনয়ের প্রচার-পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে – ইয়ান পেটার্সেন রচিত ১৯৩৩-এর বার্লিনের রোজনামচা 'আমাদের রাস্তা' – 'উনসেরে স্ট্রাসে'

থেকে গৃহীত। নাটকের পরিচিতি পৃষ্ঠায় ব্যবহার করা হয়েছে ইয়ান পেটার্সেন-এর ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব-ব্যাখ্যা :

> ফ্যাসীবাদ কী? কিভাবে ধাপে ধাপে ফ্যাসিস্তরা ঝোড়ো মেঘের মতন আচ্ছন্ন করে ফেলে দেশের আকাশ?ডাক্তার,বিচারপতি,গৃহস্থ বধূ, ধর্মযাজক, সাংবাদিক সর্বপ্রকারের বুদ্ধিজীবী কি ঘরের দরজা বন্ধ করে রাজপথের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারেন? ফ্যাসীবাদ কি রেহাই দেবে কাউকে?জার্মেনিতে নাৎসী অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা বলে, শেষ পর্যন্ত ব্যারিকেডে এসে দাঁড়াতে হবে সবাইকে,যদি না বড় বেশি দেরী হয়ে যায়।[২১]

নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার পাঠক-দর্শককে জার্মানির নাৎসি বীভৎসতার সময়ে নিয়ে যায়। সূত্রধার শ্রমিকদের কাছে ব্যারিকেড কথাটার মানে ব্যাখ্যা করে; এরপর পালার চরিত্রসমূহ সকলে সকলের পরিচয় বিবৃত করে। সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা যোসেফ ৎসাউরিৎস-এর স্ত্রী ইংগেবর জার্মানির জটিল রাজনৈতিক হানাহানির মধ্যে নেই বলে মনে করেন। 'কিন্তু ফ্যাসিবাদ কি রেহাই দেবে কাউকে? ডাক্তার, বিচারপতি, গৃহস্থ বধূ, ধর্মযাজক, সাংবাদিক, সর্বপ্রকারের বুদ্ধিজীবী কি ঘরের দরজা বন্ধ করে রাজপথের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারেন?'[২২]

রিপোর্টার অটো জানায়, বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় চলছে নাৎসি আর কমিউনিস্টদের মধ্যে যুদ্ধ। ছয় মাসে ৪৬১টা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে,এক মাসে শহরে খুন হয়েছে ৮৩ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এখানে অনবরত নির্বাচন হয়। তিনবছরে পাঁচবার। পাঁচবারই হিটলারের নাৎসি পার্টি কমিউনিস্টদের কাছে হেরে ভূত। শেষ নির্বাচনেও নাৎসিরা ১৯৬, আর কমিউনিস্টরা ৪১২। তবুও হিটলার প্রধানমন্ত্রী। হিটলার আইনসভা ভেঙে দিয়ে আবার নির্বাচন দিয়েছে। এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে নাৎসি-বাহিনী ছাড়া অন্যকোন পার্টি না থাকে, নাৎসিরা ছাড়া আর কেউ যেন ভোট দিতে না পারে।

এরই মধ্যে রাজনৈতিক চাল হিসেবে নাৎসি-বাহিনী জননেতা যোসেফ ৎসাউরিৎসকে খুন করে খুনের দায় চাপায় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। তারা হুটিগকে গ্রেপ্তার করে এবং দায়ী করে কমিউনিস্ট পার্টিকে। যোসেফ ৎসাউরিৎস- ইংগেবর দম্পতির পালিত পুত্র পাউল শাল কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে গোপনে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে মা ছেলের কমিউনিস্ট পার্টিকে তার স্বামী হত্যার জন্য দায়ী করলে পাউল জানায় 'কমিউনিস্ট পার্টি গুম খুন করে না।[২৩]কিন্তু নাৎসি দালাল মাইসারকে খুন করার কথা পাউল মায়ের কাছে কবুল করে বলে :

> প্রয়োজনে করি, সেটা আমাদের নীতি নয়।
> ইংগে ॥ প্রয়োজন আর নীতির মধ্যে এমন বিরোধ তোমাদের?
> পাউল ॥ মা, তুমি ধর্মভীরু ক্যাথলিক। আমার কথা কি করে বুঝবে? তুমি যে বিশ্বাস করো জীবন পরম ও পবিত্র।
> ইংগে ॥ তোমরা বুঝি জীবনকে পবিত্র বল না?

> পাউল ॥ পরম বা চরম বলে কিছু নেই, পৃথিবীর সংঘর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো পবিত্রতা নেই। জীবনকে শ্রেণিসংগ্রাম থেকে আলাদা করে আমরা দেখি না। একটা যুদ্ধ চলছে। এ-যুদ্ধে মালিক যখন শ্রমিককে খুন করায় সেটা অপরাধ। কিন্তু শ্রমিক যখন তিনশ বছরের শোষণের জবাবে মালিকের পোষা গুণ্ডাকে হত্যা করে, সেটা আত্মরক্ষা, সেটা ন্যায়বিচার। জীবন পবিত্র কিনা, তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হল – কে কার জীবন নিচ্ছে।[২৪]

ধর্মভীরু মায়ের কাছে ছেলের প্রয়োজন আর নীতির বিরোধ ভালো লাগে নি।তাই মায়ের সন্দেহ এরাই হয়তো তার স্বামীকে খুন করেছে; সুতরাং ছেলেকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। নাৎসিরা এমনভাবে বিচার এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে যাতে নির্দোষ কমিউনিস্ট হুটিগ এবং তার কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। জার্মানের বিখ্যাত 'ফ্রাইয়েৎসাইটুং' পত্রিকার সাংবাদিক ৎসাউরিৎস হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে;এতে হুটিগ নির্দোষ ও কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় না এবং নাৎসি দলের একটি চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। ৎসাউরিৎস হত্যাকাণ্ড চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর নাৎসিরা নতুন চাল চালে, তারা আইনসভায় আগুন লাগিয়ে তার দায় চাপায় কমিউনিস্টদের ওপর।

আবার নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে ৫ই মার্চ; সেজন্য হিটলার কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে–কমিউনস্ট পার্টি নিষিদ্ধ,ঐ পার্টির সদস্যদের দেখামাত্র গ্রেপ্তার করা এবং প্রয়োজনবোধে দেখামাত্র গুলি করে মারার নির্দেশ জারি, সর্বপ্রকার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ ও কৃষক সমিতি নিষিদ্ধ, সরকারি কর্মচারী ও ছাত্রদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে নাৎসিরা ছাড়া কেউ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলো না। এরপর নাৎসিরা বিচারপতি ফস(যিনি হুটিগকে খালাস দিয়েছিলেন)-কে হত্যা করে গিওর্গ টাইখার্টকে বিচারপতি নিয়োগ করে নতুন করে ৎসাউরিৎস হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু করে। নাৎসিদের বীভৎস অত্যাচারে আতঙ্কিত হয়ে কেউ সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসেনি। ইংগেবর ইতোমধ্যে সব জেনে গেছেন, তিনি বড় বিপজ্জনক সাক্ষী। মায়ের সামনেই ছেলে পাউলকে নাৎসিরা গুলি করে হত্যা করে। ছেলে হত্যার পর মা ইংগেবর যিনি বলেছিলেন রাজনৈতিক হানাহানির মধ্যে তারা নেই, সেই মা-ই রূপান্তরিত হয়ে যান, সেই মা-ই দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেন :

> হাঁটু গেড়ে বাঁচার চেয়ে দাঁড়িয়ে মরা ভাল। আমি কমিউনিস্ট নই, আমি যিশু ছাড়া কিছু জানি না। তাই গোড়ায় বলতাম –কয়েকটা কমিউনিস্টকে মারছে, আমাদের কি? এখন বুঝেছি আগে মরে কমিউনিস্টরা, তারপর একে একে অন্যদের পালা, তারপর – একদিন দেখি গোটা দেশটাই একটা জেলখানা।[২৫]

নাৎসিদের ফ্যাসিবাদী জুলুমের এক পর্যায়ে এই মা-ই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে বলে :

> আমি এখন এও বিশ্বাস করি – বন্দুকের গুলি দিয়েই হবে শেষ ফয়সালা। বন্দুকের নলে আগুন হেনে যা বলার আছে সব বলতে হবে। আর কোনো ভাষা ওরা বুঝবে না।[২৬]

ব্যারিকেড নাটকে মা ইংগেবর অতি সাধারণ মা। কোনো রাজনীতির মধ্যে তিনি নেই; যিশু ছাড়া কিছু জানেন না। কিন্তু এই সহজ, সরল মা-ও রেহাই পান না ফ্যাসিস্টদের কাছ থেকে। তার স্বামীকে হত্যা করে এর দায়

চাপায় কমিউনিস্ট পার্টির উপর। যেহেতু ইংগেবর-এর কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই তাই প্রথমে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু সবকিছু যখন সাংবাদিক ৎসাউরিৎস তথ্য-প্রমাণসহ উপস্থাপন করে তখন হুটিগ নির্দোষ ও কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সম্পৃক্ততা না থাকায় ইংগেবর বুঝে যান সবকিছু। তিনি স্বচক্ষে নাৎসি বর্বরতার স্বরূপ দেখেছেন। সবশেষে যখন তার চোখের সামনে তার ছেলেকে হত্যা করা হয় তখন মা ইংগেবর মত বদলান। যে মা খুব নিরীহ ছিলেন, রাজনৈতিক হানাহানির মধ্যে ছিলেন না, সেই মা সবকিছু দেখেশুনে সিদ্ধান্ত নেন হাঁটু গেড়ে মরার চেয়ে দাঁড়িয়ে মরা ভাল এবং তিনি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে বন্দুকের গুলিতে শেষ ফায়সালার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই ঘটনা-প্রবাহের ভেতর দিয়ে মায়ের রূপান্তর – সেই রূপান্তরের সার্থক রূপকার নাট্যকার উৎপল দত্ত।

নয়া জমানা নাটকের পটভূমি ১৮৭১ সালের ফরাসী বিপ্লব।বার্টল্ট ব্রেখ্ট-এর *ডী টাগে ডের কম্যুনে* নাটকের বঙ্গানুবাদ *নয়া জমানা*। উৎপল দত্ত যখন নাটকটি জর্মন থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন তখন পর্যন্ত ইংরেজিতে এর অনুবাদ হয়নি।১৪টি দৃশ্যে বিন্যস্ত *নয়াজমানা*। যুদ্ধ চলছে। প্রজাতন্ত্র দেশপ্রেমের ডাক দিয়ে জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করেছে। যুদ্ধ করছে অনেকে। যুদ্ধের সুযোগে ব্যবসা করে নিচ্ছে রাঘববোয়ালরা। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় খাবারসহ নানা সংকট; বাবা, কোকো, ফ্রাঁসোয়া, জ্যা, মাদাম কাবেসহ অনেকেই সরকারি দপ্তরে ১০১ নম্বর শ্রমিক ব্যাটালিয়নের সঙ্গে গেছে সরকারকে দাবি-দাওয়া জানাতে।

বুর্জোয়া সরকার পারী ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে বর্দো শহরে। ঐখানে প্রধানমন্ত্রী থিয়ে ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফাভ আলোচনা করছে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে। যুদ্ধ বন্ধ করতে জার্মান রাষ্ট্রপ্রধান ফন বিসমার্ক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাইছে ৫০০ কোটি টাকা,আলসাস লোথিরিংসেন প্রদেশ,সমস্ত যুদ্ধবন্দি প্রত্যার্পণ এবং যতদিন পর্যন্ত সবশর্ত সন্তোষমতন পালিত না হয় ততদিন জার্মান অধিকৃত দুর্গগুলি ওদের হাতেই থাকবে। বিসমার্কের দাবি মানা বিপর্যয় বলে মনে করে ফাভ। কিন্তু থিয়ে পারির মানুষের দাবি-দাওয়াকে বিসমার্কের দাবির চেয়েও বেশি বিপর্যয় বলে মনে করে।

পৌরভবনের ভেতরে অধিবেশন চলছে; পৌরভবনের বাইরে পক্ষ-বিপক্ষের উভয়শ্রেণীর লোকই রয়েছেন,তর্ক-বিতর্ক চলছে। পারীর সাধারণ মানুষ নির্বাচন চায়, প্রতিজ্ঞাপত্র গৃহীত হয়।বুর্জোয়া-পরিবার, আমলা এবং ধর্মযাজকরা সবাই ভার্সাই অভিমুখে পালিয়ে যাচ্ছেএবং ট্রেনে করে পারীর সমস্ত টাকা পাচার করে দিচ্ছে। পারীতে সবাই এই প্রথম স্বাধীন আনন্দঘন পরিবেশে অবস্থান করছে। পৌরভবন লাল নিশানে রঙিন। সভাকক্ষে, প্রচারপত্রে এইসব দাবি লেখা: বাঁচবার অধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের অধিকার, বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার। ২৯শে মার্চ, ১৮৭১ সালে স্বাধীন কমিউনের প্রারম্ভিক অধিবেশন বসে।নাগরিকদের মধ্য থেকে দাবি ওঠে শ্রেণি-বৈষম্য দূর হোক, সরকারের সর্বোচ্চ কর্মচারীরও হোক শ্রমিকদের সমান বেতন,শিক্ষাকে সকলের জন্যে সুগম করা হোক,অবৈতনিক করা হোক,স্কুলে বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করা হোক। ভারলা পারী কমিউনের প্রথম অধিবেশনের সূচনা ঘোষণা করেন – যা তাদের প্রথম আইন, যা অবিলম্বে

কার্যকর হবে– 'যেহেতু আমাদের শারীরিক, আত্মিক ও নৈতিক সত্তার বাধাহীন বিকাশই হইতেছে জীবনের লক্ষ্য, সেহেতু সম্পত্তি বলিতে বুঝায় আর কিছু নহে, শুধু এই যৌথ-উৎপাদনে আপন কার্যের পরিমাণ অনুযায়ী যৌথ ফলভোগে অংশগ্রহণের অধিকার। সুতরাং প্রতি কারখানায় ও শিল্পসংস্থায় যৌথশ্রম সংগঠিত করা হইবে।'[২৭]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরেজেনেভিভ ও লঁজেভাঁ কাজ করতে গিয়ে কিছুই ঠিকমত খুঁজে পায় না তারা। শিক্ষা বিভাগ, রেলবিভাগ,রুটি মালিক, দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন সব এলোমেলো অবস্থা। এদিকে ফ্রান্স-এর রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক-পরিচালকের দপ্তরেপ্ল্যুক-এর সঙ্গে কমিউনের প্রতিনিধি মসিয়্য বেলে দেখা করতে এসেছে টাকার জন্যে। শ্রমিকদের ঘরে স্ত্রী-পুত্র অভুক্ত,তাদের বেতন দিতে পারছে না। কমিউনের অধিবেশ চলে। শ্রমিকরক্ষীরা নানা খবর বহন করে ভেতরে-বাইরে আসা-যাওয়া করছে। দূরাগত কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে। দালাক্লুজ,রিগোল,রঁভিয়ে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরছে। অনেকে জড়ো হয়েছে, নানা মত ব্যক্ত করছে তারা। ভারলা বলে :

> বুর্জেয়ারা বিনা দ্বিধায় বিদেশি শত্রুর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের সূচনা করল। দুই দেশের বুর্জোয়ার মধ্যেকার সমস্ত বিরোধ উবে যায়, কোনো বাধাই আর থাকে না,মুহূর্তের মধ্যে দুজনে এক হয়ে যায়, যখন কোন দেশে সর্বহারার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার দরকার হয়।... স্বাধীনতাই যদি চান বন্ধুগণ,তবে উৎপীড়কদের নিপীড়ন করতেই হবে! অত্যাচারীর ওপর চালাতে হবে অত্যাচার। আর সেজন্য স্বাধীনতা থেকে ততটুকু বিসর্জন দিতেই হবে যেটুকু প্রয়োজন। সর্বহারার স্বাধীনতা বলতে বোঝায় শুধু শোষকের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের স্বাধীনতা।[২৮]

দ্য লা ক্লুজ দমননীতির বিরুদ্ধে, অহিংস নীতির পক্ষে। এই সংগ্রামে তিনি সবাইকে চান। ইস্টার রবিবারে জাঁ, কাবে, ফ্রাঁসোয়া নামের শিশুরা ব্যারিকেড তৈরির কাজে ব্যস্ত। বাবেৎ শেরোঁ ও জেনেভিভ গেরিকোল বালির বস্তা সেলাই করছে।দূরে কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে। পরিস্থিতি ক্রমশ পারীর বিপক্ষে চলে যাচ্ছে,তাই ফ্রাঁসোয়া বলে– 'শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে আমাদেরকে গ্রামাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ফ্রান্স-এর কাছে আমাদের কথা পৌঁছে দিতে পারছি না।'[২৯]

মে মাসের রক্তাক্ত শেষ সপ্তাহ, প্লাস পিগাল। 'সবাই ব্যারিকেডে। দালাক্রুজ মারা গেছেন প্লাস দু শাতো দোতে। ভেরমোরেল আহত। ভারঁলা লড়ছেন রূ লাফাইয়েৎ সড়কে। উত্তর রেলস্টেশনের কাছে হত্যাকাণ্ড এমন আকার নিয়েছে যে, মেয়েরা বেরিয়ে এসে,মৃতদেহ টপকে অফিসারদের গালে থাপ্পড় কষিয়ে প্রতিবাদ স্তব্ধ করে ব্যারিকেডে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।' মাদাম,বাবেৎ গুলিবিদ্ধ হয়। সরকারি সেনাসহ ওরা গুলি চালায়, ফ্রাঁসোয়া, জাঁ গুলিবিদ্ধ হয়,গুলিবর্ষণে মাথার ওপরে ব্যানারটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। জেনেভিভ লাল নিশানটা খুলে নেয়, যদিও বাবা গুলি করতে থাকে, তবুও জেনেভিভের বুকে এসে লাগে গুলি। চারিদিকের গলি থেকে ক্রুর সঙিন বাগিয়ে তেড়ে আসে সরকারি ফৌজ, লাফিয়ে উঠছে ব্যারিকেডের ওপর। ভার্সাই-এর নগর প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়ারা চশমা ও সৌখিন ক্ষুদ্র দূরবীণ দিয়ে কমিউনের পতন দেখছে আর শ্বাপদসুলভ হিংস্র চিৎকারে

উল্লাস জানাচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণি স্বাভাবিক সারল্যে পরাজিত হয়। তাদের প্রতিষ্ঠিত কমিউনকে তারা ধরে রাখতে পারেনি; আর ধনিক শ্রেণি তথা শোষকরা বেঈমানি করে ষড়যন্ত্র করে কমিউনকে ধ্বংস করেছে,তাদের পরাজিত করেছে।

ইতালিয়ান নাট্যকার দারিও ফো-এর *অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অফ অ্যান এনার্কিস্ট*অবলম্বনে উৎপল দত্ত *বাংলা ছাড়ো* নাটকটি রচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রক্ষিতে নাটকের চরিত্র ও পটভূমি নির্মাণ করে নিয়েছেন নাট্যকার। দাড়িও ফো-র নাটকের চরিত্র ও পটভূমি পাল্টে দিয়ে ১৯৭০-৭২-এর পশ্চিমবঙ্গে যে-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। এই নাটকের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। শোভা সেন লন্ডনে '*অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ অফ অ্যান অ্যানার্কিস্ট*' নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> (দারিও ফো-এর)'তাঁর সঙ্গে যখন রোম বিমানবন্দরে একবার দেখা হয়ে যায়, পরিচয় হয় তখন তো বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না নিজের সৌভাগ্যকে। তখন নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন নিজের নামও ঠিকানা তাঁর নাটকের বইয়ের ওপর। তাঁর নাটক অভিনয় করার অনুমতিও দিয়ে দিয়েছিলেন এক কথায়।[৩০]

দারিও ফো-এর নাট্যকর্মের সঙ্গে উৎপল পরিচিত ছিলেন। শোভা সেনের কাছ থেকে বইটি পেয়ে তিনি এর রূপান্তর করেন। ৪ অক্টোবর ১৯৮০ সালে একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে পিএলটি নাটকটি প্রথম মঞ্চায়ন করে। গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র ষষ্ঠ খণ্ডে। একটি অঙ্কে দু'টি দৃশ্যে বিন্যস্ত এ-নাটক। উন্মাদ চরিত্রের জবানিতে নাটকটির শুরু। এ-নাটকে উন্মাদ একটি বিশেষ চরিত্র। সে এ-নাটকে এক এক সময় এক এক রূপে আর্ভিভূত হয়। চরিত্রটি গোয়েন্দা-কৌশলে নকশাল বন্দির হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটন করে তৎকালীন পুলিশ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্টদের মুখোশ উন্মোচন করে।

পুলিশ কনস্টেবলদের সংগঠনের সম্পাদক হাওড়া স্টেশনে খুন হয়। হাওড়া স্টেশনের এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মহাদেব রায় এলাকায় নকশাল হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণে ঐ-খুনের অভিযোগে মহাদেব রায়কে গ্রেপ্তার করে এবং লালবাজার থানায় এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে মহাদেব জানালা দিয়ে লাফ দেয় এবং ফুটপাথে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ এ-রিপোর্ট দিলেও বিচারক এ-ঘটনার তদন্ত করেন নতুন করে;তাতে প্রমাণিত হয়, মহাদেব রায় আত্মহত্যা করেনি; তাকে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

এ-নাটকে দুর্নীতিবাজ পুলিশ-প্রশাসন-নেতা-মন্ত্রীদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। নাটকের শেষাংশে পুলিশ অফিসারদের একটি ঘরে বন্দি করে সেখানে একটি তাজা টাইম বোমা রেখে শকুন্তলার হাতে চাবি দিয়ে উন্মাদ চলে যায়। কী করবে শকুন্তলা,তাকে মনস্থির করতে হবে। হাতে সময় কম। তার মতো একজন গণতন্ত্রী এটা মেনে নিতে পারে না;তাই শকুন্তলা পুলিশ কর্মকর্তাদের মুক্ত করে দেয়। তারা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছুটে চলে

যাচ্ছিলো কিন্তু সাংবাদিক শকুন্তলা বড় বেশি জেনে ফেলায় তাকে ঘরের মধ্যে হাতকড়া পরিয়ে বোমা বিস্ফোরণের মুখে বেঁধে রাখে। শকুন্তলা বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করতে থাকে; উন্মাদ এসে বলে :

> যেদিকে হোক একটা কিছু তো স্থির করতেই হবে। প্রত্যেককে। আমি বলি বাংলা ছাড়তে হবে অত্যাচারকে, বেআইনি বন্দিহত্যাকে,স্বৈরাচারকে। আমি বলি বাংলার মানুষ আর বিনা বিচারে জেলে যেতে চায় না, আর চায়না বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া পুত্রের শবদেহ দেখতে। সেসব দিন যারা ফিরিয়ে আনতে চাইছে,তারাই বরং বাংলা ছাড়ো।[৩১]

নাটক পরিচিতি থেকে জানা যায়, এ-নাটকে উৎপল অভিনয় করেননি;তবে প্রত্যেকটি অভিনয়ের শুরুতে দারিও ফো সম্পর্কে কিছু কথা বলতেন উৎপল দত্ত। 'বাংলা ছাড়ো'র কথাবস্তু নকশাল আমলের, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সিপিআই (এম) এবং সিপিআই (এম.এল)-এর ভিন্নধর্মী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের। দারিও ফো-এর আদলেই এই নাটকে প্রথম থিয়েটারের আঙ্গিক মিলেছে দ্বিতীয় থিয়েটারের দায়বদ্ধতার সঙ্গে। এই থিয়েটারে তত্ত্বকথার বদলে ব্যঙ্গের আঘাত আর খেয়ালি কল্পনার উৎসার উপভোগ্য হয়ে ওঠেছে চেম্বার ড্রামার আধুনিকতম ভাষ্যে। হাসির মোড়কে পরিবেশিত হয়েছে নিষ্ঠুর রাজনৈতিক সত্য। এ-নাটকে 'এমপ্যাথির বদলে 'অ্যালিয়েনেশন'-কে নিজস্ব ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন উৎপল। সমালোচকদের কেউ কেউ বাংলা ছাড়ো নাটককে ইনভেস্টিগেটিভ ড্রামা ধরনের কেউ কেউ আবার চেম্বার ড্রামা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

শৃঙ্খল ছাড়া নাটকটি উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। এ-নাটকের পটভূমি বাডেন বিপ্লব। কার্ল মার্কস-এর মৃত্যু শতবর্ষ উপলক্ষে গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী তথা মেহনতী মানুষের মুক্তির পথপ্রদর্শক কার্ল মার্কসকে উৎপল দত্ত স্মরণ করেছেন বাডেন বিপ্লবের পটভূমিতে। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় নন্দন পত্রিকার কার্ল মার্কস সংখ্যায়। নাটকের পরিচিতি পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে স্তেফান হাইমের উপন্যাস *দ্য লেনজ পেপারস্* অবলম্বনে নাটকটি রচিত। এ-নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৯৮৩ সালের ১৬ নভেম্বর রবীন্দ্রসদন মঞ্চে;অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি বসু, সুভাষ চক্রবর্তী,শ্যামল চক্রবর্তী,সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সিপিআই (এম) নেতৃবৃন্দ। ১৭ নভেম্বর ময়দানে প্যান্ডেল বেঁধে কার্ল মার্কস মৃত্যুশতবার্ষিকী উৎসব কমিটির প্যাভেলিয়ানের অস্থায়ী মঞ্চে কুড়ি হাজার দর্শকের সামনে নাটকটি অভিনীত হয়েছে।

এগারটি দৃশ্যে বিন্যস্ত *শৃঙ্খল ছাড়া*। নাটকের শুরু কলয়ন শহরে *নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুং* পত্রিকার দপ্তরে। এই পত্রিকা পরিচালনায় রয়েছেন মার্কস-এঙ্গেলস। এঁদের সহযোদ্ধা ভোলফও এঁদের সঙ্গে কাজ করছেন। জার্মানের বাডেন রাজ্যে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে। ঐ-অঞ্চল থেকে ক্রিস্টোফেল এসেছেন মার্কসের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি অবগত করতে এবং 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' বুঝে নিতে। মার্কস সবকিছু বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে বলে ক্রিস্টোফেলকে। মার্কস ক্রিস্টোফেল-এর কথোপকথন থেকে জানা যায়,পালাটিন এবং বাডেন – জার্মানের এই দু'টি রাজ্যই শুধু বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত, অন্য রাজ্যগুলো তেমন করে তৈরি হয়নি; জার্মানেরছত্রিশটি ক্ষুদ্র রাজ্য,ছত্রিশজন ক্ষুদে রাজা, ছত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন সেনাবাহিনী। এ-অবস্থায় বুর্জেয়ারা বাড়তেই পারছে না, দেশের শিল্পায়ন হতে পারছে না। এ-জন্য শ্রমিক শ্রেণির দাবি হবে–প্রুশিয়ার সম্রাট

ফ্রিডরিখ ভিলহেলম এবং তার ছত্রিশটি ক্ষুদে সামন্তরাজকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। ক্রিস্টোফার মার্কস-এর কাছে জানতে চায় শ্রমিকরা বুর্জোয়াকে সমর্থন করবে এবং কেন করবে? গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া শ্রমিকরা সোজা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বুর্জোয়ারাই জিতবে; তাই মার্কস বলেন এ-ক্ষেত্রে 'বুর্জোয়া ও শ্রমিকের অস্থায়ী সন্ধি অনিবার্য। গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে টপকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা যায় না।'[৩২]

রাস্টাড সেনাবাসে জেনারেল ফন স্ট্রাথম্যানের দপ্তরে তিনি তার অধীনস্থদের শাস্তি দিচ্ছেন মার্কস-এঙ্গেলস সম্পাদিত *রাইনিশে ৎসাইটুং* পত্রিকা পড়ার অপরাধে। ঐ-পত্রিকায় জনসভা, প্রচরপত্র,বিরোধী সংবাদপত্র সম্পর্কিত প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জারিকৃত তিনটি কালাকানুনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। স্ট্রাথম্যানের সৈন্যবাহিনী পচারুটি, পায়ে বাঁধার পট্টি এবং চাবুকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। ক্রিস্টোফেলের নেতৃত্বে সৈনিক ও সাধারণ জনতা আক্রমণ করলে গ্রাম নিহত হয় ও স্ট্রাথম্যান কোনরকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। বাডেনের সেনাবাহিনী ও জনগণ একটি আস্ত দুর্গ দখল করে নিয়েছে;তাই তারা বহু শতাব্দীর দাসত্ব থেকে মুক্তির আনন্দে আত্মহারা। জেনারেল আশ্রয় নিয়েছেন ব্যাঙ্ক মালিক এপস্টাইনের বাড়িতে, লেনৎস এবং ডর্টু এপস্টাইনের বাড়িতে তাকে খুঁজতে এলে স্ট্রাথম্যান নেই বলে জানায়; লেনৎস এপস্টাইনের কথা বিশ্বাস করে চলে যায়।

ওফেনবুর্গ গণসম্মেলনে রাস্টাড বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সদস্যদের সম্বর্ধিত করা হয়। কার্লরুর গণফৌজের দপ্তরে বিপ্লবীরা আলোচনায় মিলিত হয়েছেন। উপস্থিত আছেন বেকার,ভিলিখ, লেনৎস,ক্রিস্টোফেল,ডর্টু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী ব্রেন্টানো এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে। তারা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করে যে, এখনও পর্যন্ত একটিও বিপ্লবী-বাহিনী গড়ে ওঠেনি। রাজ্যে চলছে নানা বিশৃঙ্খলা, বেঈমানি,বিশ্বাসঘাতকতা। ব্যাঙ্কমালিক,জমিদার সকলেই বাডেনকে শেষ করতে বদ্ধ পরিকর। অন্যদিকে এতদিনের তৈরি করা ফৌজ ভাঙতে দ্বিধা করছেন না বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ। গণফৌজে যোগদানের জন্য যে-বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে তাতে সাড়া দিয়ে লোকজন গণফৌজে নাম লেখাচ্ছে;এতে যোগ দিতে এসেছেন কনরাড নামের ৭৪ বছরের বৃদ্ধও। ইতোমধ্যে এপস্টাইনের মেয়ে লিওনোরে গণফৌজের সদর দপ্তরে আত্মনিয়োগ করেছে। মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে য়োশেফা (গণিকা)-কে নিযুক্ত করে এপস্টাইন। ধনী-কন্যা সাজিয়ে রাখতে যত খরচ লাগবে সব যোগাবে এপস্টাইন;বিনিময়ে বিপ্লবী মন্ত্রীদের সাথে মিশে য়োশেফা তথ্যাদি পাচার করবে এবং লেনৎস-এর কাছ থেকে লিওনোরেকে সরিয়ে দেবে।

প্রধানমন্ত্রী ব্রেন্টানোর দপ্তরে বেকার লেনৎস এসেছেন অস্ত্রের জন্য। কিন্তু এই সরকার নানা অজুহাতে অর্থ সংগ্রহে অপারগতা জানিয়ে চার হাজার গিল্ডার দেয়। এরই মাঝে মার্কস-এঙ্গেল্‌স আসেন। মার্কস বলেন :

> যতদিন গ্রাণ্ডডিউক বুকের ওপর চেপে বসে ছিল,ততদিন আপনারা সবাই এক ছিলেন। ডিউকের বিরুদ্ধে এক। এখন ডিউক নেই। এখন আর বিরুদ্ধে থাকলেই হবে না, এখন কিছুর পক্ষে দাঁড়াতে হবে। আপনারা কিসের পক্ষে?স্বাধীনতা? কিসের স্বাধীনতা? সে স্বাধীনতার ক্ষমতা থাকবে কার হাতে?[৩৩]

এসব বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বিপ্লবের হাতে সময় তো বেশি থাকে না।বুর্জোয়া বিপ্লবী সরকার সময়মতো কোনো পদক্ষেপই নিতে পারেনি, তাই সামনে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। তবুও তারা মার্কস-এর কোনো পরিকল্পনাই গ্রহণ করছে না। উপরন্তু ব্রেন্টানো জানায় :

> ডক্টর মার্কস্ আমরা বাডেনে বিপ্লব করেছি। আপনার উপদেশ নেব কি নেব না সেটা আমরাই ঠিক করব। আমার মনে হয় আপনি ও হের এঙ্গেল্স আগে কোন দেশে বিপ্লব সংগঠিত করুন। তারপর সেখানে আপনার সামরিক পরিকল্পনাগুলো কাজ করে দেখাবেন। [৩৪]

য়োশেফাকে কে এবং কেন নিযুক্ত করেছে, জেরা করে তা উদ্ধারে সমর্থ হয় লেনৎস। লিওনোরে তার জীবনে এখন আর শুধু এক নারী নয়, সে সহযোদ্ধা, বিপ্লবী, কমরেড। ২১জুন,১৮৪৯ সালে ভাগহয়সেলের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যারিকেডে লড়ছে লেনৎস,ক্রিস্টো,লিওনোরে, ডর্টু, ভিলিখ, বেকার এবং এঙ্গেল্স। এদের গোপন আক্রমণের নকশা ইতোমধ্যে শত্রুপক্ষের হাতে চলে যাওয়ায় তারা ক্রমশ প্রুশিয়দের কাছে হারতে থাকে। তাই এঙ্গেল্স বলছেন :

> এই যুদ্ধটা – ফলাফল যাই হোক না কেন–রাজনৈতিক চিত্রটাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। এতে সত্যিকারের পরাজিত পক্ষ হচ্ছে পাতি বুর্জোয়ারা,যাদের মুখে সবসময় হুঙ্কার,যারা শ্রমিকদের বোঝাচ্ছিল গণতন্ত্রে নাকি গরিব আর ধনীর সমান অধিকার।... একটা জিনিশ বোঝা গেল। যে-দেশে বুর্জোয়ারা দুর্বল, সেদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও শ্রমিকরাই করবে। অন্য কোন শ্রেণী পারবে না।[৩৫]

ওদিকে মন্ত্রী ও সদস্যরা পালিয়ে সুইজারল্যান্ড চলে যাচ্ছে। বিপ্লবী সরকার এবং জেনারেল রসমায়ার এদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। প্রতিপক্ষের বুলেটে মৃত্যুবরণ করে ক্রিস্টোফার। বন্দিদের দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে প্রুশিয় সৈন্যরা। লাশ পড়ছে আর তা তদারকি করছে জেনারেল স্ট্রাথমান, লেফটেনান্ট গ্রাম। মোর্ডেস, য়োশেফা এবং এপস্টাইন এসেছে। ডর্টু, লেনৎসও লিওনোরেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হয়। লিওনোরের পিতা তার কন্যার প্রাণভিক্ষার জন্য শত অনুরোধ করা সত্ত্বেও তার সামনেই তার কন্যাকে হত্যা করে। সন্তান হারানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই পিতা বাজারের শেয়ারের দরদাম নিয়ে আলোচনা শুরু করে।

শেষদৃশ্যেমার্কস সোজা দর্শকদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বলেন :

> এটা বোঝা গেল শ্রমিকশ্রেণী তার মতাদর্শকে সজোরে তুলে ধরেছিল বাডেনে। দেখা গেল অমন বেঈমানির মধ্যেও শ্রমিকরাই অতুল শৌর্য সহকারে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে গেল। তারা বুঝেছিল, এ-যুদ্ধে বীরের মতন মরাটাই হবে তাদের জন্য নৈতিক জয়,মতাদর্শের জয়। এঙ্গেল্স সবচেয়ে বেশি বীরত্ব দেখাচ্ছেন। এতে কমিউনিস্ট লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমার গর্বের সীমা নেই। কিন্তু বাডেনে এও বোঝা গেল শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পরিপক্কতার অভাব রয়েছে। তাদের সবচেয়ে বড় ভুলটা কী, তারা পুরো বুর্জোয়া শ্রেণীকে শত্রু ভেবে বসেছিল। কিন্তু সেটা ভুল।

> বৃহৎ পুঁজিপতি ও ব্যাঙ্কমালিকরা ছিল শত্রু, কিন্তু ছোট পুঁজিপতি,শিল্পপতি,ব্যবসায়ী এরা শত্রু ছিল না। ব্রেন্টানো ক্ষমতায় বসতেই বুর্জোয়ারা দুই অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক দিকের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ব্রেন্টানো, আরেক দিকের স্ট্রুভে। শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়ার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিজের কাজে লাগাতে পারে নি,পুরো বুর্জোয়া শ্রেণীকে ঠেলে দিল জমিদার-রাজা-সম্রাটের দলে। এ-থেকেই বোঝা যাচ্ছে কমিউনিস্ট লীগ নয়, এবার কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সময় এসেছে– এবং সব পার্টি মিলে একটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠনের সময় এসে গেছে।[৩৬]

এরপর মার্কস লিখতে বসেন;স্ত্রী য়েনি স্বামীকে জানান; এঙ্গেল্‌স ফ্রান্স থেকে তাঁর খবর জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন। এই-প্রথম বেশ কয়েকমাস এক জায়গায় তাদের থাকতে দিচ্ছে,তাই যতটা লেখা সম্ভব ততটা লিখে ফেলতে মার্কসকে তাড়া দেয় য়েনি; আর তখনই হাজির হয় ফরাসি পুলিশ অফিসার। তিনি জানান – স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সিদ্ধান্তক্রমে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্যারিস ছেড়ে মর্বিহাঁ জেলায় তাদের চলে যেতে হবে এবং সেখানে নজরবন্দি থাকতে হবে। কিন্তু মর্বিহা জলা জায়গা,মার্কসের ফুসফুসের রোগ আছে,মর্বিহা গেলে তার জীবন বিপন্ন হবে। অফিসার তাকে প্রুশিয়ায়,তার স্বদেশে চলে যেতে বলেন; কিন্তু সেখানে গেলে মার্কসের মৃত্যুদণ্ড হবে;কাছেই বেলজিয়াম, সেখানে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যাবার সব পথ বন্ধ হলেও; ফ্রান্সে থাকতে হলে তাকে মর্বিহাতেই থাকতে হবে,অন্য কোথাও নয়। অফিসার শুধু আদেশ পালন করছেন, তিনি জারি করেননি। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা সময়টা জুলুম হয়ে যাচ্ছে এইজন্য যে, ৪০০০ বই এ-সময়ের মধ্যে গুছিয়ে বাক্সবন্দি করা যাবে না, যদিও তাদের জামাকাপড় সুটকেসে গোছানোই থাকে। মার্কসের ফুসফুসের অসুখ জেনেও তাঁকে মর্বিহার মতো জলা জায়গায় পাঠানো এটা একরকম গুপ্তহত্যার শামিল, খুনের চক্রান্ত – মার্কস বলেন :

> আমাকে খুন করা এমন আর কি কঠিন আগ্নেয়াস্ত্রের যুগে? একটি ঘোড়া টিপলেই শেষ। কিন্তু তাতে কি হবে?বাডেনে কত ছেলেমেয়ে হাসিমুখে মরে গেল আমার কমিউনিস্ট ইশতেহার পড়ে। কেন ওভাবে মরতে পারল জান?এই ব্রেন্টানো তো পারলো না,স্টুভেও না। কারণ ঐ ডর্টু, লেনৎস,ক্রিস্টোফেল, লিওনোরেদের হারাবার কিছুই ছিল না,শৃঙ্খল ছাড়া। আর জয়ের জন্য রয়েছে সারা পৃথিবী। আমাদেরও তাই, য়েনি।[৩৭]

'সর্বহারার শৃংখল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করবার জন্য রয়েছে সারাবিশ্ব' – এই অনুভব এবং আশাবাদের মধ্য দিয়ে নাটকের পযরিসমাপ্তি। এ-নাটকের একটি মঞ্চায়ন সম্পর্কে শোভা সেন লিখেছেন : 'যতদূর দেখা যায় শুধু মানুষের মাথা। কিন্তু পেছনের দর্শক কী করে দেখবে? এও এক অভিজ্ঞতা। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও দর্শক নিঃশব্দে শেষ পর্যন্ত দেখে গেল। 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর সারমর্ম দৃশ্যত দেখা গেল এই নাটকে'।[৩৮]

দৈনিক বাজার পত্রিকা নাটকটি সরোজ দত্ত অনূদিত কনস্তানতিন সিমোনভের *দ্য রাশিয়ান কোয়েশ্চেন* নাটকের বঙ্গানুবাদ – *সাংবাদিক* নাটকের উৎপলীয় রূপান্তর। খবরের কাগজের মিথ্যাচার *দৈনিক বাজার পত্রিকার* উপজীব্য। গোপীবল্লভ দৈনিক বাজার পত্রিকার সম্পাদক, সুকুমার লাহা সহকারী সম্পাদক, মলয়ানিল সরকার, পুরুষোত্তম নাগ, বিজন পাকরাশি প্রমুখ পত্রিকার সাংবাদিক। গোপীবল্লভ কংগ্রেসের কোন ঘটনা তিলকে তাল

করে প্রকাশ করতে, নিজের অপকর্ম, কালোবাজারি ঢাকতে সংবাদকর্মীদের মিথ্যা রিপোর্ট করতে প্রণোদিত করে এমনকি বাধ্যও করে।

দৈনিক বাজার পত্রিকার প্রধান সাব এডিটর মলয়ানিল সরকারকে বামফ্রন্টের দুর্নীতি সম্পর্কে একটা বই লেখার দায়িত্ব দেয় গোপীবল্লভ। মলয় সরকার ভালবাসে গোপীবল্লভের সচিব জয়শ্রীকে। তারা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিছুদিন আগে রাজপথে প্রহৃত হয়ে মলয় এখনও অসুস্থ। মলয় বই লিখতে রাজি হয়। ময়লকে ফাইলপত্র দেয়া হয়– যা পড়ে বামফ্রন্টের দুর্নীতির বিষয় জানতে পারবে। বইটা লেখার জন্য সময় তিনমাস, টাকা মোট ৭০ হাজার,একটি ফ্ল্যাট, একটি বিদেশি গাড়ি,অগ্রিম দশহাজার টাকা। ঘরের দরজা বন্ধ করে বই লেখায় মগ্ন হয়ে যায় মলয়, ডিক্টেশান দেয় মাধুরীকে। বামফ্রন্টের দুর্নীতির বিষয়ে ময়লকে দেয়া ফাইলপত্র তন্ন তন্ন করে পড়ে মলয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় – বামফ্রন্টের দুর্নীতির কাহিনী কলঙ্ক রটনার এক হাস্যকর প্রয়াস মাত্র। মাধুরী আর মলয় ছাড়া এমনকি মলয়ের স্ত্রী জয়শ্রীও জানে না কি লেখা হচ্ছে এই বইয়ে।

এদিকে গোপীবল্লভ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বই হাতে পাবার জন্যে। বই হাতে পেয়ে গোপীর মাথায় হাত। বিবেকের তাড়নায় মলয় সরকার মিথ্যেবাদী হতে পারেনি। তাই বইটা লিখতে শুরু করে মলয় দায়বোধ করল। জয়শ্রীর জন্য,তার নিজের জন্য, কলকাতার জন্য, আরো অনেক দরিদ্র সাংবাদিকের জন্য তার লজ্জা হল। লজ্জা বোধ করল এইজন্য যে, পেটের দায়ে প্রতি সকালে এই সাংবাদিকরা দেশবাসীকে কিরকম নির্জলা মিথ্যা গিলিয়ে থাকে। ভারতবাসী যাদেরকে ভার দিয়েছে বিশ্বের সত্য তাদের কাছে জড়ো করে নিয়ে আসতে,প্রকাশ করতে; উল্টো তারা কী করছে!

গোপীবল্লভ বইটা কেটেকুটে তার মতো করে সংশোধন করে মলয়ের সই চাইলে মলয় অস্বীকৃতি জানায়। গোপীবল্লভ তো সত্য প্রকাশ করতে বই ছাপতে চায় নি। তার উদ্দেশ্য ভিন্ন – তিনি আদিষ্ট হয়েছেন ছলে-বলে-কৌশলে পশ্চিমবঙ্গে গণ্ডগোল বাধাতে হবে, বামফ্রন্টকে দুর্নীতিবাজ প্রমাণ করে বই লিখতে। মলয় সরকার গোপীবল্লভের উদ্দেশ্যের পথে হাঁটেনি,হেটেছে ভিন্ন পথে – সত্যের পথে। গোপীবল্লভ সত্যানুসন্ধানী সম্পাদক নয়; অসত্যের বেসাতি করে বেড়ায়। তার পক্ষে তো এমন বই ছাপানো সম্ভব নয়– এমন বইয়ের জন্য তো সেএতো টাকা খরচ করেনি।

মলয় সরকারের পুরনো প্রকাশক কাশীনাথবাবু বইটা ছাপতে রাজি হন। গোপীবল্লভ কাশীনাথবাবুকে নিষেধ করে দেয়–এই বই ছাপলে তার প্রেসে বড় বড় যত কোম্পানির অর্ডার আসে প্রত্যেকটির অর্ডার বাজেয়াপ্ত করবে। এমন বড় বড় কাজ হারালে কাশীনাথবাবুর দেউলিয়া হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।অনুরূপভাবে সাপ্তাহিক জনতার সম্পাদক উজ্জ্বল রায়ের কাছেও এ-বই ছাপতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয় মলয়। সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে নিঃস্বরিক্ত হয়ে যায় মলয় সরকার; আজ তার কিছু নেই– নেই সুখ, নেই শান্তি,নেই বাসস্থান, নেই টাকা, এমনকি স্ত্রী জয়শ্রীও। রিপোর্টার বিজনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তবুও সত্য প্রকাশ করার অঙ্গীকারই ব্যক্ত করে মলয় সরকার :

> এক বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়েছে বাংলার মানুষের চিন্তা, মতামতকে পিষে মারবার জন্য, তাদের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার জন্য। এ-ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে শহরের মিলমালিকরা, গ্রামের জোতদাররা, দিল্লির সরকার আর পশ্চিমবঙ্গের কিছু বৃহৎ সংবাদপত্র। দরিদ্র মানুষ যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এটা তারা সহ্য করতে পারছে না। ভবিষ্যতের মুনাফার স্বর্গরাজ্য থেকে তারা যে বঞ্চিত হবেই সেই ভবিষ্যদ্বানী লিখছে বাংলার মানুষ জলন্ত অক্ষরে। মিথ্যা আর কুৎসার বন্যা বইছে সংবাদপত্রে। বাংলার মানুষের উজ্জ্বলতর স্বপ্নগুলিকে চূর্ণ করার যে অভিযান আসছে, বৃহৎ সংবাদপত্রগুলো সেই আক্রমণের দৈবারিকমাত্র এই সত্যই সর্বত্র বলে বেড়াবে মলয় সরকার।[৩৯]

গণপ্রতিনিধি নামে গ্রেগরি লারসেন-এর একটি নাটক উৎপল দত্ত অনুবাদ করেন। নাটকটি ১৯৬৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় এবং প্রসেনিয়াম পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়।
ব্রেখ্‌ট-এর *ডীমুট্টের* নাটকের আংশিক অনুবাদ করেন উৎপল দত্ত *মা* নামে, অবশ্য এটির অভিনয়ের খবর পাওয়া যায় না। নাটকটি এপিক থিয়েটার পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় মে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।
ভাসিলি চিচকফ-এর *অ্যান আনফিনিশড ডায়লগ* অনুবাদ করেন ভ.ই. লানকিন। অনুবাদে সহযোগিতা করেছেন উৎপল দত্ত ও শক্তি বিশ্বাস। পিএলটি নাটকটি ১৯৮৩ সালের ২ মে একাডেমী মঞ্চে মঞ্চস্থ করে; এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮২ সালে এপিক থিয়েটার পত্রিকায়।

শেকস্‌পিয়ারের প্রতি উৎপল দত্তের অনুরাগ শৈশব-কৈশোর থেকে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজ অবধি শেকস্‌পিয়ারের নাটক গোটা পৃথিবীব্যাপী বহুল পঠিত, অভিনীত। আদ্যোপান্ত শেকস্‌পিয়ার পাঠ করেছেন উৎপল দত্ত;তাঁর নাট্যজীবনের অভিষেক হয়েছে শেকস্‌পিয়ার দিয়েই। বিশ্বসেরা শেকস্‌পিয়ার তাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম উৎপল দত্ত। অভিনয়-জীবনের প্রথমদিকে দ্য অ্যামেচার শেকস্‌পিয়ারিয়ান্স-এ শেকস্‌পিয়ারের ইরেজি নাটকই অভিনয় করেছেন। এলটিজিতে শেকস্‌পিয়ারের নাটক ইংরেজি-বাংলা উভয় মাধ্যমেই করেছেন। উৎপল দত্ত শেকস্‌পিয়ারের যে-নাটকগুলো অনুবাদ, অভিনয় এবং পরিচালনা করেছেন, সেগুলো হল : *ওথেলো, ম্যাকবেথ, রোমিও জুলিয়েট, আ মিডসামার নাইটস ড্রিম , মেরী ওয়াইভস্ অফ উইন্ডসর।* উৎপল দত্ত অনূদিত *ওথেলো* বিশ্বরূপায় এলটিজি প্রথম প্রযোজনা করে ১৯৫৮ সালের ৮ ডিসেম্বর। এলটিজি উৎপল দত্ত অনূদিত *রোমিও জুলিয়েট* মঞ্চস্থ করে মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯৬৪ সালে। *আ মিডসামার নাইটস ড্রিম*-এর (উৎপলকৃত) অনুবাদ *চৈতালী রাতের স্বপ্ন* প্রযোজনা করে এলটিজি ১৯৬৪ সালে।উৎপল দত্তের অনুবাদ*ম্যাকবেথ* পিএলটি মঞ্চস্থ করে ১৯৭৫ সালে রবীন্দ্রসদনে। *মেরী ওয়াইভস্ অফ উইন্ডসর* এর অনুবাদ *ফুলবাবু* পিএলটি মঞ্চস্থ করে ১৯৯৩ সালে।

উৎপল দত্তের*এংকোর*নামক গল্পগ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে – ফরাসি থেকে চারটি,রুশ থেকে তিনটি, স্পেনিস একটি,ইংরেজি তিনটি ও দুইটিমার্কিনগল্পের অনুবাদ।
নিজের লেখা তিনটি নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন উৎপল দত্ত : *অজেয়ভিয়েতনাম(Invincible Vietnam), সূর্যশিকার(Hunting the Sun)*এবং *মহাবিদ্রোহ(The Great Rebellion)*.

উৎপল দত্ত (অনুবাদ,অবলম্বনে সব মিলিয়ে) ২৪টি নাটকেররূপান্তর করেছেন;যেগুলোর মধ্যে বার্টল্ট ব্রেখ্ট-এর ৫ টি, ফ্রিডরিশ ভোলফ-এর ১ টি, শেকস্পিয়ারের ৫টি, তাছাড়া গলসওয়ার্দী, ম্যাক্সিম গোর্কি, কাউফম্যান ও হার্ট, বার্নাড শ, আগাথা ক্রিস্টি, আরউইন শ, ইয়ান পেটার্সেন, দারিও ফো, স্তেফান হাইম, কনস্তানতিন সিমনভ, গ্রেগরি লারসেন,বোরিসভিয়াঁর প্রমুখ নাট্যকারের একটি করে নাটক রয়েছে। এ-সব নাট্যকারের নাটকে তাঁদের দেশ-কাল, মানুষের জীবনাচরণ, চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। নাটক রূপান্তর করতে গিয়ে উৎপল কোনও কোনও নাটককে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে সাজিয়ে নিয়েছেন, কোনটায় আবার সংশ্লিষ্ট দেশ-কাল বজায় রেখেছেন।

উৎপল দত্তের রূপান্তরিত নাটকের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখবো, বিদেশি সাহিত্য বা নাটকের ওপর তাঁর যে পরিমাণ দখল ছিল সে-পরিমাণ নাটক তিনি রূপান্তর বা প্রযোজনা করেননি। প্রত্যেক দেশের নাটকে সেই দেশের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর নিরিখেই নাট্যকাররা রচনা করেন; সুতরাং তাঁদের নাটকে স্বদেশের চিত্রের প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। উৎপল দত্ত তাই তাঁদের নাট্য-ভাবনাকে তাঁর নাটকে নিয়ে এসেছেন, নিজস্ব নন্দনে প্রয়োগ করেছেন।

তথ্য নির্দেশ(ক):

১. উৎপল দত্ত , ভূমিকা, (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়-এর*ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত) , কলকাতা, ২০০২, প্রতিভাস, পৃ. ১৭
২.শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*, কলকাতা, ১৯৯৬, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লি:, পৃ. ৯৩
৩.উৎপল দত্ত, *গদ্য সংগ্রহ*, (প্রথম খণ্ড) কলকাতা, ১৯৯৮, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৯৮
৪.পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬
৫.প্রভাতকুমার দাস, বাংলা পেশাদার যাত্রার নতুন অধ্যায়: পথিকৃৎ উৎপল দত্ত, *পশ্চিমবঙ্গ*, উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা ১৪০৮, কলকাতা,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৯৪
৬.উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, রাইফেল, কলকাতা, ১৯৯৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লি:, পৃ. ২৭৯
৭.পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯
৮.পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯
৯.পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭
১০.পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭
১১.পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬
১২.পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, শোনরে মালিক, পৃ. ৪৮৯
১৩.পূর্বোক্ত, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৯৬, জালিয়ানওয়ালাবাগ, পৃ. ৯১
১৪.পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
১৫.পূর্বোক্ত,পৃ-৪
১৬ পূর্বোক্ত, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৯৫, নীলরক্ত, পৃ. ১২৯
১৭.পূর্বোক্ত, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯৭, সন্ন্যাসীর তরবারি, পৃ. ৩৯৩
১৮.পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩
১৯.পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪
২০ পূর্বোক্ত, তৃতীয় খণ্ড, দিল্লী চলো, পৃ.৭৭
২১.পূর্বোক্ত, শোভা সেন, পৃ. ১০১
২২.পূর্বোক্ত, *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড,সীমান্ত,পৃ. ৪৩৭
২৩.পূর্বোক্ত, পঞ্চম খণ্ড, মুক্তিদীক্ষা, পৃ. ৫৩৪
২৪.পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৪
২৫.পূর্বোক্ত, অষ্টম খণ্ড, ২০০৯, ভুলি নাই প্রিয়া, পৃ. ৬৮ ।
২৬.পূর্বোক্ত, ঝড়, পৃ. ১৫৯
২৭.পূর্বোক্ত, মাও-ৎ-সে-তুঙ, পৃ. ৩০৭
২৮.পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩
২৯.পূর্বোক্ত, নবম খণ্ড, বৈশাখী মেঘ, পৃ. ৫
৩০.পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
৩১.পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৩২. শোভা সেন, পুর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
৩৩.উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র,নবম খণ্ড, তুরুপের তাস, পৃ. ১৪৯
৩৪.পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
৩৫.পূর্বোক্ত, অরণ্যের ঘুম ভাঙছে, পৃ. ২২২
৩৬.পূর্বোক্ত, সাদা পোশাক, পৃ. ২৯৩
৩৭. উৎপল দত্তর*নির্বাচিত নাট্যসংগ্রহ*, ৪র্থ খণ্ড, কুঠার,কলকাতা,১৩৯১,জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ. ১০৯
৩৮.পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
৩৯.পূর্বোক্ত, *পশ্চিমবঙ্গ*, উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা, পৃ. ১৯৪
৪০.শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

তথ্যনির্দেশ(খ):

১.নৃপেন্দ্র সাহা, *বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত*, কলকাতা, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণী, পৃ. ৮৬

২.পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৩.পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৪.উৎপল দত্ত, সাদা পোশাক, কালো হাত, *গণনাট্য*, ১৯৮০, পৃ. ১৭৬

৫. উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*, প্রথমখণ্ড, স্পেশাল ট্রেন, কলকাতা, ১৯৯৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লি:, পৃ. ৫২৭

৬.পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, সমাজতান্ত্রিক চাল, পৃ. ৫৪৬

৭.পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৭

৮.পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৭।

৯.শোভা সেন, পূর্বোক্ত , পৃ. ৪২।

১০.উৎপল দত্ত, *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*, কলকাতা, ২০০৫, নাট্যচিন্তা, পৃ. ৩৭

১১.উৎপল দত্তর*নির্বাচিত নাট্য সংগ্রহ*-২,বর্গি এলো দেশে, পৃ. ২৯৯

১২.পূর্বোক্ত,পৃ.৩০০

১৩. শোভা সেন, পূর্বোক্ত,পৃ.২৪৯

১৪.নৃপেন্দ্র সাহা, পূর্বোক্ত,পৃ.৮৪

১৫.নৃপেন্দ্র সাহা, *নাট্যচিন্তা*,উৎপল দত্ত সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৩,কলকাতা,পৃ.৩৪

তথ্য নির্দেশ(গ):

১.উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, দ্বীপ, কলকাতা,১৯৯৪,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লি:,পৃ. ৪৯৪
২.পূর্বোক্ত,*নাটক সমগ্র*,পঞ্চম খণ্ড, কঙ্গোর কারাগারে, পৃ. ৫৭৩
৩.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৭৩
৪.পূর্বোক্ত,তৃতীয় খণ্ড, লৌহমানব, পৃ.৪১৩
৫.পূর্বোক্ত,পঞ্চম খণ্ড, কাকদ্বীপের এক মা, পৃ.৫৩৯
৬.পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৪৬

তথ্য নির্দেশ (ঘ):

১.*উৎপল দত্ত, এক সামগ্রিক অবলোকন*,নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি,কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ,পৃ.৪৮৮
২.উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*, চতুর্থ খণ্ড,চাঁদির কৌটো,কলকাতা,১৯৯৬,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লি:,পৃ.১৭৪
৩.পূর্বোক্ত, পৃ.২১৬
৪.পূর্বোক্ত,দ্বিতীয় খণ্ড, মধুচক্র, পৃ. ১৮৮
৫.পূর্বোক্ত,রাতের অতিথি,পৃ.১৪২
৬.পূর্বোক্ত,প্রোফেসর মামলক,পৃ.৩৯৬
৭.পূর্বোক্ত,পৃ.৪০৭
৮.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৩৩
৯.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৩৪
১০.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৩৭
১১.পূর্বোক্ত, হিম্মৎবাই,পৃ.৩১৩
১২.পূর্বোক্ত,পৃ.৩১৫
১৩.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৩৪
১৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৭৬
১৫.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৭৮
১৬.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৭৮
১৭.পূর্বোক্ত,চতুর্থখণ্ড,মৃত্যুর অতীত,পৃ.৩৫০
১৮.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৫৮
১৯.পূর্বোক্ত,দ্বিতীয় খণ্ড,সমাধান,পৃ.৫৫৮
২০.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৭২
২১.পূর্বোক্ত,পঞ্চম খণ্ড, ব্যারিকেড, পৃ. ২১৬
২২.পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬
২৩.পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩
২৪.পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩
২৫.পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮
২৬.পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯
২৭.পূর্বোক্ত,পৃ. ৫২
২৮.পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
২৯.পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৩০.শোভা সেন, পূর্বোক্ত,পৃ. ২১৬
৩১.উৎপল দত্ত , *নাটক সমগ্র*,ষষ্ঠ খণ্ড,বাংলা ছাড়ো,পৃ.৪২৯
৩২.পূর্বোক্ত,শৃঙ্খল ছাড়া,পৃ. ৫৪১
৩৩.পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১
৩৪.পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭
৩৫.পূর্বোক্ত,পৃ,৫৮১-৮২
৩৬.পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৮৬
৩৭.পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৮
৩৮.শোভা সেন, পূর্বোক্ত,পৃ.২২৭
৩৯.উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র*, সপ্তম খণ্ড,দৈনিক বাজার পত্রিকা, পৃ.৩৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আঙ্গিক ও শিল্পরূপ

[থিয়েটার এমন একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম যার মধ্যে দৃশ্য, আলো, সংগীত, অভিনয়, নেপথ্য-ধ্বনি সব একত্রীভূত]

সব শিল্পকর্মই বিষয় ও আঙ্গিকের যুগলবন্ধনে সার্থক হয়। নাটক দৃশ্য ও শ্রব্য শিল্পমাধ্যম। যৌথ ও সমন্বিত শিল্পমাধ্যম। নাটকের পাণ্ডুলিপি তাই নির্মিত হয় অনেক লক্ষ্যের তাগিদ নিয়ে। রচিত একটি পাণ্ডুলিপি তার লক্ষ্যানুসারী প্রকরণের ধারক। একটি পাণ্ডুলিপি তার ভাষা, সংলাপ, স্থান, কাল, অঙ্ক, দৃশ্য, গল্প ও ঘটনা-সংস্থান, চরিত্র, পরিণতি ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সজ্জাকে মেনে সার্থক হয়। কিন্তু, একটি নাটক কীভাবে, কোন্ করণ-কৌশলে দর্শকের সামনে গিয়ে পৌঁছুবে, তার যথেষ্টখানিই নির্ভর করে নাট্য-প্রযোজনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শিল্পবোধের ওপর। বিশেষত নাট্য-নির্দেশকের শিল্পাদর্শের ওপর। নাটকের আঙ্গিক তাই কেবলই পাণ্ডুলিপি-নির্ভর নয়। অনেক ক্ষেত্রে তা প্রযোজনা-নির্ভর ।উৎপল দত্ত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন,
'থিয়েটারের একটা ভিস্যুয়াল দিক আছে,যেটা বাদ দিলে থিয়েটার আর থিয়েটার থাকে না।'[১]

উৎপল দত্তের নাটকের আঙ্গিক বা শিল্পরূপের আলোচনা করতে গেলে আমাদের স্মরণে রাখা দরকার, উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী নাট্যকার, যিনি বাংলা নাটকে মার্কসীয় চেতনার নাট্য-রূপায়ণে বিশেষ সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি মনে রাখতে হয়, পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবেও তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য। অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকার – একইসাথে ত্রি-সত্তায় সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করা ব্যক্তিত্ব উৎপল। তিনি ছিলেন বাংলা থিয়েটারের চারণ, আদি-অন্ত থিয়েটারওয়ালা তিনি। থিয়েটারকেই মেনেছিলেন ধ্যান-জ্ঞান, জীবন-পালন। কেবলি একজন শিল্পস্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে তিনি নাট্যসৃষ্টিতে অবতীর্ণ হননি। নাটক তথা থিয়েটারের মাধ্যমে তিনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে চেয়েছেন। সে-লক্ষ্য আদর্শতাড়িত নয়, আদর্শ দ্বারা সুনির্দিষ্ট। উৎপল যে-রাজনৈতিক বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন আজীবন, সে-রাজনৈতিক আদর্শের বাস্তবায়নে নাটককে উপজীব্য করেছিলেন, হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। নাটক নিয়ে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন গণমানুষের কাছে, সাধারণের কাছে, সাধারণের আবেগের কাছে। নাটক দ্বারা সাধারণের আবেগকে জাগিয়ে, সে-অদম্য, বৃহৎ আবেগ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন সমাজ-সংগঠনে। সমাজসত্তার গুণগত রূপান্তরের মৌলিক দায়বোধ থেকেই জন্ম নাট্যকার উৎপলের।

নাট্যসৃজনে উৎপল ধ্রুপদী নাট্যাঙ্গিককে রীতিমতো প্রত্যাখ্যান করেছেন। গ্রেকো-রোমান ঐতিহ্য, কিংবা এলিজাবেথীয় কিংবা ভিক্টোরীয় এমনকি সংস্কৃত নাট্য-প্রকরণ : কোনটিরই সরাসরি প্রভাব-নিয়ন্ত্রণ তিনি মানেন নি। নাট্যমঞ্চায়ন তথা নাট্য-প্রয়োগে স্তানিস্লাভ্স্কি, পিসকাটর, ব্রেখ্ট এবং ওখলপ্কভের নাট্য-পদ্ধতি উৎপলকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে উৎপল দত্তের জীবন ও কর্ম পাঠ করে জানা যায়। স্তানিস্লাভ্স্কির কাছ থেকে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করার দৃষ্টি, দলগত অভিনয়, সত্যবাদিতা এবং মঞ্চে উদ্বেগমুক্ত ও শিথিল থাকার

কৌশল শিখেছেন বলে ব্রেখ্‌ট-পত্নী ও বিখ্যাত অভিনেত্রী হেলেন ভাইগেলে জানিয়েছিলেন। আর নাট্য-মহাজন ব্রেখ্‌ট নাট্যগুরু স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির কাছ থেকে যা যা শিখেছেন তার একটি তালিকা দিয়েছিলেন এরকম :

> নাটকের কাব্যগুণ উপলব্ধি করা। সমাজের প্রতি দায়িত্ব। দলগত অভিনয়। নাটকের কাহিনী বিন্যাস। সততা সহকারে চরিত্রের মুখোমুখি হওয়া। অনুভূতি ও কৌশলের ভারসাম্য। বাস্তবকে দ্বন্দ্বে-ভরা রূপে উপস্থিত করা। মানুষের মহত্ত্ব।[২]

উৎপল দত্ত মনে করতেন, স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির তত্ত্বমালার ওপর ব্রেখ্‌ট-এর এপিক থিয়েটার দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, 'ব্রেখ্‌ট-এর নাট্য-পদ্ধতি দর্শককে সজাগ করে,স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির পদ্ধতি দর্শককে টেনে নেয় 'দ্বন্দ্বে-ভরা বাস্তবে'। এপিক থিয়েটার বুর্জোয়া সমাজকে ব্যবচ্ছেদ করে প্রখর যুক্তিতে, মানুষকে বিপ্লবী করে তুলতে চায় আর বাস্তববাদী থিয়েটার আবেগ ও সমবেদনা জাগিয়ে মানুষকে করতে চায় বিদ্রোহী। এপিক স্বভাবতই অনেক পরিণত, অনেক বড়ো, অনেক বৈজ্ঞানিক। তবুও বিকল্প আঙ্গিক হিসেবে বাস্তববাদী ধারাও বহু বৈপ্লবিক বার্তার বাহন হয়ে বেঁচে রয়েছে সারা বিশ্বে।'[৩]

উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট সম্পর্কিত আলোচনায় জানান – 'ফর্মের উদ্ভব বিষয়বস্তু থেকে, নাট্যকারের চিন্তাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে। ব্রেখ্‌ট্-এর নানা নাটকে নানা ফর্ম ব্যবহৃত,সর্বত্র একই এলিয়েনেশন বা একই এপিক পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেন নি। এমন নাটকও তিনি মঞ্চস্থ করেছেন, যেখানে তিনি হবহু স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন (সেনোরাকারার প্রযোজনা একটি উদাহরণ)। ফর্মের খোঁজে ব্রেখ্‌ট পিকিং অপেরার কাছে গেছেন, কাবুকি বুঝতে চেয়েছেন, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পড়েছেন, সার্কাস অধ্যয়ন করেছেন।তাঁর কাছে ফর্ম কোনোদিনই অনড় কোনো ফর্মুলা ছিল না। যেভাবে হোক, সাত সমুদ্দুরের নানা পাড় থেকে যে-কোনো রং জোগাড় করে হোক বিষয়বস্তুটাকে পৌঁছে দিতে হবে দর্শকের মগজে, মিশিয়ে দিতে হবে দর্শকের চিন্তাধারায়।'[৪]

পারি কমিউন (ডী টাগে) থেকে শুরু করে রুশ বিপ্লব (মা), স্পেনের গৃহযুদ্ধ (কারার), হিটলারের অভ্যুত্থান (উই), চীনের বিপ্লব (সমাধান), ফ্রান্সের নাৎসী-বিরোধী পার্টিজান যুদ্ধ (সিমন মাশা), স্তালিনের বিপুল কর্মযজ্ঞ (চক্ সার্কলের প্রস্তাবনা, লুকুলুস) এ-সব এসেছে ব্রেখ্‌ট্-এর নাটকের পটভূমিকা হিসেবে। বিপ্লবের প্রত্যক্ষ চিত্র যে-সব নাটকে অনুপস্থিত সে-সব নাটকেও শ্রেণির ভিত্তিতেই মানুষের নানা বৃত্তিকে পরীক্ষা করা হয় শ্রেণি-বৈষম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পটভূমিকায়। সারাবিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ থেকে উপাদান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে রং সংগ্রহ করে তা দর্শকের চিন্তার সাথে মিলিয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত প্রকরণ সন্ধান করেছেন ব্রেখ্‌ট।ব্রেখ্‌টকে বিপ্লবের চারণকবি হিসেবে আখ্যায়িত করে উৎপল বলেছেন, তাঁর যুগের কোনো বিপ্লবই তাঁর চোখ এড়ায়নি। উৎপল নিজেও বিপ্লবের চারণকবি, তাঁর যুগের বিপ্লব-বিদ্রোহ এমনকি অতীতের বিপ্লব বিদ্রোহের ঘটনাপ্রবাহও তাঁর চোখ এড়ায়নি। সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়, ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনী বেছে নিয়ে নাটক করার, যাত্রা লেখার প্রয়াস উৎপলের প্রধান নাট্যাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় মূলত এ-সূত্রেই।

বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দেবার জন্যই যেমন ব্রেখ্‌ট-এর ফর্ম অন্বেষণ তেমনি উৎপলেরও। ব্রেখ্‌ট-এর সারাজীবনের বিপ্লব-চিন্তা, নাট্যচিন্তা এবং আঙ্গিকচিন্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। একইভাবে উৎপল দত্তেরও বিপ্লব চিন্তা, নাট্যচিন্তা এবং আঙ্গিক-চিন্তা আন্তর-সম্পর্কিত। উৎপল ব্রেখ্‌টকে একজন বিপ্লবী নাট্যকার হিসেবেই বিবেচনা করছেন; কারণ একজন বিপ্লবী নাট্যকার নিরপেক্ষ হতে পারেন না, প্রতিমুহূর্তে তিনি শ্রেণিসংগ্রামের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। ব্রেখ্‌ট-এর আঙ্গিক পুরোপুরি মার্কসবাদী নাট্য-চিন্তার নূতন সম্প্রসারণ এবং নূতন সংযোজন মাত্র। উৎপলও তাঁর নাটককে বিশেষ কোনো ফর্মুলায় বাঁধেননি। কারণ, তিনি মনে করেন, ফর্মুলা হচ্ছে নাটকের অশনিসংকেত। নাটকের আসল কথা হল বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টই শতাব্দীর মহত্তম নাট্যকার বলে উৎপল মনে করেন। উৎপল মনে করেন, ব্রেখট্‌-এর নাট্য-পদ্ধতির নামহল সারল্য। দর্শককে আনন্দ দিতে হলে কথাগুলোসহজ ও সরলভাবে বলতে হবে। অকপট সারল্য ও সহজবোধ্য ভঙ্গিই ব্রেখ্‌ট-এর নাট্যভাষা তথা নাট্যকৌশল। উৎপল দত্তের দৃষ্টিভঙ্গিও একই ধরনের কিন্তু তীব্র সমাজ ও জাতীয়তাবোধ সচেতন উৎপল এও মনে করেন :

> ব্রেখটের আঙ্গিক তার দেশ জার্মানীর তথা মধ্য ইউরোপের বহুশত বছরের মানস গঠনে তৈরি। সে আঙ্গিককে এ দেশে আনলে – এ দেশের মানুষের মানস গঠনের সঙ্গে মিলবে না। তা ছাড়া বিষয়বস্তুর মধ্যেও পরতে পরতে রয়েছে জার্মানীর রাজনৈতিক ঘটনার সাম্প্রতিক ছবি। তাই ব্রেখটের নাটকের আঙ্গিক কিংবা বিষয় পুরোপুরি ভারতবর্ষ তথা বাংলার থিয়েটার আঙ্গিকে ব্যবহার সম্ভব নয়। সম্ভব হল, ব্রেখটের ভাবনাটাকে নিয়ে আসা। ব্রেখটের এপিক থিয়েটার ও এলিয়েনেশন থিয়োরি সবসময় আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।[৫]

আমরা জেনেছি, নাট্য-মঞ্চায়ন তথা নাট্য-প্রয়োগে উৎপল ব্রেখ্‌ট, স্তানিস্‌লাভস্কি, পিসকাটার এবং ওখলপ্‌কভের নাট্য-পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তবে তিনি ব্রেখ্‌ট-এর মঞ্চ-ধারণার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন নি; বরং উৎপল দৃশ্যসজ্জা এবং দৃশ্যোপোকরণ ব্যবহারে যত্নবান ছিলেন বলেই আমরা দেখেছি। উৎপল এবং ব্রেখ্‌ট দুজনই সচেতনভাবে এরিস্টটলপন্থী নন। দুজনেই মার্কসবাদী, দুজনেই বিশ্বাস করেন :`Without Marxist knowledge and a socialist outlook, it is impossible today to understand reality or to use one's understanding to change it.'[৬]দু'জনেই নাটকের ত্রিনীতি বা ত্রি-ঐক্য মানেন নি; পঞ্চ-অঙ্কের পিরামিডও মানেন নি। উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট-এর *ডী টাগে ভেতর কম্যুনে*-এর অনুবাদ করেন *নয়াজমানা*, *ডী মাসনাহ্‌মে*-এর অনুবাদ করেন *সমাধান*, *ডী টাগে ডের কম্যুনে*-এর নির্বাচিত দৃশ্যের অনুবাদ করেন *কমিউনের দিনগুলি* এবং *মাদার কারেজ*-এর ভাবানুবাদ ও রূপান্তর করেন *হিম্মৎ বাঈ* নামে।

নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল চরিত্র-রূপায়ণ। উৎপলের নাটক পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই, তার চরিত্রসমূহ বিষয়ানুগ এবং ভাষা বা সংলাপ চরিত্রানুগ। যে-ধরনের নাটকই তিনি লিখেছেন বা মঞ্চস্থ করেছেন নাটকের চরিত্রসমূহ স্বমহিমায় উজ্জ্বল, তারা তাদের শ্রেণিচরিত্র নিয়েই হাজির হয়েছে। স্বদেশ-বিদেশের বিপ্লব-বিদ্রোহ, গণ-আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে উৎপল তাঁর নাটকের কাহিনী নির্মাণ করেছেন, সেজন্য গণনায়কেরাই উৎপলের নাটকের চরিত্র হয়ে এসেছে।উৎপল দত্তের নাটকের বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা,

নাট্য গঠন-কৌশল, মঞ্চবিন্যাস-রীতি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তাঁর নাটকের উপস্থাপনা-রীতি, গঠনশৈলী তথা আঙ্গিক-নিরীক্ষা বাংলা নাটকে যে-নূতনত্ব এবং পরিবর্তন এনেছে তা অভিনব এবং অনতিক্রান্ত। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন উৎপল দত্ত প্রথাগত পথে হাঁটেন নি, তেমনি আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও প্রথাবদ্ধ থাকতে চান নি। নাটকে তিনি বৈপ্লবিক বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন :

> প্রতি জাতি নিজ নিজ প্রিয় ফর্ম সৃষ্টি করেছে বহু শতাব্দী ধরে। সেই ফর্মেই সে দেখতে চাইবে বৈপ্লবিক নাটক। জাপানিদের কাছে বিপ্লবের বার্তা হয়তো কাবুকি মারফত সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যাবে, বাংলার মানুষের কাছে যাত্রায়, আর দক্ষিণ ভারতে নৃত্য মারফত, মহারাষ্ট্রে তামাশায়, উত্তরপ্রদেশে নৌটংকিতে, গুজরাটে ভাওআইয়ে। আসল কথা বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু। ফর্ম দেশকাল-সাপেক্ষ,বিষয়বস্তু চিরন্তন।[৭]

উৎপলের মতে এই বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু বা বক্তব্য পৌঁছানোর জন্য যা প্রয়োজন সবকিছু করতে হবে। নাটকে আঙ্গিকের অভিযোজন ঘটে বিষয়ের প্রয়োজনে। তাই উৎপল দত্ত নাটকের বিষয়ানুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণের পক্ষপাতী। কারণ, উৎপলের প্রত্যয়– যে-ধরনের নাটকই উপস্থাপন করা হোক না কেন এর মোড়কে রাখতে হবে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু। আঙ্গিকের প্রশ্নকে যেহেতু নির্ধারণ করে বিষয়বস্তু, সেহেতু বিষয়বস্তুকে বোঝাবার জন্য যা যা প্রয়োজন তা তা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন উৎপল দত্ত।

উৎপল দত্ত নাট্যকার হিসেবে নাটক লিখতে গিয়ে একথা ভোলেন নি যে, বিষয়বস্তু চিরন্তন, ফর্ম দেশকাল-সাপেক্ষ। তাই, তিনি যেমন সচেতনভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন, তেমনি পরিচালক হিসেবে সেই বিষয়বস্তুর মঞ্চে উপস্থাপন বিষয়ে খেয়াল রেখেছেন কী পদ্ধতিতে, কোন কৌশলে, কেমন মঞ্চে, কোন আলো বা সংগীত ব্যবহারে তিনি দর্শকের কাছাকাছি পৌঁছুবেন। তিনি মনে করতেন, প্রতিটি নাটককেই তার নিজস্ব আঙ্গিক খুঁজে নিতে হবে এবং আঙ্গিক এমন অনড় কোনো পদ্ধতি নয় যে তাকে বদলানো যাবে না। বিষয়বস্তু দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্য, হৃদয়গ্রাহ্য এবং দর্শকের চিন্তার সাথে নিয়ে মেলাতে হলে, যে-আঙ্গিক ব্যবহার সবচেয়ে কার্যকর বা লক্ষ্যসাধক তা খুঁজে নেয়াই প্রকৃত নাট্যকারের কাজ। বাংলা নাটকে বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক উভয়েরই নিরীক্ষায় উৎপল দত্ত সংযোজন করেছেন নতুন মাত্রা – তিনি প্রলেতারিয়েতের মিথ নির্মাণ করেছেন বাংলা নাটকে। উৎপল দত্তের জীবন ও নাট্য-পরিক্রমা পর্যালোচনা করে আমরা জেনেছি, তিনি ক্রমশ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো যাবে যে-নাট্যভাষায়, যে-নাট্যকৌশলে, উৎপল তাকেই যথার্থ নাট্য-আঙ্গিক বলে মেনেছেন।

উৎপলের বিবেচনায়, ব্যাপক জনগোষ্ঠী তথা গণ-দর্শকের কথা না ভেবে দুর্বোধ্য রূপরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলিষ্ঠ বক্তব্য-সমৃদ্ধ নাটককেও দর্শকের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে। তাই, দর্শকের জ্ঞানবুদ্ধির প্রতি খেয়াল না রেখে,দর্শককে বাদ দিয়ে আঙ্গিক-এর পরীক্ষা চালালে নিজের বৈদগ্ধ্য প্রকাশ হয়তো করা যায় কিন্তু দর্শককে সঙ্গে নিয়ে এগুনো যায় না নাটকের প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে। ব্রেখ্‌ট-এর তত্ত্বসূত্র মেনেই উৎপলেরও সিদ্ধান্ত 'পপুলার থিয়েটারকে অবশ্যই পপুলার হতে হবে।' নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্য থেকে ওঠে আসা থিয়েটারই (লোকনাট্য) পপুলার থিয়েটার-এর আখ্যা পেতে পারে। শ্রমিক-কৃষকই সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে

থাকা মানুষ; কাজেই তাদের লক্ষ্যে রেখে নাট্যনির্মাণ করলে, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সব শ্রেণির দর্শকের কাছে পৌঁছুনো যাবে। যে-নাটক সকলের কাছে পৌঁছুবার গুণসমৃদ্ধ সে-নাটকের নাট্যভাষাই যথার্থ নাট্যভাষা, যথার্থ নাট্যপ্রকরণ। এ-ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত প্রকরণ সবচেয়ে সহায়ক নাট্য-কৌশল হতে পারে, কারণ তার রয়েছে গণগ্রাহ্য হবার সুদীর্ঘ ভিত্তিক্ষমতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত, বিশেষত গণনাট্য সংঘের *নবান্ন* প্রযোজনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক বিষয় ও শিল্প উভয় অর্থেই ছিল প্রথাশ্রয়ী। কেউ কেউ, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের স্বাক্ষর রাখলেও তা খুব বিস্তৃত বা ব্যাপক ছিল না। সময়ের পরিক্রমায় বিষয়ভাবনা ও প্রকরণে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নবতর জীবনবোধে উদ্দীপ্ত এ-সময়ের নাট্যকাররা সমকাল সংরক্ত, গণজীবনমূল-সংলগ্ন; তাঁরা বিষয়ভাবনা ও শিল্পশৈলীতেও নিরীক্ষাপ্রবণ।

দর্শক তথা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের উদ্দেশ্যও বদলায়।[৮] নতুন দর্শকের কাছে হাজির হতে হয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন ভঙ্গির বিকাশ তাই গুরুত্বপূর্ণ। 'আগের দিনে যে-ভাবে বাড়িঘর তৈরি হতো সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন আর সেভাবে তৈরি হয় না, নাটকের বেলায়ও তাই পুরনো ভঙ্গিতে নতুন বিষয়বস্তু উপস্থাপনের চেষ্টা আঙ্গিকের গোঁড়ামির পরিচয় বহন করে।'[৯]শুধু নতুনত্বের খাতিরে নতুন ভঙ্গি গ্রহণ করাটাও এক ধরনের গোঁড়ামি বলে তিনি মনে করেন। তবে জাতীয় নাট্য আঙ্গিক-এর ভাবনা উৎপলকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্তালিনেরসাথে সহমত পোষণ করে উৎপল জানিয়েছেন :

> শিল্পসাহিত্য হবে কনটেন্টের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক কিন্তু ফর্মের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল। যে দেশে বহু নেশন সে দেশে একাধিক ন্যাশনাল ফর্ম গড়ে উঠবে।[১০]

আধুনিক থিয়েটারকে পরিচালকের থিয়েটার বলা হয়। আধুনিক কালের নাট্য-পরিচালকদের আত্মপ্রকাশের ভাষা আঙ্গিক। উৎপল দত্ত নাটক পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সেই সেন্ট জেভিয়ার্সের কলেজ জীবন থেকে; সেই সময়ের প্রযোজনা *মেরি ওয়াইভস অব উইন্ডসর*। এ-নাটক করার সময় নির্দিষ্ট স্থানকে তাঁরা একটি সাধারণ অঙ্গনে পরিণত করেছিলেন, চারিদিকে গোল করে নানা চরিত্রের বাড়ি– ফলস্টাফ, ফোর্ড, পেজ,শুঁড়িখানা ইত্যাদি, কোনোও বাড়িই সোজা নয়, নিয়মবিরুদ্ধ, অর্দ্ধবৃত্তের মতোন; দেয়ালগুলো ডাইনে ও বাঁয়ে ওঠে গেছে, এগুলোর দরজা-জানালাও তেমনি বাঁকা।

পরিচালক উৎপল দত্ত *চায়ের ধোঁয়া* গ্রন্থে পরিচালকের জয়কেই আঙ্গিকের জয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন,কারণ আঙ্গিকই হল পরিচালকের আত্মপ্রকাশের ভাষা। এতদিন আঙ্গিক শৈশবাবস্থায় ছিল, কারণ, এতদিন থিয়েটার নাট্যকারদের অধীনে ছিল। পরিচালক এবং নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখ্টকে উদ্ধৃত করে উৎপল লিলেছেন: The theatre is not the servant of the dramatist,but of society.[১১]তাই, একজন পরিচালক হিসেবে উৎপল তাঁর করণীয় ঠিক করেন এ-ভাবে :

> থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেব। তারপর বাদ দেব উইংস,বর্ডার প্রভৃতি। তারপর হটাব সীন-জাতীয় যত জিনিস। মেঝেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেব;এলোমেলো এদিকে ওদিকে সিঁড়ি সাজাব। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। উচ্চতর বেদী ব্যবহার করে মেঝে আর ব্যাটেন লাইটের মধ্যবর্তী বিশাল জায়গাটা ব্যবহার করব। ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করব ক্রেগ-এর আঁকা রেখা-কাটা একটা কালো পর্দা বা ব্রেখ্‌ট-বর্ণিত বিদ্যুৎ-আঁকা একটা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে ব্যবহার করব নীল পোশাক পরা জনা কুড়ি নর্তকী। আগুন বোঝাতে হয়তো উদয়শঙ্করের প্রদর্শিত কিছু লাল রিবন নাড়ব। বৃষ্টি বোঝাতে গুটি দশেক ছাতা খুলে ধরব। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পর্দা আর বেদীগুলোকে নাড়াব ভীম বেগে। মাতালের চোখে কলকাতা দেখাব :কার্ডবোর্ডের মনুমেন্ট আর হাইকোর্টকে চাকায় বসিয়ে ছুটিয়ে দেব মঞ্চের উপর দিয়ে, এলোমেলো ডগমগ কলকাতা–যাক্ করব অনেক কিছুই। কিন্তু যা করব তা থিয়েটারি ঢং-ই করব। চিত্রপটের খোকা-সুলভ বাস্তবতা আমদানি করব না। অন্য শিল্প থেকে ধার করে করব না।[১২]

'বিদ্রোহের নাটক' নামক প্রবন্ধে এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> নাটক স্বভাবতই ইতিহাসের কোনো স্থান-কালের সঙ্গে যুক্ত। সে নাটক মঞ্চায়নে সেই স্থান ও কালকে ধরতে হবে। তখনই এসে পড়ে আঙ্গিকের প্রশ্ন। কেউ যদি ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে মঞ্চে তুলতে চায়, তবে প্রথমেই তো যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দিল্লির রাজপথ তাকে দেখাতে হবে। নইলে ১৮৫৭ না হয়ে নাটকটা হবে ফৌজি বিদ্রোহের এক অনির্দিষ্ট ভাসা-ভাসা সংক্ষিপ্তসার, যার চেয়ে ক্লান্তিকর আর কিছু হয় না। তারপরই মঞ্চে আনতে হবে সেনাছাউনির দৃশ্য,সারি সারি তাঁবুর ইঙ্গিত। তারপরই হয়তো মঞ্চে আনতে হবে বাহাদুর শাহ্ জাফরের দরবার। তারপর আসে পোশাকের প্রশ্ন; সিপাহীদের লালকোট, কালো পেন্টালুন, চামড়ার শেজ-টুপি। সেইসঙ্গে ব্রিটিশ অফিসারদের লাল,সবুজ,নীল কোট। অন্যদিকে বাহাদুর শাহ ও তার সভাসদদের মোগল অভিজাত পোশাক। তারপর আসছে আবহ-সঙ্গীতের দুরূহ প্রশ্ন; ব্রিটিশ সামরিক ব্যান্ড বাদনের পাশে সংগীতজ্ঞ কবি। বিদ্রোহের নাটকের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত মঞ্চের সামগ্রিক শিল্পের প্রশ্নটা।[১৩]

একটি নাটককে কীভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছানো যায় সে-প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌টের প্যারি কমিউনের ঘটনাভিত্তিক *ডী টাগে ডের কম্যুনে* নাটকের উদাহরণ দেন। *ডী টাগে ডের কম্যুনে* নাটকের বিষয় পারির শ্রমিক-বুর্জোয়াদের রক্তাক্ত লড়াই– যে-লড়াইয়ে শ্রমিকরা তিন মাস রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে রাখতে সমর্থ হলেও বুর্জোয়াদের হিংস্র আক্রমণে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। খালিচোখে শুধুই একটি ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করলে এটি অবশ্যই পারি-শ্রমিকদের পরাজয়ের ঘটনাভিত্তিক নাটক। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ-ঘটনা বা নাটক পরাজয়ের নয়– এ-পরাজয় ছিল সাময়িক; এর ভেতরেই নিহিত ছিল অনাগতদিনের বিজয়ের ইঙ্গিত। পারির পরাজয়ের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণি ৪৬ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। ব্রেখ্‌ট এই পরাজয়ের নাটককে বিজয়ের নাটক হিসেবে দর্শকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন উপযুক্ত পরিচালনা-প্রকৌশলে। এ-প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত বলেছেন :

> দ্রুত ছোট ছোট দৃশ্য। ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়। শেষ দৃশ্যে...প্রত্যেকের ব্যারিকেডে মৃত্যু, লাল ঝাণ্ডার সম্মান রক্ষার্থে ... মৃত্যুবরণ। প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে দুটি বক্সে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ফ্রান্সের সুবেশ অভিজাতের দল, দূরবীণ

> দিয়ে তারা শ্রমিকদের পরাজয় দেখছে, প্রতিটি মৃতদেহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র শ্বাপদের মতন চিৎকার করে তারা আনন্দ জানায়। যুদ্ধ শেষ। মঞ্চের ওপর একগাদা মৃতদেহ একটি রক্তবর্ণ ঝাণ্ডাকে ঘিরে।... ব্রেশটের অতিপ্রিয় খাটো সাদা পর্দা পড়ল মঞ্চে। তার ওপরে স্লাইড মারফত লেখা পড়ল – 'ভিভ্ লা কম্যুন'। তারপর রুশ, জার্মান, চীনা, ইংরাজি, স্প্যানিশ এবং ইতালিয়ন ভাষায় একই জয়ধ্বনি লেখা হল পর্দার গায়ে। শ্রমিক-বিপ্লবের পারম্পর্যের ইঙ্গিত দেওয়া হল। প্যারি কমিউনের বাণী যে আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে সেই বলিষ্ঠ ঘোষণায় নাটক শেষ হল।[১৪]

অনুরূপভাবে শেকস্পিয়ারের একটি অক্ষর পরিবর্তন না করেও একটি অত্যাধুনিক রাজনৈতিক নাটক হয়ে ওঠেছিল *জুলিয়াস সিজার*। উপযুক্ত প্রযোজনা-প্রকৌশল তথা মঞ্চায়ন-শৈলীর জন্যই চারশো বছর আগের একটি নাটক চারশো বছর পরও অত্যাধুনিক নাটকে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ-নাটকের স্মৃতিচারণায় উৎপল জানাচ্ছেন :

> সিজারের মধ্যে যেন কালোর্ধ দেশোর্ধ এক ডিক্টেটরকে দেখতে পেয়েছিলেন মহাকবি। আমাদের সিজার(এলিস এব্রাহাম) ফেল্ট হ্যাট মাথায় যখন ভাষণ দিতে উঠলেন, সমবেত কালো ও লাল পোশাকে সজ্জিত সেনেটরগণ যখন প্রবল 'হেইল' উচ্চারণে হাত তুলে সেলাম করলেন,যখন প্রজাতন্ত্রী ব্রুটাস(আমি) রক্তপাতের মুখোমুখী হয়ে দোদুল্যমান, যখন উগ্রপন্থী ক্যাসিয়াস (প্রতাপ) নির্ভুলভাবে রক্তাক্ত সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তা বোঝান, যখন নির্মম কুচক্রী এ্যান্টনী (জেফ্যি আইজ্যাক) যে কোনো মহাবাগ্মী ফ্যাসিস্তের মতন জনতাকে বিপথে চালিত করেন, তখন নাটক হঠাৎ হয়ে ওঠেছিল সমকালীন বিশ্বের এক দর্পণ। ব্রুটাস ও এন্টনির ফোরাম-বক্তৃতা দুটি আমরা উপস্থিত করেছিলাম রেডিও-ভাষণ হিসেবে। শেষ ফিলিপাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম বোমা-বিধ্বস্ত এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ, যেখানে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স স্থাপিত হয়েছে। ঘন ঘন মেশিন-গান ও উড়ন্ত বোমারু বিমানের আবহ-শব্দের সঙ্গে চলেছিল শেষ অঙ্কের অভিনয়। পোশাক তখন আর রঙিন উর্দি নয়, ইস্পাতের হেলমেট ও বিবর্ণ খাকি ব্যাটলড্রেস। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে যেন দেশের লক্ষ্মী অন্তর্হিতা।[১৫]

উৎপল দত্ত দ্য অ্যামেচার শেকস্পিয়ার, লিটল থিয়েটার গ্রুপ(এলটিজি), গণনাট্য সংঘ এবং পিপলস লিটল থিয়েটার গ্রুপ (পিএলটি)-এ অসংখ্য নাটক প্রযোজনা করেছেন। উৎপল দত্ত বরাবরই ঐতিহ্য সচেতন এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁর মতে :

> প্রত্যেক দেশের থিয়েটার তার নিজ নিজ ঐতিহ্য অবলম্বন করে বেঁচে থাকে; যে থিয়েটারের কোনও ঐতিহ্য নেই, অতীতের অর্জিত সাফল্যগুলির প্রতি যথাযথ বিশ্বস্ততা নেই, অতীতের ভুলভ্রান্তির সমালোচনা নেই, তা মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর লোভের মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিদের দ্বারা, নির্দিষ্ট মানদণ্ডের দ্বারা নির্ধারিত হবে। যে ঐতিহ্য সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে অক্ষম সে ঐতিহ্য মরে যাবে।[১৬]

এই ঐতিহ্য-সচেতনতা থেকেই তিনি মাইকেল মধুসূদন, গিরীশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের নাটকও প্রযোজনা করেছেন। রবীন্দ্র নাটক, বিশেষত *অচলায়তন* প্রযোজনা প্রসঙ্গে উৎপল জানিয়েছেন :

> রবীন্দ্রনাথের সব নাটক মঞ্চায়নের ব্যাপারেই আমরা প্রচলিত রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার ধারা ভেঙে বেরিয়েছি; ভারী দৃশ্যসজ্জা ব্যবহার করেছি এবং পোশাক ও রূপসজ্জার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছি। আমরা সোজা

> গদ্যসংলাপগুলিকে সহজ স্বাভাবিক গদ্য হিসেবেই বলতে চেষ্টা করেছি, কোনো আবৃত্তিধর্মী বাচনভঙ্গী অবলম্বন করিনি। গানের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছি এবং অনেক ক্ষেত্রে গানকে আবহসংগীত হিসেবে ব্যবহার করেছি, যেন নাটকে গতিশীলতা সঞ্চার করা যায়।[১৭]

অচলায়তন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ৩৫০০০ হাজার দর্শকের সামনে অভিনীত হয়েছিল–যা উৎপল দত্তের উজ্জ্বল স্মৃতিসম্ভারের অন্যতম। এই নাটকের দৃশ্যসজ্জায় একটি তিনফুট উঁচু অর্ধবৃত্তাকার বেদি গোটা মঞ্চ জুড়ে ব্যবহার করা হয়;যার প্রত্যেকটিতে এক ফুট উঁচু খিলানের প্রবেশপথ ছিল। একদিকে বেদীর সামনে মঞ্চের অংশ, উঁচু বেদির উপরিভাগ এবং পর্দার সামনে মঞ্চের অপরিসর অংশ –এই তিনটি অভিনয় স্থানে ক্রমান্বয়ে অভিনয় চলেছে এবং এর ফলে নাটক তীব্র গতিশীল হয়। পুরো মঞ্চটা কালো কাপড়ে মুড়ে দেওয়া হয়। অচলায়তনের বাসিন্দাদের কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করা হয়; শোনপাংশুদের বলিষ্ঠ উলঙ্গ শরীর এবং পরনে খাটো ধূতি,মাথায় পাগড়ির মতো কাপড় বাঁধা, এর ফলে পরিবেশটা হয় শ্বাসরুদ্ধকর। কিশোর সুভদ্র-এর পাপস্খলনের জন্য প্রদীপ সহযোগে অচলায়তনের অধিবাসীদের শোভাযাত্রার দৃশ্যটি যুক্ত হয়েছিল।

তপতী নাটক প্রযোজনার সময় মঞ্চকে এমনভাবে সিঁড়ি ও বেদি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল, যাতে মঞ্চে নানা স্তরভেদ সৃষ্টি হয়; এতে করে বিভিন্ন দৃশ্যের কম্পোজিশন যেমন আকর্ষণীয় হয়েছে, তেমনি নাটকও হয়েছিল গতিশীল। নাটকের পোশাকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল এবং আলোকসম্পাতেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছিল।উৎপল দত্ত *বিসর্জন* পরিচালনা করেছিলেন গণনাট্য সংঘে কাজ করবার সময়, তবে এ-নাটক প্রযোজনায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। উনিশ শতকের মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রযোজনা প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত বলেছেন :

> আমরা উনিশ শতকের প্রহসনে ইংরেজি থিয়েটারের প্রভাবান্বিত অভিনয়-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা ও গবেষণার পথে এগোই এবং ইচ্ছাকৃতভাবে শেকস্পিয়ারের নাটকের অতি অভিনয়রীতি কাজে লাগাই। নাটকের প্রথম দৃশ্যটি আমরা পুকুরপাড় থেকে ভক্তপ্রসাদের বৈঠকখানায় স্থানান্তরিত করি, ফলে ঘরটিতে উনিশ শতকের আসবাবপত্র ঝাড়লণ্ঠন, পরীদের কুরুচিপূর্ণ মূর্তি ও কালো পাথরের তৈরি রবার্ট ক্লাইভের আবক্ষমূর্তি কাজে লাগাতে সক্ষম হই। মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ না করেই আমরা সেই অতীত যুগ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হই।[১৮]

গিরীশ ঘোষের *সিরাজউদ্দৌলা* প্রযোজনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> আমরা একাগ্রচিত্তে নাটকটির প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনায় মনোনিবেশ করলাম এবং ম্যালেসন,অরমি স্টুয়ার্ট,স্ক্রাফটল এবং সিয়ার-উল মুতাখরিন-এর রচনা পাঠ করতে শুরু করলাম। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৫৭ সালে গিরিশের 'সিরাজদ্দৌলা' মঞ্চস্থ করলাম। ... আমরা উপলব্ধি করতে শিখলাম ইতিহাস নাটকের মতো ঘটনাস্রোত নয়, ইতিহাস একাধিক আপাত-অসম্পৃক্ত ঘটনাপঞ্জি।...আমরা নাটকটি মুর্শিদাবাদের বাজারে এক জনতার দৃশ্য দিয়ে শুরু করলাম। ফলওয়ালা, আতর ও চামরওয়ালা, ছুরি ও কাঁচি বিক্রেতা ষড়যন্ত্রকারীদের আনাগোনা, ফরিদাবাদের বিনোদন, সাকী, কবি, সৈনিক, ভন্ড, ফকির, গান, রংবাজ, দাঙ্গা, বিদেশী বণিকদের সুলভ বিক্রয় পসরা ইত্যাদির মাধ্যমে নাটকের পশ্চাৎপট গড়ে তোলার চেষ্টা করি।... এরপর গঠন করতে চেষ্টা করি দরবারি আদব-কায়দা দরবারের দৃশ্যে –

Dhaka University Institutional Repository

> সেখানে বাঈজীর কণ্ঠে রোশনচৌকি থেকে ভৈরোঁ রাগে আলাপ, নকীব রুমাল নেড়ে সিংহাসনকে অভিবাদন জানাচ্ছে, নবাবের সিংহাসনে আরোহণ করার আগে তার পদপ্রক্ষালন করা হচ্ছে, পারিষদবর্গ নজরানা প্রদান করছেন, পারিষদরা একে একে জুতো খুলে হাঁটু মুড়ে নবাবকে কুর্নিশ করে আসন গ্রহণ করছেন, ক্রীতদাসী পানের সরঞ্জাম,পানীয়,থুকদান ও গোলাপের স্তবক এগিয়ে দিচ্ছে। পলাশির যুদ্ধের ফলাফল ঘোষণা ও সিরাজের গ্রেপ্তারের সংবাদ ঘোষণার আগে আমরা দেখিয়েছি ভগবানগোলায় নৌকার মাস্তুল ও স্তুপাকৃতি দড়ি প্রথমে মাটিতে রাখা হচ্ছে এবং নাখোদা দূরের কোনো নৌকাকে লণ্ঠন নেড়ে সঙ্কেত দিচ্ছে; রেশম,লবণ ও গন্ধকের জন্য ব্যবসায়ীরা কর প্রদান করছে ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি ঘটনার সমাহার।[১৯]

উৎপলের নাটকের আঙ্গিকের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবেই উৎপল দত্তের কিছু বিখ্যাত ও সফল প্রযোজনা সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে : কোলিয়ারি শ্রমিকদের জীবন-সংগ্রাম-ভিত্তিক নাটক *অঙ্গার*উৎপল দত্তের প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় নাটক। এ-নাটকে আঙ্গিকের প্রাধান্যের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। কেউ কেউ এমনও বলেছেন আঙ্গিকের স্টিমরোলারের তলায় পবিত্র নাটক-বস্তুটি গুঁড়িয়ে গেছে। যাঁরা এরকম অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তারা থিয়েটারের সামগ্রিকতাই কোনোদিন বোঝেন নি বলে উৎপল মনে করতেন; থিয়েটার বলতে তারা বুঝেছেন শুধু নাটক ও অভিনেতা। উৎপল দত্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন *অঙ্গার*-এর অভিনয় আঙ্গিকের তলায় হারিয়ে তো যায়ইনি,আঙ্গিকের সোপান বেয়ে আরও সহজে আরোহণ করেছিল সাফল্য শিখরে। তাঁর মতে :

> থিয়েটার এমন একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম যার মধ্যে দৃশ্য, আলো, সংগীত, অভিনয়, নেপথ্য-ধ্বনি সব একত্রীভূত। হেমাঙ্গ বিশ্বাস *অঙ্গার*-এর আঙ্গিকের প্রাধান্যের বিরোধিতা করে এলটিজি তথা উৎপলকে সমর্থন করে বলেছেন – 'বিষয়বস্তুর দিক থেকে একটুও আপস না করে পেশাদার থিয়েটারের সাম্রাজ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে লিটল থিয়েটার।[২০]

অঙ্গার-এর আঙ্গিকের আলোচনা করতে গিয়ে উৎপল দত্ত চতুর্থ দৃশ্যে (রেসকিউ কর্মকাণ্ডে) অপূর্ব আলোক-সম্পাতের, শেষ দৃশ্যে একই সঙ্গে ভয়াবহ ও মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টিতে আশ্চর্য পরীক্ষা চালানোর প্রশংসা আশা করেছিলেন। কিন্তু সমালোচকেরা অঙ্গারের আলোচনায় শুধুই দেখেছে জল। এ-প্রসঙ্গে উৎপলের মতামত প্রণিধানযোগ্য :

> কাহিনীর একান্ত প্রয়োজনেই আসছে জল। প্রথম থেকেই ইঙ্গিত রয়েছে মৃত্যুর– কয়লাখনি মজুরের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি –যার হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই। পুরো নাটক নির্মমভাবে এগুচ্ছে ওই শোচনীয় মৃত্যুর দিকে। বিনুর স্বপ্ন ছিল, ছিল আশা – ওই মৃত্যুতে তার স্বপ্নভঙ্গ। মা তাকে কোন এক মুহূর্তে অপমান করেছিলেন – ওই মৃত্যুতে তার শান্তি। রমজান আর আরিফের আজীবন আপোষহীন দ্বন্দ্ব; এই মৃত্যুতে তার অবসান। মহাবীর সিং-এর ছিল মানুষের প্রতি গভীর অবজ্ঞা–ওই মৃত্যুতে তার আত্মোপলব্ধি। মুস্তাকের ছিল সবাইকে ঘোল খাওয়াবার ক্ষমতা–ওই মৃত্যুতে তাঁর নিজের ঘোল খাওয়া। সনাতনের ছিল জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়াবার অভিযান–ওই মৃত্যুতে তার জীবনলাভ। এমনি সবাই – সব চরিত্র। ওই মৃত্যুই একাধারে ক্লাইম্যাক্স, সলিউশন,পরিণতি,নাটকে বক্তব্যের সম্পুর্ণতা– সেই মৃত্যুকেই বহন করে আনছে জলোচ্ছ্বাস। তাই জলোচ্ছ্বাস আসছে নাটকের প্রয়োজনে।[২১]

উৎপল দত্ত মনে করতেন :

> এমন একটা মুহূর্ত আসে থিয়েটারে যখন স্বাভাবিক বা সংযত আঙ্গিকে আশ মেটে না, নাটকের প্রয়োজন মেটে না, কার্যকারণের চাহিদা মেটে না। তখন অভিনেতাকে স্বর চড়াতে হয়– আবেগের রঙে রাঙিয়ে দিতে হয় দৃশ্যটাকে। ঠিক তেমনি দৃশ্যসজ্জা বা আলোকসম্পাতও মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে গলা চড়ায়, হাতপা ছোঁড়ে– নইলে ক্লাইম্যাকস্ ফিকে হয়ে যায়। ... অঙ্গার-এর বিশেষ প্রয়োজনেই আলো ও আঙ্গিকের অন্যান্য মাধ্যমগুলি প্রকট,স্পষ্ট,চড়া সুরে বাঁধা। এই আঙ্গিকের চরম ক্লাইম্যাকস্ জলপ্লাবনের দৃশ্য–ইচ্ছে করেই অসংযত, উদ্দাম। সে যে পুরো নাটকের আবেগ ভয়-আশা-স্বপ্ন সবকে ধুলিসাৎ করতে সংহার মূর্তি ধরেছে –এ কি ইঙ্গিতে চলে?[২২]

এবং :

> শ্রমিক আন্দোলন আনতে হবে পেশাদার নাট্যশালায়। বিষয়ের দিক থেকে এইটা ছিল 'অঙ্গার'এর স্ট্রং পয়েন্ট। শ্রমিককে মঞ্চের উপর তুলব আমরা পেশাদার নাট্যশালার স্টেজে। অন্যপক্ষে এমন স্পেকটাকুলার প্রোডাকসন করতে হবে যাতে দর্শকের চোখকে তৃপ্তি দেওয়া যায়, চমক দেয়া যায়।[২৩]

ফেরারী ফৌজ নাটকের পটভূমি তিরিশের দশকের বাংলার বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলন। এ-নাটকের প্রথম দৃশ্যে শুরুতেই রয়েছে মঞ্চসজ্জার দীর্ঘ বর্ণনা। গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করেন বিবেক। গানের মাঝে থেমে সূর্যসেনের মুক্তিপথের নিশানায় মিলিত হবার ও অর্থ সাহায্যের আহবান জানিয়ে আবার গান ধরে বিবেক – এরপর, তাকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। এমনি দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে উৎপল দত্ত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সাথে যাত্রার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। যে-পরিবেশে দীর্ঘকাল ধরে অভ্যস্ত বাংলার দর্শক সেই চিরচেনা যাত্রার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্য দিয়েই উৎপল বিবেক তথা সূত্রধারের একমাত্র আগমনের মাধ্যমে নাট্যঘটনায় প্রবেশ করান কুশীলবদের। সে-সাথে দর্শকও একাত্ম হয়ে যায় নাট্য-মুহূর্তের সাথে :

ফেরারী ফৌজ নাটকে মঞ্চকে বহুস্তরে সাজিয়ে কার্যত যবনিকার ব্যবহার বাদ দেয়া হয়েছিল। গোটা মঞ্চকে ত্রিস্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছিল – যাতে একই সঙ্গে একাধিক দৃশ্য অভিনয় করা যায়; প্রথম স্তরে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত জীবন, দ্বিতীয় বা মধ্য স্তরে বিপ্লবীদের সংগ্রাম, তৃতীয় স্তরে পুলিশ, জমিদার তথা সমাজের উচ্চশ্রেণী। মঞ্চের পেছনে ন'ফুট উঁচু বেদি তৈরি করা হয়েছিল – যা ব্যবহৃত হয়েছে গির্জায় যাওয়ার পথ হিসেবে কখনো, কখনো ভুবনডাঙার সাঁকো হিসেবে। মঞ্চের ডানের মেঝেকে ব্যবহার করা হয়েছে বিপ্লবী অশোকের বাড়ির ভেতরের অংশ। মঞ্চের বাঁদিকের অংশে ছিল রাধার ঘর, গ্রামের হাটতলা। এই নাটকের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন নির্মল গুহ রায়; আলোক সম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। ফেরারী ফৌজ-এর আবহসঙ্গীতে রবিশঙ্কর *অঙ্গারকে*ও ছাড়িয়ে গেছেন বলে উৎপল দত্তের ধারণা। নাট্য ঘটনা, দৃশ্যসজ্জা, আলো, সঙ্গীত, অভিনয় সবকিছুর সমন্বয়ে *ফেরারী ফৌজ* ছিল এলটিজির অসাধারণ প্রযোজনা।

উৎপল দত্তের অসামান্য রচনা, নৌবিদ্রোহভিত্তিক নাটক *কল্লোল*। এই নাটকে তিনটি সেট ব্যবহার করা হয়েছে– খাইবার জাহাজের বিশাল সেট, বোম্বে ওয়াটারফ্রন্ট বস্তির সেট এবং ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর

অফিসারদের হেডকোয়ার্টার্স। খাইবার জাহাজের যে সেট, সেটা মঞ্চের মাঝখানে বিরাট জাহাজ যেন উপকূলে নোঙর করে আছে; জলের ঢেউও দেখানো হয়েছে আলোর যাদুতে–জাহাজটা যেন জলে ভাসছে। বোম্বাইয়ের ওয়াটারফ্রন্ট বস্তির সেট-এ আছে শার্দুলের মা, স্ত্রী ও অন্যান্য শ্রমিকদের বস্তিজীবন। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর অফিসারদের হেডকোয়ার্টার্সটি একেবারে ব্রিটিশ কায়দায়ই বিন্যস্ত করা হয়েছে। মঞ্চে নফুট উঁচু খাইবার জাহাজ, ওয়াটারফ্রন্ট বস্তি প্রেক্ষাগৃহে র‍্যাম্প, দর্শকদের জন্য রাখা বাক্সগুলোও মঞ্চের অংশ হয়ে যায়। উৎপল দত্ত এ-নাটক সম্পর্কে লিখেছেন :

> হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহারাষ্ট্রের পোয়াডা ও লাওনি সুরে পশ্চিম প্রান্তের মহান মেহনতী মানুষের অন্তরের কথাগুলি যেন সাজিয়ে দিলেন পুষ্প স্তবকের মতোন। সুরেশ দত্ত সৃষ্টি করলেন খাইবার ক্রুজার বস্তির দৃশ্য; তাপস সেনের আলো। আর সংগীতে আমরা জর্মন, রুশ ও চীনা বিখ্যাত নৌবিদ্রোহের গান কয়েকটি ব্যবহার করেছিলাম। আর অবশ্যই আর্ন্তজাতিক শ্রমিক সংগীত। ... বিদ্রোহের দৃশ্যে প্রথমে তেরঙ্গা ও লিগের ঝাণ্ডা, ক্রুজার খাইবারের মাস্তুলে ওঠে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। তার পর ইন্টারন্যাশনাল গানের সঙ্গে লাল নিশান এসে, সদর্পে উড়তে লাগলো আলোকবৃত্তের মধ্যস্থলে এবং ঘন ঘন শ্লোগানে মুখরিত হতে লাগলো প্রেক্ষাগৃহ।...লিটল থিয়েটারের বহু বছরের ত্যাগ ও শ্রম যেন ওই মুহূর্তে কেন্দ্রবিন্দুতে এসে রোমাঞ্চিত সার্থকতায় পূর্ণ হল।[২৪]

এলটিজির সবাই অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন এ-নাটকে। মঞ্চসজ্জা, আলো, সংগীত অভিনয় এবং নাট্য বিষয়–সবকিছুর সুষম সমন্বয়ে *কল্লোল*-এর মত অসাধারণ প্রযোজনা বাংলা থিয়েটারে আগে দেখা যায়নি। সূত্রধারের গানের মাধ্যমে নাটকের শুরু। এ-নাটকেও উৎপল প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও যাত্রার মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মানুষের অধিকারে ব্যতিক্রমধর্মী নাটক। আদালতের বিচার দৃশ্যকে ঘিরে নাটকটির মূল ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। লিভোভিটস-এর তথ্য-প্রমাণসহ জেরা, সওয়াল-জবাব দর্শকের মধ্যে জন্ম দেয় আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে দক্ষতার সঙ্গে, অসাধারণ নৈপুণ্যে ও কৌশলে, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় রূপায়িত করা হয়। এটি কোর্টরুম ড্রামার আঙ্গিকে রচিত। উৎপল দত্ত লিখেছেন :

> মানুষের অধিকারে লিটল থিয়েটার গ্রুপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। ১৯৩১-এর কুখ্যাত স্কটস্‌বরো মামলা অবলম্বনে মার্কিন মুলুকে কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নের এই নাটকটিলিখেছিলাম অনেক আগে, বোধ হয় ৬২ সালে। আফ্রো-মার্কিন সংগীতে,এলবামার তুলার ক্ষেতের পারে পেন্টরক রেলস্টেশনে ও ডেকাটুর শহরের আদালতের দৃশ্যসজ্জায়, পোশাকে, হাবভাবে, মেকআপে, সমবেত অভিনয়ে নাটকটা হঠাৎ যেন যথাযথ ও শক্তিমান হয়ে ওঠেছিল।[২৫]

সাতটি দৃশ্যে বিন্যস্ত *টিনের তলোয়ার*। *টিনের তলোয়ার* পিপলস লিটল থিয়েটার(পিএলটি)-এর প্রথম প্রযোজনা এবং শতবর্ষের বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মঞ্চে এবং নেপথ্যে একই সাথে এই নাটকের অভিনয় চলেছে। এই নাটক প্রযোজনা করতে গিয়ে উৎপল একেবারে ভিন্ন

ধারার প্রয়োগ-পদ্ধতি কাজে লাগান। থিয়েটারের ভেতরে থিয়েটার, মঞ্চের ভেতরে মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহকে থিয়েটারের মধ্যে নিয়ে আসা – সব মিলিয়ে অভিনব প্রযোজনা *টিনের তলোয়ার*। এই নাটকে উৎপল দত্ত ঘূর্ণায়মান মঞ্চের পুরোপুরি ব্যবহার করেন। *টিনের তলোয়ার* নাটকের শেষ দৃশ্যের চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় :

> যেই মুহূর্তটিকে নাট্যকার নির্দেশক উৎপল দত্ত বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে নাট্যকলাকেই কাজে লাগিয়েছিলেন, মঞ্চপটকেই সহসা প্রায় এক বিস্ফোরণ শক্তিতে বহুধা বিস্তৃত করে দিয়ে মঞ্চে যে শক্তির উন্মোচন ঘটে, তা-ই যেন সঞ্চারিত হয়ে যায় প্রেক্ষাগৃহে, রবীন্দ্রসদনের দুটি সুউর্ধে স্থাপিত আলো বসাবার জন্য নির্দিষ্ট বকস্-এ বা ছোট ব্যালকনিতে। মঞ্চে নাটকীয় প্রতিরোধলীলা, গান, বক্স থেকে গান, বকস্ থেকেই শাসকশক্তির হুমকি ও শাসানি,সম্পূর্ণ আলোকিত প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সমাবেশ– সব মিলিয়ে নাট্য নির্দেশকের সাহসিক, আত্মপ্রত্যয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটে।[২৬]

লেনিনের ডাক নাটকে লেনিনের সৃষ্টিমুখর জীবনের বিশেষ একটি অধ্যায়– বলশেভিক পার্টি, সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অসামান্য সাহসী সংগ্রাম ও বিজয় নাটকে তুলে ধরার জন্য যে-মঞ্চসজ্জা করা হয়েছিল তার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শক। মঞ্চের উপর দিয়ে ট্রেনগাড়ি চলে যাওয়া, লেনিনের আহ্বানের জন্য মঞ্চে একটি ঝুল বারান্দা, গ্রামের পরিবেশ, লেনিনের অফিসঘর ইত্যাদি পরিকল্পনা যথাযথ, সুন্দর, বাস্তবসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য। লোক-সঙ্গীত, রুশ বিপ্লবের গান এবং বিদেশি সুরের আবহে উৎপল দত্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, সেইসঙ্গে তাপস সেনের আলো, সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জা যুক্ত হয়ে প্রযোজনাটিকে দিয়েছিল ভিন্ন মাত্রা।

ব্যারিকেড, *দুঃস্বপ্নের নগরী*, *এবার রাজার পালা* নাটকত্রয় ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সেই ভয়ঙ্কর কালো সময়কে যথার্থভাবে তার ঐতিহাসিক যোগসূত্রসমেত শিল্পসম্মতভঙ্গিতে দর্শকের কাছে হাজির করতে সক্ষম হয়েছে। *ব্যারিকেড* নাটকের প্রযোজনায় তাইরভের কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে বলে উৎপল জানিয়েছেন। ব্যারিকেড নাটকে সংগীত, দৃশ্য, নৃত্যসহ থিয়েটারের সব শিল্পমাধ্যমের সুষম সমন্বয় ঘটে। অসাধারণ প্রযোজনা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করে নাটকটি।

দুঃস্বপ্নের নগরী-এর নাট্য-পরিচিতিতে বলা হয়েছে :

> এর বিষয়বস্তু যেমন বিস্ফোরক, আঙ্গিক তেমনি আক্রমণাত্মক। জরুরি অবস্থা, দমবন্ধ করা পরিবেশ, পুলিশ-মাস্তান-সংবাদমাধ্যম আর রাজনৈতিক নেতার প্রকাশ্য আঁতাতে, জনগণের আর্তনাদে-উল্লাসে শহর কলকাতার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছে এক জট-পাকানো 'জগাখিচুড়ি' দৃশ্যসজ্জায়। ব্যঙ্গের চাবুক সেখানে ছন্দের নূপুর পরেছে পায়ে। অতীতের শবের বুকের উপর বসে রচিত হয়েছে আত্ম-সাক্ষাৎকারের কবিতা। আর গ্লানিময় জীবন থেকে উত্তরণের মাভৈঃ মন্ত্রের মতো গোটা নাটকটাকে বেঁধে রেখেছে তার কেন্দ্রীয়-সংগীত। – 'কলকাতা আমার প্রিয়ার নাম'... নির্যাতিত মানুষের বুকের কথাটা এ-নাটক এমন ভাবে বলল, মনে হল যেন 'ইশতেহারের বুকের ওপর গড়ে তুলছে শিল্পের ঘরবাড়ি'।[২৭]

এ-নাটকের সংলাপে কবিতার পংক্তি এবং গদ্য সংলাপের মিশ্রণ ঘটেছে। কোনো চরিত্র গদ্যসংলাপে কথা বলেছে, কোনো চরিত্র পদ্য সংলাপে। সংলাপ রচিত হয়েছে চরিত্রানুযায়ী। মণিভূষণের সংলাপে যে-গভীরতর জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় লক্ষ্মণ পালিতের তেমন নয়। এ-নাটক কবিতা, ছড়া, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সবকিছুর মিলিত কোলাজ।

স্তালিন-১৯৩৪ নাটকটি নির্মিত হয়েছে ক্রাইম থ্রিলারের আদলে। ঘটনার উৎকণ্ঠা এবং ঘটনার কার্যকারণ-সূত্র উন্মোচনে 'ক্রাইম থ্রিলার' পদ্ধতি ব্যবহার-এর ফলে নাটকটি যেমন দর্শকের কৌতূহলকে উদ্রিক্ত করেছে তেমনি আকর্ষণীয়ও হয়েছে।*বাংলা ছাড়ো* দারিও ফো-এর *দ্য একসিডেন্টাল ডেথ অফ অ্যান এনার্কিস্ট* নাটকের বাংলা রূপান্তর। এই নাটককে সমালোচকগণ 'চেম্বার ড্রামা', 'ইনভেস্টিগেটিভ ড্রামা' বলে অভিহিত করেছেন।

*মহাবিদ্রোহ*নাটকটি*টোটা*-এর পরিমার্জিত ও নামান্তরিত রূপায়ণ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আখ্যান *মহাবিদ্রোহ*। এ-নাটকের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন মনু দত্ত; সংগীতে ছিলেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য আর আলোকসজ্জায় তাপস সেন। ১৯৭৩ সালে দিল্লীতে *টোটা-র* প্রযোজনা প্রসঙ্গে শোভা সেন জানিয়েছেন :

> লালকেল্লার সেই শো কিন্তু আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'টোটা'র ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে এত মিশে গিয়েছিল যে এক এক সময় মনে হচ্ছিলো ইতিহাসের পাতা থেকে বাহাদুর শাহ'র শেষ জীবন বাস্তব হয়ে ওঠে এসেছে। দরবারের দৃশ্য। মসনদে অমাত্য পরিবৃত বাহাদুর শাহ, মোগল সম্রাট। দূর বাতায়নের গবাক্ষের ওপাশে বসে আছে তানপুরা নিয়ে বাঈজী, তান ধরেছে ভোরের রাগের। সুরের মুর্ছনার আবহাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এক স্বপ্নের জগৎ। অতীতের এক অধ্যায় মূর্ত হয়ে উঠল দিল্লীর লাল কেল্লায় – ১৯৭৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। তাপস সেনের আলোর মায়াজাল সৃষ্টি করল এক নজিরবিহীন পরিবেশ। বাহাদুর শাহের সেই করুণ পরিণতি,আর্ত হাহাকার বেরিয়ে আসতে চাইছে লাল কেল্লার প্রাচীর ভেদ করে।...দর্শক অভিভূত হয়ে পড়ত যখন সেই বিধ্বস্ত, সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব, ন্যুব্জদেহ মা ও স্ত্রী বেরিয়ে যেত। বিশেষ করে তাপস সেনের আলো যেন আরো বাস্তবায়িত করে দিত সেই করুণ মুহূর্তটিকে। সংগীতের সুরে মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেত সেই অভিনয়।[২৮]

সূর্য শিকার প্রাচীন ভারতবর্ষের সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের শাসনকালের পটভূমিতে রচিত ও মঞ্চস্থ হয়। *সূর্যশিকার* নাটকের দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র-নির্মাণে উৎপল দত্ত অত্যন্ত সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ নাটকে। এ-নাটকের আঙ্গিক শেকস্‌পিয়রীয় এবং বিষয়বিন্যাস ও দ্বন্দ্ববিকাশ ব্রেখ্‌টীয় এবং এতেব্রেখ্‌ট্‌-এর *গ্যালিলিও গ্যালিলাই* নাটকের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায় বলে সমালোচকগণ মনে করেছেন। এ-নাটকের প্রযোজনা উচ্চমানের হয়েছিল। মঞ্চসজ্জা, আবহ সঙ্গীত, আলো এবং উচ্চমানের অভিনয় প্রযোজনাটিকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

তিতুমীর নাটকের কাহিনী ঐতিহাসিক। *তিতুমীর* নাটক প্রযোজনা করতে গিয়ে উৎপল মঞ্চে তিতুমীরের সেই বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। মঞ্চের বড় পরিসর ব্যবহার করে আদালতের দৃশ্য, আলোর মাধ্যমে আঁকা গাছপালার কাট আউট *তিতুমীর* নাটকের মঞ্চসাফল্য তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বর্ণাঢ্য জীবন-কাহিনীভিত্তিক নাটক *দাঁড়াও পথিকবর* নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা ও দৃশ্যসজ্জা ছিল অভিনব ও অসাধারণ – মঞ্চনির্মাণ, আলো, সংগীত, মঞ্চ ব্যবহার সব মিলে আবহটি তৈরি করা হয়েছিল উনিশ শতকের নাগরিক কলকাতার। মঞ্চকে একেবারে দর্শকের আসন পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হয়েছিল। আঁকা দৃশ্যপট ততোদিনে থিয়েটারে অচল হয়ে পড়েছিল যদিও – উৎপল দত্ত মাইকেলের পড়ার ঘরের দৃশ্য পরিকল্পনায় তার ব্যবহার করেছিলেন। বাস্তবসম্মতভাবে আঁকা পুরো দেয়াল বোঝাই বই-এর দৃশ্যপটে দ্রোহী, স্বপ্নচারী, সৃষ্টিশীল মধুসূদনকে উপস্থিত করা ছিল হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্ত, দাশরথি রায়, গিরিশ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের গান ব্যবহার করে উনিশ শতককে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

অদ্বৈত মল্ল বর্মণ-এর *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর নাট্যরূপ দেন উৎপল। নাটকের শুরুতে, প্রেক্ষাগৃহের মাঝ বরাবর একটি সরু পথ দিয়ে অভিনেতৃবৃন্দ বরণডালা হাতে নেচে-গেয়ে চলেছেন। মালোদের নাচ-গান, ব্রতপালন উৎসব, তাদের প্রাত্যহিক জীবন, বাড়িঘর, পাশে বয়ে চলা তিতাস নদী –সব মিলিয়ে নদীপাড়ে মালোদের জীবন বাস্তবসম্মতভাবে ধরার চেষ্টা ছিল উৎপলের। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যকে দর্শকের খুব কাছেআনবার চেষ্টা করা হয়েছিল। উৎপল তা শিখেছিলেন মস্কোয় নিকোলাই ওখলপ্কভের মায়কোভস্কি থিয়েটারের অভিনয় দেখে,তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে। বিশেষত, যাত্রার প্রভাবকে নাট্যশালায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রসেনিয়ামের কারাগার ভাঙা দরকার বলে উৎপলের প্রতীতি বহু আগেই জন্মেছিল। ওখলপ্কভের নাট্যশালা দেখে তেমন একটি পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, যা ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন *তিতাস একটি নদীর নাম*প্রযোজনায়।

নকশালবাড়ি অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহ *তীর* নাটকের পটভূমি। প্রকৃত শিল্পীর হাতে সামান্য জিনিসও যে অসামান্য উঠতে পারে,অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে,*তীর* প্রযোজনা তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মনে করতেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তীর-এর মঞ্চসজ্জায় ছিলেন নির্মল গুহ রায়, আলোকসজ্জায় তাপস সেন এবং সঙ্গীতে হেমাঙ্গ বিশ্বাস। অনন্য মঞ্চসজ্জা বিশিষ্ট এই নাটকের মঞ্চে চারটি স্থানে একই সাথে অভিনয় হয়েছে। এ-প্রযোজনা-কৌশল দর্শকদের অভিনব অভিজ্ঞতায় নিয়ে যায়। মঞ্চে অরণ্যের পরিবেশ নির্মাণ করা হয়েছিল পুরোপুরি বাস্তববাদী শিল্পপ্রকরণে।

উৎপল দত্তের নাটকের সবচেয়ে আকষর্ণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তাঁর নাটকের ভাষা বা সংলাপ। নাটকে অভিনয় করে, নাটক পরিচালনার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে উৎপল দত্ত নাট্যকার সত্তায় অবতীর্ণ হন। ফলে তিনি দর্শকের হৃদয়গ্রাহ্য, অনুভবগ্রাহ্য ভাষা ও সংলাপ নির্মাণ করার দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। এই প্রবণতা তাঁর পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকে যেমন বিদ্যমান তেমনি যাত্রাপালা, পথনাটক, একাঙ্ক নাটক এমনকি তাঁর রূপান্তরিত বা ভাবানুবাদমূলক নাটকেও বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গার-এখনিগর্ভের অতল জলে ডুবে যেতে যেতে মোস্তাক, বিনু, সনাতনরা যে চিঠি লিখে ডাক দিয়ে যায়,সেই সংলাপ যেমন হৃদয়স্পর্শী তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ :

> সনাতনের কণ্ঠ ॥ পৃথিবীর মানুষ, তোমরা আমাদের ভুলো না। মানুষের ঐশ্বর্য আহরণ করতে আমরা নেমে যাই ধরিত্রীর অতল গর্ভে। সেখানে আমাদের জীবন রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। ঐশ্বর্য লিপ্সাই মানুষকে করে শয়তান আর সেই শয়তানরা হাসিমুখে আমাদের জলে ডুবিয়ে মারে। আমরা মরে যাই, ক্ষতি নেই, তোমরা দেখো এর পরে যেন আর একজন মানুষও এভাবে ইঁদুরের মতন না মরে।[২৯]

ফেরারী ফৌজ নাটকে সশস্ত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে অশোক পুলিশের কাছে ধরা পড়লে পুলিশ রটিয়ে দেয় – অশোক সব বলে দিয়েছে। যেহেতু সেজে-গুছে সুন্দর কাপড়-চোপড় পরা অশোককে পুলিশের গাড়িতে দেখা যায় তাই মা-বাবাসহ সকলেই ভুল বোঝে অশোককে। তবুও অশোক এক বুক ভালবাসা ও আশা নিয়ে বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে যায়।ঐ-মুহূর্তের সংলাপ :

> অশোক : যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে সজ্ঞানে তার দেশকে বিকিয়ে দিয়েছে একথা তুমি বিশ্বাস কর?
>
> যোগেন :হ্যাঁকরি। শান্তি রায়ের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছি আমরা। তোমার চাইতে তাঁকে আমরা বেশি বিশ্বাস করি।
>
> অশোক:শান্তি রায় তাঁর দলকে রক্ষা করছেন,দেশকে রক্ষা করছেন। তিনি মহান, তিনি বিরাট, আক্রমণের সম্ভাবনাতেই তাঁকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। অশোক চাটুয্যে সেই বিরাট প্রস্তুতির মধ্যে সামান্য একটা বিন্দু মাত্র,একটা জ্যামিতিক বিন্দু। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি একটা পূণাঙ্গ, সম্পুর্ণ মানুষ। তোমাদের গায়ের রক্তে মাংসে আমার দেহ গড়ে ওঠেছে। শান্তি রায়ের কাছে যে মানুষটাকে বোঝা অসম্ভব তেমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না? [এবার বাবা-মা কেউই কোন জবাব দিতে পারেন না।]
>
> আমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরো কাহিনীটা ওদের একটা ভাঁওতা, আমার মন ভেঙে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। এবং ওরা কৃতকার্য যে হয়নি একথা বলতে পারি না। রাতের পর রাত আমার চোখে ঘুম নেই। আমি নিঃসঙ্গ,একা। দিন হলেই এইসব কাপড় জামা পরিয়ে বসিয়ে দেয় জনসন সাহেবের গাড়িতে। কিন্তু কেউ কি জানে তখন আমার পা থাকে সীটের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা? পাশে থাকে সশস্ত্র প্রহরী? তারপর যখন ওরা জানতে পারল আমি দল থেকে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, তখন আমাকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করল। জানে এখন আর আমার যাওয়ার জায়গা নেই। যেখানেই যাই, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই প্রাণভয়ে ভীত মানুষটা পালিয়ে আসবে পুলিশ ক্যাম্পে,কারাগার তার কাছে আশ্রয় এখন। বন্ধুর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় শত্রুর কারাগার।[৩০]

কল্লোল নাটকের সাহসী সৈনিক গানার শার্দুল প্রেমে ও সংগ্রামে অনমনীয়। দীর্ঘ দুবছর পর স্ত্রী লক্ষ্মীর কাছে ফিরে সে জানায় – নাৎসিদের বীভৎস নির্যাতনেও লক্ষ্মীর জন্যে আনা আতরটা সে হাতছাড়া করেনি। কিন্তু যখন জানতে পারে যুদ্ধ শেষ হবার পরও সে না ফেরায় টিকে থাকার প্রয়োজনে লক্ষ্মীকে সুভাষ দেশাইয়ের সঙ্গে থাকতে হয়েছে তখনকার মর্মস্পর্শী সংলাপ :

> সার্দুল ॥ মরে গেছি। (নীরবতা) মরাই দেখছি উচিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষী ॥ ও কথা বলো না, বলো না ও কথা।

সার্দুল ॥ আর কটা মাস অপেক্ষা করতে পারলে না? এত তাড়া কিসের?

সুভাষ ॥ আমরা ভেবেছিলাম এতদিন নিখোঁজ থাকার অর্থ– একটাই হতে পারে।

সার্দুল ॥ (চিৎকার করে) কিন্তু আমি মরিনি– বেঁচে আছি। দিনের পর দিন জর্মন বন্দীশিবিরে গরম লোহার ছ্যাঁকা খেয়েও বেঁচে আছি। ঐ শীতে শুধু জল আর রুটি খেয়ে বেঁচে থেকেছি। কেমন করে জানেন? একটা মুখ চোখের সামনে ভেসেছে বলে। প্রাণভরে শুধু সেই মুখটাকে দেখেছি বলে। এমন করে ভালবাসতে জানেন আপনি ?[৩১]

লক্ষ্মী জানায়, সুভাষের কোন দোষ নেই; সুভাষ তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, ইজ্জত বাঁচিয়েছে। সুভাষ সার্দুলকে জানায় লক্ষ্মী সার্দুলকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসে না, বাসতেও পারবে না। তাই সার্দুল এখন ফিরে আসায় সুভাষ সরে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু সার্দুল বলে 'লক্ষ্মীকে কি আপনি পণ্য ভেবেছেন? যখন খুশি হাত বদল করলেই হয়?' এই পরিস্থিতিতে লক্ষ্মীর মানসিক অবস্থার টানাপোড়েনের চিত্র চমৎকার সংলাপে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার :

লক্ষ্মী ॥ শোন,ক্ষমা করে যাও। ও যা বলছে তাই ঠিক। তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসি না। অথচ তোমাকে হারালাম। আবার তোমাকেই ভালবাসি বলে অমন একজন মহৎ মানুষের মনে ব্যথা দিচ্ছি দিনরাত। আমি কী করবো? আমার দিন-রাত্রি বিষিয়ে যাচ্ছে। কী করবো আমি?[৩২]

মানুষের অধিকারে নাটকের সংলাপ যেমন কাব্যময় তেমনি যুক্তিময়; হৃদয়স্পর্শী।

স্টিভ ॥ বোনটির আমার অল্প বয়স– ভেবেছিলাম আমেরিকার উদার রাত্রি তার গায়ে দেবো জড়িয়ে। নিউইয়র্কের নিয়নবাতি দিয়ে গড়ে দেবো তার মুকুট! আমেরিকার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দিয়ে বাজাবো দামামা,– তারপর সেটাকে রেকর্ড করিয়ে– ভেবেছিলাম আমার বোনের হাত ধরে নাচবো তার তালে তালে – লেনকস্ এভিন্যুর ওপর। তুমি তাকে ধর্ষণ করেছো সৈনিক।...

ব্র্যান ॥ ক্ষমা করে দাও স্টিভ! লোকে বলে নিগ্রো যখন কাঁদে, সে কান্নাও গান হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি প্রকৃতির উষাকালে – ধমনীর রক্তপ্রবাহের চেয়ে পুরাতন নদ-নদী। আমার আত্মা আজ নদীর চেয়েও গভীর! আমি স্নান করেছি ইউফ্রেটিস নদীতে– পৃথিবীর নবীন প্রদোষে! কঙ্গো নদের তীরে বেঁধেছি কুটির– সে নদীর কল্লোল ঘুম পাড়িয়েছে আমায়।নাইল নদের তীরে এই পেশল হাতে গড়েছি পিরামিড। অর্বাচীন এই শেতাঙ্গকে অঙ্গুলি হেলনে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাই চলো।[৩৩]

নাটকের শেষাংশে পৃথিবীখ্যাত আইনজ্ঞ লিবোভিট্স কালো হে উড প্যাটারসনকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হলেও, শুধু কালো হওয়ার অপরাধে হত্যা করতে উদ্যত হলে, লিবোভিটস্-এর সংলাপ পাঠক-দর্শককে সচকিত করে তোলে :

লিবোভিটস্ ॥The white man is not free as long as his black brother is in chains! ঐ পিটারসন– বালক মাত্র– ওকে এটর্নি জেনারেল বলছেন নিগার। আমি ওর দিকে তাকিয়ে কি দেখছি

> জানে দেখছি He is a black brother is in chains! আমার কালো ভাই, কে যেন তাকে শিকল পরিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে যদি হত্যা করেন, তবে হত্যা করবেনএকটা আদর্শকে একটা স্বপ্নকে। ওকে যদি মুক্ত না করেন তবে এ-দেশের সমস্ত মানুষ এই এলবামা থেকে পেনসিলভেনিয়া পর্যন্তবন্দী হয়ে পড়বে।...ভদ্রমহোদয়গণ, ভিক্টোরিয়াকে এগারোবার আমরা মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন করেছি, আরো দরকার আছে? ভিকটোরিয়া শ্বেতকায় আর প্যাটারসন কৃষ্ণকায়,এই ত এখন সরকারের একমাত্র যুক্তি, একমাত্র অস্ত্র? ভদ্রমহোদয়গণ এটাই হল জগতের সবচেয়ে ঘৃণ্য জঘন্য অস্ত্র– জাতি-বিদ্বেষ। বর্ণবিদ্বেষ। মিনতি করছি প্যাটারসনের ভাগ্য নির্ধারণ করার সময়ে বর্ণবিদ্বেষ মন থেকে মুছে ফেলে তবে রায় দেবেন।...আপনারা বিচার করুন কিন্তু মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবেন না।[৩৪]

এতকিছুর পরও প্যাটারসনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘোষণা দিলে প্যাটারসন মাকে সান্তনা দিয়ে বলে– 'কেঁদোনা মা, চোখের জলে ওদের পাষাণ হৃদয় গলবে না,যেদিন আমার সাথীদের হাতে উঠবে রাইফেল।সেদিন বেঁচে উঠবো আমি আবার।' নাটকের পরিশিষ্টে স্টিভের কণ্ঠে আবারও ধ্বনিত হয় আশাবাদ :

> স্টিভ ॥ হে কৃষ্ণবর্ণ চারণকবি। নতুন গান গেয়ে শোনাও আমায়। সে গানে থাকে যেন মেঘের গর্জন আর বিদ্যুত– সে গানে থাকে যেন দর্পিত খুনীদের প্রতি যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ। গান গাও বলিষ্ঠ মানুষের বলিষ্ঠতর ইতিহাস নিয়ে যৌবনের সূর্য অভিযান আর সশস্ত্র নিগ্রো কৃষকদের ব্যারিকেড যেন হয় সে গানের ছন্দ আর লয়। সে গানে চাই না শুনতে শাশ্বত শান্তির বাণী। দোহাই তোমার–চাই না খ্রীষ্টান কবরের শান্তি! আমাকে শোনাও মুক্তি ক্ষুধায় অধীর সেইসব কালো মানুষের গান– যারা চায় মুক্তির যুদ্ধ![৩৫]

ব্যারিকেড নাটকে য়োশেফ ৎসাউরিৎস-এর স্ত্রী ইংগেবর ছেলের কমিউনিস্ট পার্টিকে তার স্বামীর হত্যার জন্য দায়ী করলে ছেলে পাউল জানায় –'কমিউনিস্টরা গুম খুন করে না'; কিন্তু নাৎসী দালাল, গুণ্ডা মাইসার যে তাদের পাঁচজন কমরেডকে খুন করেছে তাকে খুন করার কথা পাউল মায়ের কাছে কবুল করে মাকে জানায় :

> পাউল ॥ সে নাৎসীদের দলে ভিড়েছিল।
> ইংগে ॥ পেটের জ্বালায়। যাক গুম-খুন যে তোমরা করো,সেটা কবুল হ'ল।
> পাউল ॥ প্রয়োজনে করি, কিন্তু সেটা আমাদের নীতি নয়।
> ইংগে ॥ প্রয়োজন আর নীতির মধ্যে এমন বিরোধ তোমাদের?
> পাউল ॥ মা, তুমি ধর্মভীরু ক্যাথলিক। আমার কথা কি করে বুঝবে? তুমি যে বিশ্বাস করো জীবন পরম এবং পবিত্র।
> ইংগে ॥ তোমরা বুঝি জীবনকে পবিত্র বল না?
> পাউল ॥ পরম বা চরম বলে কিছু নেই, পৃথিবীর সংঘর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো পবিত্রতা নেই। জীবনকে শ্রেণিসংগ্রাম থেকে আলাদা করে আমরা দেখি না। একটা যুদ্ধ চলছে। এ-যুদ্ধে মালিক যখন শ্রমিককে খুন করায় সেটা অপরাধ। কিন্তু শ্রমিক যখন তিনশ বছরের শোষণের জবাবে মালিকের পোষা গুণ্ডাকে হত্যা করে, সেটা আত্মরক্ষা, সেটা ন্যায় বিচার। জীবন পবিত্র কিনা, তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হ'ল কে কার জীবন নিচ্ছে।[৩৬]

টিনের তলোয়ার নাটকে ঘষে-মেজে তিলে-তিলে বিশ্বকর্মা কাপ্তেন বেণীমাধব যে-ময়নাকে গড়ে তুলেছেন, যে-ময়না তার মেয়ের চেয়ে অধিক কিছু, সেই ময়নাকে তার মতামতের তোয়াক্কা না করে, থিয়েটারের স্বার্থে, বীরকৃষ্ণর রক্ষিতা হিসেবে পাঠাতে বেণীর দ্বিধা হয় না। এ-সময়ে ময়নার সংলাপ :

Dhaka University Institutional Repository

ময়না ॥ভিখিরি যখন ছিলাম,তখন তরকারি বেচে পেট চালাতাম। এখন এমন ভদ্রমহিলা বানিয়েছ,বাবু, যে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর পথ নেই! কেন তুলে এনেছিলে রাস্তা থেকে ? জবাব দাও। কেন রাস্তা থেকে তুলে এনে আমায় এ অপমান করলে?...যখন রাস্তায় আলু বেচতাম, তখন কারুও সাহস হয়নি আমাকে জিগ্যেস পর্যন্তনা করে আমাকে দোকানের পসরা করে দেবে। ...সাহস হয়নি পুতুলের মতন আমায় হাটে নিয়ে গিয়ে এমন বেচাকেনা করবে।

প্রিয়নাথ এ-প্রসঙ্গে সতীত্বকে বাজি রেখে পাশা খেলার প্রসঙ্গ তুললে বেণীর উত্তর :

বেণী ॥সতীত্ব ! সেটা একটা কুসংস্কার। যতই সাহেবি পোশাক পরো না কেন, প্রিয়নাথ মল্লিক, আসলে তোমার মনটা পড়ে আছে হিন্দুয়ানির আস্তাকুঁড়ে! সতীত্ব-টতীত্ব আমি মানি না। এ-কালে আর সীতা সাবিত্রীর দরকার নেই।...থিয়েটারের জন্য সব করতে পারি,করে এসেছি, করে যাবো।

এ-অবস্থায় বসুন্ধরা ময়নাকে দল ছেড়ে চলে যেতে বললে ময়না জানায় :

ময়না ॥ কোথায় যাবো? আর তো তরকারির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাজারে গিয়ে বসতে পারবো না! এমন ভদ্রমহিলা বানিয়েছ যে খেটে খাওয়ার উপায় পর্যন্তহারিয়ে ফেলেছি। ... দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি। সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে ওঠেছি এখানে, গায়ে ওঠেছে গয়না, পায়ের কাছে হাতজোড় করে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে কলকেতার বড়লোকের দল। আবার ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে গেরস্ত ঘরে ঝি-গিরি আমি করতে পারবো না।[৩৭]

দুঃস্বপ্নের নগরী নাটকে কলকাতার দুঃসময়-চিত্র তুলে ধরতে ব্যঙ্গ-কাব্যের সংলাপ :

মৃগাঙ্ক ॥ তা স্বপন,মুস্তাফা আর অন্যান্য মাল
ও পাড়ায় কি করে কাটল খাল?
চিন্ময়বাবুর লোকেরা নাকি ওপাড়াকে করেছেন মুক্ত?
তাহলে কি করে ঘটল ঘটনা উপরি-উক্ত?
লক্ষণ ॥ সেটাই আমার প্রশ্ন? জলের ন্যায় পয়সা খরচ
করিয়া যে মাস্তানের দলকে করিলাম নিযুক্ত,
পুলিশ ও সি-আর-পির যুক্ত পাহারায় যাহাদের করিলাম মোতায়েন,
তাহারাও কি প্যান্ট খুলিয়া করিয়াছে পলায়ন?
চিন্ময় ॥ ট্রাবল, ট্রাবল দেখা দিয়েছে। মণিভূষণ দিচ্ছে ব্যাগড়া–
তাই নানাবিধ ফ্যাকড়া।
লক্ষণ ॥ সেকি? মণিভূষণ মিত্র তো আপনার দক্ষিণ হস্ত!
চিন্ময় ॥ তার কাছেই হচ্ছি পর্যুদস্ত!
মৃগাঙ্ক ॥ ফ্র্যাংকেনস্টাইন!
নিজের হাতে গড়া দানব
এখন কি হতে চায় মানব?
ঘুরে বুঝি ধরতে চায় আপনারই টুটি?
গোবিন্দ॥ পোষা ষাঁড় বুঝি আর মানছে না খুঁটি?[৩৮]

মহাবিদ্রোহ নাটকে লছমন সিং ইংরেজদের চেয়ে বড় শত্রু মনে করে আমীর বানিয়ার দলকে। তাই সে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরে ওদের গলা কেটে মুণ্ড কেটে পোলো খেলা উচিত বলে মনে করলে হীরা সিং-এর অসাধারণ সংলাপ:

> তুমি একটা রক্তপিপাসু হিংস্র জানোয়ার। গলা কাটা আর মুণ্ড কাটার জন্য এ লড়াই নয়।মারতে বাধ্য হলে আমরা নিশ্চয়ই মারব,কিন্তু রক্তপাত নিয়ে গর্ব করে ফিরিঙ্গি ফৌজ,ওটা হিন্দুস্তানের ধাতে নেই। আমরা লড়ছি একটা আদর্শ নিয়ে, একটা স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নকে তুমি নিছক রক্তের হোলি খেলায় টেনে নামিয়ে আনছ। তোমার কোনো বিশ্বাস নেই, দেশের প্রতি কোন টান নেই,এ মাটিতে মিশে থাকা মহত্ত্বের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। এইসব মহান মানুষগুলোর জন্য কোন ভালবাসা নেই তোমার অন্তরে। তোমার কোনো শিকড় নেই, মাটির রস কি করে আসবে ও-বুকে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তোমাকে শিকল এঁটে বন্দী করে রাখি, কারণ স্বাধীনতার লড়াইয়ে তুমি শুধু লড়াইটা দেখ স্বাধীনতাটা দেখতে পাও না।[৩৯]

এই দেশপ্রেমিক হীরা সিংকে আমীররা ষড়যন্ত্র করে, বেঈমান বানিয়ে, ফাঁসি দিলে লছমন সিংয়ের সংলাপ:

> লছমন ॥এখানে এতজন ছিলে, প্রত্যেকের হাতে বন্দুক – কেউ বন্দুক তুললে না। আমীরদের ভয়ে। সে ভয় বহু শতাব্দীর ভয়। দুটো লড়াই চলছে–আমাদের সঙ্গে গোরার আর আমাদের সঙ্গে আমীরদের। সেটা না বুঝলে কিছুই বুঝলে না। তোমাদের সামনেও শত্রু,পিছনেও শত্রু।হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে মরছ আর পেছন থেকে চশমখোর আমীর আর বানিয়ার দল ছুরি চালাচ্ছে।[৪০]

যুদ্ধং দেহি নাটকে মগধের মহানায়ক ও সাঙ্গপাঙ্গদের চক্রান্তে যখন বেঙা, তাড়ি, শঙ্খ, ঘটু, অশ্বিনদের বন্দি করে হুনবন্দি হিসেবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়, সে-সময়ের সংলাপ :

> বেঙা ॥ যেই খেতে বসলি, অমনি বুঝলাম হয়ে গেছে।
> শঙ্খ ॥ভুল হয়েছে ...হোক...পরের বার আর হবে না ... আমাদের পরে আসবে যারা ... তারা ভুল করবে কেন?
> [শম্পা আসিয়া দাঁড়ায়, কোলে শিশু।] ....ভবিষ্যৎ– ! যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই বৌদ্ধ শ্রমণ– সে ভবিষ্যৎ ঐ যে ! গীতায় ভবিষ্যৎ ! গীতায় শ্রী ভগবান বলেছেন, অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যর্থার্হতঃ! সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে অন্ন বিভাগ করাই ধর্ম। সেটা বাস্তবে নেই–কিন্তু তাই বলে সেটা স্বপ্নমাত্র নয়। সেটাই মানবজাতির অনিবার্য ভবিষ্যৎ ![৪১]

এবার রাজার পালা রাজনৈতিক স্যাটায়ার। এ-নাটকের শুরুতেই বিপ্লবী ভীষ্মলোচন ত্রিবিদ সিংহের তাড়া খেয়ে বন্ধুদের আশ্রয় চায়, ঐ সময়ের সংলাপ :

> ভীষ্ম॥ থাকতে যদি না দেন আবার মাঠের পথ ধরছি, কিন্তু আমার বাঁচাটা দরকার ছিল গো বাবু, এ-তল্লাটের চাষীদের জন্যে দরকার ছিল।
> বঙ্কু ॥ আপনি কোথাও যাচ্ছেন না, বসুন এখানে।
> চন্দ্র ॥ কর কি, কর কি বঙ্কু? ত্রিবিদ সিংহ যে পিটিয়ে আমাদের আমসত্ত্ব করে দেবে !
> বঙ্কু ॥ দূর হও,অপসৃত হও, চক্ষের সম্মুখ হতে,দুরাচার। ভীষ্মলোচন দাস জমিদারের গলার কাঁটা,পেটের অম্লশূল, চোখের বালি। তাই সে আমাদের আপনজন। ভূতের বালাই যেমন রাম, পতির বালাই দুষ্টা নারী, সতীর বালাই বেশ্যা, ভিখিরির বালাই লজ্জা–তারপর– ইয়ে– ব্যাঙের বালাই সাপ, বংশের বালাই কুপুত্র– ...কংসের

বালাই কৃষ্ণ, যোদ্ধার বালাই ভয়, ইংরেজের বালাই ম্যালেরিয়া, জ্বরের বালাই বৈদ্য, ঘরের বালাই যেমন উই– তেমনি ত্রিবিদ সিংহের বালাই এই ভীষ্মলোচন দাস। এ এখানেই থাকবে।[৪২]

একলা চলো রে নাটকে যখন অঘোর রায়ের গুণ্ডারা গোলাম নবী ও তার স্ত্রী ফাতেমাকে ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করছে তখন যোগমায়ার সংলাপ:

যোগমায়া ॥ স্বাধীনতার অভিষেক! স্বাধীনতা এসেছে দেশে। এই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিলে তোমরা? হ্যাঁ গো! এই স্বাধীনতার জন্য তোমার বড় ছেলে গলায় ফাঁসির দড়ি পরেছিল ? তোমার ছোট ছেলে দ্বীপান্তরে গিয়েছিল? তুমি এই করলে? তোমার ছেলেদের প্রাণ যাঁরা বাঁচিয়েছিল তাদের রক্তে তোমার ঘরের অঙ্গন নিকোলে?[৪২]

নাটকের শেষ প্রান্তে এসে গান্ধীর অনুসারী অনাথবাবুদের মত সৎ,ত্যাগী,নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মীদের উপলব্ধি :

অনাথ ॥সারা জীবন বাপুজীর পেছনে ছুটে এ কোথায় এসে পৌঁছলাম ? বাপুজী আমাদের কোথায় নিয়ে এলেন ? নিজের রক্ত দিয়েও তো বাপুজী পারলেন না ঘটনাস্রোত রুখতে! তাহলে ? তাহলে বাপুজীর পথ কি আগাগোড়া ভুল ছিল? নইলে কংগ্রেস এইরকম দানবীয় একটা শক্তিতে পরিণত হয়?[৪৪]

তিতুমীর নাটকে উৎপল দত্ত তিতুমীরকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কৃষক সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ-নাটকেআছে তিতুসহ বেশকিছু মুসলিম চরিত্র।এ-নাটকের সংলাপ নির্মাণে উৎপলের সতর্কতা লক্ষণীয় :

মিসকিন॥যে কোন জেহাদে চাই হুকুমৎ,রিয়াসত– একটা সরকার– যে হবে দেশের ইনসানের মনের ইচ্ছা, তার মনের কথার প্রতিধ্বনি, তার ইমান-ইজ্জত হকিকতের প্রহরী। তাই এই তরবারির জোরে আমরা ঘোষণা করছি– আজ থেকে সুবে বাংলায় ফিরিঙ্গিশাহী আর নেই, আমরাই হচ্ছি সরকার, আমরাই শাহী সুলতানিয়ৎ,আমরাই একমাত্র শাসনকর্তা।[৪৫]

উৎপলের নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার নিয়ে আলোচনায় আমাদের মনে রাখা দরকার প্রথমত, সঙ্গীত উৎপলের আগ্রহের এক প্রধান এলাকা। বাড়িতে শৈশব থেকেই গান শুনে শুনে কান অভ্যস্ত হয়েছে, মন তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। দ্বিতীয়ত, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে পাণ্ডিত্য যুক্ত হয়ে তা পৌঁছে গেছে বিশেষ স্বরগ্রামে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতে উৎপলের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং এর প্রভাব তাঁর থিয়েটারকে যে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য।নাটকে একটা বিশেষ মুহূর্ত আসে যখন আর কথায় কুলায় না। তখনই নাটকে গানের সুর উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এটাকে আবহসংগীত বলে মানেননি উৎপল। তিনি মনে করেন আবহসংগীত অন্য জিনিস, সেটা ভাষাহীন, স্বাতন্ত্র্যহীন সেটা একান্তভাবেই নাটকের অঙ্গ। *অঙ্গার*-এর সঙ্গীত সম্পর্কে উৎপল জানিয়েছেন :

'অঙ্গার'-এ জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্যে পুরো অর্কেস্ট্রার স্থান দখল করেছে একটি সেতারের ঝালা– সেটিকে তখন যর্থার্থ জলের তোড় মনে হয়েছে বলেই তা সার্থক। আবার প্রথম দৃশ্যের শেষে সনাতনের 'জান বাঁচাও' চিৎকার থেকে ধরে নিয়ে যে

সংগীতাংশটি, তা খাঁটি ইয়োরোপীয় রীতিতে সৃষ্ট; কিন্তু নাটকে ওই মুহূর্তটিকে অকস্মাৎ বিরাট বৃহৎ করে তুলেছে বলে ও-টিও সার্থক।[৪৬]

মানুষের অধিকারে নাটকে আফ্রো-মার্কিন সংগীত ব্যবহার করেছেন বলে উৎপল দত্ত জানিয়েছেন।

> 'ফেরারী ফৌজ'-এর আবহ সংগীতে যোগ, নায়কি, কানাড়া প্রভৃতি ব্যবহার হয়েছে; অথচ বারবার সব নিয়ম লঙ্ঘন করে কাউন্টারপয়েন্ট গর্জন করে ওঠেছে, যোগরাগ হঠাৎ মালকোষের দিকে ছুট দিয়েছে, নানা যন্ত্রের নির্ঘোষ হঠাৎ মূল সুরটিকে চেপে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে 'ফেরারী ফৌজ'-এর উদ্দাম বিপ্লবীদের জীবন ওই রকমই হয়। সেই বাঁধনছেঁড়া জীবনকে প্রকৃত রূপই দিয়েছেন রবিশঙ্কর।[৪৭]

ব্যারিকেড নাটকে সংগীতের ব্যবহার নাটকটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে :

> ব্যারিকেড নাটকে আমরা সেই নীতি অনুসরণ করেছি যা মঞ্চের আবহসঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য – অর্থাৎ তার নিজের কোনো চেহারা নেই,নিজের কোনো নিটোল পূর্ণতা নেই, দৃশ্যমান অভিনয়টা বাদ দিলেও সঙ্গীতের অন্য মানে দাঁড়াবে। মঞ্চের সঙ্গীত একটা ডায়ালেকটিক্যাল ব্যাপার : অ+ই যেখানে = ঈ; অ-এর এক সত্তা, ই-এর আর এক; দুটোকে যোগ করলে তৃতীয় এক আইডিয়া ঈ-এর জন্ম হয়। থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসে সিনথেসিসের উদ্ভব হয়।[৪৮]

এই থিয়োরির দ্বান্দ্বিক প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেছেন তিনি :

> প্রথম মাইমের গোড়ায় ভেইয়ানভসকি ও সেরেনেড, যেটি বাস্তবে প্রকৃতির বর্ণনা,কিন্তু নাচ ও সেরেনেড একসঙ্গে দর্শকের চক্ষু ও কর্ণকে আঘাত করলে ওটাকে বার্লিনের মুক্তির স্বপ্ন বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়... আদালত দৃশ্য যখন শেষ হয় তখন ঘোষক অ্যনেলীজে টাউসিগ চেচাঁয়–'কমিউনিস্টদের রাজনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত'–তখন সংগীত বেজে ওঠে, পঞ্চম সিম্ফনীর একাংশ, যেটি আদতে ছিল হাস্যরসাত্মক, কমিক মিউজিক, কিন্তু মঞ্চভর্তি স্থানুবৎ দাঁড়ানো মানুষ, অ্যানেলীজের চিৎকার,সদ্যসমাপ্ত বিচার দৃশ্য– এ সবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কমিক মিউজিক হরর-এ পরিণত হয়,ভয়ের সঞ্চার করে। আবার ইংগে যেখানে আদালতে প্রবেশ করেন সেখানে আমরা প্রোকোফিয়েভের যে টুকরোটা বাজাই সেটা আদতে ছিল আনন্দসংগীত কিন্তু এখানে সেটা নানা সংশয়পূর্ণ এক থমথমে ভাবের সৃষ্টি করে।এমনকী ইংগে যখন হুটিগ-কে খুনী হিসেবে শনাক্ত করেন, যে টুকরো বাজে আলাদাভাবে সেটা শুনলে আনন্দের তুর্যধ্বনি। কিন্তু ওই বিশেষ মুহূর্তের সঙ্গে মিশে সে এক সর্বনাশের সংকেত। এটাই নাট্যসংগীতের স্বভাব,বৈপরীত্যেই লুকিয়ে আছে নাটকের সংগীতের প্রাণ। উল্টো গাইলেই এখানে সবচেয়ে ভালো গাওয়া হয়। এখানে ধান ভানতে শিবের গীতই শ্রেষ্ঠ গীত, নইলে করুণ মুহূর্তে বেহালা আর প্রবল মুহূর্তে হুঙ্কার– এ তো ছেলেমানুষী, দর্শককে প্রভাবিত করতে পারে না।[৪৯]

আদর্শ থিয়েটারের আবহ-সংগীত প্রসঙ্গে শেকস্পিয়ারের *এ মিডসামার নাইটস ড্রিম* নাটকের প্রসঙ্গে উৎপল বলেছেন :

> বিশ্বে শ্রেষ্ঠ সংগীত সৃষ্টি করেছেন বোধ হয় ফিলিপ মেন্ডেলসন। 'এ মিডসামার নাইটস ড্রিম' নাটকের অভিনয় হচ্ছিলো জার্মেনীর ড্রেসডেন শহরে, সেই ১৮৪২ সালে। কিন্তু আমি এটি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যদি কেউ এই মিউজিক

> শোনে, তার মাথায় যদি নাটকটা না থাকে তাহলে সে পুরো মিউজিকটা উপভোগ করতে পারবে না। কারণ সঙ্গীতটা একান্তভাবেই নাটকটার উপর নির্ভরশীল।... দুটো এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে শেকস্‌পিয়ারের নাটকটা ভালোভাবে পড়া না থাকলে চোখের সামনে না ভাসলে মিউজিকটা পুরোপুরি বুঝতেই পারবে না কেউ। এই হল আদর্শ থিয়েটারের মিউজিক।[৫০]

প্রফেসর মামলক নাটকে সংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে উৎপল বলেছেন, 'সংগীতের ব্যবহারে আমরা সফল কিছু পরীক্ষা চালাই। দৃশ্যের যা মূল সুর তার সম্পূর্ণ বিপরীত সুরের সংগীত ব্যবহার করি। বিশেষত মামলকের করুণ আত্মহত্যার সঙ্গে পল রোবসনের ওয়ারস ইহুদী বিদ্রোহের বলিষ্ঠ আশাবাদী গান একটা আকর্ষণীয় বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।'[৫১]

স্তালিন ১৯৩৪ নাটকে সংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে উৎপল বলেছেন :

> একই নাটকে ইন্ডিয়ান মিউজিক,ওয়েস্টার্ণ মিউজিকসব মিশিয়ে ফেলতে আমার একটুও বাধে না। ... আমরা স্তালিন/১৯৩৪ বলে একটা প্লে করেছিলাম। তাতে আমরা ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক দিয়ে শুরু করে অবলীলাক্রমে 'স্যাটারডে নাইট ফিভার'-এ ফিরে গিয়েছিলাম।আবার ফিরে গেছি ক্ল্যাসিক্যালে। আবার ফিরে এসেছি স্যাটারডে নাইট ফিভারে এবং রক মিউজিক ইউজ করেছি। এতে কোনো কোনো ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন চিঠি লিখে, কানে ভীষণ খারাপও লাগে; এসব সস্তা সংগীত। কনসার্ট হলে এটা সস্তা; থিয়েটারে নয়। থিয়েটারে আমাদের দেখতে হবে জাস্ট কী এফেক্ট হচ্ছে, নাটকটার– অর্থাৎ দৃশ্যের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? আমরা 'স্যাটারডে নাইট ফিভার' ইউজ করেছিলাম চার্চিলের সঙ্গে – চার্চিল হাঁটছে – তার সঙ্গে 'স্যাটারডে নাইট ফিভার'-এর রক মিউজিক। চার্চিল হাতে চুরুট নিয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে যাচ্ছে নানাবিধ সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসা করে– তার বক্তব্য হচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ছমাসের মধ্যে কোলাপস্ করবে। তখন তাকে সাংবাদিক বলছে–ছমাসের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোলাপস্ করবে আপনি তো এই একটা কথা বলে আসছেন মশাই সেই ১৯১৭ সাল থেকে। আর এটা তো ১৯৩৪।'তাই তো' বলে 'ভদ্রলোকের এক কথা' –এই বলে চার্চিল রওনা হয়। তখন তো স্যাটারডে নাইট ফিভারের মিউজিকই বাজবে তো, নাকি বেঠোফেন বাজবে।[৫২]

উৎপল দত্ত যেহেতু নিজেই নাটক লিখেছেন, নাটকে নির্দেশনা দিয়েছেন,অভিনয় করেছেন, পরিচালনা করেছেন; তাই তিনি তাঁর নাটকের বিষয় ও লক্ষ্যানুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণ করে নেবার সুযোগ নিয়েছেন। একটি সুনির্দিষ্ট, বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় উৎপল দত্ততাঁর নাটকে এমনসব আঙ্গিকের ব্যবহার করেছেন যাতে তাঁর আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। অভিনয়,দৃশ্যসজ্জা,আলোকসম্পাত,আবহসংগীত, টিমওয়ার্ক – সবকিছুরসমন্বিত সারকেই যেহেতু নাটকের আঙ্গিক বলে বুঝতেন তিনি;তাই তাঁর নাটকেএর প্রতিটি দিক খুব সযত্নে অনুশীলিত হতো। রাজনৈতিক নাট্যকার উৎপল দত্ত যেহেতু মার্কসবাদে আস্থাশীল সেহেতু বিষয়-আঙ্গিক সর্বত্রই তিনি এই তত্ত্বের রূপায়ণে তৎপর থেকে বাংলা নাটককে রেভ্যুলিউশনারি থিয়েটারে উন্নীত করতে সর্বাত্নক চেষ্টা করেছেন। প্রথাগত কোনো নাট্য-আঙ্গিকে তাঁর আস্থা যেমন ছিল না, তেমনি কোনো নাট্যাদর্শের প্রতি স্পষ্ট বিরোধও তিনি পোষণ করেননি। সুনির্দিষ্ট কোন নাট্য-মতবাদের অনুসারী-অনুকারী হতে চাননি তিনি। তাঁর অসংখ্য নাটক ও নাটকের প্রযোজনায় উৎপল একটি জায়গাতেই কখনো আপস করেননি. আর তা হল :

দর্শকের কাছে পৌঁছুনো। দর্শকই ছিল তাঁর গন্তব্য। এই দর্শক কেতাদুরস্ত নাগরিক হতে শুরু করে বস্তিবাসী কুলি-মজুর। নানা বর্গ-বর্ণ, শ্রেণির মানুষের কাছে নানা ভাষ্য নিয়ে উৎপল উপস্থিত হয়েছেন। যখন, যে-নাটকে, তাঁকে যে-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ঐ-নাটকের দর্শকের কাছে পৌঁছুনো যাবে বলে তিনি মনে করেছেন – ঐ-নাটকের জন্যে তাই ছিল তাঁর শ্রেয় আঙ্গিক। জীবনে, জীবনের লক্ষ্যে, শিল্পের লক্ষ্যে তিনি ঘোর মতবাদী ছিলেন। কিন্তু শিল্পনির্মাণে মতবাদী শিল্পীর ভূমিকায় হাঁটেন নি। তবে, একটি কথা না বললে শেষ নয়, রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও জাতীয় নাট্য-আঙ্গিকের কথা ভেবেছিলেন। বাংলার মাটিমূল থেকে ওঠে আসা নিজস্ব নাট্য-আঙ্গিক। এবং সে-আঙ্গিক যাত্রার প্রাণরস থেকে উৎসারিত হবার সম্ভাবনা বলে তিনি মেনেছেন। তাই তিনি প্রসেনিয়াম থিয়েটারও যাত্রার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন।

তথ্য নির্দেশঃ

১.উৎপল দত্ত,যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সব ভুল(সুরজিৎ ঘোষের নেয়া একটি সাক্ষাৎকার), *দেশ*,কলকাতা, ৩০.০৩.১৯৯১

২.উৎপল দত্ত,*গদ্য সংগ্রহ*,(প্রথম খণ্ড),কলকাতা,১৯৯৮, দে'জ পাবলিশিং,পৃ.২৭৪

৩.পূর্বোক্ত,পৃ.২৭৮

৪.পূর্বোক্ত,পৃ.২৭৭

৫.দর্শন চৌধুরী,*থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত*, কলকাতা, ২০০৭, সাহিত্যপ্রকাশ, পৃ.১৮২

৬.পূর্বোক্ত,পৃ.১৮২

৭.পূর্বোক্ত,উৎপল দত্ত,*গদ্য সংগ্রহ*,পৃ. ২৮৩

৮.'আঙ্গিক আকাশ থেকে পড়ে না ভগবানও তাকে ছুঁড়ে দেন না। প্রতি দেশে প্রতি যুগে থিয়েটারের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক কলা গড়ে ওঠেছে' ।[৩] পূর্বোক্ত,উৎপল দত্ত,*গদ্য সংগ্রহ*, চায়ের ধোঁয়া, পৃ. ৬৯

৯.উৎপল দত্ত,*গদ্যসংগ্রহ* প্রথম খণ্ড,পৃ.৭০

১০.পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯৫

১১.পূর্বোক্ত,পৃ.৭৩

১২. পৃ.৭৮ পূর্বোক্ত

১৩.উৎপলদত্ত,বিদ্রোহের নাটক,*উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন*,(নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত) উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি,কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ,পৃ.৯৪

১৪.নৃপেন্দ্র সাহা,বাংলার রাজনৈতিক নাটক ও উৎপল দত্ত,পূর্বোক্ত,পৃ.১৯০

১৫.উৎপল দত্ত, *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*,২০০৫,নাট্যচিন্তা, পৃ.১৬

১৬.উৎপল দত্ত,রাজনৈতিক থিয়েটার ও সাধারণ দর্শক,*পশ্চিমবঙ্গ*, উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা,কলকাতা,১৪০৮,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার,পৃ. ৫৬

১৭.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৯

১৮.পূর্বোক্ত,পৃ.৫৯

১৯.পূর্বোক্ত,পৃ.৬০

২০. উৎপল দত্ত,*আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*,পূর্বোক্ত,পৃ.২৮

২১. উৎপল দত্ত,*গদ্যসংগ্রহ*প্রথম খণ্ড,পৃ.৩৮৭

২২. পূর্বোক্ত,পৃ.৩৮৭

২৩.দর্শন চৌধুরী, *থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত*,পৃ. ৪৭

২৪. উৎপল দত্ত,*আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*,পূর্বোক্ত,পৃ.২৮

২৫.পূর্বোক্ত,পৃ.৪০

২৬.পূর্বোক্ত,*থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত*,পৃ.১৬৬

২৭.উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*,ষষ্ঠ খণ্ড,কলকাতা,১৪০৫,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিঃপৃ.৬৫৩-৫৪

২৮.শোভা সেন, পূর্বোক্ত,পৃ.১১৩-১৪

২৯.উৎপল দত্ত,*নাটক সমগ্র*,প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪,পৃ.১৪৪

৩০.পূর্বোক্ত,পৃ.২০৮

৩১.পূর্বোক্ত,দ্বিতীয় খণ্ড,পৃ.২৫২-৫৩

৩২.পূর্বোক্ত,পৃ.২৫৩

৩৩.পূর্বোক্ত,পৃ.৭০

৩৪.পূর্বোক্ত,১৩৪-৩৫

৩৫.পূর্বোক্ত,১৩৭

৩৬.পূর্বোক্ত,পঞ্চম খণ্ড,পৃ.২৩৩

৩৭.পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭-২৮
৩৮.পূর্বোক্ত,ষষ্ঠ খণ্ড,পৃ.৮৩
৩৯.পূর্বোক্ত,পঞ্চম খণ্ডপৃ.৩৩২
৪০.পূর্বোক্ত,পৃ.৩৫২
৪১.পূর্বোক্ত,চতুর্থ খণ্ড,পৃ.৩৩৩
৪২.পূর্বোক্ত,ষষ্ঠ খণ্ড,পৃ.২৩৫
৪৩.পূর্বোক্ত,সপ্তম খণ্ড,পৃ.৪০০
৪৪.পূর্বোক্ত,পৃ.৪৩৫
৪৫.পূর্বোক্ত,ষষ্ঠ খণ্ড,পৃ.৩৪১
৪৬.পূর্বোক্ত,*গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড*,পৃ.৯৩
৪৭.পূর্বোক্ত,পৃ.৯৩
৪৮.উৎপল দত্ত,*পশ্চিমবঙ্গ*, পূর্বোক্ত,পৃ. ৬৩
৪৯.পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪
৫০.*উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন*, পূর্বোক্ত,পৃ. ২০৮
৫১.উৎপল দত্ত,*আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
৫২.*উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন*,পূর্বোক্ত**,** পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

অর্ধশতাব্দীব্যাপী নাট্যচর্চায় উৎপল দত্তের অভিনিবেশ ছিল রেভ্যুলিউশনারি থিয়েটারের অভিযাত্রায়। নাট্যজীবনের শুরু থেকেই উৎপল দত্ত শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার, সংগ্রাম ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে তাঁর নাট্যসাধনার মৌলিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কাছের-দূরের গণমানবের সকল সংগ্রামী আন্দোলন ও গণনায়ক তাঁর নাটকের উপজীব্য। আধুনিক নাটকের বিষয় ও রূপরীতির ক্ষেত্রে তাঁর নাটক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। মার্কসীয় তত্ত্বের নাট্যরূপ দেয়ার ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের নাটকবিশিষ্টতাজ্ঞাপকও। উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যসৃজন ও মঞ্চায়নে বিষয়-আঙ্গিক সর্বত্রই মার্কসীয় বিশ্বাসে স্থিত থেকে শতবর্ষের ঐতিহ্য-লালিত বাংলা নাটককে রেভ্যুলিউশনারি(বিপ্লবী) থিয়েটারে উন্নীত করার প্রয়াস পেয়েছেন।চল্লিশের দশকের বাংলানাটকের গণজীবনমূল সংলগ্নতার বহমান নাট্যস্রোত পঞ্চাশ-ষাটের দশকে নতুন মাত্রা লাভ করে। উৎপল দত্ত এই নাট্যস্রোতকে উত্তাল ও কল্লোলিত করেন, এগিয়ে নিয়ে যান অনেকদূর।

উৎপল দত্তের পরিবারে সাংস্কৃতিক আবহ থাকলেও রাজনৈতিক আবহ ছিল বলে জানা যায় না। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের পুত্র উৎপল দত্ত ইংরেজি স্কুল-কলেজ, ইংরেজি মাধ্যমে এবং ইংরেজি-সাহিত্যে অধ্যয়ন করেও সাহেবিপনার দিকে ঝুঁকেননি; ঝুঁকেছেন ভিন্নদিকে – গণমানুষের দিকে। এই ঝোঁকটা পুরোপুরিই উৎপল দত্তের ব্যাপক অধ্যয়ন-ফলশ্রুত; একান্ত আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার ফসল এবং অর্জন।তাত্ত্বিক অধ্যয়ন, নিরন্তর নাট্যচর্চা, জেফ্রি কেন্ডাল ও গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে হাটে-মাঠে-ঘাটে প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার উৎপল দত্তের হয়ে ওঠা। এক যুগাধিক কাল নাট্যাভিনয় এবং নাট্য-পরিচালনার কাজে রত থাকলেও নাটক লেখার কথা তিনি ভাবেননি। টালমাটাল বিপ্লবের কর্কশ হুঙ্কার শুনবার প্রত্যাশী নাট্যকার সমকালীন নাটকের মৃদু প্রগতির ফিসফিসে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি; অনেক খুঁজেও তিনি বা তাঁর দল যে-ধরনের নাটক প্রযোজনা করতে চাইছিলেন তা পাননি। তাই বাধ্য হয়ে নিজেই নাটক লিখতে শুরু করেন এবংবাংলা নাট্যাঙ্গনকে জয় করলেন। একে একে লিখলেন শতাধিক নাটক–হয়ে উঠলেন বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। হয়ে উঠলেনব্রেখ্টের মতো নাট্যতাত্ত্বিক, পিসকাটারের মতো পরিচালক ও প্রযোজক। উৎপল দত্তের নাট্যকার হয়ে ওঠা আমাদেরকে শতবর্ষ আগে বাংলাসাহিত্যের দিকপাল আরেক দত্তের নাট্যকার হয়ে ওঠার কথা মনে করিয়ে দেয়। সৃষ্টিশীলতা,মননশীলতা, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য আর দ্রোহে এই দুই নাট্যকার বাংলা নাটকে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতা লিখলেও নাটক লেখার কথা কখনও ভাবেননি। কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী* নাটকের অভিনয় দেখে তাঁর কাছে ওই নাটককে মনে হয়েছে কুনাট্য। তিনি ব্যথিত মনে লিখেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।[১]

এ-রকম অলীক কুনাট্যে বাংলার মানুষদের মজে থাকা মধুসূদন দত্তকে বিচলিত করে তোলে। তিনি নাটক লিখতে মনস্থ করেন–এবং লিখেন *শর্মিষ্ঠা* নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও উৎপল দত্ত দুজনেই প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে নাটক লিখেছেন। একজন তাঁর কালের 'অলীক কুনাট্য' মানতে পারেননি, অন্যজন 'সমকালীন মৃদু প্রগতির ফিসফিসে' সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। সমকালীন নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও উৎপল দত্তের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি–একজন দেখতে চেয়েছেন কুনাট্যের পরিবর্তে সুনাট্য; অন্যজন মুদু প্রগতির ফিসফিসের পরিবর্তেটালমাটাল বিপ্লবের কর্কশ হুঙ্কার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম নাটক *শর্মিষ্ঠা* লেখেন ১৮৫৮ সালে, উৎপল দত্তের নাটক লেখায় হাতেখড়ি ১৯৫৮ সালে*ছায়ানট*-এরমাধ্যমে। *শর্মিষ্ঠা* আর *ছায়ানট*,মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর উৎপল দত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঠিকএক শতবছর। এই শতবর্ষে বাংলা নাটকের পথ পরিক্রমায় অনেক নাট্যকারের আগমন বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছে –এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলা নাটকে গণমানুষের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে যাঁর নাটকে প্রথম, সেই জনপ্রিয় ও প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের আগমন ঘটেছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরেই।উপেন দাস, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু,দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ নাট্যকারদেরপ্রয়াস বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা-জাগরণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। শিশির ভাদুড়ী, গিরিশ ঘোষ প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব থিয়েটারকে বাবুশ্রেণির হাত থেকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে, বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান ভিন্নমাত্রিক এবং ব্যতিক্রমী। নাট্যনির্মাণে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংএকটি যুগের স্রষ্টা ও ধারক। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়,বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকারের প্রয়াসে বাংলা নাটক অনেকদূর এগিয়েছে। কিন্তু একই সময়ের কবিতা ও কথাসাহিত্যের চিত্র ছিল ভিন্ন;নাটকের তুলনায় কবিতা ও কথাসাহিত্য ছিল অগ্রসর। এই কাল পরিসরের নাটক ত্রিশের দশকের কবিতা ও কথা সাহিত্যের সমান্তরালবর্তী হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের নাট্যকারগণ সমকাল-সংরক্ত, মৃত্তিকাসংলগ্ন, প্রথাবিরোধী এবং বাস্তবের কাছাকাছি। গণমানুষের কাছে পৌঁছুনোর অভিলাষী এ-সময়ের নাট্যকারগণ সমকালকে দেখেছেন ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে। বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়,তুলসী লাহিড়ী,সলিল সেন,ঋত্বিকঘটক প্রমুখ নাট্যকারগণ নবতর জীবনবোধ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বোপরি গণচেতনার যে-ধারা সৃষ্টি করলেন সে-ধারার প্রাগ্রসর উত্তরাধিকার উৎপল দত্ত। কিন্তু উৎপল দত্তের প্রচেষ্টা ও প্রতিভা আরও প্রাগ্রসরতা এবং ব্যাপ্তি চাইছিল। চল্লিশের দশকের বাংলা নাটকের গণচেতনাশ্রয়ী ধারা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এসে নতুন মাত্রা লাভ করে উৎপল দত্তের রাজনৈতিক নাটকের বিশেষ ধারায় সংযুক্তি পেয়ে।

উৎপল দত্ত ছিলেন পড়ুয়া মানুষ;বিপুল তাঁর অধ্যয়ন। নাট্যকার ছাড়াও উৎপল দত্ত অতি জনপ্রিয় অভিনেতা, সফল পরিচালক-প্রযোজক, দক্ষ নাট্যনির্দেশক, বিশিষ্ট গবেষক-তাত্ত্বিক, সুবক্তা এবং বিদগ্ধ সমালোচক ছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুবাদে অধিক পরিচিতি অর্জন করলেও তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রধান এলাকানাটক। কলেজ জীবন থেকেই তিনি নাট্যদল গঠন করেছেন;প্রথমে দ্য অ্যামেচার

শেকসপিয়ারিয়ান্স,পরে লিটল থিয়েটার গ্রুপ(এলটিজি) এবং পিপলস্ লিটল থিয়েটার(পিএলটি)। উৎপল দত্ত একত্রিশটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক,একুশটি যাত্রাপালা,পঁচিশটি পথনাটক,তেইশটি একাঙ্ক নাটকএবং চব্বিশটি রূপান্তরিতনাটক রচনা করেছেন। পরিমাণ বিবেচনায় এই রচনাসম্ভারকে বিপুল বলা যায় অনায়াসেই। এর পাশাপাশি রয়েছে নাটক বিষয়ক বিপুল পরিমাণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সমালোচনা, মন্তব্য-প্রতিবেদন এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থও। রচিত,নির্দেশিত ও পরিচালিত, যে-ধরনের নাটকই হোক না কেন, তাঁর নাট্যসাধনার মর্মবস্তু –সামাজিক জীবনে বঞ্চিত-বিড়ম্বিত-নির্যাতিত গণমানুষের সংগ্রাম, বিদ্রোহ ও বাঁচার লড়াই।

পৃথিবীর কোনকিছুই নির্দ্বন্দ্ব নয়।মানুষের জীবন, সমাজ সবকিছুই নিয়ত সংঘাতময় ও দ্বন্দ্বময়। এই দ্বান্দ্বিক চেতনাবোধমানুষের কাছে পৌঁছানোর দায় থেকেই উৎপল দত্তের নাট্যপ্রয়াস। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তথা মার্কসীয় ডায়লেকটিকস্-এ আস্থাবান উৎপলদত্ত সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে নাটকের মাধ্যমে পাঠক দর্শকের কাছে হাজির করার প্রয়াস পেয়েছেন।শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনকিছুই নিরপেক্ষ নয়, হতে পারে না – হয় তা শোষকের পক্ষে, নয় তা শোষিতের পক্ষে। উৎপল দত্ত তাই শোষিত,নিপীড়িত,নির্যাতিত মানুষের পক্ষে নাটক নিয়েপৌঁছাতে চেয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তাঁর চেতনাকে স্বচ্ছ ও প্রত্যয়দৃঢ় করেছে। উৎপলের কাছে নাটক অবসর যাপন বা শখের বিষয় ছিল না, ছিল শৃঙ্খলা ও প্রত্যয়ের বিষয়। নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার।তাই নাটক রচনা, পরিচালনা,প্রযোজনার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। উৎপল তাঁরTowards A Revolutionary Theatreগ্রন্থে বলেছেন'From the very beging of my theatre Work, We have tried to put revolution in a historical perspective.'[২]তাঁর নাট্যকর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তrevolution-কেhistorical perspective-এ-ই তিনি দেখতে ও দেখাতেপ্রয়াসী ছিলেন।

উৎপল দত্তের অভিমত – শ্রমিকশ্রেণি যখন প্রত্যক্ষভাবে রাজপথে সংগ্রামে রত, তখন নাট্যকর্মী তথা শিল্পীদেরও কাজ হল মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য লড়াই করা।শতবর্ষ ধরে বাংলায় রাজনৈতিক নাটক, রাজনৈতিক নাট্যশালা কার্যকরভাবে উপস্থিত রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। রাজনৈতিক নাটকের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন তিনি। পৃথিবীর অন্যদেশের চেয়ে আমাদের দেশের নাটকে দর্শক নাটকের সাথে অনেক বেশি অংশগ্রহণ করেন, যুক্ত হন মানসিকভাবে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক নাটক দেখে দর্শকের যে-মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও লক্ষ করা যায় না। তবে,এটা সত্য যে, আমাদের থিয়েটার এখনওরেভ্যুলিউশনারী (বিপ্লবী) থিয়েটারের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি – উৎপল মনে করেছেন। তাই তিনি বলেছেন :

> আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, সর্বত্র রয়েছে বৈপরীত্যেই সহ-অবস্থান এবং সংঘর্ষ। এই বিপরীত ধারা সবসময়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত – থিসিস অ্যান্ড অ্যান্টি থিসিস। এটা বুঝতে না পারলে আমরা সমাজের কন্ট্রাডিকশনগুলোকে,

> আমাদের দ্বন্দ্বগুলোকে সঠিকভাবে দর্শকের সামনে উপস্থিত করতে পারছি না। সেইটাই হচ্ছে বিপ্লবী নাট্যশালার,বিপ্লবী থিয়েটারের প্রধান কাজ।[৩]

প্রতিপক্ষ তথা প্রতিক্রিয়াশীলরা অবিরাম মানুষের মনকে জয় করার চেষ্টা করে যায়; দিনের পর দিন চেষ্টার ফলশ্রুতিতে মানুষের মনকে তারা এমন একটা নীচ স্তরে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকে, যাতে তারা সংগ্রাম করতে না পারে, যাতে তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙে যায়। মানুষের মন শত-হাজার বছরের অভ্যাস আর সংস্কারে জীর্ণ। সংস্কারের এই জীর্ণতা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করে আনতে হলে দীর্ঘ ও লাগাতার সংগ্রাম করে যেতে হবে। এই লাগাতার সংগ্রামে ঐতিহ্যকে ধরে রেখেই নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষকে নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করলে,একদিন সাধারণ মানুষই হয়ে উঠতে থাকবে অসাধারণ। এ-প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত লিখেছেন:

> পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে-রীতিতে নাটক সৃষ্টি হয়ে এসেছে তাকে বজায় রেখেই নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষ নাটকে আসবে নয়া-ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে।...সমাজ একটা যুদ্ধক্ষেত্র, নয়া যোদ্ধৃবৃন্দকে তুলে ধরুন; আপসে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠবে।[৪]

উৎপল দত্ত উপলব্ধি করেছেন, ভারতবর্ষের মানুষকে তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে বিয়োজিত করার চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানে চলমান লড়াইটাও ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের উত্তরসূরী; এ-লড়াইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের এ-ধরনের আক্রমণের প্রতি লক্ষ রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই মহান অধ্যায়গুলো তুলে ধরতে হবে, যে-গুলো শত্রুরা মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে। তাহলেই কেবল এই মিথ্যাটা ধ্বসে যাবে যে, ভারতবর্ষের মানুষ হচ্ছে অহিংস, ভীরু, কাপুরুষ। শত্রুর কৌশল পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও কৌশল পাল্টাতে হবে বলে উৎপল মনে করতেন। প্রতিপক্ষ বারবার এটাই বোঝাতে চেয়েছে, প্রচার করতে চেয়েছে যে, ভারতবর্ষের মানুষের পেছনে কোনও সংগ্রামী ঐতিহ্য নেই। তাদের অহিংস, শান্তিপ্রিয় ঘোষণার মধ্য দিয়েশোষণের রথের চাকা ঘড় ঘড় করে তাদের উপর দিয়ে চালিয়ে নিতে চেয়েছে তারা। এর বিরুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে বলে উৎপল মনে করেছেন। উৎপলের প্রত্যয় – এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে মোকাবেলা করতে পারলে একদিন রাজনৈতিক নাটকই বৈপ্লবিক নাটকে উন্নীত হবে। তাই তিনি বলেছেন:

> The political theatre must not only deal with day to day political issue,but must also transcend it to create proletarian myths of revolution.Only then would it fulfil its task as Revolutionary Theatre.[৫]

জনতার কাছে রাজনীতি পৌঁছে দেয়া – নাট্যকর্মীদের প্রাথমিক এবং প্রধান কাজ বলে মনে করেছেন উৎপল দত্ত। সে-রাজনীতি অবশ্যই শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতি। শ্রমিক-কৃষকের লড়াই-সংগ্রামের সাফল্য-ব্যর্থতা,ভুল-ত্রুটি,বীরত্ব সবকিছুই সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মধ্যবিত্ত, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর লড়াইয়ের খবরও জানাতে হবে। রাজনৈতিক নাটকের যা প্রধান কর্তব্য, তা হচ্ছে – সমাজের ঘটনাপ্রবাহ, ঘটনার অভ্যন্তরীণ সত্য, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দর্শকের সামনে তুলে ধরা। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে শোষকের শ্রেণি-অবস্থান, কৃত্রিম দেশপ্রেম, লোকদেখানো, তথাকথিত উন্নয়নের আসল উদ্দেশ্য জনতার সামনে উন্মোচিত করতে পারে রাজনৈতিক নাটক। রাজনৈতিক নাটক ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের আসল চিত্র তুলে ধরতে পারে দর্শকের সামনে। কারণ,রাজনৈতিক নাটক যবনিকায় শেষ হয়না, সমাপ্তির ভেতরএকটা অসমাপ্তিরসম্ভাবনা রেখে দেয়; যেখানে থাকে করণীয় বিষয়ে ছুঁড়ে দেয়া প্রশ্ন ও ইঙ্গিত। ইতিহাসের সমাপ্তি নেই, ইতিহাস সমাপ্ত হয় না, ইতিহাস চলমান।

উৎপল দত্ত প্রমাণ করেছেন, ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে লেখা রাজনৈতিক নাটকও অসাধারণ হতে পারে, যদি তা ঠিকভাবে, ঠিক পন্থায় লেখা হয়। কার্ল মার্কস্-এর রেফারেন্স-এ উৎপল দত্ত লিখেছেন :

> কার্ল মার্কস-এর কথা হচ্ছে বিপ্লবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। শ্রমিক কৃষককে পুঁজিপতিরা করে রাখে ব্যক্তিত্বহীন, গোষ্ঠীবদ্ধ উৎপাদনী যন্ত্রমাত্র, তারা আধখানা হয়ে আছে। বিপ্লব তাকে এই পরিচয়হীনতা থেকে মুক্তি দেয়।[৬]

আর তাই,উৎপল দত্ত বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক তথা সাধারণ মানুষকে পরিচয়হীনতা থেকে মুক্ত করে, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে রাজনৈতিক তথা বৈপ্লবিক নাটক নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছেন, আজীবন।অনেক নাটকের ভিড়ে কয়েকটি মাত্র রাজনৈতিক সচেতনতার নাটক লিখেননি তিনি; আদ্যোপান্ত, সকল নাটকই তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার নাটক। এখানেই উৎপল দত্তের সঙ্গে অন্যসব নাট্যকারের মৌলিক তফাৎ। তাঁর নাটকে বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকলেও, তাঁর নাটকসমূহেরস্থান-কাল বিচিত্র ওবিভিন্ন হলেও, তাতে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বিচ্যুত ও বিচলিত হয়নি বিন্দু মাত্রও। বিপ্লবী থিয়েটারের অবিচল যাত্রায় তিনি বিশ্বাসী ও স্থিত ছিলেন মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্বসূত্র দ্বারা পরিশীলিত হয়ে। তিনি মনে করতেন, এর ব্যতিক্রমে, এ-যুগের কোনো থিয়েটারই জনগণের থিয়েটার হতে পারে না, গণমানুষের নাটক হতে পারে না।

সাম্যবাদী উৎপল দত্ত মানুষকে দেখেছেন শ্রেণি-অবস্থানের নিরিখে। দেশ-কাল-বর্ণ-লিঙ্গ-ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তাঁর নাটকে মানুষ এসেছে তার কর্মের পরিচয়ে, সংগ্রামী চেতনার পরিচয়ে। পৃথিবীর সকল সংগ্রামী মানুষ, সকল বিপ্লবী তাঁর নিকটাত্মীয়।তাঁর নাটকে তিনি তাই পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন অবিরত ভৌগোলিক সীমানা, সময়ের সীমানা – দেশ থেকে দেশান্তরে,শতাব্দী থেকে শতাব্দী পরিভ্রমণ করে তুলে এনেছেন তিনি সংগ্রামশীল মানুষের ইতিকথা – পৃথিবীর যে-প্রান্তেরই তারা হোক না কেনো; তারা তাঁর চেতনার আাত্মীয়। এশিয়া থেকে ইউরোপ, ইউরোপ থেকে আফ্রিকা, আফ্রিকা থেকে আমেরিকা – পৃথিবীর যে-প্রান্তেই, মানুষের

মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রয়াস, সে-প্রয়াস ব্যর্থ বা সফল যাই হোক, তা উৎপলকে প্রাণিত করেছে। তাই, সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় ধ্বনিত হয় উৎপলের কণ্ঠে।

উৎপল দত্ত মেহনতী মানুষ; সাধারণ, বৃহত্তর যে-মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন; সেই সাধারণ মানুষ, সেই বৃহত্তম গণ-জনতা নাটকে কী দেখতে চায় সে-সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে সজাগ। উৎপল মনে করেছেন, নাটক দেখতে বসে মানুষ শিহরিত ও চমকিত হতে চায়। বিশাল মঞ্চসজ্জা দেখে চোখকে তৃপ্ত করতে চায়। বিরাট ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখতে চায়। আবেগে কম্পিত হতে চায়, আর চায় – বৃহৎ নানা শক্তির সংঘর্ষ দেখতে। তাই উৎপল তাঁর নাটকে প্রাত্যহিক জীবনের নথি নির্মাণ না করে, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ, দেশবিদেশের সংগ্রাম, বিপ্লব-বিদ্রোহের নথি নির্মাণ করেছেন – যেখানে বৃহতের সন্ধান পাওয়া যায়, বৃহত্তর অর্থের উপযোগ সহকারে।

গোর্কির মতোন উৎপলও নাটকে মানুষের জীবনকে উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য দেখাবার পক্ষপাতী:

> এমন একটা সময় এসেছে যখন চাই দুঃসাহস। সবাই চায় এমন কিছু যা মনকে চাগিয়ে তুলবে,জীবনে রঙ ধরাবে – এমন কিছু যা ঠিক জীবনের মতো নয়, জীবনের চেয়ে বড়ো, জীবনের চেয়ে উঁচু, ভালো, সুন্দর। আজকের সাহিত্যে কোনো না কোনোভাবে জীবনকে উজ্জ্বলতর করে দেখাতেই হবে। আর সাহিত্য যেই তা করতে পারবে, তখনই জীবনও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে, মানুষের জীবন হবে আরো গতিময়, আরো উজ্জ্বল।[৭]

উৎপল দত্ত-এর অভিমত, বাস্তবে যা ঘটছে তাই শুধু নাটকে দেখাবার বিষয় নয়; যা ঘটার কথা, যা ঘটবে বা ঘটা উচিত তা দেখানোই সত্যিকারের নাট্যকারের দায়িত্ব। *রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ* প্রবন্ধে তিনি বলছেন:

> সত্যটা তথ্যের চেয়ে অনেক বড়। সত্য ইতিহাসের অংশ। এবং যেহেতু মেহনতী মানুষ হচ্ছে ইতিহাসের উদীয়মান শক্তি,তাই তার সত্যটাই সত্য।...গোর্কি ও ব্রেখ্‌ট দুজনই বলে গেছেন– যা ঘটছে সেটাই দেখাব না। যা ভবিষ্যতে ঘটবে,যা ঘটা উচিত তাও আমরা দেখাব। সন্ত্রাসের সময়ে কৃষক পড়ে মার খাচ্ছিল শুধু সেটাই সত্য, আর অদূর ভবিষ্যতে সে যে বিদ্রোহ করবে এই অনিবার্য ইতিহাসটা সত্য নয়? শুধু যা দেখছ তাই দেখাও – এটা বুর্জোয়া বাস্তবতার দাবি।...বিপ্লবী বাস্তবতাবাদ জীবনের ফটোগ্রাফ উপস্থিত করে না,জীবনকে অনুকরণ করে না। তার দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক। সে জীবনকে ধরে তার গতির মধ্যে, তার অনিবার্য ভবিষ্যৎ-সহ। কল্লোল নাটকে খাইবার জাহাজের নাবিকরা কেন আত্মসমর্পণ করে না [বাস্তবে নাকি করেছিল] এ-প্রশ্ন তখন তুলেছিল কেউ কেউ। তখন তাদের এই উত্তর দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম – কারণ, আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে পোটেমকিনের নাবিকরা আত্মসমর্পণ করে না [যদিও বাস্তবে করেছিল]।[৮]

যাদের জন্য নাটক, সে-বৃহত্তর জনতা-দর্শকের যেন নাটক দেখে কার্যকর অর্থে ভালো লাগে, তারা যেন নাট্যবস্তু বুঝতে পারে এবং নাটকীয় আনন্দরসে উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত হতে পারে, সেদিকটাতেও উৎপলেরসদাসতর্ক মনোযোগছিল। নাটকের উপস্থাপনা তথা প্রয়োগ-ব্যবস্থাপনা, পাণ্ডুলিপি, নাট্যবস্তুসহ

সবকিছুর মূল লক্ষ্য উৎপলের কাছে মূলত একটিই, আর তা হল – নাটক দেখিয়ে দর্শককে ভালো লাগায় ভরিয়ে দিতে হবে; এ-ভালো লাগা সচেতনভাবেই সস্তা বিনোদনের খোরাকে নয়।

উৎপলের সৃষ্ট কোন নাট্য-চরিত্রই প্রাকনির্মিত (টাইপড্) নয়। শতাধিক নাটক আর সহস্রাধিক চরিত্রের স্রষ্টা উৎপল বিশ্বাস করতেন মানুষের অমেয় সম্ভাবনায়। তাঁর বিশ্বাস এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় জেনে নেন, লড়াইয়ে জেতা সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু অনিঃশেষ সম্ভাবনার নামই জীবন। মানুষের উপর আস্থাশীল বলেই উৎপলের চরিত্ররা চোরাবালিতে হারিয়ে যায় না; বরং শেষ পর্যন্ত এই প্রতীতি নিয়েই লড়ে যায়– নিরন্তর লড়তে লড়তে, হারতে হারতে একদিন না একদিন বিজয় অর্জিত হবেই। একবার হারলে, এক জায়গায় হারলে, তারপরের বার, নয়তো তার পরের বার, হয়তো এখানে নয়, অন্যখানে, অন্য কোথাও এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এক বুক স্বপ্ন আর আশা এবং দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছায়। পৃথিবীর ইতিহাস সে-সাক্ষ্যই বহন করে নিয়ে এসেছে মানুষের কাছে। পৃথিবীর ইতিহাস, বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। উৎপল বিশ্বাসও করতেন, লড়াইয়ের নামই জীবন।জীবন দ্বন্দ্বময়, সংঘাতময় এবং সম্ভাবনাময়।

উৎপলের কাছে নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। তাই,তাঁর নাটকে যুদ্ধাস্ত্রের এত অনুষঙ্গ এসেছে : টোটা,তীর, রাইফেল, টিনের তলোয়ার, কুঠার, কৃপাণ, ফৌজ, ব্যারিকেড, অস্ত্র, দুর্গ ইত্যাদি ইত্যাদি।

উৎপল দত্তের নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রয়োগ-বৈভব আমাদের বিস্মিত করে। রবীন্দ্র ছোটগল্পের মতোতাঁর শতাধিক নাটক পড়তে একঘেয়ে লাগে না। কোনো বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি নেইতাঁর নাটকে। কমিউনিজম প্রচারকে উৎপলতাঁর ধর্ম বলে জানলেও এবং নিজেকে প্রোপাগান্ডিস্ট হিসেবে আখ্যায়িত করলেও, প্রচারধর্মিতায় আড়ষ্ট হয়ে যায়নি তাঁর নাটক,বিনষ্ট হয়নিতার শিল্পগুণ। প্রায় প্রতিটি নাটকের বিষয়ানুযায়ী নির্মাণ করে নিয়েছেনআঙ্গিক। বিশ্বাসী ছিলেন মার্কসবাদী আঙ্গিক-চিন্তায়। স্টালিনের মতো উৎপলও বিশ্বাস করতেন বিষয়বস্তু হবে সমাজতান্ত্রিক বা আন্তর্জাতিক কিন্তু আঙ্গিক হবে জাতীয় বা দেশীয়।

এরিস্টটলীয় নাট্য-ধারণার বিপরীতে ব্রেখ্টের নায়ক যেমন অতি সাধারণ মানুষ, উৎপলের নাটকের মানুষেরাও অতি সাধারণ। অতিমানবীয় গুণ আরোপ করে উৎপলতাঁর চরিত্রগুলোকে বাস্তবাতিরিক্ত করে তোলেননি। চরিত্রগুলোকে জনতার কাতার থেকে টেনে তুলে দূর দেবলোকে নিয়ে হাজির করেননি।মানুষের বাঁচার লড়াই-সম্বলিত নাটকে গণনায়কের ছবি আছে, কিন্তু কেবল ভাল মানুষ, মহৎ মানুষের চিত্র নেই; বিশ্বাসঘাতক, লোভী, আপসকামীরও ছবি আছে। ভালো-মন্দ, ক্ষুদ্র-নীচ,মহৎ-উদার, সহজ-সরল,ক্রুর-হিংস্র সকল শ্রেণিবৈশিষ্ট্যের জীবন্ত মানুষেরা হাজির হয়েছে তাঁর নাটকে। সর্বাঙ্গসুন্দর কোনো মানুষে নাট্যকার ব্রেখ্ট-এর যেমন আস্থা ছিল না, তেমনি আস্থা ছিল না উৎপলেরও। তিনি জানতেন এবং মানতেন, মার্কসবাদ কোনো চিরন্তনতায় বিশ্বাস করে না,গতিশীল পৃথিবীতে সবকিছুইআপেক্ষিক, কারণ সবকিছুই নিরন্তর পরিবর্তনশীল। তাই, অনড় আদর্শ

বলে কিছু নেই। উৎপলও মনে করেন, সব মানুষের ভেতরেই আছে দ্বান্দ্বিক সত্তা, ভালো-মন্দ উভয় দিক। সম্পূর্ণ ভালো বা সম্পুর্ণ খারাপ মানুষের অস্তিত্ব তাঁর কাছে নেই। দ্বান্দ্বিকতাবাদে আস্থাশীল ছিলেন বলে, তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো ভালো-মন্দের বৈপরীত্যসহ ধরা দিয়েছে।

থিয়েটারকে ব্রেখ্‌ট যেমন সমাজ পরিবর্তনের যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন, তেমনি উৎপলও। বুর্জোয়া নাটকে খণ্ডিত জীবনের ছবি, খণ্ডিত ব্যক্তিমানুষকে দেখানো হয়, বিচ্ছিন্নভাবে; ব্রেখট এবং উৎপল তাদেরনাটকে অখণ্ড-জীবন, আস্ত-মানুষের ছবি উপস্থাপন করেছেন। ব্রেখট যেমন অ-এ্যারিস্টটলিয়ান, উৎপলও তেমনি। ট্র্যাজেডির বহুশ্রুত সংজ্ঞায় এ্যারিস্টটল নায়কের শৌর্য, বীর্য, উচ্চ-আদর্শ ইত্যাদি মহত্ত্বের কথা বলেছেন – ব্রেখট এবং উৎপল উভয়েইছিলেনতার বিরোধী। তাঁদের নায়ক জীবনের জীর্ণমূল থেকে ওঠে আসা গণমানব, অতি সাধারণ মানুষ।

ইতিহাসছিল উৎপলের প্রিয় বিষয়। তাঁর ইতিহাসবীক্ষার মূলে কাজ করেছে শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী। শাসকশ্রেণি বরাবরই তারসুকৌশল প্রচার-প্রতারণায়মিথ্যা তথ্যকেসত্যইতিহাস বলে চালিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে।আর তাই, পাঠক-দর্শকের কাছে উৎপলশাসকশ্রেণির সুচতুর কৌশল-সমেত ইতিহাসের আসল সত্যকে, ইতিহাসের ভিতরকার সত্য ইতিহাসকে তাঁর নাটক ও লেখায় তুলে ধরায় প্রয়াসী থেকেছেন। দেশে দেশে, কালে কালে শোষকের শোষণ-কৌশল ভিন্ন হলেও,তাদের শ্রেণিচরিত্রের দেশকাল ভেদ নেই। শোষকশ্রেণি নিজের স্বার্থে কখনও ধর্ম কখনও বর্ণ, কখনও সীমান্ত ইত্যাদি যে-কোন কিছুকে কাজে লাগিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে। উৎপল দত্ত তাঁর নাটকেসমাজ-ঘটনার মর্মমূলে প্রবেশ করে, আসল সত্যকে তুলে আনার এবং খুলে দেখানোর চেষ্টায় নিরত থেকেছেন। উৎপল দত্ত বিপ্লবের চারণ। ইতিহাসের চড়াই-উৎরাই এবং সমকালীন সংকটে চোখ বুঁজে না থেকে সত্যানুন্ধানেই ব্যাপৃত থেকেছেন আজীবন।ইতিহাসকে অবলম্বন করে নাটক লিখলেও তিনি কেবল ইতিহাসের ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনরোস্থাপনে সীমাবদ্ধ থাকেননি,ইতিহাসের পুনর্ঘটনের ভেতর দিয়ে সমকালকে স্পর্শ করেছেন; ইতিহাসকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন, নতুন তাৎপর্যে উপস্থাপন করেছেন, সম্ভাবনাময় সংবাদে পরিণত করেছেন :

> ইতিহাসচেতনা ব্যতীত সমকালকে বোঝার চেষ্টা করাই বাতুলতা। আজকের সংগ্রাম দীর্ঘ এক ঐতিহ্যের পরিণত রূপমাত্র।... গণবিদ্রোহ যে ভারতের মানুষের মজ্জার মধ্যে মিশে আছে, ইতিহাস ঘেঁটে তার নজির আমাদের খুঁজে বার করে নাটকে রূপায়িত করা উচিত ছিল।[৯]

উৎপল তাই মনে করেন, শিল্পনির্মাতাগণ তাদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে পারেননি বলেই শিল্পসম্ভোগীরা বিচ্ছিন্ন, বিয়োজিত, উন্মূলিত হয়ে পড়েছে তাদের আপন ঐতিহ্য থেকে,ভাষা থেকে, সংস্কৃতি থেকে, শেকড় থেকে; এমনকি নিজেদের সুকুমার-বৃত্তিগুলি থেকেও। এ-সবই পরস্পরসম্পৃক্ত এলিয়েনেশনের ফল বলে উৎপল দত্ত মনে করতেন।উৎপল বিশ্বাস করতেন :

> বিপ্লবী শিল্পী কখনোই বলতে পারেন না, অজ্ঞ জনতা আমাকে বুঝল না। যদি বলেন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে কোথাও বৃহৎ ফাঁকি আছে, আছে চালবাজি ও অসাধুতা। জনতার বর্তমান মান থেকে শুরু করে যেতে হবে উচ্চ থেকে উচ্চতর মার্গে, জনতাকে সঙ্গে নিয়ে – এটা মাও-এর কথা, মার্কসবাদের কথা,প্রগতিশীল শিল্পকর্মের গোড়ার কথা।[১০]

উৎপল প্রথাগত বা চিরায়ত ধারায় নাটক রচনাকে মানেননি। পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনিহাঁটেননি প্রথাগত পথে। তবে, ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। তাই,পুরাকাল থেকে আজ-অবধি যে-রীতিতে নাটক সৃষ্টি হয়ে এসেছে তাকে গ্রাহ্য রেখেই নতুনকে গ্রহণ করায় পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। নাট্যকার-জীবনের শুরু থেকেই উৎপল তাঁর নাট্যকর্মকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি অনুগামী রেখেছেন, তা হল – মানুষে মানুষে বৈষম্য বিলোপ। কারণ তা না হলে মানব জাতির কল্যাণ অসম্ভব। মানুষে মানুষে বৈষম্য-বিলোপ সম্ভব শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েমের মধ্য দিয়ে। এ-বিশ্বাসের কারণে, নিজের নাটক বা অন্য কোন নাট্যকারের নাটক, যেমন : শেকস্পিয়ার, গোর্কি, ওডেটস্, মধুসূদন, গিরিশ, রবীন্দ্রনাথ; যাঁর নাটকই যখন পরিচালনা করেছেন উৎপল, সবসময়ই তাঁর সে- বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। যেখানেই মানুষের সংগ্রাম, পরাভব না-মানার দৃঢ় মানসিকতা, ভালো করে বাঁচার লড়াই – সেখানেই উৎপল খুঁজে পেয়েছেন তাঁর নাট্য-প্রেরণা। 'নাট্যজীবনের আদিপর্ব থেকেই উৎপল সর্বহারা শ্রেণির অধিকার,ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামকে তাঁর নাটকের মূলবস্তু করে তুলেছিলেন।'[১১]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান অধ্যায়গুলোকেগণমানুষের সামনে তুলে ধরা উৎপলতাঁর নিজের এবং সকলের কর্তব্য বলে মনে করেন :It is therefore our task to re-afirm the violent history of India,to re-affirm the martial traditions of its people,to recount again and again the heroic tales of armed rebels and martyrs.[১২]

যে-কোন দেশের কৃষ্টি-ঐতিহ্য বেঁচে থাকে নিজস্ব শিল্পকর্মের ভেতর। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে অতীত ঐতিহ্য বহুমাত্রিক, নবতর অস্তিত্ব খুঁজে না পেলে সংকটে পড়ে।ঐতিহ্য-সচেতন উৎপল তাই,একদিকে পুরোনো ঐতিহ্যকে ভেঙেছেনঅন্যদিকে নবতর ঐতিহ্য-নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যে উৎপল দত্তের সৃজনশীল ইতিহাসবীক্ষা এবং নাট্য প্রয়োগ-পদ্ধতি সমকালীন নাট্যকারদের চেয়ে বহুলাংশে প্রাগ্রসর, স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রম। একটি নির্দিষ্ট,স্থিতবিশ্বাসে গণ্ডিবদ্ধ থেকেও বহুতর ব্যঞ্জনার নাট্যগুণে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণেই উৎপলের নাটক বিশ্বমানে পৌঁছাতে পেরেছে। এখানেই নিহিত সমকালীন বাংলা নাট্যধারায় উৎপলের নাটকের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী প্রতিভা যাঁর সাথে বিশ্ব নাট্য-আন্দোলনের নিবিড় পরিচয়ও নৈকট্য গড়ে ওঠেছিল। উৎপল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন, বিভিন্ন দেশের নাটক, নাট্যমঞ্চ, প্রযোজনা,পরিচালনা, অভিনয়রীতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। নাট্যকার, পরিচালক,

অভিনেতৃবৃন্দের সঙ্গে নাট্যবিষয়ে মতবিনিময় করেছেন। পৃথিবীর নানাপ্রান্তের নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে উৎপলের বন্ধুত্বও গড়ে ওঠেছিল। এসব কিছুর সাথে যোগ হয়েছিল তাঁর ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন, অনুসন্ধিৎসা।উৎপল দত্ত বাংলা নাটকের প্রচলিত প্রথা ভাঙতে যেমন প্রয়াসী ছিলেন;তেমনি প্রয়াসী ছিলেন বিশ্বের রাজনৈতিক নাটকের মূল প্রবাহের সঙ্গে তা যুক্ত করতে । বাংলা নাটকে তিনি প্রলেতারিতের মিথ নির্মাণ করেছেন।

সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করে, প্রচলিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে শ্রমিক-কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। সমাজের কোথায় কোথায় অসঙ্গতি, কেন শ্রমিক-কৃষক মানবেতর জীবন-যাপন করে, কেন তাদের উৎপাদিত পণ্য তারা ভোগ করতে পারে না, কেন তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটে না, কেন তারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে শোষিত হয়ে আসছে– এ-সবকিছুসহ শোষকের শোষণের কৌশল এমন বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতায় দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে হবে, যে-বাস্তবতা দেখে দর্শক এ-সব সম্পর্কে ভাববার, সংগঠিত হবার এবং রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অর্ধশতাব্দীব্যাপ্ত নাট্যচর্চায় উৎপলের চলার পথ মসৃণ ছিল না।নাট্য-জীবনের প্রথম দিকে আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত হয়েছেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে নাট্য-হাতিয়ার ব্যবহার করতে গিয়ে চরম মূল্য দিয়েছেন। জেল পর্যন্ত খেটেছেন। বন্ধু-স্বজন-সহকর্মীদের সন্দেহ-সংশয়ের বিড়ম্বনা সয়েছেন। কিন্তু, তারপরও, জেল থেকে ফিরে এসেও সেই রাজনৈতিক নাটকই করে গেছেন–পিছপা হননি, দমে যাননি। যে-বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য এতো আয়োজন,এতো শক্তির ব্যয়, জীবনের সায়াহ্নবেলায় সেই বিশ্বাস ও আদর্শ বিশ্বব্যাপী ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ততোদিনে শরীরও ভেঙে পড়েছে। কিন্তু দায়বোধটা যেনো থেকে গেছে একই বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল – কেন সমাজতান্ত্রিকসমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, পড়ছে তার প্রকৃত কারণ উন্মোচন করে পাঠক-দর্শকের সামনে হাজির করতে হবে। এতো বড়ো মানবীয় অর্জন কেবল লোভী ও ভোগী মানুষের আত্মপ্রতারণায় মিথ্যা ও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। জীবন-সায়াহ্নের অস্তরাগে দাঁড়িয়েও আর তাই লিখেছেন, ১৯৯০ সালে,পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র লিভোনিয়ার পতনের ওপর*লালদুর্গ*। এ-নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র গ্রোমেক যখন বলেন :

> কারণ ব্যতীত কার্য নেই, বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নেই, সব ঘটনা অন্য ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। হ্যাঁ, দায়িত্ব অখণ্ড, মস্কো থেকে কভনোগ্রাদ, দায়িত্ব সর্বত্র। সে দায়িত্ব নেয়ার মতন বুকের পাটা কমিউনিস্টদের আছে। আমি নিচ্ছি দায়িত্ব। শ্রমিকশ্রেণী একটা স্বপ্ন দেখেছিল, বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে ভুল হয়েছে অনেক, কিন্তু সে ভুলের মধ্যে কোনো কুটিলতা ছিল না, ছিল না অসাধুতা। সবার জন্য রুটি, সবার জন্য বাসস্থান,এই কঠিন কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণী স্বাভাবিক সারল্যে বুঝতে পারেনি সাম্রাজ্যবাদীরা ছেড়ে কথা কইবে না।...কোন ভুল করিনি। দরিদ্র মানুষের জন্য এদেশে গড়েছিলাম খানিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। সেটা পৃথিবীর ধনীদের সহ্য হয়নি। তাই ওরা ভাবছে লাল দুর্গ বুঝি চূর্ণ হয়ে গেল। ওরা যেন মনে রাখে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অভিযানের পথে এটা একটা কমা মাত্র, দাঁড়ি নয়,পূর্ণচ্ছেদ নয়।[১৩]

তখন কারো বুঝতে অসুবিধে হয় না, কেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, বিপর্যয় নেমে এসেছে। যৌবনে দেখেছেনপৃথিবীব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবল জোয়ার, জীবনের ক্রান্তিকালে দেখেছেন সে-আন্দোলনের ক্রান্তি ও পতন। কিন্তু, নিজের বিশ্বাস থেকে একচুলও নড়েননি তিনি। আমৃত্যু স্থিত ছিলেন সে-বিশ্বাসে। শুধু তাই নয়, পতনের কারণ অনুসন্ধান করে বুঝেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন, এ-বিপর্যয় সাময়িক।

যাপিত জীবনে উৎপল দত্ত অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন, নিরলস,নিরন্তর নাট্যচর্চা করেছেন। অভিনেতা,পরিচালক,নাট্যকার – ত্রিসত্তার এমন চূড়াস্পর্শী মেলবন্ধনে সতত সঞ্চরণশীল উৎপল দত্তের তুলনা বাংলা-নাট্যাঙ্গনে শুধু নয়;বিশ্ব-নাট্যাঙ্গনেও মেলা ভার।চল্লিশের দশকের গণমুখী ধারার সাথে উৎপলের মার্কসিস্ট ধারা সমন্বিত হয়ে বাংলা নাটক ক্রমশ পৌঁছেছে শিল্পিত স্বরগ্রামে, ব্যাপক গণ-জনতার কাছাকাছি। দর্শনে মার্কসবাদ, নাট্যবোধে শেকস্পিয়ার-ব্রেখ্‌ট আর নাট্যলক্ষ্যে জনগণই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। জগৎ সেরা শেকস্পিয়ার বিশেষজ্ঞদের অন্যতম উৎপল। নাট্যচর্চা শুরু করেছিলেন শেকস্পিয়ার দিয়েই;যা তাঁর চেতনায় এক বিশুদ্ধ শিল্পবোধের বীজ বুনে দিয়েছিল। এ-শিল্পবোধ গণনাট্য সংঘের সান্নিধ্যে তাঁর ঘুম ভেঙে দিয়ে আরও শাণিত,বিকশিতও আলোকিত জাগরণের উৎসারণ ঘটায়। যে-উৎসারণ কেবলই দ্যুতি ছড়িয়ে ব্যাপ্ত থেকে ব্যাপ্ততর হয়েছে। হাট-মাঠ-ঘাট;গ্রাম-গ্রামান্তর, শহর-বন্দর, দেশ-বিদেশ সর্বত্র তিনি নাটক নিয়ে হাজির হয়েছেন; যার কেন্দ্রবিন্দুতে কাজ করেছে গণমানবমুখিতা। নাটককে উৎপল দত্ত 'বহু মানুষের সান্নিধ্যের ব্যাপার'[১৪] বলে মেনেছেন এবং সেই-সূত্রেই তিনি বহু মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন।

উৎপল দত্ত সহজবোধ্য ভাষায় সহজগ্রাহ্য গল্পের কাঠামোয় মহত্তম চিন্তা যোজনা করে ব্যাপক জনগোষ্ঠী তথা গণমানুষের কাছে পৌঁছাতে অভিলাষী ছিলেন। বাংলা নাট্য-আন্দোলনকে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তির উপর নিয়ে দাঁড় করাতে, স্থিতি দিতে অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন উৎপল। চেয়েছিলেন,বাংলানাটক সত্যিকার অর্থেই রেভ্যুলিউশনারিথিয়েটারের সীমানা খুঁজে পাক।তিনি বিশ্বাস করতেন, 'যে-নাটকের রাজনীতি ভুল, তার সব ভুল'।[১৫]মার্কসীয় তত্ত্বের নাট্যরূপায়ণ,স্বদেশ-বিদেশের বিপ্লব-বিদ্রোহ তথা গণ-আন্দোলনের সংবাদ বাংলার গণমানুষের কাছে নাট্যকাহিনীতে পৌঁছে দিয়ে, তাদের জীবনে ও চিন্তায় মৌলিক সমাজবোধের জ্ঞানবীজ ছড়িয়ে দিয়ে, আস্ত সমাজটাকে এক প্রবল-ভীষণ ঝাঁকিতে দুলিয়ে দেয়ার অবিচলিত সংগ্রাম– উৎপলের নাটক।সে অমর, অন্তহীন স্বপ্ন-প্রেরণার আস্থাবান, কর্মযোগী তপস্বীপুরুষের অপর নাম উৎপল দত্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশঃ

১. অজিত কুমার ঘোষ,*বাংলা নাটকের ইতিহাস*,কলকাতা,১৯৯৯, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স,পৃ. ৭১

২. Utpal Dutt,*Towards A Revolutionary Theatre*,Calcutta,1995,M.C. Sarkar & Sons LTD,p.28

৩. উৎপল দত্ত,রাজনৈতিক থিয়েটারও সাধারণ দর্শক,*পশ্চিমবঙ্গ*,উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৩

৪. উৎপল দত্ত,*গদ্য সংগ্রহ(প্রথম খণ্ড)*,কলকাতা,১৯৯৮, দে'জ পাবলিশিং,পৃ.৩৩-৩৪

৫. Utpal Dutt,*Towards A Revolutionary Theatre*,ibid,p.148

৬. উৎপল দত্ত, ,*গদ্য সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত,পৃ. ১৬৬

৭. দর্শন চৌধুরী,*থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত*, কলকাতা,২০০৭,সাহিত্যপ্রকাশ, পৃ.৩৩৯-৪০

৮. উৎপল দত্ত,*গদ্য সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২২৯-৩১

৯. *উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন*, (নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত) উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি,কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগপৃ. ৯১

১০. *পশ্চিমবঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১১. উৎপল দত্ত,ভূমিকা,*নাটক সমগ্র*(প্রথম খন্ড),কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লি:,১৯৯৪,পৃ.৫

১২. Utpal Dutt,*Towards A Revolutionary Theatre*, ibid, p. 57

১৩. উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র*,সপ্তম খন্ড,লালদুর্গ, ১৯৯৯,পৃ.৪৯৩-৯৪

১৪. উৎপল দত্ত, *আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার*, কলকাতা, ২০০৫, নাট্যচিন্তা, পৃ.৫৪

১৫. উৎপল দত্ত, যে নাটকের রাজনীতি ভুল,তার সব ভুল (সুরজিৎ ঘোষের নেয়া একটি সাক্ষাৎকার), *দেশ*,কলকাতা, ৩০.০৩.১৯৯১,পৃ.৪২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট(১) : উৎপল-পত্নী শোভা সেনের সাক্ষাৎকার

অভিসন্দর্ভের গবেষক কর্তৃক উৎপল দত্তের সহযোদ্ধা,জীবনসঙ্গী শোভা সেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়(২০০২ সালের ১৬,১৭ই নভেম্বর এবং ১ও ২রাডিসেম্বর)। উৎপল দত্তের জীবনের বিশেষ কিছু দিক ; যেমন পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক, পার্টির মেম্বারশিপ,গণনাট্য সংঘে বেশিদিন থাকতে না পারা,বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে অভিনয়,নকশাল আন্দোলনে ঝুঁকে পড়া,মুচলেকা প্রসঙ্গ,উৎপল-শোভার পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদিনানান প্রসঙ্গের অবতারণা করলে কলকাতার টালিগঞ্জে নিজ বাসভবন 'কল্লোল'-এ শোভাসেন তাঁর জীবনসঙ্গী উৎপলের জীবনের নানাদিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন।

উৎপল দত্তের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নিবিড় সম্পর্ক থাকার পরও এবং নিজেকে তিনি কমিউনিস্ট,এ্যাজিটেটর ও প্রোপাগান্ডিস্ট পরিচয়ে পরিচিত করতে আগ্রহী হলেও পার্টির মেম্বারশিপ গ্রহণ করেননি এ প্রসঙ্গে শোভা সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শোভা সেন জানান,পার্টির মেম্বারশিপ গ্রহণ করে তারপর পার্টির কাজ করতে হবে,এমন তো কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই;দেখ, কেউ মিছিল,মিটিং,শ্লোগান,বক্তৃতা,বিবৃতির মাধ্যমে পার্টির কাজ করেন,কেউ আবার অন্যভাবে। যেমন ধরো, আমরা নাটকের লোক,এই এলাকায় আমরা বেশি পারদর্শী সুতরাং এই কাজটাই যদি পার্টির আদর্শের দিক খেয়াল রেখে আমরা ভালভাবে করি তাহলে তো পার্টির কাজই করা হল।পার্টির বাইরে থেকেও অনেক কিছু করা যায় যদি জনগণ এবং পার্টির প্রতি কমিটমেন্ট ঠিক থাকে।

গণনাট্য সংঘে মোটে দশমাস, বেশিদিন থাকতে না পারার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে শোভা সেন বলেন এর উত্তর তো উৎপল তাঁর 'লিটল থিয়েটার ও আমি'স্মৃতিচারণমূলক লেখায় দিয়েছে;ওটা তুমি পড়নি? আমি জানালাম, পড়েছি। তাহলে? তবু আপনি যদি কিছু বলেন;দেখ,ও যা বলেছে;এর বাইরে তো আর বলার কিছু নেই। উৎপল তো জেফ্রির শিষ্য,ওর ডিসিপ্লিন অন্যরকম। এদিকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে কেবল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে। গণনাট্য সংঘ যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির কালচারাল উইং,এখানকার প্রায় সবাই পার্টির সঙ্গে কোনো নাকোনোভাবে যুক্ত ছিল,পার্টির নানা কাজ থাকতো,তাই উৎপলের ডিসিপ্লিনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো একটু মুশকিল ছিল।

হিন্দি বা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে অভিনয় এ প্রসঙ্গে শোভা সেন বলেন;এপ্রসঙ্গে তো আমি আমার বই(স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লালদূর্গ)-এ বলেছি। জান তো, উৎপল ভীষণ পড়ুয়া মানুষ, শুটিংয়ে যাবার সময় ও বই সঙ্গে নিয়ে যেত;শুটিংয়ের ফাঁকে, অবসরে ওখানে ওবসে পড়াশুনা করতো।শোভা সেন এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, উৎপল মানুষকে,মানুষের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতো; চলচ্চিত্রে নানান ধরণের মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেও, এসব ও (উৎপল)'এনজয়' করতো। উৎপল যেহেতু 'ফুলটাইম' নাটক করার পক্ষে তাই চলচ্চিত্রে ও (উৎপল) অভিনয় করলেও তা তাঁর নাট্যকর্মে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে বা নাট্য-সংশ্লিষ্ট কোনো কাজকর্ম এতে ব্যাহত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

তীর নাটক লেখার সময় উৎপল একটু অতি বাম রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল;পরবর্তীতে শোচনীয় ভ্রান্তি বলে ও স্বীকার করেছে;এ প্রসঙ্গেও তো আমি আমার বইয়ে লিখেছি। আমি জানালাম সেসব আমি পড়েছি।

উৎপল দত্তের মুচলেকা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শোভা সেন বলেন; মুচলেকা প্রসঙ্গে সত্য,উৎপল ও আমি যা বলেছি তাই-ই,এর বাইরে আর কিছু নেই।

উৎপলের আদর্শিক, পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরালে শোভা সেন বলেন, উৎপল শতভাগ মার্কসিস্ট,মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে উৎপল তাঁর নাট্য রচনা,প্রযোজনার সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারকে রেভ্যুলেশনারী থিয়েটারে উন্নীত করতে প্রয়াসী ছিল। উৎপল ফুলটাইম নাটক করার পক্ষে,এ ব্যাপারে ও শৌখিন নয়,দারুণ পেশাদারী। সাউথপয়েন্ট স্কুল ও স্ট্যাটসম্যান পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে চাকরি নিয়েছিল কিন্তু তাতে নাটকে পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া যায় না,তাইওবেশিদিন চাকুরি করতে পারেনি। থিয়েটারইওর পেশা,সব।

ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কি আর বলব, ওর মত উদারচেতা মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে আমি ধন্য। একটা বড় বিষয় হল আমাদের কাজের ক্ষেত্র ছিল এক। তাছাড়া আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়াটা ছিল চমৎকার। তাই কোনো সমস্যা হতো না কখনো। সাংসারিক-আর্থিক বিষয়গুলো আমিই সামাল দিতাম,উৎপল নাটক লেখা পরিচালনা,অভিনয় সব যেন ঠিকমত করতে পারে তার সুবন্দোবস্ত করে দিতাম এবংষোলআনা খেয়াল রাখতাম।

আমি শোভা সেনের বই থেকে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে শোভা সেন হাসতে হাসতে বলেন,তুমি দেখি আমার এবং আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানো।

MÖš’cwÄ

g~jMÖš’(bvUK):

Drcj `Ë bvUK mgMÖ,cÖ_g LÐ,KjKvZv,জানুয়ারী 1994,wgÎ I †Nvl cvewjkvm©
*Drcj `Ë bvUK mgMÖ,*wØZxq LÐ,KjKvZv,AvM÷ 1994,wgÎ I †Nvl cvewjkvm©
Drcj `Ë bvUK mgMÖ,Z…Zxq LÐ,KjKvZv, AvM÷ 1995,wgÎ I †Nvl cvewjkvm©
Drcj `Ë bvUK mgMÖ,PZz_© LÐ,KjKvZv, জানুয়ারী 1996,wgÎ I †Nvl cvewjkvm©
Drcj `Ë bvUK mgMÖ,cÂg LÐ,KjKvZv, জানুয়ারী 1997,wgÎ I †Nvl cvewjkvm©
উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র,পঞ্চম খণ্ড,কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৭,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
Drcj `Ë bvUK mgMÖ,mßg LÐ,KjKvZv, জানুয়ারী 1997,wgÎ I †Nvl cvewjkvm©
Drcj `Ë bvUK mgMÖ,Aóg LÐ,KjKvZv, জুন ২০০৯,wgÎ I †Nvl cvewjkvm©
Drcj `Ë bvUK mgMÖ,beg LÐ,KjKvZv, অক্টোবর ২০১১,wgÎ I †Nvl cvewjkvm©
Drcj `Ëর নির্বাচিত নাট্য সংগ্রহ-২,কলকাতা, আশ্বিন ১৩৮৫, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
Drcj `Ëর নির্বাচিত নাট্য সংগ্রহ-৩,কলকাতা, অগ্রহায়ন ১৩৮৬, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
Drcj `Ëর নির্বাচিত নাট্য সংগ্রহ-৪, কলকাতা,পৌষ ১৩৯১, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
GKwU Z‡jvqv‡রর Kvwnbx,bvU¨wPšÍv,KjKvZv,Drcj `Ë msL¨v, †m‡Þ¤^র-A‡±veর,1993

cÖeÜMÖš’:

Drcj `Ë, M`¨ msMÖn,cÖ_g LÐ (bvU¨wPšÍv), kgxK e‡›`¨vcva¨vq m¤úvw`Z,KjKvZv, জানুয়ারী 1998,‡`ÕR cvewjwks
উৎপল দত্ত, শেকসপিয়ারের সমাজচেতনা,কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৯,এম.সি,সরকার এণ্ড সন্স,প্রাইভেট লিমিটেড
উৎপল দত্ত,গিরিশ-মানস,কলকাতা,জানুয়ারি ১৯৮৩, এম.সি,সরকার এণ্ড সন্স প্রা: লি:
উৎপল দত্ত,আশার ছলনে ভুলি, কলকাতা,জানুয়ারি ১৯৯৩,পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী
উৎপল দত্ত,প্রতিবিপ্লব, কলকাতা,শ্রাবণ ১৪০০, এম.সি,সরকার এণ্ড সন্স প্রা: লি:
উৎপল দত্ত,আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার,কলকাতা,জানুয়ারি ২০০৫,নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন
উৎপল দত্ত,বিষয় থিয়েটার,কলকাতা,জানুয়ারি ১৯৯৯,নাট্যচিন্তা
উৎপল দত্ত, চীনযাত্রী,কলকাতা,(২য় সংস্করণ)১৪০০, এম.সি,সরকার এণ্ড সন্স প্রা: লি:
Utpal Dutt, Towards A Revolutionary Theatre,Calcutta,1982,M.C.Sarkar &Sons private Ltd.
Utpal Dutt,What is to be Done,new Delhi, 1988, Shri Ram Centre for Art and Culture,
Utpal Dutt,Girish Chandr Ghosh, Calcutta,1992,Sahitya Akademi,Rabindra Bhavan,new Delhi
Utpal Dutt, Towards A Heroic Cinema, Calcutta,1994,M.C.Sarkar &Sons private Ltd.

অনুবাদ গল্পঃ

উৎপল দত্ত,এংকোর,কলকাতা(২য় সংস্করণ)১৯৯৫,উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশান ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ

কবিতাঃ

উৎপল দত্ত,দিনবদলের কবিতা,কলকাতা,১৯৯৬,প্রমা প্রকাশনী

সহায়ক গ্রন্থ(বাংলা)ঃ

অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস,কলকাতা,জুন,১৯৯৯,জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:
অজিতকুমার ঘোষ,নাটকের কথা, কলকাতা,১৯৯৬,সাহিত্যলোক
অমলেন্দু সেনগুপ্ত,উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব,কলকাতা,নভেম্বর ১৯৮৯,পার্ল পাবলিশার্স
অসীম রায়,একালের কথা,কলকাতা, ১৩৬০,নতুন সাহিত্য ভবন
অরুণ মুখোপাধ্যায়,চেতনাশ্রয়ী (মারীচ সংবাদ,রামযাত্রা ও জগন্নাথ):মুখবন্ধ ও জগন্নাথের মনের কথা,কলকাতা, ১৯৯২,জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
আবদুল হক,বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ,চট্টগ্রাম,১৩৮০,বইঘর
আবুল মনসুর আহমদ,আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,ঢাকা ১৯৯৫ (৭ম সংস্করণ),খোশরোজ কিতাব মহল
আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য নাহিত্যের ইতিহাস(১ম খণ্ড), কলকাতা, (৫ম সংস্করণ)২০০২,এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা: লি:
আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য নাহিত্যের ইতিহাস(২য় খণ্ড), কলকাতা,(৪র্থ সংস্করণ)২০০৩,এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা: লি:
এন.কে.কৃষ্ণান, কমিউনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লীগ,কলকাতা,১৯৪৬,ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
কিরণময় রাহা, বাংলা থিয়েটার,নয়া দিল্লী,১৯৮৫,ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ,
কবীর চৌধুরী,ইউরোপের দশ নাট্যকার,ঢাকা,১৯৮৫,বাংলা একাডেমী
কবীর চৌধুরী,প্রসঙ্গ নাটক,ঢাকা ১৯৮১,বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী,
কুন্তল মুখোপাধ্যায়,থিয়েটার ও রাজনীতি,কলকাতা,২০০২,নাট্যচিন্তা
গঙ্গাপদ বসু,নাটক ও নাট্য-আন্দোলন,কলকাতা, ১৯৮৬
গোপীকানাথ রায় চ্যেধুরী,দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,কলকাতা, ১৯৮৬,দে'জ পাবলিকেশন্স
গোলাম মুরশিদ,সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক,ঢাকা,১৯৮৪,বাংলা একাডেমী
গোলাম মুরশিদ,হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,ঢাকা,জানুয়ারি ২০০৬,অবসর প্রকাশনা সংস্থা
গোপাল হালদার,তেরশ পঞ্চাশ,কলকাতা, ১৯৪৬, ডি.এম.লাইব্রেরী
জওহরলাল নেহেরু,বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ,কলকাতা,১৯৯১,আনন্দ পাবলিশার্স লি:
জিয়া হায়দার, নাট্যকলার বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার,ঢাকা,১৯৯৫,বাংলা একাডেমী
জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা (১ম খণ্ড-১৯৮৫, ২য় খণ্ড-১৯৯০,৩য় খণ্ড-১৯৯৪,৪র্থ খণ্ড-১৯৯৬) ঢাকা, বাংলা একাডেমী
জ্যোতি বসু, জনগণের সঙ্গে, কলকাতা,১৯৪৬,ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৯৪,মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লি:
ড.মন্দিরা রায়,বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত
ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, কলকাতা(৩য় মুদ্রণ),১৯৯৪,করুণা প্রকাশনী
ড. মানসী জামান,বাংলা নাটক(১৯৪০-৬০):আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট,কলকাতা, জগৎমাতা পাবলিশার্স
ড. স্বাতী লাহিড়ী,গ্রুপ থিয়েটারের উৎস সন্ধানে,কলকাতা,১৯৯৫,জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
ডঃ দীপক চন্দ্র,বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা,কলকাতা,১৯৯৪,দে'জ পাবলিশিং
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,মন্বন্তর ও সাহিত্য,কলকাতা, ১৩৫০,ভারতবর্ষ

দর্শন চৌধুরী,গণনাট্য আন্দোলন,কলিকাতা,মে ১৯৮২, অনুষ্টুপ প্রকাশনী
দর্শন চৌধুরী,থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, কলকাতা, ২০০৭, সাহিত্যপ্রকাশ
দর্শন চৌধুরী,উনিশ শতকের নাট্যবিষয়,কলকাতা,১৯৮৫,পুস্তক বিপনী
দর্শন চৌধুরী,বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস,কলকাতা,১৯৯৫,পুস্তক বিপনী
দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,মার্কসবাদ,কলকাতা, ১৯৯৫, অনুষ্টুপ সংস্করণ
দীনবন্ধু রচনাবলী,পঞ্চম মুদ্রণ,কলকাতা,১৯৯৭, সাহিত্য সংসদ
ধনঞ্জয় দাস(সম্পাদিত), মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক(অখণ্ড), কলকাতা,২০০৩, করুনা প্রকাশনী
নিকোলাই অস্ত্রভস্কি,ইস্পাত(প্রথম ভাগ),তাশখন্দ,অনুবাদ:রবীন্দ্র মজুমদার,১৯৮৬,'রাদুগা' প্রকাশন
নিকোলাই অস্ত্রভস্কি,ইস্পাত(দ্বিতীয় ভাগ),তাশখন্দ,অনুবাদ:রবীন্দ্র মজুমদার,১৯৮৬, 'রাদুগা' প্রকাশন
নীলিমা ইব্রাহীম,বাংলা নাটক:উৎস ও ধারা,ঢাকা,১৯৭২
নীলিমা ইব্রাহীম,আমি বীরাঙ্গনা বলছি, ঢাকা,২০০১,জাগৃতি প্রকাশনী
নুরুল হুদা মির্জা অনূদিত,মার্কস থেকে মাও সে তুঙ, ঢাকা(৩য় মুদ্রণ),১৯৯১,চলন্তিকা বইঘর
নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত,এক সামগ্রিক অবলোকন,উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ,কলিকাতা
নৃপেন্দ্র সাহা, বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত,কলকাতা,১৯৯৮,পুস্তক বিপনী
নৃপেন্দ্র সাহা, বাংলা থিয়েটারের পূর্বাপর,কলকাতা,২০০৩,তৃণ প্রকাশ
পি.সি. জোশী-কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস,কলকাতা, ১৯৪৬,ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
প্রভাত কুমার গোস্বামী,উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক,কলকাতা,১৯৮২,সংস্কৃতি পরিষদ
প্রভা চ্যটার্জী, শহীদ প্রতিভা গাঙ্গুলী,কলকাতা, ১৯৮৫, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি,
বঙ্কিম রচনাবলী,প্রথম খণ্ড(সংশোধিত চতুর্দশ প্রকাশ,দ্বিতীয় খণ্ড,একাদশ মুদ্রণ)কলকাতা,১৩৯৭,সাহিত্য সংসদ
বাদল সরকার,নাট্যসংগ্রহ,কলকাতা,১৪০২,অপেরা
বাদল সরকার, তৃতীয় ধারার নাটক,কলকাতা,১৯৮৮,প্রকাশক অঞ্জলী বসু
বিনয় ঘোষ,শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ,কলকাতা,১৯৮০,অরুণা প্রকাশনী
বিনয় ঘোষ,ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ, কলকাতা, ১৯৪২,অরণি কার্যালয়,
বিশ্বজিৎ ঘোষ,বাংলাদেশের সাহিত্য,ঢাকা,২০০৯,প্রথম আজকাল সংস্করণ
বিষ্ণু বসু, রাজনীতি নাটকে রাজনীতি থিয়েটারে,কলকাতা,১৯৯০,প্রতীক
ব্রজেন্দ্রকুমার দে,যাত্রার সেকাল ও একাল, কলকাতা,১৯৮৪,ইম্প্রেশন সিন্ডিকেট
ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়,ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব,কলিকাতা,১৩৭৭
মার্কস এঙ্গেলস,কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার,কলকাতা,১৮৭২,ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
মার্কস এঙ্গেলস,ধর্ম প্রসঙ্গে,মস্কো,১৯৮১,প্রগতি প্রকাশন
মার্কস এঙ্গেলস রচনা-সংকলন ১ম খণ্ড (১ম অংশ,২য় অংশ), ২য় খণ্ড (১ম অংশ,২য় অংশ),মস্কো, ১৯৭২, প্রগতি প্রকাশন
মুনতাসির মামুন,উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার,ঢাকা ১৯৮৬,সুবর্ণ
মুহম্মদ আবদুল্লা রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস,কলকাতা, ১৩৭৬,নবজাতক প্রকাশন
মো:জাকিরুল হক,দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা,ঢাকা, জুন ২০০৭, বালা একাডেমী
মণিকুন্তলা সেন,সেদিনের কথা,কলকাতা, ১৯৮২, নবপত্র
মোহিত চট্টোপাধ্যায়,পূর্ণাঙ্গ নাট্যসংগ্রহ(প্রথম খণ্ড),কলকাতা,১৯৯১,পুস্তক ইন্ডিয়ান বুক মার্ট
মনোজ মিত্র,নাটক সমগ্র(প্রথম খণ্ড-১৯৯৪,দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৯৭,তৃতীয় খণ্ড-১৪০২), কলকাতা,মিত্র ও ঘোষ পালিশার্স
মোহিত চট্টোপাধ্যায়,একাঙ্ক নাট্যসংগ্রহ,কলকাতা,১৯৮৮,পুস্তক বিপণি

রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ(প্রথম খণ্ড), কলকাতা,১৪০৬,বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ(দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা,১৪০৬,বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
রঈস আহমদ জা'ফরীসম্পাদিত ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত,ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিলো,ঢাকা,১৯৭৯
রথীন চক্রবর্তী অনূদিত ও সম্পাদিত,রঁমা রল্যাঁ পিপলস থিয়েটার,কলকাতা,১৯৯৬,পুস্তক বিপনী
রামেন্দু মজুমদারসম্পাদিত,বাংলাদেশের নাট্যচর্চা(১৯৭২-৮৬), ঢাকা, মুক্তধারা
রাহমান চৌধুরী, রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক, ঢাকা, জুন ২০০৭,বালা একাডেমী
লেনিন,কি করিতে হইবে,কলকাতা,১৯৯৫,ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
লেনিন,সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব,মস্কো,১৯৮৬,প্রগতি প্রকাশন
শম্ভু মিত্র,চাঁদ বণিকের পালা(ষষ্ঠ সংস্করণ), কলকাতা,১৪০৬,এম.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স
শেকসপিয়ার রচনাসমগ্র,সংকলন ও সম্পাদনা-তপন রুদ্র,সালমা বুক ডিপো,ঢাকা,২০০০
শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রবন্ধ, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,কলকাতা,১৯৮৬
শোভা সেন, স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ, কলিকাতা,সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, এম.সি,সরকার এণ্ড সন্স, প্রা: লি:
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়,ব্রেশ্‌ট ও তাঁর থিয়েটার,কলকাতা, ২০০২,প্রতিভাস
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়,উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার,কলকাতা,১৯৯৬,প্যাপিরাস
সত্যেন সেন, বাংলাদেশের কৃষক সংগ্রাম,ঢাকা,কালিকলম
সত্যেন সেন,গ্রাম বাংলার পথে পথে,কালিকলম, ঢাকা,১৩৮১
সরোজ মুখোপাধ্যায়,ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (২য় খন্ড)কলকাতা,১৯৮৬,ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
সরদার ফজলুল করিম,নানা কথার পরের কথা, ঢাকা,১৯৮৪
সাইদ-উর-রহমান,পূর্ব বাংলার রাজনীতি,সংস্কতি ও কবিতা,ঢাকা ,১৯৮৪
সিরাজুল ইসলাম চ্যেধুরী, রাষ্ট্রের মালিকানা,ঢাকা,১৯৯৭,বিদ্যা প্রকাশ
সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাংলা নাট্য,ঢাকা,১৯৯৬,বাংলা একাডেমী
সেলিম মোজাহার,স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা,ঢাকা,২০০৮,বাংলা একাডেমী
সুকুমার সেন,বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(৩য় খণ্ড),কলকাতা,আনন্দ পাবলিশার্স
সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা,ঢাকা,১৯৯৮,বাংলা একাডেমী
সুকোমল সেন,ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস,নবজাতক প্রকাশনকলকাতা,১৯৭৬,
সুধী প্রধান,গণ নব সৎ গোষ্ঠীনাট্য কথা,কলকাতা,১৯৯২,পুস্তক বিপনী
সুপ্রকাশ রায়,ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম,কলকাতা,১৯৮৩,পত্রপুট
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ,কার্ল মার্কস জীবন ও চিন্তা,কলকাতা,১৯৯৪,দে'জ পাবলিশিং
সৈয়দ অকরম হোসেন,বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,ঢাকা ,১৯৮৫
সৈয়দ জামিল আহমেদ,হাজার বছর বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা,ঢাকা,১৯৯৫,বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
সৈয়দ শামসুল হক রশীদ হায়দার সম্পাদিত শতবর্ষের নাটক(প্রথম খণ্ড),ঢাকা,১৪০১,বাংলা একাডেমী
সৈয়দ শামসুল হক রশীদ হায়দার সম্পাদিত শতবর্ষের নাটক(দ্বিতীয় খণ্ড),ঢাকা,১৪০১,বাংলা একাডেমী
হায়দার আকবর খান রনো,মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৮২,গণমুক্তি প্রকাশনী

সহায়ক গ্রন্থ(ইংরেজি):

A.C.Bradley, Shakespearean Tragedy(Indian Edition) , Calcutta,1992, Radha publishing House
Ahmed,Syed Jamil,Contemporary Theatre inBangladesh: A Brief Introduction,1989,The Jahangirnagor ReView
Al Deen,Salim, Folk Theatre Traditions of Bangladesh,Dhaka,International Theatre Institute,1991

Bharucha,Rustom, Rehearsals of Revolution,The political Theatre of Bengal,1983,Honolulu,University of Hawaii
Bottomore,Tom et al, A Dictonary of Marxist Thought,1988,Oxford (Blackwell Refernce),
C.P.I. Publication-One year of Freedom, 1948
Dutt Rajani Palme,India To-day,1988,Manisha,
Drama from Ibsen to Eliot, R.W. Williamss
Guhu Thakurata,p. The Bengali Drama:Its origin and Development,London,1930,Kegan Paul, Trench,Trubner
Lenin, V. 1.On Literature And Art.1970.Moscow
Maxim Gorky, `On Literature' (Moscow,ed)
Modern Drama, J.W. Marriett
Martin Esslin,The Theatre of the Absurd,England, 1968,Penguin Books
Marxiist cultural Movement in India (Chronicles and Documents) compiled and edited by Sudhi Pradhan
Mosley Leonard, The Last Days of the British Raj, 1965,Jaico Edition,
Murshid,Khan Sarwar, Contemporary Bengali Writing,Dhaka,1996, UPL
Mukherjee,Sushil Kumar,The Story ofCalcuttaTheatres(1753-1980)Calcutta,1982, K.P. Bangladeshi,Co.
Nehru Jawaharlal, Letters to Cheif Ministers,(Vol.1)
Roy Ajit, Some Reminiscent Notes,1987,Marxist Review,
Ranadive B.T, The Role Played by Communists in the Freedom Struggle, 1985, Social Scientist,
Rehearsals of Revolution the Political theatre of Bengal, by Rustom Bharucha, 1983(First Edition) Seagul Books, Calcutta
Rozhdestvensky Robert, The poet of the New World, Soviet Literature, 1983
Terry Eanleton &Drew Milen eds. Marxist Literary Theory,USA, Bl Sudhi Pradhan,Blackwell publishers
Twentieth Century Drama, R.Gascoigue
Victor Hugo, William Shakespeare(Paris,1864)
Vatsayan Kapila,Traditional Indian Theatre : Multiple Streams, National Book Trust, New Delhi
W.F.T.U. Conference at Peking-Working class in the Struggle for National Liberation, Peking, 1949
Zhukov E.M.etc, Problems of National and Colonial Struggle After the Second World War, People's Publishing House, New Delhi, 1947
20th Century literary Critism,A Reader,Edited by David Loge,LONGMAN GROUP,1972, London & New york

সহায়ক পত্র-পত্রিকা(বাংলা):

অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়,উৎপল দত্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকার,নন্দন,মে ১৯৯২,কলকাতা
অমৃতলোক,বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা,কলকাতা,১৯৯৫
অনুষ্টুপ,নাট্য বিষয়ক সংখ্যা,৩৪তম বর্ষ,২য়-৩য় যুগ্ম সংখ্যা,২০০০
আনন্দলোক,নভেম্বর ১৯৯৩,কলকাতা
এপিক থিয়েটার,উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যা,কলকাতা,মার্চ-১৯৯৪
এপিক থিয়েটার,কলকাতা, মে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা
গণনাট্য: পঞ্চাশ বছর, ডিসেম্বর ১৯৯৩,গণনাট্য সংঘ
গ্রুপ থিয়েটার,১৯৭৯ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা

গন্ধর্ব,উৎপল দত্ত সংখ্যা,১৯৯৩
গন্ধর্ব,বিজন ভট্টচার্য সংখ্যা,আশ্বিন ১৩৮৪
দেশব্রতী,১৪ জানুযারী,কলকাতা, ১৯৬৮
দীপেন্দু চক্রবর্তী, নাট্যকার উৎপল দত্ত: একটি অসম্পূর্ণ মূল্যায়ণ,অনুষ্টুপ,১২ বর্ষ,১ সংখ্যা,১৩৮৪
নাট্যচিন্তা,উৎপল দত্ত সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর,কলকাতা, ১৯৯৩
নাট্যচিন্তা,গ্রুপ থিয়েটারের পঞ্চাশ বছর,কলকাতা,১৯৯৯
নাসিরউদ্দীন ইউসুফ,গণতান্ত্রিক আন্দোলন,গণতন্ত্রের সংগ্রাম,গণতান্ত্রিক লড়াই ও গ্রপ থিয়েটার ফেডারেশন
নাট্য আকাদেমী পত্রিকা,১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত
নিত্যপ্রিয় ঘোষ,লিটল থিয়েটারের প্রথম পাঁচ বছর,আনন্দবাজার পত্রিকা,১৯৯৫(বার্ষিক)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নির্বাচিত সংকলন,কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ,উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা,কলিকাতা, ১৪০৮, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সলিল সরকার ,উৎপল দত্ত কিছু অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা,গ্রুপ থিয়েটার, ১৭ বর্ষ,৪ সংখ্য,১৯৯৫
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌঁছতে হবে মানুষের কাছে,গণশক্তি,শারদ সংকলন,কলকাতা,১৯৯২
সরোজমেহন মিত্র, উৎপল দত্ত:স্মরণ-মূল্যায়ন-জিজ্ঞাসা,গ্রুপ থিয়েটার,১৭ বর্ষ,৪ সংখ্য,১৯৯৫
সুরজিৎ ঘোষ,যে নাটকের রাজনীতি ভুল,তার সব ভুল(একটি সাক্ষাৎকার), দেশ,কলকাতা,৩০.৩.১৯৯১
স্মরণিকা,নাট্যোৎসব,লিটল থিয়েটার গ্রুপ(১৫-১৭ জুলাই)১৯৫৭,রঙমহল
সৌভিক রায় চৌধুরী,উৎপল দত্ত:কিছু স্মৃতি ও আমাদের উত্তরাধিকার,বনানী,১৪ বর্ষ,১৪ সংখ্যা,কলকাতা,১৪০০
শোভা সেন, প্রস্তুতিপর্বের উৎপল ও অগ্রজের অনুস্মৃতি,নন্দন,৩০ বর্ষ,৪ সংখ্যা,এপ্রিল,১৯৯৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সাহিত্য পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা
থিয়েটার স্টাডিজ,জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এরবিভিন্ন সংখ্যা
বাংলা একাডেমী (ঢাকা)-র পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা
উত্তরাধিকার (ঢাকা)-র বিভিন্ন সংখ্যা
থিয়েটার (ঢাকা)-র বিভিন্ন সংখ্যা
থিয়েটারওয়ালা (ঢাকা)-র বিভিন্ন সংখ্যা
লোকায়ত (ঢাকা)-র বিভিন্ন সংখ্যা

সহায়ক পত্র-পত্রিকা(ইংরেজি):

St.Xavier's College Magazine,Calcutta,January 1942,July, December 1947,July,December1948,July 1949,
TheStatesman,Calcutta,28October,25November,3,17December-1947,7JanuaryJ7uly,December-1948,7March,7July,9September,3,7november-1949,January,5,May,8August,27november, 1950,2September - 1951, 7July -1952
Amrita Bazar Patrika,Calcutta, 18August,1950,26 January 1951
Hindusthan Standard,Calcutta,5 May,1950
The Economic Times, Calcutta,20 August,1993
Nag Ashoke - `painting the Stage Red'(Interview), Saterday Times, The Times of India.
Webb John, A Mutiny in 1946, The Statesman, 1986 (5 March)
Charu Prakash Ghose's Crisis in Bengal IPTA, 18th Aug 1946